পান্নালাল দাশগুপ্ত ঃ রচনা সংগ্রহ

রচনা-সংগ্রহ

পান্নালাল দাশগুপ্ত

নবপত্র প্রকাশন □ কলিকাতা-৭৩

ISBN 81-85325-89-8
প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুযাবি ১৯৬৩
প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

টাইপ সেটিং : দি বেঙ্গল পি টি এস এণ্ড কম্পিউটাব সেন্টাব
৯এ বাযবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রক : স্বপনকুমাব দে
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ : গৌতম বায়

মূল্য : ১২৫ টাকা

RACHANA-SANGRAHA
by PANNALAL DASGUPTA

এই সংগ্রহে আছে

চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন?

ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা

গ্রামদেশে কাজ করা

নৌ-বিদ্রোহ

জেলের চিঠি

ভূমিকা

নব্বই বছর পেরিয়ে এসেছি অনেকদিন। সকলেই বলবেন, কি দীর্ঘ জীবনের আমি অধিকারী। অথচ আমার ভাবনা ঠিক বিপরীত। সাহিত্যের ভাষায় আমার বলতে ইচ্ছা করে, জীবন এত ছোট কেন। এই জীবনে কতটুকু কাজ করবার আমি সময় পেলাম! পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় কাটল কারান্তরালে অথবা গোপন আস্তানায়। সেই কিশোর বয়সে রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদ, সাম্যবাদ আরও কত আদর্শবাদের মধ্য দিয়ে কাটল জীবন। জীবনে যতটুকু কাজ আমি করতে পেরেছি অথবা পারিনি, তার জন্য আমার কোনো ক্ষোভ নেই। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ মনে হয়, অনেক কাজ হয়তো সঠিক ছিল, আবার অনেক কাজ হয়তো বেঠিক ছিল কিন্তু সততার অভাব ছিল না কোনোদিন। অসংখ্য যে সব কর্মীকে আমি আমার জীবনের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি, তাদের সততা, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের কথা আমি কখনই ভুলতে পারি না। আমি আছি, অথচ তারা বেশির ভাগই আজ এই সুন্দর পৃথিবীতে নেই। তাদের প্রতি আছে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। আজ আমাকে যতটুকু স্বীকৃতি দেওয়া হয়, সেখানে তাদের অবদানই সবচেয়ে বেশি।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কেটেছে আমার জীবন। অন্যদের থেকে হয়তো একটু স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নানা দল উপদলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। স্মরণীয় অনেক রাজনৈতিক নেতার সান্নিধ্যে এসেছি। কাছ থেকে অনেককে দেখবার সুযোগ ঘটেছে। অনেক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আজ মনে হয় বাংলা থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে কোনো নেতার জন্ম হলো না, তার অন্যতম কারণ এই দল আর উপদল। বাঙালীর আত্মত্যাগ অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি ছাড়া কোনো অংশে কম নয়। ব্যতিক্রম একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁরও সান্নিধ্যে আমি এসেছি। কিন্তু তিনি ঠিক বাংলার মাটি থেকে উঠে আসেন নি।

মার্কসবাদে দীক্ষিত হলেও আমি কখনই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করিনি। আমরা পৃথকভাবে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়েছিলাম। মিলের চেয়ে আমাদের মধ্যে অমিলই ছিল বেশি। কিন্তু আদর্শ ছিল অভিন্ন। রুশ বিপ্লব আমাদের প্রভাবিত করেছিল ঠিকই কিন্তু তুলনামূলকভাবে চীন বিপ্লব আমাদের প্রভাবিত করেছিল অনেক বেশি। রুশ বিপ্লব সার্থক করতে লেনিনকে লেগেছিল দশদিন, আর চীন বিপ্লব সার্থক করতে মাও-সে-তুং-কে লেগেছিল কুড়ি বছর। চীনের লং-মার্চ তো আজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কি অসীম স্থৈর্য, কি গভীর সহনশীলতা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কি আন্তরিক একাত্মতা, মাও-সে-তুং-এর কি অসাধারণ নেতৃত্ব, কি গভীর ঐতিহ্য ও ইতিহাস-চেতনা চীন বিপ্লবকে সার্থক করে তুলেছিল। চীন বিপ্লবের প্রকৃত শিক্ষা আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারিনি।

দমদম-বসিরহাটে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করবার যখন আমরা চেষ্টা করেছিলাম, তখন মাও-সে-তুংই আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন। চীন-বিপ্লবের পথের মতো আমরা মনে করেছিলাম একটি অঞ্চলকে মুক্ত করতে পারলে, সেখানে শিকড় স্থাপন করে বৃহত্তর বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ভাবনার মাঝে আমাদের কোনো ভুল ছিল না। সময় নির্বাচনেও যে ভুল হয়েছে তা নয়। কারণ সময়টা ছিল খুবই অস্থির। আমাদের ভুল হয়েছে

প্রস্তুতির, পরিকাঠামোর। প্রস্তুতি ও পরিকাঠামো ছাড়া যে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না, সে কথা আমরা অনেকেই বুঝেও বুঝে উঠতে পারিনি। আজ অকপটে স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে, দমদমের অসহিষ্ণু, অস্থির শ্রমিক ও স্বপ্নালু তরুণ কর্মীদের চাপেই এই অপরিণত বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। বিপ্লব ব্যর্থ হলেও, এই ঘটনা থেকে আমরা কোনোও ফল-লাভই করিনি, সে কথা আজও আমি মনে করি না।

কিছুদিন আগে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আমরা পেরিয়ে এলাম। এই প্রসঙ্গে রাজনীতিক ও বিদ্বদ্‌জনের অনেক লেখা পড়বার সুযোগ ঘটল। কিন্তু কারুব ভাবনাই আমাকে কোনোভাবেই নাড়া দিল না। জানিনা আমার বয়সের দোষ কিনা। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কেউই মূল সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি বা চাননি। আমাব মতে আমাদের সামনে মূল এবং জ্বলন্ত সমস্যা হলো ভোগবাদ। ভোগবাদ শুধুমাত্র আমাদের মতো দরিদ্র দেশ নয়, সারা পৃথিবীকেই গ্রাস করছে। ভোগবাদকে পরাস্ত করতে না পারলে মানব সমাজের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সশস্ত্র বিপ্লবের চেয়ে আরও অনেক কঠিন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ ভে' বাদের প্রভাব। এই ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে করতে হবে তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

শেষবারের মতো কারান্তরালে থাকবার সময় আমি "গান্ধী গবেষণা" রচনা করেছিলাম। সেই সময়ের প্রায় তিন দশক পরে 'নবপত্র-প্রকাশন' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে গান্ধী বা গান্ধীবাদ সম্পর্কে আমি আমার মূল্যায়ণ বা অভিমত তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। সেই সময়েই আমি অনুভব করেছিলাম ঐ একটি মানুষই প্রকৃতভাবে ভারতবর্ষকে চিনতে পেরেছিলেন। আর চিনতে পেরেছিলেন বলেই কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তিনিই আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। আমরা যারা বিপ্লবের দীক্ষায় সেদিন দীক্ষিত ছিলাম তারা কেউই গান্ধীকে বুঝতে পারিনি। সত্যিই যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়তো অন্যরকমভাবে লিপিবদ্ধ হতো।

ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গান্ধীকে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের কোনোও উপায় নেই। কখনও সে লড়াই হবে নীরব, কখনও সোচ্চার। দৈনন্দিন জীবনচর্চার ক্ষেত্র থেকেই শুরু করতে হবে সেই লড়াই। নিজে ত্যাগ না করলে অপরকে ত্যাগের কথা বলা যায় না। গান্ধী তাঁর জীবনচর্চা দিয়েই অন্যকে প্রভাবিত করেছিলেন, শুধু কথা বা বক্তৃতা দিয়ে নয়।

আমি সারাজীবনই নাস্তিক। কখনই ঈশ্বর বিশ্বাসী নই। ধর্মকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখবার কথা কখনই ভাবিনি। ধর্ম বলতে আমি লোকাচার বা কুসংস্কারের কথা বলছিনা, ধর্ম-ভাবনার কথা বলছি। আমরা যারা ধর্মকে অস্বীকার করেছিলাম, বা আজও করি, সেই বিরুদ্ধাচরণ ভাবনা কি আমরা আমাদের ঘরেই প্রতিফলিত করতে পেরেছি? আমার অভিজ্ঞতা বলে, পারিনি। ধর্মানুষ্ঠান হয় না, এমন কোনোও পরিবার খুঁজে পাওয়া প্রায় দুষ্কর। ধর্ম, তা সে যে কোনো ধর্মই হোক্ না কেন, তার মূল সত্য হল ত্যাগ, সেবা ও আত্মসমীক্ষা। ধর্ম আর ধর্মাচার কিন্তু এক নয়। প্রকৃত ধার্মিক কিন্তু অন্য ধর্ম-বিরোধী হন না। ধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই। সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ ধর্মকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে। যে প্রকৃত ধার্মিক, সে তার ঈশ্বর-সাধনা করতে চায় একান্ত সংগোপনে, প্রকাশ্যে কখনই নয়। এই কথাগুলি আজ

আমি একটি কারণে বলছি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে অনুভব করছি, ধর্মবিশ্বাসকে আমরা আঘাত করলাম ঠিকই কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য কোন্ বিশ্বাসের আমরা জন্ম দিতে পারলাম? আমার মনে হয় এই প্রসঙ্গে আজ গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন। আত্মত্যাগ, সেবা ও আত্ম-সমীক্ষা যখন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত এবং এই তিনটি গুণাবলী ছাড়া মানব-সমাজের অগ্রগতিও সম্ভব নয়, তখন কোন্ পথের সন্ধান আমরা দেখাতে পারি? অন্য কোনো পথের সন্ধান না করে গান্ধীজী তাঁর ভাবনায় ধর্মকে বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক গান্ধীকে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ গান্ধীকে ভাবা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

আমার শেষ জীবন কাটল গ্রাম-সেবায়। সেবা বলা বোধহয় ঠিক হল না। গ্রামের কাজে বলতে পারা যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী গ্রামের দুর্বিষহ দুঃখ বেদনা ও যন্ত্রণার সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। যাঁরা রাজ্য বা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাঁরা গ্রামকে কতটুকু চেনেন সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আমি যে পূর্ণমাত্রায় চিনি সে দাবিও করছি না। কিন্তু আংশিক চিনবার দাবি তো নিশ্চয়ই করতে পারি। আমাদের পরিকল্পনায় গ্রাম-সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলা আছে, গ্রামের জন্য প্রচুর অর্থও বরাদ্দ আছে। কিন্তু তার ফললাভ গ্রামবাসী কতটুকু করতে পেরেছে সে কথা ভাবার আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন। কোনো কাজ হয়নি, এমন কথা আমি কখনই বলছিনা বা আমি কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুলও তুলছি না। আমি দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছি। কিন্তু গ্রাম-সেবা যেরকম বিলাসিতার পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে আমি শঙ্কিত বোধ না করে পারছি না।

এতসব কথা তো বললাম, কিন্তু মানুষকে সজাগ বা সচেতন হওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে কে? আমি বিশ্বাস করি, এই দায়িত্বভার একমাত্র গ্রহণ করতে পারেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা, অন্য কেউ নয়। বক্তৃতার ওপর মানুষের আর বিশ্বাস নেই। আলোচনা সভার প্রতিও মানুষের আস্থা কম। ছোট বড় যে কোনো সভাতেই জমায়েত হলেও সেখানে মানুষের হৃদয়ের কোনো স্পর্শ থাকে না। কোনো কথাই তাদের মনে আর সাড়া জাগায় না। সেক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকরা যদি জীবনকে প্রকৃতভাবে তাঁদের শিল্প-সাহিত্যে তুলে ধরতে পারেন, মানুষ যদি সেই শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে তাদের জীবনের সন্ধান পায়, তাহলে পরম শ্রদ্ধায় সেই শিল্প-সাহিত্য ও তার স্রষ্টাকে গ্রহণ করবে। পৃথিবীর যে কোনো সঙ্কটে শিল্প সাহিত্যই পথ দেখিয়েছে। অন্য কেউ পারেনি। আমি বিশ্বাস করি প্রবীণ এবং তরুণ শিল্প-সাহিত্যিকরা আমার কথা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারবেন। গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার তাঁদের, আমার নয়।

পরিশেষে, এই রচনাসংকলন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চাই। শুরুতেই আমি আমার ছন্নছাড়া জীবনের কথা বলেছি। তার ফলে কোনো কিছুই গুছিয়ে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কখন কোথায় কিভাবে থাকতে হয়েছে তা আমি নিজেও জানতে পারিনি। এই রচনা সঙ্কলনের প্রকাশের তাগিদে যখন আমাকে ব্যতিব্যস্ত করা হতে লাগল, তখন আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। হাতের কাছে কপি পাওয়া দূরে থাক, কোন্ মুহূর্তে, কোন্ পরিস্থিতিতে কখন কি লিখেছি তা আমার কাছে স্পষ্টভাবে মনেই পড়ে না। আমার কিছু গুণগ্রাহী যখন আমার নানা রকম রচনা সংগ্রহ করে আমার সামনে তুলে ধরলেন, তখন আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। যে রচনাগুলি তাঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, সেগুলিই কালানুক্রমিকভাবে এখানে

সাজানো হয়েছে। এখানে প্রকাশিত রচনাগুলির অনেক বক্তব্যের সঙ্গেই আজ আমি একমত নই, অনেক বক্তব্য থেকে আজ আমি দূরে সরে এসেছি। তবুও সেই সব বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা একেবারে হারিয়ে গেছে বলে আমি মনে করি না। "জীবনে কোনোকিছুই ফেলা যায় না"— সেই বিচারে আমার অতীতের এই বচনাগুলি সামান্য হলেও কিছু মূল্য হয়তো পেতে পারে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নানা সময়ে নানা ছদ্মনাম আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছিল। এখানে সেই ছদ্মনাম তুলে নিজনামেই সব প্রকাশ করলাম। কিন্তু উদ্যোক্তাদের বাসনা আরও কয়েক খণ্ডে তাঁরা আমার রচনা প্রকাশ করবেন। উদ্যোক্তাদের দুঃসাহস দেখে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছি।

এই সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন নীরেন দাশগুপ্ত, তুষার কাঞ্জিলাল, নমিতা দাস, অঞ্জলী বসু, শক্তি ভট্টাচার্য, চৈতালী দত্ত, অশোক বসু, অমিতাভ সেনগুপ্ত ও মনীশ পাল। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পান্নালাল দাশগুপ্ত

চেতনা, প্রেরণা ও সংঘাত

বর্তমান স্বাধীনতার নৈতিক দুর্বলতা

স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানেব সব চেয়ে বড় অভাব হলো উপযুক্ত মানসিক সম্পদের অভাব। একটা দেশকে, জাতিকে মানুষ করে তোলার জন্য যে প্রাণেব আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া দরকার, যে আকুল ঐকান্তিকতা ও জাগরণ সৃষ্টি হওয়া দরকার সর্বস্তরেব লোকের মনে—অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে ভারতে বা পাকিস্তানে তার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ বা জনসাধারণ যদি একটা সাড়া পেয়ে থাকে—জাগরণের দুর্বার আকাঙক্ষা যদি পায়—তবে অন্যান্য অভাব অভাবই নয়। পৃথিবীতে এর চেয়ে অনেক কম সম্পদ, অনেক কম লোকবল নিয়ে অনেক জাতি এব আগে জেগেছে এবং মহাকীর্তি রেখে গেছে ইতিহাসের পাতায়— কিন্তু আজ আমাদের এত অসহায়, এত দুর্বল মনে হচ্ছে কেন?

কয়লা, তেল, মাটি, লোহা, জলস্রোত, বিদ্যুৎশক্তির সম্ভাবনা, জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষিত লোক, শ্রমশক্তি—এর যে কোনোটির দিক দিয়ে হিসাব করলেও হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানের ভয়ানক কিছু অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। জাপান, ইটালি, ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা লোকবলের তুলনায় আজকের খণ্ডিত ভারতের কোনো খণ্ডিত অংশই কোনো অর্থে দরিদ্র নয়। তথাপি আমাদের এত ভয় কেন? ভাবত অথবা পাকিস্তানের কাশ্মীরে প্রযোজন এত বেশি বলে কেন মনে হয়? কাশ্মীরেব প্রাকৃতিক সম্পদ ও মুষ্টিমেয় লোক কয়টি না হলে পাকিস্তানের বা হিন্দুস্থানের এমন কি দুর্বলতা থাকে যার জন্য বিশাল ভূখণ্ডের পুনর্গঠন সম্ভব নয়? ত্রিশ কোটি লোকের হিন্দুস্থানে এবং দশ কোটি লোকের পাকিস্তান আজও পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। তথাপি এত লোক ভাগে পড়ার পরেও, কে কোন দিকে লোক টেনে রাখতে পারি তাব জন্য এত রাজনীতি, যুদ্ধ আর দাঙ্গা কেন? দাঙ্গা করে একদিকে লোকক্ষয় করবার চেষ্টা চলেছে—অপর দিকে ক্রমাগত বেশি জনপদ আয়ত্তে বাখবার দুর্দান্ত চেষ্টা চলেছে—এই অর্থহীন পরস্পর-বিরোধী মনোভাব কেন?

মানুষকে দূরে ঠেলে দেবার দৈনন্দিন চেষ্টা চলেছে আমাদের—ভাইকেও ভিন্ন করে দেবার চক্রান্ত চলেছে ঘরে ঘরে—আপনাকে পর করে দেবার চেষ্টা চলেছে অহর্নিশি—পারিবারিক দারিত্ব, আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব এড়াবার জন্য কত না চাতুরী করে থাকি—অথচ কাশ্মীর আমাদের চাই, জুনাগড় না হলে চলবে না—আমাদেব পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সীমানাকে দিগন্ত-প্রসারী করতে চাই—এই দুই পরস্পব-বিরোধী মনোভাবের সঙ্গতি কোথায়?

সঙ্গতি নেই বলেই আমাদের চাওয়ার পিছনে সত্যিকার কোনো তাগিদ নেই—অর্থহীন হাঁকপাঁক করা ছাড়া তার কোনো সত্যিকার প্রেরণা নেই—দায়িত্বহীন বিশৃঙ্খলা কেবলই বাড়িয়ে চলেছি। এবং সকল উদ্যম, সকল চেষ্টা এই অর্থহীন দাবিদাওয়ার পাথরে আঘাত খেয়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। দেশের বুকে কোনো সত্যিকার জাগরণ মাথা তুলে উঠতে পারছে না—যা সত্যিকারের গঠনমূলক—যা সত্যিকারের শান্তিসূচক—যা সত্যিকারের আশাপ্রদ। উন্মাদনা আছে—কিন্তু সে কেবল বিদ্বেষের, ঝগড়ার, ঈর্ষার, দাঙ্গাহাঙ্গামার—মনেব নীচ প্রবৃত্তিগুলি যাতে ইন্ধন পায়। সৎ প্রবৃত্তিগুলি, সৎ চিন্তাগুলি কোনো প্রেরণা পায় না।

দেশের নেতারা—কি পাকিস্তান, কি হিন্দুস্থান সর্বত্র এই অভাবটা লক্ষ্য করে ভয় পেয়ে উঠেছে। এই সব খণ্ডিত দেশের জননায়কেরা আশা করেছিলেন দু'শ বছর পরাধীনতার পর

আমরা যে আজ আবার স্বাধীন হয়েছি এটাই মস্ত পাওনা—মস্ত বড় সম্পদ। হৃতসর্বস্ব, ক্লান্ত, দরিদ্র, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন জনগণকে মানুষ করে তুলবে—আস্তে আস্তে—ধীবে ধীরে দেশটাকে গঠন কবে তুলবে—কিন্তু দেশবাসী যেন তার জন্য প্রস্তুত নয়—তারা অবুঝ, সহ্যশক্তি নেই, সহনশীলতা নেই, ধৈর্য নেই, গঠনমূলক প্রেরণা নেই, আত্মত্যাগেব মহিমাবোধ নেই, স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করবার আগ্রহ নেই—কেবলই দাও দাও করছে, অধিকারের দোহাই তুলছে—কিন্তু দায়িত্বের দায় নিতে চাইছে না। কত দেশ তো কত দুঃখ ববণ করে নিজেদের গড়ে তুলেছে—বিপ্লবের পরে লেনিন রুশবাসীদেব আধপেটা খেয়েও দাঁড়াতে বলেছেন—তথাপি মাথা নত করতে নিষেধ করেছেন—প্রাণের ও দৃষ্টির অপূর্ব সাড়া জেগেছিল সেদেশে—একটা দরিদ্র, অশিক্ষিত দেশ কোমব বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এক হয়ে নিঃস্বার্থপর প্রেরণায় কত পিছিয়ে পড়া দেশটাকে রাতারাতি কত দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে! কিন্তু আজকের জননায়কবা কি দেশবাসীব কাছে সে বিশ্বাস, সে ত্যাগ, সে সহিষ্ণুতা, সে কষ্ট দাবি করতে পাবে না? রাশিয়ার তুলনায় লোকবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পশক্তি, শিক্ষিত লোকের অভাব তো কিছু নেই। তথাপি এই অবাজকতা, এই দৈন্য, এই কলুষিত আবহাওয়া কেন? ঘুষ, চুরি, জোচ্চুরি, কালাবাজাব, শিশুহত্যা, নাবীনির্যাতন, গৃহদাহ, পরগনার পব পবগনা দাঙ্গায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া, পাইকাবী দরে নাবীর উপব বলাৎকার, জোরজবরদস্তি, প্রভৃতি যে সব ঘৃণ্য প্রবৃত্তির আজ ব্যাপক ঝড় বইছে—তাতে সমস্ত দেশেব আবহাওয়ায় এক কুৎসিত, ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি কবেছে। জনসাধারণও এই চিত্র থেকে বাদ যায় না। যারা চোবাকারবারী, দুষ্ট নেতা তাদেবই বুদ্ধিতে প্রভাবিত হচ্ছে জনসাধাবণ এবং তারা তাদের প্রভুদেব অনুকরণ কবতে গিযে কোনো ভব্যতা বক্ষা করতে পারছে না—নির্লজ্জ পাপের নমুনা দেখাচ্ছে । যারা ধনী, যাবা ক্ষমতাপন্ন তারা তাদের লোভ ও জঘন্য হিংসা আইনানুগ ও সভ্যতা-সাপেক্ষ-শালীনতাব মধ্যে ঘিরে রাখতে পাবছে—তাদের লোভ যুদ্ধ নামক আইনসঙ্গত হত্যালীলার ব্যাপক অভিযান চালিয়েও তা দেশপ্রেম নামে চালিয়ে দিতে পারছে—কিন্তু যাবা নিঃস্ব, যাবা গবিব তাবা প্রভুদের অনুকরণে তাদের লোভকে চালু কবতে গিয়ে নির্লজ্জ লুঠ, দাঙ্গা ও নারী-নির্যাতন করে ফেলছে। মূলত একই জাতীয় প্রেরণা—অর্থাৎ ধনতন্ত্র থেকে উদ্ভুত একই জাতীয় মানসিক প্রেরণা—যা হলো ব্যক্তিগত ভাবে কে কত দখল কবে নিতে পাবি—এই মারাত্মক লোভই আজ কি ধনী, কি নির্ধন সবাবই মানসিক সম্পদ বা কর্মপ্রেরণা। এতে সমাজ সেবার নামে ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থতাব এক অবিবাম অন্তর্দাহ চলেছে। এই মানসিক সম্পদ নিয়ে আজকের দেশগঠন করা অসম্ভব।

দেশগঠন করতে যে মানসিক সম্পদ ও মানসিক বল দরকাব তার সৃষ্টি না হবার দরুন আজ দেশে এত লোকবল, এত সম্পদ ও তার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যেন কিছুই নেই। কেবল ভাঙবার, নষ্ট করবার প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তিগুলিই আছে—গড়ে তোলবার আগ্রহ নেই। মানুষের সমাজ মানুষকে দিযেই গড়া সম্ভব। মানুষ দরিদ্র হতে পারে, দেশের কলকব্জা তেমন না থাকতে পারে, কিন্তু যদি আজকের এই স্বাধীনতা দরিদ্র জনসাধারণের বুকে এনে দিতে পারত এক জাগরণ—যদি সমর্থ হতো তার ভিতরকার অন্তর্নিহিত জাগরণীকে স্পর্শ করতে—তবে মুহূর্তে এই সব বাধা বা অভাবকে তুড়ে ফেলে দিত—সহনশীলতা, ধৈর্য, কর্মপ্রেরণা, ত্যাগ ও বলিষ্ঠতার কোনো অভাব হতো না। এইখানেই আজকের এই তথাকথিত স্বাধীনতা সব চেয়ে বেশি বিফল হয়েছে—জাতীয় নেতৃত্ব সব চেয়ে পরাজিত হয়েছে এইখানে—অর্থাৎ দেশে উপযুক্ত মানসিক সম্পদ ও মুক্তির আবহওয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। বরং যেন কোনো এক

অজ্ঞাত নরককুণ্ড থেকে বিষাক্ত যত পাপবুদ্ধি সমাজের সমস্ত স্তরে কিলবিল করে এগিয়ে এসেছে—মানুষের সমাজে এত জঘন্য পাপ কোথায় লুকিয়ে ছিল যা পশুবৃত্তিকে লজ্জায় হার মানিয়ে দেয়—যা হাজার হাজার বছরের শিক্ষা, নিবৃত্তি, শাসন ও ধর্মকে অগ্রাহ্য করে সাক্ষাৎভাবে সর্বনাশ করতে প্রবৃত্ত—এ দেখেও আশ্চর্য হতে হয়।

তথাপি বর্তমান নেতারা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা এখনো মনে করেন এই আবহাওয়ার ভিতরেও দেশ গঠন করা সম্ভব। তাঁদের এই প্রকার বিশ্বাসের মূল কোথায়? তাঁদের বিশ্বাসের মূল হলো সেই একই জাতীয় মনোভাব—যে দেশগঠন করবে তারা—যারা শিক্ষিত, যারা বুদ্ধিমান—দেশের লোক নয়—যারা সবাই অশিক্ষিত, অবুঝ। শিক্ষিত লোকেরা সব ঝামেলা ধৈর্য ধরে মাথায় নিয়ে এক অশিক্ষিত বর্বর জনসমুদ্রকে সামলিয়ে নেবে—এই বন্য পশুর মতো বর্বর জনসমুদ্রকে দরকার হলে ডাণ্ডার জোরে ঠাণ্ডা রেখে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আইনকানুন, জেলহাজত, গুলিগোলা ও গ্যাস দিয়ে হলেও বর্বর দেশবাসীকে তাদের কথামতো কাজ করিয়ে নিতে হবে, কেননা রাষ্ট্র-কর্তাদের উদ্দেশ্য সাধু এবং ক্রমে ক্রমে জনতা এই সাধুতা স্বীকার করে নেবে। যে দেশের লোক নিজেদের ভাল নিজেরা বোঝেনা, তাদের এ ছাড়া গতি নেই—এই হলো বর্তমান রাষ্ট্র-কর্তা ও জননায়কদের চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারায় এগুতে গিয়ে—শিক্ষিত লোকদের উপর ভরসা করতে গিয়ে—ক্রমেই এবং স্পষ্টত এমন একদল লোকের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে—যারা ব্যবসায়ী, ধনী, জমিদার ও উচ্চশিক্ষিত অনুচর শ্রেণী বা ইন্টেলিজেন্সিয়া—কেননা শিক্ষিত ও বুঝবান লোক হবার সৌভাগ্য এদেরই হয়েছে। রাষ্ট্র ও নতুন সমাজের গঠন ভিত্তি যদি ধনতন্ত্রকেই ধরে নেওয়া হয—যা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের গঠন নীতি—তবে মানসিক বাহনও হতে বাধ্য ধনতান্ত্রিক মানসিক সম্পদ বা 'ইডিওলজি'। অতএব দেশগঠনের জন্য যে মানসিক প্রেরণা দরকার সেই প্রেরণা এই উচ্চশ্রেণীর মানসিক প্রেরণাতে আজ পর্যবসিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এবং এরই জন্য দেখতে পাই যে 'আজ জনগণের উপর নির্ভর করা তাদের সম্ভব হচ্ছে না—জনগণকে শ্রদ্ধা করতে পারছে না—বরং ঘৃণা করতে, ভয় করতে শুরু করেছে। জনগণের মধ্যে অন্য রকম কোনো প্রেরণা জাগাতে তারা অসমর্থ কেননা তাদের মূলগত ভিত্তি জনসাধারণের মূলগত স্বার্থের বিরোধী। তাই তাদের আবেদন নিবেদন জনসাধারণকে বুঝবান, বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল হবার আহ্বান বধির বা কালা কানের উপর পড়েছে—কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না।

যদি ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির কোনো ভবিষ্যৎ থাকত—তবে ধনতান্ত্রিক মানসিক ধর্ম ও ডাকের ভবিষ্যৎ থাকত—যেমন একদিন ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, ওয়াশিংটন বা নেপোলিয়নের ডাকের অর্থ ছিল। আজ জাতীয়তাবাদ সেই প্রেরণা জাগাতে অসমর্থ। আজ তাই জাতীয়তাবাদের ভারত ও পাকিস্তান দেশ গঠনের কাজে ঘুষখোর রাজকর্মচারী, চোরাকারবারী, অসৎ কণ্ট্রাক্টর, খুনি ব্যবসায়ী, নির্লজ্জ খোসামোদপ্রবণ তাঁবেদার ও অনুগ্রহ-প্রার্থীদের ওপর একমাত্র নির্ভর করতে পারে এবং করে থাকে। নইলে উপায় কি—অবুঝ বর্বর জনসাধারণকে যখন জাগানো যায় নি—তারা যখন দায়িত্ব বুঝতে নারাজ—তা যত দূষিতই হোক ধনতন্ত্রের দালাল ও অসৎ রাজকর্মচারীদেরই উপর নির্ভর করতে হবে—তারা নিজেদের স্বার্থ যতই দেখুক—দেশনেতাদের সাক্ষাৎভাবে আনুগত্য দেয় তো—অবুঝ তো তারা নয়—অধৈর্যও নয় ইত্যাদি এই হলো বর্তমান শাসনকর্তাদের মানসিক চিত্র। ব্যবসায়ীদের অতিশয় লোভী না হবার জন্য এবং কর্মচারীদের অসৎ না হবার জন্য তাঁরা আবেদন নিবেদন করে চলেছেন এবং মনে করেন এমনি

করে কিছুকাল কাটিয়ে দিতে পারলেই দেশের উপর তাঁদের ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং জনগণ কিছুটা শান্ত ও বুদ্ধিমান হবে এবং শেষ পর্যন্ত ভালই হবে ইত্যাদি।

মোট কথা জনগণের দুর্গতিতে রাষ্ট্রনায়কেরা ততটা ভয় পাচ্ছেন না—যদি আবেদন করে সাড়া না পাওয়া যায়—তবে গুলি করে ঠাণ্ডা রেখেও কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি এ করেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো তবে এই প্রচণ্ড পন্থায় চলা শেষ পর্যন্ত সার্থক হতে পারত। কিন্তু আজ আর এই ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদেব গণ্ডীর মধ্যে এক পা'ও এগিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও আত্মরক্ষার মূলগত ব্যাপারে।*

ফলে দেখা যাচ্ছে প্রতি পদে পদে বাধা দাঁড়াচ্ছে, এক পা এগিয়ে চলেছে তো তিন পা পিছিয়ে আসছে—যার ফলে রাষ্ট্রনাযকরা সামনের দিকে না গিয়ে সোজা ঘুরে উল্টো দিকে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন—দু'শত বছর আগেকার পৃথিবীতে যেতে পারলে যেন বেঁচে যান—এবং পিছন দিকে যাওয়া সম্ভব মনে কবে পিছন দিকে সোজা রওনা হতে চাইছেন। কিন্তু পিছনে ঝুঁকে পড়া সহজ মনে হলেও পিছন দিকে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়—কেননা ইতিহাস সত্যি পিছনে যেতে পারে না—বর্তমানটা আঁকড়ে ধরে রাখবাব জন্য সামনে দিকেব উপব দেয়াল দাঁড় করিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায় মাত্র। ফলে অযথা অনর্থ বেড়ে যেতে থাকে—অযথা বিপদ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে—যেমন এসেছে সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তান হিন্দুস্থানের লড়াই রূপে।

মোট কথা ফাঁকি দিয়ে, জনসাধাবণের অজ্ঞাতে জনসাধারণের সাক্ষাৎ সহযোগিতা ও সজ্ঞান নিষ্ঠা বাদ দিয়েই দেশগঠনের নামে যা হচ্ছে তা হলো দেশেব ধ্বংস। জনসাধাবণেব দেশ জনসাধারণ নিজ হাতেই গড়বে এবং সজ্ঞানে। তার উপযুক্ত মানসিক সম্পদ ও শক্তি আজকের ধনতন্ত্র বা গতায়ু জাতীয়তাবাদ যোগাতে পাবে নি। নৈতিক শক্তি ও বীর্যবান মনোভাব জনসাধারণের সাধারণ গুণ হিসাবে দাঁড় করাতে না পারলে কোনো দলই দেশগঠন করতে পারে না। চাবদিকে আজকেব নৈতিক দুর্গতি ও অধঃপতন সম্বল করে কোনো নেতা বা কোনো দলই কিছু করতে পারবে না।

মহাত্মা গান্ধী

সর্বসাধাবণের মধ্যে একটা নৈতিক বল ও জাগরণ আনবাব ক্ষমতা তবে কি বামপন্থী সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীরা রাখে? এইটাই আজকের দিনে এক বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। যে মানসিক সম্পদ ও সত্যিকার জাগ্রত চেতনা বর্তমান ধনতন্ত্রপন্থী নেতারা জাগিয়ে দিতে অসমর্থ হয়েছে—তা যদি বামপন্থীরাও না জাগাতে পারে তবে ধ্বংস অনিবার্য। মনে রাখতে হবে আজ শুধু দেশগঠনের জন্য মামুলি গঠনমূলক মনোবৃত্তি জাগাতে পারলেই যথেষ্ট নয়—পরস্পর ঈর্ষা ও দাঙ্গার কলুষিত আবহাওয়া ও সর্বপ্রকার দুর্নীতির দূষিত আবহাওয়াব প্রতিষেধক বলিষ্ঠ মনোবলই শেষ কথা নয়—প্রচণ্ডতম আঘাত, আণবিক বোমাব আঘাত সহ্য করতে পারে এমন মনোবল সৃষ্টি করতে হবে দেশে—নইলে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে হার মানতে মানতে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় একপ্রকার বশ্যতা ও দাসত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। বর্তমান মানসিক দুর্গতির চেহারাটা দেখে সেই নির্ভীকতা ও নৈতিক বল কখনো আমাদের হবে এ যেন বিশ্বাস করতে

* নারায়ণ গুপ্তের 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন?' দ্রষ্টব্য।

চায় না কেউ। অথচ এই প্রস্তুতি, এই শক্তিই শেষ পর্যন্ত আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হতে পারে। প্রত্যাঘাত করার মতো সামরিক অস্ত্রশস্ত্র যতই আমরা ব্যাপকভাবে জনগণকে দিতে পারি না কেন—শত্রুপক্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের তুলনায় কখনোই তা সমকক্ষ হবে না—অস্ত্রের অনটন ও দুর্বলতাকে মনের শক্তি দিয়ে পূরণ করে নিতে হবে—তা এক-আধটি লোকের মনোবল নয়—সমগ্র জনতার মনোবল।

উদ্যম, উৎসাহ, উদ্দীপনা, নির্ভীকতা, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি জাগরণের মনোবৃত্তিগুলির জন্ম কোথা থেকে—কোন অবস্থায়—কি কারণে—তা প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে কখনো কখনো দেখা দেয়—আবার কি কারণেই বা তা একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায়, এই সব চিত্তবৃত্তির রহস্যজনক জাগরণ ও মৃত্যুর গূঢ় কারণগুলি এবারে অনুসন্ধান করতে হবে। সমাজের কোন গহনপুরীতে এই সব দেবতাসুলভ মনোবৃত্তি লুকিয়ে আছে তাকে আবিষ্কার করতে হবে। দৈব ব্যাপারের মতো তাকে অনিশ্চিত ব্যাপার বলে হাঁ করে তার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। এইসব অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক চেতনা, মনোবৃত্তির উপাদান ও কার্যকারণ সম্বন্ধগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা দরকার, তা নইলে আমাদের কার্যকলাপের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা আসতে পারে না, আমাদেব আশাবাদী হবার কোনো সত্যিকার ভিত্তি তৈরি হয় না এবং একটা দৈবশক্তির উপর নির্ভর কবে চলতে হয়। প্রাকৃতিক শক্তি ও নৈসর্গিক শক্তির উপব বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি মানুষের প্রভুত্ব কায়েম হতে পারে তবে মানুষের মনেব উপর বিশেব কবে সামাজিক মনের উপর মানুষের হাত কেন সুদৃঢ় হবে না এই প্রশ্ন আজ তুলতে হবে। যদিও জানি সামাজিক মন সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর কবে কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি কোনো একটি মাত্র পরিস্থিতি নয়, বরং পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির উপর একটা অস্থায়ী সমন্বয়ের ধারা মাত্র। সেই দ্বন্দ্ব জড়িত নিত্য প্রবাহিত ঘটনার ঘর্ষণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও তার ভিতরকার ব্যক্তিরা কখন কেমন ব্যবহার করবে তা কেবল কতকগুলি মোটামুটি সূত্র আউড়ে গেলেই চলবে না এবং বলে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না যে শেষ পর্যন্ত মানুষের মন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারাই নির্ণীত হবে। শেষ পরিণতি কোন বাস্তব নিয়তির দ্বারা নির্ণীত হবে সেটা তো আজকের কর্মীর ভাবনা নয়--আজকের কর্মীর ভাবনা আজ এবং আজকের মনোবৃত্তিকে তার অনুকূলে সজ্ঞানে গঠন কবে নেওয়া। বলিষ্ঠ হাতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে তাকে সামাাজিক মনের গতিকে ইচ্ছামতো—তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্মত ইচ্ছামতো—প্রবাহিত করে ছাড়তে হবে, এই হলো কর্মীর কাজ। ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে শেষ শুভ পরিণতির অনিবার্য সম্ভাবনার ভরসায় বসে থাকা তার কাজ নয়। মানুষের মনোবৃত্তিকে জোর করে হলেও আজ তাকে তার প্রকৃত পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে—উপযুক্ত মনোবল তাকে সৃষ্টি করতে হবে—আবিষ্কারের পথ সৃষ্টি করতে হবে। অতএব মনের রহস্যজনক চলাফেরার নিয়মটাকে অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো আবিষ্কার করতে হবে তাকে এবং কার্যোপযোগী ব্যবহারিক উপায় তৈরি করে নিতে হবে।

আজ দেশে আশা করা যায়, ভরসা করা যায় এমন নৈতিক শক্তির বিকাশ হলো না : দেখেছি তখন কিন্তু এ কথাটাও লক্ষ্য করা উচিত যে গত পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতের গগনে কম বড় বড় রোমহর্ষক বক্তা, চিত্তাকর্ষক নেতা ও মহাত্মা-জনসুলভ নীতিবাদীর উদয় হয়নি। ইয়োরোপে, জাপানে অথবা আমেরিকায় ঐতিহাসিক দেশনায়কেরা যে এর চেয়ে বেশি বক্তৃতা করেছিলেন এমন বলা যায় না—সেদিনকার প্রেস, প্রোপাগাণ্ডা, বেতার ইত্যাদি যান্ত্রিক সাহায্য আজকের ভারতীয় নেতাদের তুলনায় খুবই কম—

তাদের লেখা বইপত্রও আজকের ভারতের স্বদেশী সাহিত্যের তুলনায় নগণ্য—এবং এত দীর্ঘদিন ধরে এত বক্তৃতা করার—বোধ হয় একমাত্র বক্তৃতা করবার সুযোগ ইংরেজের মতো কোনো রাজশক্তিই দেয় নি একথা আজ সততার খাতিরে স্বীকার করতেই হবে। তা ছাড়া ধর্ম ও নীতির এতবড় প্রচারক ইয়োরোপ কোনো কালেই জন্ম দিতে পারেনি যেমন পেরেছে এই ভারত আজকের এই কলিযুগেও মহাত্মা গান্ধীর মধ্য দিয়ে। অহিংসার এত বড় বাণী এত দীর্ঘকাল ধরে প্রচার ও নিজ জীবনের উপর দিয়ে ভয়াবহ পরীক্ষা চালিয়ে গান্ধীজী দেশে নৈতিক উন্মেষ করবার যে চেষ্টা করেছিলেন তার তুলনা বিরল। তথাপি আজ দেশে নৈতিক গুণাবলীর এত অধঃপতন ও এত দ্রুত অধোগতি হয়ে গেল কেন? দেখতে না দেখতে চোখের সামনে মহাত্মাজীকে যেন ব্যঙ্গ করে দেশের আবহাওয়া তার শিক্ষার সম্পূর্ণ উল্টো পথে ধেয়ে চলেছে। জনসাধারণ—অশিক্ষিত জনসাধারণ তো দূরের কথা তাঁর একান্ত আপনার নিজ শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যেও নৈতিক পচনের ধারা মহাত্মাজীকে লজ্জা দেয়। জনসাধারণের সম্পত্তির ট্রাস্টি হিসাবে ধনপতিদের তিনি যে আশীর্বাদ ছলে শিক্ষা অথবা শিক্ষার ছলে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন তাদের মনোবৃত্তিকে এতটুকু কম জঘন্য তিনি করতে পারেন নি। পৃথিবীতে এবং এই ভারতেই ইতিপূর্বে ধনীকে ধনত্যাগ করে, রাজাকে সিংহাসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বৈরাগ্যধর্ম নিতে দেখা গেছে—কিন্তু সেই ভারতে আজ গান্ধীজী একটি শেঠকেও তার নির্লজ্জ শোষণ-নীতি থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হননি—খদ্দর-সুশোভিত শেঠজীর অহিংসার-নামাবলীর অন্তরালে তাদের লোভ দিন দিন বাড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে—কোথাও কিছুমাত্র ত্যাগ বা সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান বাড়াতে পারেননি। তা ছাড়া ঘুষ, চোরাকারবার, স্বজনপোষকতা প্রভৃতি দুর্নীতি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিফল-মনোরথ ও পরাজিত মহাত্মার তাই আজ আর ক্ষোভের অন্ত নেই, কেননা দেশে কোথাও অহিংসার নাম-গন্ধও নেই। তাই ক্ষণে ক্ষণে অনশনে অথবা আগুনে ঝাঁপিয়ে জীবন শেষ করবার নানা আকাঙ্ক্ষা তাঁর জাগছে দেখতে পাই। তাঁরই আশ্রিত কংগ্রেসের রাষ্ট্র আজ আর অহিংসার কোনো সূত্রের উপর দাঁড়াতে সাহস করে না—নির্মম গুলি, লাঠি, গ্যাস, জেল, হাজত, নিরাপত্তা আইনের উপর তার ভিত্তি। রাম-রাজ্য তো দূরের কথা রাবণ-রাজ্য গঠন করাই দুরূহ হয়ে উঠেছে।

উপরোক্ত কথাগুলি এই জন্যই আনা হলো যে দেখা যাচ্ছে নৈতিক উন্নতির এত বড় বিচিত্র ও বিরাট চেষ্টা সত্ত্বেও আজ কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী তা দেশে আনতে পারেন নি। ধনতন্ত্রকে নৈতিক জোরের বলে সমাজতন্ত্র করে ফেলবার বাহাদুরী তো দূরের কথা, প্রচলিত ধনতন্ত্রকে তার স্বাভাবিক ভব্যতার মধ্যেও ধরে রাখতে পারছে না। সামান্য একটা নীতি অর্থাৎ যেমন প্রতিবেশী ভিন্ন-ধর্মীর মান ইজ্জতকে সম্মান দেবার সামান্য নাগরিকত্বটা পর্যন্ত শেষ হতে চলেছে। এই সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতা থেকেও যদি আজ আমরা ভাববার কারণ দেখতে না পাই তবে বড়ই দুঃখের কথা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ যে কোনো সূত্র ধরেই অহিংসার বাণী ছড়ালে সমাজ অহিংস হতে পারে না। নৈতিক বল ও উদ্দীপনার উৎসটাকে কংগ্রেস বা মহাত্মাজী এত পরিশ্রম করেও স্পর্শ করতে পারেননি। তাঁদের সমস্ত চেষ্টা সত্যিকার জায়গায় আঘাত করতে পারেনি তাইতেই আজ সন্দেহ করা খুব যুক্তিসঙ্গত যে তারা এত দিন কেবল ভুল তারটার উপরেই টোকা দিয়ে এসেছে, আজকের মানুষের মনোবীণার ঠিক তারটায় আঘাত দিতে পারে নি, যেখানে আঘাত পড়লে সমাজের সমস্ত মনে ঝঙ্কার দিয়ে উঠত। কখনো কখনো ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠেনি যে তা নয়—উঠেছে যখন বিদ্রোহের সুরটাতে হাত পড়েছে, কিন্তু সে তো ক্ষণিক এবং অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু তারই গুঞ্জনটাকে স্মৃতির সম্বল করে নেতারা প্রতিদিন যে তারে আঘাত

দিয়ে গেছে তার পরিণাম হলো এই রাবণ-রাজ্য—যেখানে সহানুভূতি নেই, সুচিন্তা নেই, ত্যাগ নেই বরং বিরাজ করছে এক অবসাদপূর্ণ কলুষতা। সত্য, শান্তি, অহিংসা নিশ্চয়ই একটা জ্বলন্ত আদর্শ হতে পারে এবং পৃথিবীতে আজ এরই দরকার এবং মানুষ তাই চায় বলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এবং তারই জন্য সংগ্রাম কখনো কখনো অপূর্ব মনোবৃত্তির নমুনা দেখিয়েছিল—কিন্তু কালে কালে যখন দেখতে পেল যে অহিংসার নামে সমাজের বর্তমান স-হিংস শোসণ-নীতিকে রক্ষা করবার চেষ্টা চলেছে, সত্যের নামে কায়েমী স্বত্বকে স্বীকার করবার চেষ্টা চলেছে, শান্তির নামে গণ-বিদ্রোহকে দমন করবার চেষ্টা চলেছে—তখন অলক্ষ্যেই কংগ্রেসের আদর্শগত শক্তি ও উদার আহ্বান গেল ক্ষীণ হয়ে—লাভের ও লোভের হিসাব নিকাশ চলতে লাগল। সব চেয়ে হিংস্র সমাজটাকে অহিংসার বৈরাগ্য দিয়ে ঢেকে রাখবার মধ্যে যে ছলনা রয়েছে তাতে সত্যিকার নৈতিক শক্তির বিকাশ হতে পারে না—হযও নি। জনগণের ব্যর্থ জীবনাদর্শ নিস্তেজ অবসাদে ও কখনো কখনো ব্যর্থ আক্রোশে আত্মঘাতী হয়ে উঠল।

মহাত্মা গান্ধীকে আজকের যুগে নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠতম চ্যালেঞ্জ বলে বলা হয। আজকের বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজ্ঞানের অপূর্ব প্রভুত্ব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই অবৈজ্ঞানিক শিশুসুলভ ন্যাংটা ফকিরের মান্ধাতার আমলের কথা—বিজ্ঞান-বিরোধী কথা লোকে গ্রাহ্য করে এবং মনোযোগ দিয়ে শোনে। আণবিক বোমার সম্পদ হাতে করেও যখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতিবা মহাত্মার ক্ষীণ কণ্ঠ শোনবার জন্য কান পেতে থাকে তখন আশ্চর্য হতে হয়। অসম্ভব শক্তিশালী সীমাহীন ধ্বংস করার শক্তিধাবী সাম্রাজ্যবাদীরাও এই নৈতিকশক্তির ঋষিকে যেন আগ্রাহ্য করে না ববং একটু ভয়ও করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীবা তো করতই এবং শেষ পর্যন্ত তাব সাথে হাতে হাত মিলিয়ে নিল এবং সব চেয়ে মজাব কথা এই—এই নৈতিক শক্তির আধার গান্ধীজীকেও নিজেদের দলে নেবাব প্রয়োজন বোধ করে—অর্থাৎ পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাব যে স্থিতাবস্থা তাকে চিরস্থায়ী করবাব প্রয়োজনে গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংসাকেও নিযুক্ত কবতে চায়। দূরপাল্লার কামান, দ্রুতগামী বোমারু বিমান, রকেট চালিত দিগন্তগামী সর্বনাশকারী সর্বধ্বংসী আণবিক বোমা উৎপাদন করেও পৃথিবীর শাসক-শ্রেণী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি এবং বিশ্ব-বিপ্লবকে রুখবার জন্য এবং অশান্ত জনতাকে শান্ত কবে উৎপাদন বৃদ্ধি করার কাজে নিযুক্ত রাখার জন্য যে একমাত্র মাবণ অস্ত্রই যথেষ্ট নয়—বশীকরণ বিদ্যারও দরকার—সেই যাদু মহাত্মা হয়ত দিতে পাবেন এই আশায় গান্ধীজীর এত ভূয়সী প্রশংসা করে থাকে এবং তাঁর বাণী রেডিও, খবরেব কাগজ ইত্যাদিতে প্রচারের অবাধ সুযোগ দিয়ে থাকে। বিত্তবানদেব বিলাসপুরীর সুসজ্জিত ড্রইং হলে, সুরা-নারী-নৃত্য-মুখরিত নাচঘরে, বাসরঘবে, প্রমোদালয়েও গান্ধীজীর আত্মিক অভিযানের অপূর্ব মহিমা পরম শ্রদ্ধার সাথেই আলোচিত হয় এবং প্রাচা দেশে এই সব দৈব ও ভৌতিক বিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীনতার পরিবর্তে বিশেষ কৌতূহল জেগেছে বলে মনে হয়। আরো মজা এই বিলাসীদেব আসরেই—অর্থাৎ ভোগ ঐশ্বর্য শিক্ষা সম্পদের অধিকারী যারা সেই সব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও কৃষ্টিবানেরাই মহাত্মার মাহাত্ম্য আজকাল বেশি বুঝে থাকেন ও বোঝাতে চান। নিরক্ষর, দরিদ্র, পঙ্গু, বয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া জনসাধারণের কাছেও মহাত্মার আকর্ষণ কম নয়। তাদের কাছে গান্ধীজীর অর্ধনগ্ন মূর্তিখানা দারিদ্র্যেরই প্রতিমূর্তি অতএব দরিদ্র্যের প্রতিনিধি তিনি—তিনি দরিদ্র-নারায়ণের দরিদ্র-নেতা, যার গায়ে পোশাক নেই—যার নেংটি হাঁটুর নিচে নামে না—যিনি নিজের পরিশ্রমে, কায়িক পরিশ্রমে নিজের প্রয়োজন জোগাড় করে থাকেন। শ্রমের সঙ্গে

তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তাঁর চরকার সম্বন্ধ, ভক্তি, প্রার্থনা ভিক্ষার সহজ প্রকাশ তার প্রতিদিনকার এক অতি সহজাত সরলতা ও সাধারণতার রূপ দান করে। নির্যাতিত মানুষের জন্য তাঁর সহানুভূতি পদে পদে প্রকাশিত, জীবন-বিপন্নকারী অনশন করে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতে প্রস্তুত, ভিন্ন-ধর্মী মসজিদ রক্ষা করতেও তিনি জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। তিনি জনসাধারণকে আপনার করার জন্য নিজে সামান্য জনসাধাবণের একজন হবার বিপুল প্রচেষ্টা করেছেন, শুধু তাদের দুঃখের কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন না সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারেন। অতি সাধারণ হয়ে সাধারণকে ধরবার জন্য তিনি তাঁর সর্বাঙ্গের বেশভূষা এমনকি পায়ের জুতোটা পর্যন্ত ফেলে দিয়েছেন। এতে অবশ্য তিনি দরিদ্র হননি—সত্যিকার হীনবল হননি কেননা তিনি জানেন মানুষের শক্তি আজ হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে হলে অসংখ্য দবিদ্র যারা—যারা পৃথিবীটাকে মানুষে মানুষে ভবে দিয়েছে তাদের আনুগত্য লাভ করতে হবে। মানুষ থেকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে বিজ্ঞানাগাবে যে সমস্ত শক্তির সাধনা চলেছে, তাও তার কাছে স্থূল বিজ্ঞান—মোটা কথা এবং শেষ পর্যন্ত অমোঘ নয় ; মানুষের মন নামক যে জটিল ও সূক্ষ্মশক্তিকে দেখা যায় তার বহস্যকে তিনি বেশি শ্রদ্ধা করে থাকেন এবং কার্যত তারই তিনি গবেষণা করে থাকেন যাব নাম দিয়েছেন সত্যাগ্রহ।

অতএব তাঁর পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলে মনে হয। মানুযেব ছোট ছোট অভিযোগ, ছোট বড় ব্যথা তিনি মনোযোগ দিযে শোনেন। কোনো এক দূর আদর্শের স্বপ্ন দেখেই তিনি ক্ষান্ত নন, প্রতিদিনকাব জ্বালা যন্ত্রণার জন্যও তাঁব ব্যবস্থা বয়েছে। যাত্রাপথ ও যাত্রাব শেষ লক্ষ্য তাঁর কাছে নাকি একই—পথই তাঁর কাছে লক্ষ্য অতএব পথটা অগ্রাহ্য কবে লক্ষ্যটাকেই বড় করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, লক্ষ্য বা শেব পরিণতি তাঁর কাছে তাই বড় কথা নয়, প্রতিদিনকাব জীবনটাই তাঁর গবেষণার বস্তু। আদর্শটাকে ব্যবহারিক জীবনে জীবনসঙ্গী করে নেবাব উপব তিনি যে জোর দিয়ে থাকেন তাইতেই তাঁর নৈতিক অভিযানের বিশেষত্ব। কার্যত এবং কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ মাঠ, ঘাট, গৃহকোণ, বন্ধনাগার শযনাগার, বিছানা, এমন কি শৌচাগার সম্বন্ধে তিনি তাঁব নীতিগত কথা নিয়ে উপস্থিত, তিনি কেবল জনসভাব দিগ-কম্পনকারী বক্তা নন, বস্তুত বক্তা তিনি একেবারেই নন। তিনি অতি সাধাবণ লোকের অতি সাধারণ কথার সহযোগী এবং সাধারণ কথার ঢং-এ তিনি কথা বলেন। অথচ তিনি যে বক্তাদের কাজে লাগান না তা নয়, তিনি যে আধুনিক প্রচার যন্ত্রকে অবহেলা করেন তা নয, অনশনরত মৃত্যুশয্যায-শাযিত মহাত্মার শেষ ক্ষীণ কথাটি পর্যন্ত অতি আধুনিক বার্তাবহ রেডিও-যন্ত্র-সাহায্যে প্রচার কবা হচ্ছে, অতি সুচতুর বক্তারা ও লেখকেরা অসংখ্য কাগজপত্র, বই ও জনসভাতে তাঁর বাণীকে ব্যাখ্যা করে চলেছে—শ্রবণ-শক্তিকে আবো প্রখর করবাব জন্য যদি রাডার যন্ত্রকে রেডিও বিসিভারের মতো সস্তা সার্বজনীন করা যেত তবে হয়ত তাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটি পর্যন্ত শোনাবার ব্যবস্থা করা হতো—নিঃশব্দ আত্মাব বাণীকে শ্রবণ করাব চেষ্টা চলেছে যেন—তাঁর মহাপ্রয়াণের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন আজ দূর জনতার চোখে প্রত্যক্ষ করার জন্য, অনশন শয্যায়-শায়িত গান্ধীজীর দর্শন আজ সম্ভব হলে টেলিভিশানের সাহায্যে পৃথিবীর দূরতম কোণে ঘরে ঘরে দেখানো যেত। আর দু-এক বছর পরে হয়ত তা সম্ভব হবে।

লোকের ধারণা ধর্ম ও নীতিপথের যারা সাধক তাদের শক্তি বাহ্যিক সম্পদ ও শক্তির উপর নয়, তারা ত্যাগী, দারিদ্র্যই তাদের অঙ্গের ভূষণ, বস্তুর বহুলতা তাদের পথের বাধা, সূক্ষ্মতর পথে তাদের যাতায়াত। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সমস্ত অবতারসাপেক্ষ ধর্মবীর এসেছেন তাঁরা তথাকথিত প্রচার-যন্ত্রের সুবিধা পান নি। বুদ্ধের বাণী পায়ে হেঁটেই সুদূর মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত,

জাপান পর্যন্ত গিয়েছিল— কোনো রেল বা উড়োজাহাজ বা আধুনিক বার্তাবহ যন্ত্রের সাহায্য পায় নি। মহম্মদকে শেষ ধর্মবীর বলে মনে হয়েছিল যার প্রভাব এমনি একদিন পৃথিবীর বুকে কম্পন এনে দিয়েছিল। মুসলমানেরা মনে করে মহম্মদ শেষ নবী বা আল্লাহ্‌র শেষ দূত। তেরশ বছর কেটে গেছে, বস্তুত ধর্ম নিয়ে গণধর্ম হিসাবে ব্যাপক কোনো ধর্ম আর নতুন দেখা দেয়নি, ধর্মের গতি তারপরে পূর্ব ধর্মকে সংস্কার ও মার্জিত করেই দু'চার জনা যা চেষ্টা করেছে। এই এক হাজার বছরের মধ্যে বিজ্ঞান এসে উপস্থিত—বিজ্ঞান ধনতন্ত্রের ব্যবহারিক জগতে সাহায্য করতে পেরে বিশেষ তারিফ পেয়ে গেল, ধর্মের সমস্ত কুসংস্কারকে ভেঙেচুরে দিতে লাগল এবং সংস্কারগত কোনো ধর্মকে আর কেউ বড় একটা শ্রদ্ধা করতে প্রকাশ্য সাহস দেখাতে পারল না। ধর্মের মূল ভিত্তি যেন বিজ্ঞান ভেঙে দিয়েছে এমনি মনে হলো এবং বিদগ্ধ জনের কাছে এই ধারণা দৃঢ় হয়ে গেল যে যেহেতু ধর্মের মূল ভিত্তি অজ্ঞান কুসংস্কার এবং যেহেতু আজ বিজ্ঞান ও শিক্ষায় পৃথিবী ছেয়ে গেছে—সেহেতু আর কোনো নতুন ধর্মের অভ্যুত্থান অসম্ভব। ছোটখাটো যে সমস্ত ধর্মাবতার ইতিমধ্যে উঠেছে তারা সবাই ক্ষীণজীবী এবং তাদের সাহস অত্যন্ত কম—নতুন ধর্ম প্রচার করবার মত শক্তি না থাকায়—কোনো না কোনো পুরানো ধর্মকেই নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে। আগের দিন হলে এই সব ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যার উপর দাঁড়িয়েই হয়ত একটা নতুন ধর্ম আলাদা অস্তিত্ব ঘোষণা করত—কিন্তু রামমোহন রায় অথবা গুরু নানক অথবা শ্রীচৈতন্য প্রচুর উত্তেজনা ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ত্রিসীমানা বেঁধে দেবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারেননি, তাঁরা শেষ পর্যন্ত হিন্দুই রয়ে গেছেন।

ধর্মে ও মুসলমান ধর্মেও এই প্রকার চেষ্টা কবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট ধর্ম আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু আজ বহুকাল পরে মনে হবে মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এই শেষ চ্যালেঞ্জ—ধর্মের শেষ চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুপরিচিত—নিজে বৈজ্ঞানিক না হলেও বহু বৈজ্ঞানিক তাঁর ভক্ত, অতএব ধর্ম আজ কোনো একটা নিরেট লোকের মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছে না। এমন একজন ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছে—যার হিম্মত, জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস, ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা যে কোনো প্রাচীন অবতারের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর সাধনা বুদ্ধকে হার মানিয়ে দেয়, বুদ্ধের অহিংসাও লজ্জা পেয়ে যায়, যার আত্ম-নির্যাতন স্বয়ং যীশুখৃস্টের চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং বারে বারে প্রমাণ হয়েছে, যাঁর প্রতি আনুগত্য যে কোনো সময়ে মহম্মদের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বেশি, তাঁর রাষ্ট্রের উপর প্রভাব শুধু এদেশেরই নয় অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রের উপরও—বুদ্ধের অথবা মহম্মদের রাষ্ট্রনায়কদের উপর প্রভাবের চেয়ে কিছু কম নয়, বরং বেশি, এমনকি একদিন যুক্ত জাতি-সংঘের তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। প্রথমটায় হয়ত এই সব রাষ্ট্র—যেমন বিলেতের রাষ্ট্র—তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে—ঠাট্টা করেছে এমন কি জেলে দিয়েছে— কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাত্মার কথা স্বীকার করে নিয়েছে যে তিনি বৃটিশ জাতির সত্যিকার বন্ধু। এমনি করে একদিন তারা—এমন কি আমেরিকার রাষ্ট্রপতিরাও মহাত্মা গান্ধীকে তাদের রাষ্ট্রগুরুর সম্মান দিতে পারে—আশ্চর্য নয়। বুদ্ধের একটি মাত্র অশোক দেখতে পাই—মহম্মদ নিজ হাতেই অশোকের কাজটা করে নিতে বাধ্য হন, কিন্তু মহাত্মার হাতে অনেক অশোক এসে যাওয়া অসম্ভব নয়। ভারতীয় রাষ্ট্রে আজ তাই অশোকের ভূমিকায় পণ্ডিত জওহরলাল নামতে পারেন।

আধুনিক বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলিরও মহাত্মার মতো একজন সজ্ঞান অজ্ঞতাবাদীকে মাথার শিরোমণি করে তোলবার ভিতরে যে কারণ রয়েছে, সে তাদের ভিতরকার দুর্বলতা।

অস্ত্রের দম্ভ, বিত্তের বাহুল্য, সম্পদের ঐশ্বর্য সাম্রাজ্যবাদের ভিতরকার দ্বন্দ্বকে দূর করতে পারেনি বরং বিষম সঙ্কট ও সর্বধ্বংসী যুদ্ধ, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিপ্লব তাকে অহরহ বিপদাপন্ন করে রেখেছে। ভিতরকার দুর্বলতা ও পতনের ভয়ই তাকে এই ব্যয়-বহুল রণসজ্জা করতে বাধ্য করেছে, যার ব্যয়ভার তার বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠছে, যার ব্যয় ও ক্ষয়ের পরিমাণ তার বাঁচবার শক্তিকেই শেষ পর্যন্ত বিপদাপন্ন করে ছাড়ছে। আহা, যদি যুদ্ধ করতে না হতো—যদি যুদ্ধ না করেও তাদের ভোগ সম্পদের উপর দখল রাখা যেত, যদি চাবুক ও গুলির ভয় না দেখিয়েও মজুর ও চাষীকে শোষণ করা যেত, যদি স্রেফ একটা ধর্মের আবহাওয়া ও প্লাবন সৃষ্টি করেই রাশিয়াকে ভাসিয়ে দেওয়া যেত—তবে বোধ হয় তারা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা বেঁচে যেত। তাদের অস্তিত্ব, তাদের অধিকার, তাদের ভোগ-বিলাসকে ঈর্ষা কেন করে, ওরা সংগ্রাম করতে কেন চায়—ওরা এত ধর্মহীন কেন—ওদের মাথায় সংগ্রামের দুষ্টবুদ্ধি কারা দেয়—প্রচলিত ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করে শান্তি রক্ষা চলে না কি—চলে না কি একটা প্রকৃত বিশ্ব-ব্যাপী অহিংসার ধর্ম? যত দিন যাচ্ছে তত দেখতে পাচ্ছে বিশ্ব-রাষ্ট্রপতিরা কেবলই নতুন নতুন বিপদের ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে—আমেরিকায় শান্তি রাখতে হলেও ইয়োরোপে, এশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, আফ্রিকায় শান্তি দরকার—কোথাও বিদ্রোহ মেনে নেওয়া চলে না। অতএব এই শান্তি—ঘরে বাইরে একটা শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে কি ঐ ন্যাংটা ফকিরটা—যে ভারতে বিশেষ একটা অহিংসার প্রতিপত্তি চালাতে চাইছে—তাকে অগ্রাহ্য করে লাভ কি? তার ধর্মটা কি শোনা যাক্ না? এই হলো এদের মনোভাব।

এদিকে কোটি কোটি নরনারী প্রতিদিন অসহ্য অভাব ও নির্যাতন, যুদ্ধ ও দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গেছে, দুর্ভিক্ষ ও অনশন নিত্যকার সহচর হয়ে উঠেছে, দুর্দশার চরম অবস্থা এসেছে—দুঃখের পাত্রটি পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে। জাগতিক কোনো শক্তি এমন কিছু দেখছে না যাতে তারা রক্ষা পেতে পারে, বিজ্ঞান তাদের দুঃখের ভার নিতে পারছে না—বরং বাড়িয়ে চলেছে, কোনো রাষ্ট্রই তাদের নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে না—এ হেন অবস্থায় তাদের খোঁজ পড়েছে ও পড়বে কোনো অপ্রাকৃত শক্তির সন্ধানে—তাই ভগবানের কাছে হাঁটু গেড়ে পড়েছে, বিজ্ঞানের পুঁথিপত্র যা তারা সদম্ভে তুলে ধরত তা লজ্জায় বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের দারিদ্র্য তাদের কষ্টকে গ্রাহ্য করে ঐ যে ন্যাংটা সন্ন্যাসী মহাত্মা গান্ধী ভারতের আকাশে উঠেছে—তাঁকে প্রণাম করি, চলো তাঁকে দেখি—সে বুঝি ভগবানের বাণী এনেছে—সে বুঝি আমাদের বাঁচাতে পারে। এই প্রকার মনোবৃত্তিতে একটা ধর্মের উত্থানের পক্ষে—কি রাষ্ট্রশাসকদের পক্ষ থেকে—কি শাসিতদের পক্ষ থেকে—একটা অনুকূল পরিস্থিতির উদয় হয়েছে। আর সুবিধা এই, গান্ধীজী সকল ধর্মকে সমান চোখে দেখেন—হয়ত তিনি ধর্মে ধর্মে লড়াইটা বন্ধ রাখতে পারবেন—এবং সকল ধর্মকে সমন্বয় করতে যা রামকৃষ্ণদেব পারেন নি, তিনি আজকের এই অরাজক বিশৃঙ্খল জগতে সমর্থ হতে পারবেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন অশিক্ষিত এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ সেদিনকার জগতে তেমন কোনো অনুকূল পরিস্থিতি পাননি—কিন্তু মহাত্মা নিজে পণ্ডিত লোক, এবং বহু পণ্ডিত তাঁর হাতের মুঠোয় এবং পৃথিবীর শাসকশ্রেণীরা তাঁকে অনুগ্রহ এবং স্বীকার করতে শুরু করেছে। ধর্ম ও ধর্মান্ধতা কুসংস্কার থেকে জন্মলাভ করে না—বরং ধর্ম ইতিপূর্বে অগ্রগতির পথে অনেকবার বৈপ্লবিক কাজও সম্পাদন করেছে—কিন্তু ধর্মের আসল ভিত্তি হলো ভয় থেকে এবং ভয় বাসা বাঁধে সেই সমাজে যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, নির্যাতিত এবং বিপদগ্রস্ত।

কোনো সন্দেহ করার কারণ নেই যে আজ মহাত্মার ধর্ম ক্রমেই রাষ্ট্রধর্ম হতে চলেছে। কোনো এক বিশেষ মতের গণ্ডি টেনে হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম তা নয়—আজকের যুগের উপযোগী শাসনের ও শোষণ ব্যবস্থার স্থিতাবস্থার উপযোগী রাষ্ট্র সে। মহাত্মা দরিদ্রও নন—হীনবলও নন—মহাত্মার একটা ইঙ্গিতে আজ প্রবল যুদ্ধ হওয়া সম্ভব—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের রক্তপাত করাও সম্ভব। পৃথিবীর দুর্দান্ত প্রচার যন্ত্র তাঁর বার্তাবাহক—তিনি পায়ে হাঁটতে ভালবাসলেও দ্রুতগামী বিমানযানের তাঁর অভাব নেই—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনি অস্ত্রহীনও নন—একটি রাষ্ট্রের সমস্ত অস্ত্র তাঁর হাতে এবং আরো অনেক রাষ্ট্রের অস্ত্র তিনি হাত করতে পারেন। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ তাঁর শক্তির তুলনায়—বাহ্যিক শক্তির তুলনায় তাঁর কাছেও যেতে পারেন না।

অথচ কঠিন সাধনা, দুর্দান্ত পরিশ্রম, ভয়ঙ্কর বিপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে বহুকাল ধরে সংগ্রাম করে তাঁকে এই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে, যার অর্ধেকের অর্ধেকটাও আর কোনো অবতারকে পোহাতে হয় নি। স্রেফ কথা না বলে, কোনো বাণী না দিয়ে মৌনীবাবারাও আগের দিনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল—কিন্তু আজকালকার সাধুদের বনে গেলে কোনো প্রতিষ্ঠা হবার নয় এবং খুব বিশেষ প্রতিভা-শক্তি না থাকলে পৃথিবীতে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদের যে বিরাট প্রভাব ছিল—তাকে ব্যর্থ করে, পরাজিত করে ধর্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করা চাট্টিখানি কথা নয়। মহাত্মা একা কথাই বা কত বলেছেন—তার সঙ্কলন যেদিন শুরু হবে তা পরবর্তী যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ে শেষ করা হবে না। তা ছাড়া কবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, অরবিন্দ প্রভৃতির সবার কথা তিনি আজ কাজে লাগাচ্ছেন—আর সহস্রাধিক কংগ্রেস নেতাদের ব্যাখ্যা ও শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা ও রচনাবলী ইত্যাদি মিলে যে গান্ধী-সাহিত্যের পর্বত তৈরি হয়েছে তা কারো এক জন্মে শেষ করা সম্ভব হবে না।

অথচ পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো এই ঘটনাটাও আশ্চর্যজনক যে এত প্রতিষ্ঠা, এত চাহিদা, এত অনুকূল অবস্থা, এত শাসকশ্রেণীর সহায়তা ও শাসিতের আকাঙক্ষা ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা থাকা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী সমাজে সত্যি করে কোনো ধর্ম, কোনো অহিংসা স্থাপন করতে পারেন নি। সমাজ জীবনে ও ব্যক্তি জীবনে জঘন্য কলুষ ও পচনের বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারেন নি—কোনো প্রকার নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চেষ্টা, চিত্তাকর্ষক কার্যাবলী জগতে চমক লাগায় সত্যি, এক একটা উত্তেজক ঘটনা সৃষ্টি করে সতি, কিন্তু সত্যিকারের কোনো ব্যবহারিক উন্নতি সমাজ-জীবনে দেখা দেয় না—এমন কি কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে পর্যন্ত কোনো স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে নি। অন্তরের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, জীবনে শান্তি আনবার জন্য, সমাজে সহিষ্ণুতা আনবার জন্য, আর বিকৃত জটিলতা থেকে, হীনতা, দীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের প্রাণে একটা আকুল আগ্রহ রয়েছে—মানুষের মনুষ্যত্ব নতুন করে জন্ম ও মুক্তি পাবার জন্য ভিতরে ভিতরে আর্তনাদ করে কেঁদে মরছে—তাকে যেন মহাত্মা ছুঁই ছুঁই করেও ছুঁতে পারছেন না—জাগরণীর পরশমণিটা যেন ধরতে পারছেন না। তার ফলে এত নৈতিক প্রেরণার কথা ও কাজ বারে বারেই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—এমন কি সাধারণ বুদ্ধিটাকে পর্যন্ত জাগাতে পারছেন না। আজকের সমাজে চারদিকে যে জঘন্য মনোবৃত্তি বিরাজ করছে তাতে কি কখনো বিশ্বাস করতে পারা যাবে যে নৈতিক উন্নতির সব চেয়ে দুর্দান্ত চেষ্টা যিনি করছেন তিনি আমাদেরই মধ্যে বাস করেন? এবং তিনি জীবিত? তিনি নাকি জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অথচ এই হীন পরিণতি কেন? ব্যক্তির, সমাজের, সম্প্রদায়ের, রাষ্ট্রের কোনো কিছুর চেহারাতেই

অহিংসা বলতে যা বোঝায় তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। ব্যবহারিক জীবনে এর অভাব গান্ধীজীর ব্যবহারিকবাদ বা পথ ও লক্ষ্য একই, এই মতবাদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছে। যারা পথ ও উপায়টাকে গৌণ বিষয় মনে করে কিন্তু লক্ষ্যকে সম্পূর্ণ, আদর্শ ও সুন্দর দেখতে চায়—যারা যে কোনো পথেই হোক লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, হিংসা অহিংসার বালাই নিয়ে মাথা ঘামায় না তাদের কাছে বর্তমানের হিংসা, সংঘর্ষ ও সংগ্রাম তেমন হয়ত ভয়ের কারণ নয় কেননা তারা মনে করে লক্ষ্যে পৌঁছুবার পূর্বে কোনোই মঙ্গল, কোনই শান্তি মিলতে পারে না। কিন্তু গান্ধীজী—যিনি পথটাকে লক্ষ্য বলে প্রচার করেছেন, প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি পদক্ষেপই যাঁর লক্ষ্য—তাঁর চরম পরাজয় হয়েছে—কেননা এর চেয়ে আর কি স্পষ্ট করে দেখা যায় যে প্রতিদিনের জীবনটা আজ পঞ্চাশ বছরের গান্ধী-শিক্ষার পরেও আমরা কি কদর্যভাবে যাপন করছি, অতি নোংরা হত্যা, আগুন, বলাৎকার ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছি। Ends and Means are the same thing but end justifies the means is a licence for corruption ইত্যাদি বলে যারা বিপ্লববাদীদের উপর টেক্কা মারতে চেয়েছিল—যারা তাদের নৈতিক আদর্শের বাহাদুরী ফলাতে চেয়েছিল—তাদের আজ লজ্জার শেষ নেই। তাঁবেদার ও অনুচরদের হয়ত সে লজ্জা নেই, কিন্তু গুরুজীর সে বোধ হয়েছে—তাই তিনি ক্ষণে ক্ষণে জীবন বিসর্জন করতে চান—আশা হয়তো জীবনে যা হলো না—মরণে তাই হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যীশু মৃত্যু দিয়ে সত্যিকার কোনো স্থায়ী নৈতিক উন্নতি করতে পারেন নি—যীশুরই অনুচরেরা আজ সাম্রাজ্যবাদের রক্তপিপাসু দস্যু—যারা দেশে দেশে আজ ব্যবসায়ের নামে লুঠ করে বেড়াচ্ছে, রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের উপর ক্রুশ চিহ্নটি বসিয়ে দিয়ে যীশুকে ফাঁকি দিচ্ছে। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেও গান্ধীবাদীরা তাই করবে এবং ধনতন্ত্রেরই প্রেরণায়। গান্ধীবাদী হব অথচ সুদূর রাম-রাজ্যের স্বপ্ন দেখব কিন্তু চালু রাখব রাবণ-রাজ্য এটা যদি করতে হয় তবে গান্ধীবাদের কবর দেওয়া হলো। গান্ধীবাদের সবচেয়ে বড়ো কথা যেটা অর্থাৎ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত নিয়ে যে বর্তমান সেটাই তার আদর্শের কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষাস্থল—গান্ধীবাদ ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়—এই পরীক্ষাস্থলে গান্ধীজী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ধর্ম, অহিংসা, শান্তি কোথাও স্থায়ী জীবনে চালু হয়নি এবং যেটুকু ছিল সেটুকুও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটা গান্ধীধর্মের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরকার গলদের জন্য ধর্ম ও গান্ধীধর্ম জন্মাতে না জন্মাতেই মরতে বসেছে।

অথচ গান্ধীজীর প্রভাব লক্ষ লক্ষ জনতার উপর সম্পূর্ণ স্পষ্ট। তাঁকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক হাজির হয়, তাঁকে দেখেই খালাস কিন্তু তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে নারাজ। এ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে গান্ধীজীর শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ—অথচ এই সব ব্যক্তিরাই লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় করে তাঁর দর্শনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। এই ঘটনার মানে কি? গান্ধীজী মানুষের মনকে পেয়েও পান নি, তাদের অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা পেয়েও তাদের মানুষ করতে পারেন নি। গণমনে একটা জাগরণ আনি আনি করেও একটা সত্যিকারের উন্নতি বা স্থায়ী জাগরণ আনতে পারেন নি। অথচ তিনি নাকি ক্রমবর্ধমান বা ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী। ক্রমাগত আমরা যে পথের দিকে যাচ্ছি সে তো ভয়াবহ পতনের দিকে—এখন কি তবে গান্ধীজী বিপ্লব-বিশ্বাসী হবেন নাকি? যা হোক, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে লক্ষ, লক্ষ লোকের জমায়েতেও একটা সাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কংগ্রেস ইতিপূর্বে যে সমস্ত আন্দোলন ডেকেছিল তাতেও অপূর্ব সাড়া দেখতে পাওয়া গেছে এবং আন্দোলন করতে গিয়ে যে কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তাতে জনতার নৈতিক জাগরণের ক্ষমতায় বিশ্বাস সৃষ্টি

হয় এবং মনে হয় দেশ সত্য জেগে উঠতে চায়—কিন্তু আন্দোলনের পরে এবং আজ যখন আন্দোলন তথাকথিত স্বাধীনতায় এসে সমাপ্ত হয়েছে তখন দেখা যায় জনসাধারণের জাগরণ সত্যি স্থায়ী নয়, হিসাব করবার মতো কিছু নয়—যেন জনতা আরো অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে—স্বার্থপরতার বান বয়ে চলেছে—ক্লেদগুলি বন্যার জলের মতো সব গৌরবের কাহিনীগুলোকে মুছে দিয়ে যাচ্ছে। দেশ জেগেছে অথচ জাগেনি—দেশ নৈতিক আদর্শের ডাকে সাড়া দিয়েছিল অথচ সত্যি কিছু নেই—এ এক অদ্ভুত ধাঁধাঁ। এই পরস্পর বিরোধী মনোভাব এল কোথা থেকে? আত্মত্যাগ ও স্বার্থপরতা, অহিংসা ও হিংসা, উদারতা ও সঙ্কীর্ণতা, প্রেম ও বিদ্বেষ, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অথচ বিপুল উপেক্ষা ও অবজ্ঞা, এসব পরস্পর-বিরোধী ভাবধারা আমাদের মনে একই সাথে এল কোথা থেকে এবং আমাদের চিন্তাজগতে এমন বিশৃঙ্খলা এল কি করে যাতে আমাদের যা ভাল তা করতে রাজি নই এবং যা রাজি তা ভাল নয়, আমাদের স্বার্থ এক কিন্তু চিন্তা ভিন্নরূপ ইত্যাদি। ভাল ও মন্দ এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে, কোনো কাজই হতে পারছে না ফলে কেবল মন্দটাই ঘটে যাচ্ছে এবং ক্রমে মন্দটাই সর্বব্যাপী বিরাজমান হয়ে পড়েছে—কেননা ভাল ও মন্দ যার যার স্থায়ী আসন পেতে বসে নেই—ক্রমাগত গতির পথে ভালটা নিজ শক্তির অভাবে নষ্ট হয়ে পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

এই দুই পরস্পর-বিরোধী ধারার কেন্দ্রস্থল গান্ধীজী—কেননা তাঁর প্রতি আনুগত্য দুইয়েরই—ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই নেতা তিনি। দরিদ্রেরা এক কারণের জন্যে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করে—ধনীরা ঠিক উল্টো কারণের জন্যে শ্রদ্ধা করে। দরিদ্রেরা গান্ধীজীর কাছ থেকে শোষণের মুক্তি চায়, ধনীরা গান্ধীজীর কাছ থেকে শোষণ-ব্যবস্থার আশীর্বাদ ও রক্ষা পেতে চায়। দরিদ্রেরা মনে করে গান্ধীজী বিপ্লববাদী, ধনীরা মনে করে গান্ধীজী বিপ্লব-বিরোধী। দরিদ্রেরা তাদের পাওনার জন্যে লড়াই করতে চায় গান্ধীজীকে সামনে রেখে, ধনীরা সে লড়াই বন্ধ করতে চায় গান্ধীজীকে সামনে রেখে। এবং এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তি দু'টি ক্রমেই মারমুখো, ক্রমেই তীব্রতর হতে শুরু করেছে এবং গান্ধীজীর শান্তির বাণী ধনীদেরই সাহায্য করে ফেলেছে। লড়াই করতে গিয়ে যে নৈতিক বলের প্রয়োজন তার সৃষ্টি হচ্ছে জনতার মধ্যে কিন্তু লড়াই বন্ধ করার জন্য যে চাতুরী ও ছলনার দরকার তা আসছে ধনীদের তরফ থেকে। কিন্তু এই লড়াইয়ে গান্ধীজীর শান্তির দোহাই ধনীদের ছলনাকেই করছে জোরদার এবং পরাজিত জনতা পরাজয়ে, অবসাদে দুর্দান্ত বেগে মনে প্রাণে পিছিয়ে যাচ্ছে, তখন আর নৈতিক আহ্বান কোনো সাড়া দিতে পারছে না।

মহাত্মা গান্ধী যদি একমাত্র জনতার হয়েই দাঁড়াতে পারতেন তবে তাঁর বাণী সার্থক হতে পারত। কিন্তু দুইয়ের হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি স্থিতাবস্থারই প্রধান প্রচারক ও পুরোহিতের কাজ করছেন। তাঁর নীতির লড়াই তাই সম্পূর্ণ পরাজিত।

এই পুস্তিকা লেখার কিছুদিন পরেই বৃহত্তম মৃত্যুর ও জঘন্যতম হত্যার খবর পেয়েছে পৃথিবী। আততায়ী নাথুরাম বিনায়ক পিস্তলের গুলিতে অহিংসার প্রতীক মহাত্মাকে খুন করে দিয়েছে। মহাত্মার ভারতে যে কোনো রকমের জঘন্য কাজ আজ মানুষের কাছে সম্ভব। এই কি ইতিহাসের পরিহাস?

মানুষ এ কাজ করেছে? মানুষের ইতিহাসে এই কলঙ্ক কোনো দিন ঘুচবে কি? আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। যে মানুষ শিশুহত্যা, নারীহত্যা, ঘুষ, কালোবাজার, গৃহদাহ, গুলি, লাঠি, গ্যাস, অগ্নিবৃষ্টি, আগ্নেয় বোমা, আণবিক বোমা এসব করতে পারে, সে মানুষ তার নৈতিক ঋষিকেও খুন করতে পারে।

যে কায়েমী স্বার্থের দুর্গন্ধময় আবর্জনা থেকে এই দুষিত বিষাক্ত হাওয়া সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলছে—সেই দুষিত নরকটাকে সমাজে জিইয়ে রাখলে কোনো কালে মানুষের মুক্তি নেই, কোনো নীতি, কোনো ধর্ম, কোনো বিচার বাঁচতে পারে না। এই সমস্ত জঞ্জালগুলিকে ক্ষমা করতে গিয়ে, সহ্য করতে গিয়ে, সংশোধন করতে সময় নিতে গিয়ে মহাত্মার অহিংসা এদের জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল—জনসাধারণের ক্ষমাহীন সংগ্রামের অমোঘ আঘাতকে সংযত করে প্রতিক্রিয়ার সবগুলি উৎসকেই জিইয়ে রেখেছিলেন। তারই ফলে দেশ হয়েছে বিভক্ত, সাম্প্রদায়িকতাযুক্ত, নারী-নির্যাতনকারীদের, খুনীদের, ডাকাতের, কালা-বাজারের রাজ্য। এই লেলিহান নরকাগ্নিকে মহাত্মা দু'হাতে থামাবার জন্যে কত না ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি—শেষ পর্যন্ত এই আগুনেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল।

নাথুবাম বিনায়ক, হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা, কালাবাজার, দুর্নীতি, অসৎ ব্যবসায়, যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি যে সমস্ত কুৎসিত শয়তানের শক্তি আজ ভারত ও পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছে—তাদের জন্মস্থানকে চূর্ণ করতে হবে—তবেই নীতি ও অহিংসাব রাজ্য স্থাপিত হবে। মহাত্মাজী তা পারেন নি—করতে চান নি—তাঁর এই মৃত্যুর কাবণ তিনিও অনেকটা—ইতিহাস একথা বলবে। কিন্তু ইতিহাস তাঁর বাণীকে অগ্রাহ্য করবে না—শান্তি, সত্য ও অহিংসা একদিন সাম্যসমাজে সত্যি কায়েম হবে—ধনতন্ত্রের অবসানে। সেদিনই মানুযের রক্ত মাখা কলঙ্কিত হাত আবার শুদ্ধ হবে এবং এই বৃদ্ধ ঋষিকে প্রকৃতরূপে পুনর্জীবিত ও মুক্ত কবতে পাববে।

মহাত্মার মৃত্যুর পর ভাবতের ও পাকিস্তানেব রাজনীতিতে কি কি প্রতিক্রিয়া হবে এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় তা নয়। বিভিন্ন শ্রেণী আজ যে মানুষটিকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ খুঁজতে চেয়েছিল সে মানুষ না থাকার দরুন তাদের চিন্তাধারা বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে বাধ্য এবং ঘটনা সেই স্রোতগুলিকে কত তাড়াতাড়ি সঙ্কটময় অবস্থায় পৌছে দেবে তা লক্ষ্য করবার বিষয়।

কিন্তু নীতির বিচার করতে গিয়ে একথা জোর করে বলা যায় যে মহাত্মার মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র অহিংসা কায়েম হবে না। মহাত্মার নাম করে যাঁরা রাষ্ট্র চালাবেন তাঁরা আরো বেশি সশস্ত্র ও স-হিংস হবেন। মহাত্মার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে যদি জনতা এগিয়ে আসে তাও অহিংস উপায়ে নেবে না এবং সমাজে, ব্যবসায়ে, আচারে, ব্যবহারে কোথাও সত্যাগ্রহ দেখা দেবে না। নৈতিক সম্পদের অভাব রাষ্ট্র ও কংগ্রেসে তেমনি থাকবে—এবং আরো এসে জুটবে একটা ভয়াবহ পচনের কারণ—সে হলো ভয়। ভয় সর্বপ্রকার নৈতিক সম্পদের বিনাশক।

মহাত্মার দিক থেকে মহাত্মার এই প্রকার মৃত্যু সবচেয়ে সার্থক। অসুখে মরলে কোনো প্রতিক্রিয়া বা দাগ থাকত না—লোকে সহজে ভুলে যেত—অনশনে মরলে ইতিহাস একটা আত্মহত্যা বলেই লিখে রাখত ; আততায়ীর গুলিতে, তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে যা করেছেন তার চেয়েও বেশি করলেন, তাঁর মৃত্যু দিয়ে। মানুষের বিশ্বাসের চরম দাম দেবার একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিসাবে যুগে যুগে সত্যান্বেষীদের উৎসাহ তিনি দেবেন—কিন্তু তার নীতিপথ বাস্তবে কার্যকরী হবে না—একথা দিনকে দিন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অধিকার বোধ এবং তার জন্য সংগ্রাম ও সংঘাত

এবারে বোঝবার পক্ষে হয়ত অনেকটা সহজ হবে যে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের জটিল মনোভাবটা বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন স্বার্থ থেকে জটিল রূপে দেখা দিয়েছে। জাগরণের মধ্যে ও

জাগরণের পথে যে দুটি জিনিস সবচেয়ে দরকার সে হল অধিকার বোধ ও তার সঙ্গে সে অধিকার কায়েম করবার জন্য সংগ্রামশীলতা। অধিকার কোনো সামাজিক আধারে কায়েম হতে পারে, তা থেকে আসে সমাজ-চেতনা এবং সংগ্রামের মধ্যে পরীক্ষিত ও জাগরিত হয় তার মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুতি—অর্থাৎ ত্যাগ, নিষ্ঠা, নির্যাতন, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি নৈতিক সম্পদ—যার থেকে আসছে সংঘাতের শক্তি।

কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এই দুই বস্তুই কখনো পরিষ্কার রূপ গ্রহণ করে নি। অধিকার কায়েম করবার প্রেরণায় বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন রকমের সামাজিক আধারের কল্পনা করেছে এবং দেশ-নেতারা সামাজিক আধার বা সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন নি। সবারই অধিকার কায়েম হবে এই একটি মাত্র কথাতে তা শেষ করতে চেয়েছেন—সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রাচীন কালের কথা উঠিয়েছেন—বর্তমান ব্যবস্থাটা কি তারও কোনো সদুত্তর দেন নি—ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে বিবেচিত হবে বলে ঠেকিয়ে রেখেছেন। যা হোক, সকলেরই অধিকার কায়েম হবে—কারো নালিশ থাকবে না এই প্রতিশ্রুতি তখনকার মতো যথেষ্ট মনে হলো। কিন্তু গোল রয়ে গেল অধিকার কাকে বলে সেই প্রশ্নেও। জমিতে, কলে, কারখানায় কার কি অধিকার এবং সকলেরই তাতে অধিকার কায়েম হতে পারে কি না এসব কথা পরের কথা বলে চালিয়ে দিতে লাগলেন। ফলে সামাজিক চেতনা বা সমাজটাকে ভাল করে বোঝবার প্রয়োজন অস্বীকার করেই সমাজের ভাল করবার ব্যর্থ সংগ্রাম শুরু হলো। যারা ধনী, যারা ব্যবসায়ী, যারা উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক তাদের অধিকার কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা বা সামাজিক আর্থিক ব্যবস্থায়ই আরো বেশি কায়েম হতে পারে এবং এই বোধটা তাদের চতুর, শিক্ষিত মন বেশ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু যারা নির্ধন, যারা মজুর, যারা চাষী, যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের অধিকার কিন্তু এ সমাজে কায়েম হতে পারে না, কিন্তু তারা অশিক্ষিত, সে কথা তারা বোঝে না এবং যারা বোঝে তারা বোঝাতে রাজি নয়। ফলে সামাজিক চেতনায় একটা প্রকাণ্ড গোঁজামিল নিয়েই জাতীয় আন্দোলন মন্থর গতিতে চলতে শুরু করল। দ্বিতীয় গোঁজামিল দাঁড়াল এই তথাকথিত, সম্মিলিত অধিকার কায়েম করতে যে সংগ্রামের প্রয়োজন তার কায়দা বা ধারা নিয়ে। নিয়মতান্ত্রিক ও বৈধ উপায়ে স্বাধীনতা বা অধিকার কায়েম করা সম্ভব, না প্রচলিত বিপ্লব পন্থায় তা সম্ভব? স-হিংস না অহিংস উপায়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে এই নিয়ে যে তর্ক, সে তর্কের গোড়াকার কারণ হলো ধনিক শ্রেণী ও নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের আদর্শগত বা অধিকারগত পার্থক্য থেকে। স্বভাবত যারা ধনী তাদের বর্তমান ব্যবস্থায় যা কিছু নালিশ ও অভিযোগ আছে তা সত্যাগ্রহ নামক চাপ দেবার নীতিতেই দূর করা সম্ভব—কিন্তু নির্যাতিত দরিদ্র শ্রেণীসমূহের অধিকার বলতে তারা যে জিনিসের স্বপ্ন দেখে তা একটা বিরাট কিছু পরিবর্তন না হলে সম্ভব নয় এবং তাতে হিংসা অহিংসার বালাই তুচ্ছ কথা হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক এই নীতিগত লড়াই হয়ত আরো কিছুকাল চলত কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থায়, সমাজ ব্যবস্থায় ও সাম্রাজ্যবাদে দুর্দান্ত রকমের পরিস্থিতির পার্থক্য ঘটেছে—ম্রিয়মাণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিপ্লবের ভয়ে বিপ্লবের পূর্বেই দেশের স্বাধীনতা দিয়ে দেশটাকে দুটি টুকরো করে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে যে স্বাধীনতা এল তা সত্যাগ্রহ করে এল, না রক্তপাত করে এল এটা একটা অকেজো তর্ক হয়ে দাঁড়াল—আসল যা সত্যি তা হলো এই যে আমরা ঘটনার নানা চক্রে স্বাধীনতাটা প'ড়ে পাওয়ার মতো পেয়ে গেলুম। ফলে অধিকার-জাতীয় কথাগুলি ও সংগ্রামের পাঁয়তাড়াগুলি কোনোটাই চূড়ান্ত ভাবে পরীক্ষিত হলো না।

যা হোক স্বাধীনতার উপায় সম্বন্ধে আর কোনো তর্কের দরকার না থাকলেও একটা প্রকাণ্ড ফাঁক রয়ে গেল। সে হলো স্বাধীনতা বহন করবার ক্ষমতা ও তাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নিয়ে। আজকে মনে হচ্ছে আমরা যেন স্বাধীন হবার উপযুক্ত নই, স্বাধীনতা যেন রক্ষা করতে পারব না, স্বাধীন হবার জন্য যে দায়িত্ববোধ থাকা দরকার, নতুন রাষ্ট্র গড়বার জন্য যে নৈতিক বল ও দৃঢ়তা থাকা দরকার তা যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! অধিকারবোধটা আজ যে স্বার্থপরতায় এসে দাঁড়িয়ে গেল এ যে প্রকাণ্ড এক মহাদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক নিজেদের স্ব স্ব অধিকার রক্ষাব নামে লক্ষমুখী বিচ্ছিন্ন স্বার্থবোধ নিয়ে প্রকাণ্ড এক হল্লা তুলেছে। এই বিচিত্র দাবির হট্টগোলটা একটা সুশৃঙ্খল চিন্তাধাবায় পরিষ্কার হয়ে আসছে না কেন? কারো কাছেই যে ত্যাগ বা সহিষ্ণুতা দাবি করা যাচ্ছে না এবং যারা দাবি করছে তাবাও ত্যাগী বা সহিষ্ণু নয়।

অধিকার? কিসের অধিকার? আমার হক্? কিসেব হক্? বেঁচে থাকবার হক্? সে তো আছেই, কেউ তোমাব জীবন হত্যা করতে পারবে না—তার জন্যে তো আইন আছে, পুলিশ আছে, সৈন্য আছে। সেই আইন, আদালত, সৈন্য, পুলিশকে শক্ত করো। কিন্তু সেগুলিকে শক্ত করলে আমার বাঁচবার অধিকার, শান্তির দাবি, প্রগতিব দোহাই কাযেম হবে কি? কে জানে—হয়ত হবে, হয়ত হবে না। তবে দেখই না, সময় দাও না কেন? সময় কাকে দিচ্ছি, সময় যে শাসক ও শোষকরাই ব্যবহার করে নিচ্ছে তাদের নিজেদের অধিকার কাযেম করে নিতে—আমার যে কিছুই হচ্ছে না। এমনি ধরনের এক অশান্ত মনোবৃত্তি জেগে উঠেছে।

অধিকার-বোধটা বিকৃত রূপে দেখা দিয়েছে—কেননা অধিকার কথাটা যে একটা সামাজিক শব্দ-বিশিষ্ট সমাজের বিশিষ্ট অধিকারের স্বত্ব রয়েছে—অতএব সমাজ-ব্যবস্থাটা কি এই কথাটির উপর নজর না দেবার জন্য অন্ধ সংগ্রাম ও অর্থহীন বাচালতা শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত অধিকারের এক কাল্পনিক দাবির তাগিদে সমাজটা কি একথা লক্ষ্য করবার যেন কোনো তাগিদ নেই। সম্পূর্ণ চিত্রটার দিকে তাকাবার খেয়াল নেই, পাছে সবার দিকে তাকাতে গিয়ে আমার ঈপ্সিত বস্তুটি হারিয়ে যায় বা কেউ ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়ে যায় এমনি তাড়া। তোমার আমার অধিকার যে আজ এই সমাজে মিলতে পাবে না, একথা ভাববার সময় নেই—রাতারাতি কিছু কেড়ে লুটেপুটে ছিনিয়েও যদি বড়লোক হতে পারি তার এই ব্যর্থ ছটফটানি চলেছে সমাজের সর্বস্তরে। প'ড়ে পাওয়া স্বাধীনতার এই বিপদ।

যদি ইংরেজরা দম ধরে বসে থাকত, নিজেদের বজ্রমুষ্টি কিছুমাত্র শিথিল করতে প্রস্তুত না হতো—তবে দেশবাসীকে এক কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হতো। তেমন সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বহুলোক পিছপা দিত—অর্থাৎ যারা ধনী ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবান তারা ঘুরে ইংরেজের সাথে প্রকাশ্যে যোগ দিয়ে দিত। ফলে দেশের উপরে, সমাজের উপরে, ধন-সম্পত্তির উপরে তাদেরই অধিকার কায়েম হতো...যারা তখন সেই দেশে সত্যি কঠিন সংগ্রাম বা বিপ্লব করেও স্বাধীন করতে চায়। তখন দুটো জিনিসই—অর্থাৎ অধিকার ও তা কায়েম করবার সংগ্রাম-নীতি দুটোই জনতার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হতো। সেই কঠিন সংগ্রাম করতে গিয়ে দরকার হতো দুর্দান্ত নৈতিক বল, সংগঠন নিপুণতা, সামাজিক সচেতনা, দায়িত্ববোধ, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ইত্যাদি নৈতিক বা মানসিক সম্পদ। এই সম্পদের সৃষ্টি হলে তার ফলে যে স্বাধীন দেশ মিলত তাকে গড়ে তোলবার জন্য কোনো প্রেরণা, কোনো উদ্যম, কোনো উদ্দীপনার অভাব হতো না।

এখানে গান্ধীবাদীদের লক্ষ্য ও পথ নিয়ে যে নৈতিক বাহাদুরির কথা বলতে শোনা যায় তাদের এবারে উল্‌টিয়ে ধরা যায়। যে কোনো উপায়ে স্বাধীনতা নিতে তারা রাজি ছিল না কিন্তু

কার্যকালে দেখা গেল কোনো উপায না নিযেও এমনি উত্তবাধিকাব সূত্রে দেশেব শাসন ক্ষমতা গ্রহণ কবল। এখানে তাদেব লক্ষ্য ও পথ সম্বন্ধে যে নৈতিক ঐক্য নিযে তর্ক তা তাবা নিজেবাই অগ্রাহ্য কবল। কিন্তু দাঁড়াল এই, নৈতিক সম্পদ বলে কোনো কিছুই তাদেব বইল না। নীতিবাগীশদেব নীতি নেই ভাগ্যে—ভাগ্যে জুটল কেবল মানসিক পচন দেশেব সর্বত্র, সর্বস্তবে। মানবিক সম্পদ বা নৈতিক শক্তি যাদেব প্রধান দবকাব বলে মনে হযেছিল তাবা কিন্তু আজ তা বাদ দিযে একমাত্র গাযেব জোবে, বুলেটেব জোবে ফেব দেশে নীতি ফিবিযে আনতে চায—শাসনেব দোর্দণ্ডতায দেশে শান্তি ফিবিযে আনতে চায। সাম্রাজ্যবাদেব সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ কবলে নীতিব সর্বনাশ হবে, ভাবতীয-ধর্মেব সর্বনাশ হবে বলে যাবা চিৎকাব কবেছে আজ দেশে যখন সত্যিই নীতি ও ধর্মেব সর্বনাশ হযে গেল তখন তাবা সশস্ত্র-বাহিনী দিযে নীতি ও ধর্মকে বক্ষা কবতে চায, কিন্তু সশস্ত্র-বাহিনী আজ কাব বিরুদ্ধে লাগানো হবে? নীতি ও ধর্মকে কে লুকিযে বেখেছে বা কেডে নিযেছে? কাব বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম? মনে হবে, কি যেন এক অদৃশ্য শক্তিব বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভাবতেব ভাগ্যকে অন্ধকাবাচ্ছন্ন কবে দিযেছে, কিন্তু সে শত্রু যে তাবা নিজেবাই এমন দৃষ্টি হবে না, ববং জনতাব উপবে—এই অধিকাবমত্ত জনতাব উপবে ঝাঁপিযে পডবে এবং এখনই পডছে। ইংবেজ তাব শত্রু নয, পাকিস্তান তাব শত্রু নয, মুসলিম লীগ তাব শত্রু নয, ধনীবা তাব শত্রু নয—তবে শত্রু কাবা? শত্রু দেশেব লোক, যাবা স্বাধীনতাব দাযিত্ব বোঝে না—যাবা স্বাধীনতাকে নাকি বিপন্ন কবে তুলেছে। নৈতিক জাগবণেব যা কিছু লক্ষণ আমবা ক্ষণে ক্ষণে সংগ্রামেব মধ্যে দেখেছি তা তো একমাত্র জনসাধাবণেব মধ্যেই—ধনীবা তো কখনোই কোনো নৈতিক বল বা ত্যাগেব পবাকাষ্ঠা দেখায নি , তবে নীতিব শত্রু হিসেবে আজ সেই জনসাধাবণকেই দাযী কবা হচ্ছে কেন?

যাবা বিপ্লববাদী তাবা যে কোনো উপাযে দেশেব স্বাধীনতাব জন্য লালাযিত এ হতে পাবে না। প্রত্যেকটি আদর্শেব নির্দিষ্ট পথ আছে—একটি মাত্র পথই একটা মাত্র আদর্শেব জন্য নির্দিষ্ট। গোঁজামিল দিযে পথটা চালিযে নেওযা যায না বিপ্লববাদে। বিপ্লববাদীব কাছেও পথ ও লক্ষ্যেব ঐক্য বযেছে—সুবিধাবাদেব সন্ধানে উপাযেব সহজ বাস্তা তাব হতে পাবে না। কেননা সে যে জিনিস চায, যে সমাজ-ব্যবস্থা তাব কাম্য, তাকে পেতে হলে যে শক্তি, যে চেতনা, যে নৈতিক বল, যে সংগ্রামশীলতা ও জাগবণ দবকাব তা দিযেই পাওযাব পবেও তাকে রক্ষা কবা, পুনর্গঠন কবা, সমৃদ্ধ কবাব পক্ষে যথেষ্ট হযে দাঁডায। তাব পক্ষে তা পাওযা যায না, সংগ্রাম কবে নিতে হয এবং সংগ্রামেব মধ্যেই জন্ম হয উপযুক্ত নৈতিক শক্তি ও সামাজিক চেতনা। ঈপ্সিত সমাজে পৌছবাব পব তাই তাব আব কোনো দুর্বলতা থাকে না। বিপ্লব তাব চোখে কেবলমাত্র বক্তপাতই নয, বিপ্লব মানুষেব মনোজগতে এক বিবাট যুগান্তব—সমস্ত প্রকাব সৃজনকাবী চিন্তা ও শক্তিব মুক্তি, লক্ষ কোটি মানুষেব নতুন সামাজিক চেতনা, বিবাট দায়িত্ব বোধ। এই শক্তিব উৎস বযেছে জনতাব বুকে—তাকে জাগিযে দিতে পাবে একমাত্র বিপ্লব—তখন মানসিক সম্পদেব নৈতিক শক্তিব অভাব তো থাকেই না ববং এত বেশি থাকে যে আর্থিক অভাব, যন্ত্রপাতিব সঙ্গতিব অভাবটাকে অগ্রাহ্য কববাব মতো শক্তি বাখে এবং এক দুর্দান্ত প্রতিজ্ঞায় সমাজেব রূপান্তব কবে ফেলে—শুধু হাতেও দেশ গঠন কববাব সাহস বাখে এবং এমন কি বহিঃশত্রুদেব মেবে তাডিযে আসে এবং বিশ্ব বিপ্লবেবও দাযিত্ব নিতে চায। রুশদেশেব ইতিহাস তাব প্রমাণ। ধর্মেব দেশ, নীতিব দেশ এই ভাবত আজ তথাকথিত ধর্মহীন বাশিযাব তুলনায নীতিব দিক দিয়ে, ধর্মেব দিক দিযেও লজ্জিত।

নৈতিক সম্পদের উৎস

উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অন্যান্য নৈতিক প্রেরণার মূল সামাজিক সূত্র খুঁজতে গিয়ে প্লেখানভ বলেছেন যে সামাজিক প্রয়োজন বোধ ও তার উপলব্ধি থেকেই জন্মে প্রেরণা। এক এক যুগে বিশেষ করে যুগান্তর-কালে এই নৈতিক প্রেরণার উন্মেষ আশ্চর্যজনক। শুধু রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নয়—জীবনের সব ক্ষেত্রে এই নব জাগরণ সমানভাবে অনুভব করা যায়। সাহিত্যে, ধর্মে, কাজকর্মে, আচার ব্যবহারে মানুষের চৈতন্য ও অনলস সৃজনীশক্তি পরবর্তীকালে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার খাদ্য ও ঐতিহ্য জুগিয়ে দিয়ে যায়।

এক্ষেত্রে ইতিহাসের দৃষ্টিধারাকেই স্মরণ রাখতে হবে। দ্বন্দ্ব-জড়িত ইতিহাস—অর্থাৎ ইতিহাসের ভিতরকার পরস্পব-বিরোধী একটি উঠতি ধারা ও অপরটি পড়তি ধারা। ক্ষয়িষ্ণু, হৃতসর্বস্ব, গতায়ু শাসক-শ্রেণীর নীতিগত আকর্ষণী শক্তিও দুর্বল—নিচতা, দীনতা, কুৎসিত স্বার্থপরতা ছাড়া আর কোনো নীতির বড়াই তো করতে পারে না। একটা অকেজো-শোষণ প্রধান সমাজ-ব্যবস্থা—যাব প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে, তাকে স্রেফ্ গাযেব জোবে ও প্রচারের শঠতায় জিইয়ে রাখতে গিয়ে শাসক-শ্রেণীকে ক্রমাগত মিথ্যা ছলনা, ভেদবুদ্ধি ও জঘন্য মনোবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। এবা যেখানেই হাত দেবে, তাদের কালো ও শীতল স্পর্শে সবই কালো হয়ে যেতে বাধ্য। ধর্মে, সামাজিক উৎসবে, রিলিফ ওযার্কে, খেলাধূলায়, নাচে গানে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেখানেই তাবা আছে এবং তারা সর্বত্রই আছে—সেখানেই নীতিহীন একটা কুৎসিত স্বার্থসন্ধানী প্রতিযোগিতা ও কলুষিত আবহাওয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। আজকের যুগের প্রচলিত মানসিক চেহারাটা দেখলেই যথেষ্ট প্রমাণ খুঁজে বেড়াতে হবে না।

দরিদ্র জনসাধারণ যারা শাসক-শ্রেণী নয়, শোষক নয়, সমাজের কর্তা নয়, তারাও এই অধঃপতিত মনোবৃত্তি থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাবা চালু মনোবৃত্তি বা ইডিওলজির দূষিত আবহাওয়া থেকে প্রভাব-মুক্ত হতে পারে। গরিব হলেই যে সে উঠতি পথের পথিক হবে এমন নয়, ইতিহাসের প্রয়োজন—মানুষের নিয়তির প্রকৃত দাবিকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন উদ্দীপনার শক্তিকে সে ছুঁতেই পারল না। প্রচলিত ক্ষয়িষ্ণু ধারার পশ্চাতে যে নতুন বিদ্রোহী শক্তি বর্তমান সামাজিক প্রয়োজনীয়তার চাপে বেগে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তার জাগরণী স্পর্শ না পেলে আদর্শের যাদু সৃষ্টি করা অসম্ভব। অতএব আজকাল যে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন দেশে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উদীয়মান হতে দেখি—লক্ষ লক্ষ লোক তার সভ্য—কাগজ-পত্র, অফিস, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, বেতনধারী কর্মচারী, যান-বাহন ও অন্যান্য প্রচার-যন্ত্রাদির বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও তাতে নবজীবনের বা নব জাগরণের আদর্শ, নৈতিক উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া যায় না। বরং দেখতে এগুলিও একটা সাধারণ যৌথ কারবারের মতো গড্ডালিকা হয়ে দাঁড়ায়—তার সভ্যদের মধ্যে সত্যিকার কোন নতুন জীবন ও নতুন চেতনার সাড়া আনতে ব্যর্থ হয় এবং তার সভ্যদের চিত্তবৃত্তি ও মানসিক সম্পদ যে কোনো একজন সাধারণ বুর্জোয়ার চেয়ে উন্নত বলে মনে হয় না। এ'ত সত্য ঘটনা, একে কম করে দেখা অন্যায়।

যখন মজুরেরা ধর্মঘট করে এবং মাসের পর মাস অর্ধাশন, অনশন করে কাটায়, অসম্ভব অত্যাচার সহ্য করে চলে—তখন অবশ্য তাদের নৈতিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়—তাদের দৃঢ়তার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হয়। কিন্তু ধর্মঘটের পরে অথবা ধর্মঘট ব্যর্থ হলে যে নৈতিক পতন দেখতে পাওয়া যায়, এটাও অবহেলা করার মতো নয়। তারপর যারা ব্ল্যাকলেগ অর্থাৎ

যারা ধর্মঘটকালে কাজ চালু রাখতে মনিবদের সাহায্য করতে আসে—তারাও যে শ্রমিক একথা অস্বীকার করলে চলবে না এবং তাদের সংখ্যা যে দিন দিন কমছে একথাও বলা চলে না। বিভিন্ন দলের ছুতোয় শহরের মধ্যে দলাদলি ও ভাগাভাগির মূলেও রয়েছে শ্রমিকের চেতনা ও চরিত্রের দুর্বলতা। কোনো কোনো ধর্মঘটে অবশ্য অপূর্ব নৈতিক শক্তির বিকাশ দেখা যায় কিন্তু আজকাল তার বিপরীতটাই যেন বেড়ে চলেছে। মজুর যে নাকি নতুন সভ্যতার বাহক—ঐতিহাসিক প্রয়োজনের প্রকৃত প্রতিনিধি, যার হাত দিয়ে গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতা, যেখানে শোষণ নেই, স্বার্থপরতা নেই, কোনো প্রকারের হীনতা, দীনতা নেই—তাকে আজ এমন দুর্বল, চেতনাহীন ও চরিত্রহীন দেখাচ্ছে কেন?

প্রথম প্রথম মজুর আন্দোলনে যে নৈতিক জাগরণ দেখা যায়, কালে কালে তা যেন কেমন মিইয়ে যায়, সে প্রেরণা থাকে না। কখনো কখনো প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় সত্যি—ভয়ানক রক্তারক্তি ও সংঘর্ষ হয় সত্যি—কিন্তু সেটা তো রাগ ও বিরক্তির বিকাশ—কিন্তু পরক্ষণেই তা দপ করে নিভে যায়, যতটা উত্তেজিত হয়েছিল তার কিছুমাত্র লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না—একটা প্রতিক্রিয়া চালু হয়ে যায়। উত্তেজনা উদ্দীপনাতে রূপান্তর হয় না, বিরক্তি ও বিদ্বেষ দৃঢ় সংগ্রামে ও প্রতিজ্ঞায় পর্যবসিত হয় না—অথচ মনে হয় যেন হতে গিয়ে হতে পারছে না। কিসের একটা অভাবে যেন বারে বারে উঠতে গিয়েও উঠে বসতে পারছে না।

সে অভাবটা হল আদর্শের অভাব। আদর্শ হলো নতুন জীবনের সমগ্র চিত্র, মুক্তির সামগ্রিক কল্পনা। যখনই শ্রমিককে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে এই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই তার দাবিকে মিটিয়ে নিতে হবে—তার হকের পাওনা এই সমাজ থেকেই পাওয়া যাবে, তখন তাকে একটা ভুল বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই সমাজের কায়দা-কানুন, রীতি-নীতি, হাল-চাল, সংগঠন ও নেতৃত্বের প্রতি শেষ পর্যন্ত মেনে নেবার এই নির্দেশ অথবা শক্তিহীনতা—নতুন প্রেরণার ইতিহাসের সত্যিকার তাগিদকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়ে যায়। পেটের দাবিটা এত বড় করতে গিয়ে—একটা পেটুক আদর্শ চালু করতে চেয়েছে মজুর নেতারা—যা একটা হাস্যকর ব্যাপার। পেটের আদর্শ তাই ভুঁড়ি, তার সৌন্দর্যবোধ মাড়োয়ারীদের অট্টালিকা। তাইতেই ধনীকে নকল করবার একটা মোহ, ধনীর মতো পোশাক পরা, ধনীর ঢং-এ কথা বলা, ধনীর নীতিকে শ্রদ্ধা করা, ধনীর বিদ্যাকে পুজো করা, ধনী হবার আশা করা—এক কথায় ধনীকে অনুসরণ করে প্রকারান্তরে ধনতন্ত্রবাদের নীতিকে যাচ্ছে সমর্থন করে। অতএব তারা ইতিহাসের অন্য ধারা—বিপ্লবী ধারা—নতুন উদ্দীপনার ধারাটাকে স্পর্শ করতে পারছে না। ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাহস, চেতনা, প্রেরণা, উদ্দীপনা তাই আজও নির্যাতিত-শ্রেণী-শক্তির ঘরে হিসাব করা চলছে না , তাই ধনী নির্ধন সর্বস্তরেই নৈতিক অবসাদ সমানভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

অন্তঃকরণের গুণ (Qualities of the heart) এবং মস্তিষ্কের চেতনা (Qualities of the head) সম্বন্ধে লোকের একটা জগাখিচুড়ি গোঁজামিল ধারণা আছে। মনের হিসাবী চেতনা বা যুক্তির প্রাধান্য, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতমহলের একমাত্র কথা। যুক্তিবাদে বা র‍্যাসানালিজম্ হিসাব করে বিচার করে চলার বড়াই করে বেড়াত। অন্তরের গুণ বলে যে সমস্ত জিনিস ও মনোবৃত্তি আগের দিনে শ্রদ্ধা পেত তাকে ঠাট্টার বস্তু করে ছাড়ল। সাহস—তার তো কোনো বিশেষ নৈতিক দরকার নেই—মাইনে করা সেপাই ও শান্ত্রী দিয়েই সাহসের কাজটা সেরে নেওয়া যায়, বিচার বিবেক তো আইন আদালতের মধ্যেই নির্দিষ্ট করে রাখা যায়। মানুষের দুঃখ, অন্নহীনের আর্তনাদ যদি ওঠে ত তো Red Cross Society-র মতো রিলিফ ফাণ্ডে চাঁদা দিলেই হয়ে যায়। অন্তরের সাড়াও যে একটা মাপদণ্ড, যত অন্ধই হোক সেটাও যে মানুষের

জীবন সংগ্রামে অস্তিত্ব দাবি করছে—বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচার আজো যে সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্বাভাবিক টান তাকে এবং এই জাতীয় প্রাকৃতিক শক্তির অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে পারেনি বা তাদের স্থান দখল করে সমান কার্যকরী হতে পারেনি একথা হয়ত আজ আর অস্বীকার করতে পারবে না। স্বার্থপরতার দুর্দান্ত গতিপথে মানুষকে যেমন ওবা Hedonist নামক কুৎসিত স্বার্থকেন্দ্রিক বেনে হিসেবী জীব বানিয়েছিল—তেমনি যুক্তিবাদকে লজিকের একদেশদর্শীতায় টেনে নামিয়েছিল—যার ঠুলি চোখে পড়লে বর্তমান কায়েমী স্বার্থ-সম্পন্ন শ্রেণীর অনন্তকাল পর্যন্ত অস্তিত্বের কোনো ব্যাঘাত দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এদিকে যে বিরুদ্ধ-শক্তি লোক-চক্ষুর অন্তরালেই জন্ম নিয়েছে, ক্রমবর্ধমান আক্রমণ শুরু করেছে, তাদের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে সন্দেহাকুল করে তুলেছে, এই দ্বন্দকে তারা কোনো যুক্তি দিয়ে যুক্তিবাদের বিদ্যায় ব্যাখ্যা করতে পারছে না, ইতিহাসের নতুন সম্ভাবনাকে তাই একটা দৈত্য বলে চালিযে দিতে চাইছে—যার জন্ম-রহস্য বুঝে উঠতে পাবছে না। এমন এমন ঘটনা ঘটছে যাতে তাদের লাভক্ষতি ও বাজারের ওঠানামার কাল্‌চার ও শাস্ত্র দিযে এঁটে উঠতে পারছে না এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সমাজের এমন অনেক বিষয় তাবা এতকাল ধবতেও পাবেনি—যাবা ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে।

লোকচক্ষুর আডালে ইতিহাস তাব পববর্তী স্তরের সূচনা সৃষ্টি কবে যাচ্ছে—এই বৃদ্ধ, গলিত, কুৎসিত সমাজ-ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দিযে নতুন সমাজ গড়বার শক্তি আছে, সে দিনে দিনে বাড়ছে কিন্তু সে আজও অবচেতন্। চেতনা যেখানে ফাঁকি দেয়, ছলনা করে, সত্যিকথা বলে না—অবচেতনা সেখানে প্রাণের স্পন্দনে অন্তরের তারে বেসুব বাজাতে থাকে। প্রাণের বা অন্তরের সহজাত গুণাবলীকে তাই আজকের দিনে মনে হবে চেতনার বিরুদ্ধবাদী এবং স্বার্থের খাতিবে তাকে মোহ, নিম্নজাতীয় বৃত্তি বা অন্ধতা বলে উড়িযে দেবার চেষ্টা চলে। ফলে দু'য়েব ভিতর একটা দ্বন্দ্বেব আকার ধারণ করে। প্রাণ ও মন যেখানে এক কথা বলছে, জীবনের স্বতঃপ্রকাশিত তাগিদ ও চেতনা যেখানে একত্র এসে মিশেছে, সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই, জড়তা নেই, ছলনা নেই, ঠিক সেই মুহূর্তেই জন্ম হয় আদর্শ, নৈতিক উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও উদারতা। ইতিহাসের অব্যক্ত দাবি এখন মানুষের হাতে-নাতে এসে স্বীকৃতি পায়—মানুষ যখন সেই প্রয়োজনীযতাকে সত্যিকাব উপলব্ধি কবে তখন দেখা দেয় এই সামাজিক উৎসাহ ব্যক্তিগত জীবনে—প্রাণ ও মনের কোনো দ্বিধা থাকে না।

ইচ্ছা শক্তির একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা, চবিত্রের দৃঢ়তা, আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবার পণ, এই যে সমস্ত আদর্শ-স্থানীয় গুণ এগুলি জীবনের নিজস্ব শক্তি। এরই সাহায্যে জীবন মানুযের মধ্য দিযে এতটা পথ, এতটা দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসেছে। মানুষের বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধি আজ যতটা প্রসারিত, প্রথমে ততটা তো ছিল না—সহজাত গুণগুলির উপরে নির্ভর করেই অনেক কাল তাকে এগুতে হয়েছে। এবং তখন দুরূহ, শক্ত শক্ত চারিত্রিক শক্তিগুলি না হলে একেবারেই চলত না। আজ শক্তের ও শক্তির প্রয়োজন হয়ত যান্ত্রিক সহায়তায় সম্পন্ন করা যায়, এই ভেবে মানব চরিত্রের শক্তিকে শক্ত করতে ঢিলে দিয়েছিল কিন্তু কালে দেখা গেল মানুযের প্রয়োজনে আজকের সমাজ ধ্বংসশীল এবং মানুযের সত্যিকার প্রয়োজন আজ ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা না হলে মিটবে না। ওদিকে যারা যান্ত্রিক শক্তিতে শক্তিমান তারা এই সমাজকে ইস্পাতের জোরে ধরে রেখে দিতে ব্যস্ত কিন্তু অগণিত দুঃখী মানুষ তাদের হাতে নেই সেই যান্ত্রিক শক্তি অথচ মনটাকে সেই আদিমকালের শক্তি থেকে, চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকেও করেছে বঞ্চিত। তাই আজকের যুগের নিপীড়িতদের আন্দোলনে যেন নেই সেই

আদর্শের মাদকতা। এবং যাঁরা নেতা তাঁরাও বোধ হয় মনে করেন না যে ওসবের আর দরকার আছে। নিপীড়িতদের লড়াইয়ের কায়দায় বিপ্লব যেদিন বাদ দিল তারা—সেদিন একমাত্র দরকার হলো ভোট সংগ্রহ করা। ছলে, বলে, পয়সায় ভোট ও সমর্থন সংগ্রহ করার পথে আজকের এই বেনে সমাজে কোনো কালে নৈতিক সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে না।

বিপ্লবকে অস্বীকার করতে গিয়ে সমাজের রূপান্তরকে অস্বীকার করা হয়েছে—কার্যত ইতিহাসের প্রয়োজন ও তাগিদকে এড়িয়ে চলা হয়েছে। অথচ আমরা দেখছি নৈতিক উদ্দীপনা আজকের যুগে জন্ম পেতে পারে একমাত্র ঐ নতুন তাগিদকে স্বীকার করার মধ্যে। জীবনের নতুন নৈতিকপ্রবাহ তাই আজ হতচেতন, অর্ধচেতন ও দ্বিধাগ্রস্ত। এ হেন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা মজুর আন্দোলন করেছে, তার মানে দৃষ্টিহীন, সংজ্ঞাহীন অন্ধ আন্দোলন করেছে—তারা কখনোই আশা করতে পারে না যে নিপীড়িতদের মধ্যে কোনো কালে এ পথে আদর্শের ও মনের সেই যুগান্তকারী শক্তির উন্মেষ করতে পারবে।

প্রাণের সম্পদ চরিত্রের সম্পদ, তাই সত্যিকার চেতনার সম্পদের সঙ্গে এক হওয়া চাই, মানুষের মনে দেখা দেবে এক অপূর্ব বিপ্লব, অসাধারণ ক্ষমতার উৎস। চেতনাতে আজ বিশেষ গোল অর্থাৎ অবচেতন এন্টিথিসিস আজও চেতন থিসিসের জায়গা দখল করতে পারেনি, এমন কি নিপীড়িতদের মনেও না। আজকের যুগের ইতিহাসের তাগিদ ও দাবিকে আজও গ্রাহ্য করা হয়নি—এড়িয়ে চলা হয়েছে, তারই ফলে প্রাণের ও চরিত্রের সম্পদেও জাগছে না কোনো সাড়া, নৈতিক বল ও চেতনার দৃষ্টিতে হচ্ছে না কোনো সংযোগ, উঠছে না নবজাগরণের কোনো আশার বাণী। মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক লড়াই চেতনার গোঁজামিলে টুকরো টুকরো হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিপ্লবকে অস্বীকার করে নীতিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, প্রতিক্রিয়ার গায়ে নীতির পোশাক একেবারেই ধরছে না, হাস্যাস্পদ হচ্ছে। আর বিপ্লবহীন বিপ্লববাদীদেরও নেই কোনো নৈতিক জোর। তাদের পরাজয়টা আরও লজ্জাকর।

পরবর্তী অধ্যায়ে বিপ্লবীদের অন্তঃসারশূন্যতার বিশদ ব্যাখ্যা শুরু হবে।

মার্কস্‌বাদের বিকৃত ব্যাখ্যা ও ব্যবহার

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা যেদিন থেকে আবিষ্কার হয়েছে, অর্থাৎ মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর আবিষ্কার থেকে, একটা সহজ মোটা বুদ্ধি বামপন্থীকে পেয়ে বসেছে। তারা অন্তত ব্যবহারে 'জীবনের প্রধান সমস্যা জীবিকার অন্বেষণ' এই সূত্রকে এমনভাবে বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে লাগল যাতে মনে হবে তথাকথিত মার্ক্সিস্টদের কাছে মানুষ মানে কতকগুলি পেটসর্বস্ব জীব। পেটের চিন্তা বা উদরবাদ বলে যে জিনিস এরা কার্যত চালু করে বসল সেটা কিন্তু মার্কসের বাস্তব ব্যাখ্যা নয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত সামাজিক অন্যান্য সমস্ত সত্তা ও নীতিকে নির্ধারিত করে থাকে, এর অর্থ এই নয় যে পেট ভরানো হলো অর্থনৈতিক ভিত্তি। একটি লক্ষপতি যখন কোটিপতি হবার তাগিদে দিনরাত্রি ফিকির খুঁজে বেড়ায় তার অর্থ এই নয় যে লক্ষপতির পেটে আরো ক্ষিধে রয়েছে এবং কোটিপতি হলে তার খাদ্যসমষ্টি আরো বেড়ে যাবে। এখানে তার পেটের ক্ষিধে কোনোই কাজ করছে না বরং কাজ করছে মনের ক্ষিধে। কিন্তু এই মনের ক্ষিধের ইন্ধন জুগিয়ে দিচ্ছে অর্থনৈতিক প্রয়োজন। সে অর্থনৈতিক প্রয়োজন তার নিজের খাদ্য-বস্ত্রজনিত জীবিকার দায় নয়, সমাজের অর্থনৈতিক দায়। অর্থাৎ ধনতন্ত্রের জীবনের জন্য মূলধনের ক্রমবৃদ্ধির চাহিদা লক্ষপতিকে কোটিপতি হবার তাগিদ জুগিয়ে

চলেছে। ধনতন্ত্রে ভিতরকার প্রতিযোগিতা ও মুনাফার জন্য নিত্য নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে শোষণ-কায়দা অনবরত মূলধন বাড়িয়ে চলবার অদম্য চাপ দিয়ে থাকে এবং তারই মানসিক প্রকাশ ধনীদের আরো ধনী হবার তাগিদ জোগায়। তা ছাড়া সমাজে প্রতিপত্তি যত বাড়ে ততই তার দাম ও গৌবব উপলব্ধি বেড়ে যায়—সেখানে তার নিছক মানসিক লোভ, যে লোভ আজ ধনতন্ত্রের নিয়মকেই সাহায্য করছে।

বড়বাজারের নোংরা, আলো-বাতাসহীন ঘনবস্তির কদর্যতার মধ্যে কলকাতা তথা বাংলাব বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রাব নমুনা দেখলে একথা স্পষ্ট মনে হবে যে জীবন-সম্ভোগ করবার ফুরসতও ঐসব ধনীদের ও ধনাকাঙক্ষীদের নেই। ধন সঞ্চয়ের তাগিদ তাদেব ব্যক্তিজীবনেরই তাগিদ নয়, সঞ্চয় বা মূলধনের বৃদ্ধি তাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে—ভোব না হতে তাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে ছাড়ছে—রাত্রিদিন টাকাব স্বপ্ন বা Money-fetishism-এ পেয়ে বসেছে কিন্তু এই দুর্দান্ত তাগিদ পিছিয়ে পড়া ভারতীয় মূলধনের বিশ্ব-মূলধনের সাথে সমগোত্রে আসবার তাগিদ। আজকাল অবিশ্যি একদল অতি ধনী, জীবনসম্ভোগ-সর্বস্ব ধনপতিব সৃষ্টি হয়েছে—যারা বিলাসিতার দিকে ঝোঁক দিতে সমর্থ তারা আজ বৃটিশ ধনতন্ত্রেব সাথে একটা আসন কায়েম করে নিয়েছে এবং ভোগ-বিলাসিতার দিকে নজর দেবাব অবসর পেয়েছে। কিন্তু এখানেই তাদেব শান্তি নেই, কেননা ভারতীয়-মূলধন বিশ্ব-মূলধনেব বাজারে এসে আরো অনেক দুর্দান্ত প্রতিযোগিতাব মুখোমুখি হয়ে পড়ছে এবং তাদেব সংগ্রাম কোনো কালেই শেষ হচ্ছে না। তাবপর মজুবদেব সাথে ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের সাথে লড়াইটাও তাদের তীব্রতর হয়ে উঠছে, ফলে তাদেব আব অলস থাকতে দিচ্ছে না। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে, শক্তি সন্ধান করছে—অলস-বিলাসিতায় ডুবে থাকতে পারছে না—তাদেরও লড়াইয়েব নীতির দরকার হচ্ছে—নানাপ্রকার নীতিব চলন করতে চাইছে—ফ্যাসিজম নামক এক নয়া-নীতির চলন করতে চাইছে—নযত গান্ধীজীর অহিংস-নীতির আশ্রয নিচ্ছে। এই ধনতান্ত্রিক প্রথাকে চালু রাখবার জন্য কোনো ধনীর ব্যক্তিগত জীবনে বহু কাট্‌ছাট এমনকি সম্পূর্ণ বৈবাগ্য অবলম্বন কবাও আশ্চর্য নয়, অথবা যুদ্ধ বিগ্রহেব ঝক্কি নেওযাও অসম্ভব নয়। আজকেব যুদ্ধ বিগ্রহের সর্বধ্বংসী ভয়াবহতা, যাতে তাদের নিজস্ব শহর, নিজস্ব কল-কারখানা, নিজস্ব ব্যবসায়ও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তা সত্ত্বেও—জাপান, জার্মানির অবস্থা দেখা সত্ত্বেও—তাদেব যুদ্ধ-বিরোধী করতে পারে না। এই অর্থনৈতিক তাগিদ এত বড় যে শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের সর্বনাশও তারা না করে থাকতে পাবে না। এখানে তাদেব ব্যক্তিগত আশু স্বার্থকে ছাপিয়ে ধনতন্ত্রের সামাজিক তাগিদ প্রাধান্য লাভ করছে। সোজা মোটা হিসাব কাজ করছে না। মোটকথা সামাজিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সহজ শান্তি-পুষ্টিলাভের নেশা নয়—বিশেষ শ্রেণীব স্বার্থ, শ্রেণীগত প্রতিষ্ঠার স্বার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে আসছে। এই শ্রেণীস্বার্থ তথা ধনতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া অসম্ভব নয়, যদিও ধনতন্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিস্বার্থের ভিত্তিতে নিহিত বলে চালু হয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ থেকে ধনতন্ত্রের স্বার্থ আসেনি—কিন্তু ধনতন্ত্রের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ এতদিন এতটা প্রাধান্য ও রস পেয়ে এসেছিল। আজ হয়ত এমন দিন এসেছে যখন ধনতন্ত্রের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডি আরো সঙ্কীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ছে অর্থাৎ যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় ধনী এই ধনতন্ত্রে ব্যক্তিস্বার্থ নিরাপদ ও কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিল তাদের সংখ্যাও দিন দিন কমে আসছে এবং বিশ্ব-যুদ্ধ ও সঙ্কট সেই মুষ্টিমেয়র স্বার্থও বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে—ফলে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ছে—তার সামাজিক প্রয়োজন সকল দিক দিয়ে ফুরিয়ে গেছে কিন্তু চালু ধনতান্ত্রিক

মনোভাব বা ইডিওলজি আজও ভূতের মতো সর্বশ্রেণীর মনে কাজ করে চলেছে—কাজ করে চলেছে তাদের ঐতিহাসিক ও জৈবিক স্বার্থের বিরুদ্ধে। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও আজ যে মানুষ মূর্খের মতো কাজ করে চলেছে এরও অর্থ এই, তাদের ব্যক্তিগত সুবিধাজ্ঞানটাই তাদের কাজের সত্যিকার প্রেরণা নয়—তাদের কাজের ব্যবহারের প্রেরণা ভঙ্গি নির্ধারিত করছে আজও ধনতন্ত্রের প্রয়োজন—ধনতন্ত্রের প্রয়োজনহীন প্রয়োজন। যে ভিত্তি আজ নষ্ট হয়ে গেছে—প্রায় সবারই জন্য অর্থাৎ এই বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ভিত্তি—তার রীতি-নীতি ও প্রেরণাকে আজও চালু রাখতে গিয়ে মানুষ গাধার মতো ব্যবহার করছে—নিজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে—নইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, অদ্ভুত রকমের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যবাদ ও জাতিবাদ ইত্যাদি চলছে কেন? কে না বোঝে যে এসব সত্যিকার স্বার্থবিরোধী? অতএব ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যাকে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিকৃতরূপে যারা ইতিহাসের ব্যক্তি স্বার্থ ব্যাখ্যায় পরিণত করতে চেয়েছে, তাদের চেষ্টা হাস্যকর এবং বিশেষ ক্ষতিকারক।

ক্ষতিটা সবচেয়ে বেশি হয়েছে শ্রমজীবী শ্রমিকদের। শ্রমিকদের চিন্তা জগতে এই তথাকথিত *বাস্তবস্বার্থ* বা *স্বার্থবাদ* ঢুকে গিয়েছে। (প্রথমত) সমাজের যেটা চালু নীতি অর্থাৎ ধনীদের হাল-চাল, রীতি-নীতি স্বভাবতই অশিক্ষিতেরা অনুকরণ করে থাকে, ধনীদের জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যকে দেখে ধনী হবার চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু ধনী হওয়া এ জগতে সম্ভব নয়। ধনীদের মনের ছবিটা ধনী হতে ব্যর্থ হয়েও নিজেদের ছবি করে নিতে চায়, ফলে দেখা দেয় অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতামাতি, কাড়াকাড়ি। ধনীদের লোভ দেশ জয় করে সন্তোষ লাভ করে অথচ সমাজে তাকে দেশ প্রেম বলে চালু করতে সমর্থ হয় কিন্তু নির্ধনদের লোভ সামান্য জিনিস নিয়ে মারামারি ও শেষ পর্যন্ত ছেঁচকা চুরি ও নানা গ্লানিতে পরিণত হয়, অথচ তাদের সামর্থ্য না থাকার দরুন তাদের লোভটাকে কোনো মতবাদের আড়ালে লুকোতে পারে না—সকলের চোখে কদর্যরূপে দেখা দেয়—ধিকৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের সম্বন্ধে খেলো ধারণা জন্মে ও নিকৃষ্টতা মনে মনে মেনে নেয়—ধনবাদী সমাজের কাছে মাথা নত করে চলে। নৈতিক অবসাদ এমনি ভাবে তার সংগ্রামের শক্তিকে পঙ্গু করে দিতে থাকে। মজুরেরাও মানুষ অতএব তার দাবি মেটাতে হবে এই প্রেরণা ভুল পথে চালু হয়ে অর্থাৎ ধনী হবার চেষ্টাতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে ধনবাদই নৈতিক সমর্থন পেয়ে যায়। মজুরের মানুষ হবার পথ ধনবাদের পথ নয় অতএব ধনবাদের কোনো নৈতিক বৃত্তি তাকে গ্রহণ করলে চলবে না , ধনবাদকে ধনতান্ত্রিক নীতির বা মনোভাবের সাহায্যে পরাজিত এবং ধ্বংস করা যায় না।

দ্বিতীয়ত অনিষ্ট হয়েছে অধুনা প্রচলিত তথাকথিত মার্কসবাদী বা বামপন্থীদের কল্যাণে। তারা যে ধরনের শিক্ষা, চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি চালু করতে চায় এবং এতদিন চালু করে এসেছে, তার মধ্যেও ইতিহাসের স্বার্থ-ব্যাখ্যা কার্যত চালু করে এসেছে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রাধান্যকে এমনভাবে কাজ-কর্মে, হাল-চালে ব্যবহার করেছে যাতে এমন মনে হবে, নীতি-টিতি এ সব ফাঁকি—বুর্জোয়া চালাকি, স্বার্থটাই সব—সকলকে তাদের নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করাই হলো প্রধান কাজ, অতএব তার খাওয়া পরা, থাকা-শোওয়া ইত্যাদি দৈনন্দিন অসুবিধার লিস্টিটাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে এমন প্রচার শুরু করল যাতে শ্রমিক ও অন্যান্য নিপীড়িতশ্রেণীর লোকদের মনে একটা নতুন করে স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা এল। খণ্ড সংগ্রাম ও দৈনন্দিন দাবিদাওয়ার উপর জোর লড়াই চলতে লাগল—জনসাধারণ দিনকে দিন স্বার্থ চেতন হতে লাগল। কিন্তু একটা ফাঁক রয়ে গেল তাতে। আজ যে জনসাধারণের স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের কায়দায় কায়েম হতে পারে না—ধনতান্ত্রিক ব্যক্তি-ভিত্তি-সমাজের মধ্যে

তাদের আকাঙক্ষা পূর্ণ হতে পারে না—এ কথাটার উপর জোর কম পড়তে লাগল। কেননা সে কথাটার অনিবার্য দাবি হলো বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব যেহেতু আজকের কথা নয়—আজ কেবল প্রাথমিক স্বার্থ-চেতনার খণ্ড সংগ্রামই চলতে থাকুক এবং একদিন এইসব স্বার্থ চেতনা ও খণ্ড সংগ্রাম কোনো কালে আপনা আপনি সমগ্র সংগ্রাম বা জনসাধারণের সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে—এই ছিল এদের আশা। কিন্তু খণ্ড খণ্ড ব্যর্থ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত স্বার্থসমাধিতে ছিন্ন-ভিন্ন অর্থহীনতায় পবিণত হয়ে যেতে পারে—যদি না সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সংগ্রামের রূপটাকে বাস্তব কর্মপন্থা হিসাবে সবার উপরে তুলে না ধরা যায়—এ খেয়াল হলো না।

এই জাতীয় চিন্তাধারার দেখবার ভঙ্গিটাই উল্টো বা Up side down। এরা শ্রেণীর কথা বলে, শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে, কিন্তু শ্রেণী বা সমাজটাকে তারা কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি বলে মনে করে। চিন্তার গোড়াকার সূত্রে বিরাট এক গলদ রয়েছে। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজের ইউনিটটাকে ব্যক্তি হিসাবে শুরু করে যে চিন্তাব লহরী শুরু হয়, সেটা বুর্জোয়া শাস্ত্র। কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনে সমাজ থেকে ব্যক্তির বিবেচনা শুরু হয়। সমাজের জন্ম ব্যক্তির পূর্বে অর্থাৎ সমাজ না হলে মানুষ হতে পারত না—মানুষ বানরই থেকে যেত। সমাজের সাহায্যেই মানুষ মানুষ হয়েছে—কন্ট্রাক্ট করে নয়—রুশোর Social contract তাই মার্ক্সিস্টদের কাছে অপাংক্তেয়। কিন্তু এই ব্যক্তি থেকে ধরা চিন্তাধাবা আজকেব যুগেব সস্তা মার্ক্সিস্ট সত্যি করে বর্জন করতে পারেনি। বর্জন কবতে পারেনি ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থান্বেষী প্রেবণাব দুর্জয় প্রভাবে পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীব ব্যক্তিবাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে। কলেজে, স্কুলে Mill, Bentham-এর অর্থনীতি আইন পাঠের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। তার উপব গণতন্ত্রের প্রভাব তো আছেই। যে পরিমাণে আমরা আন্দোলনে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সুবিধার পিছনে ছুটেছি সেই পরিমাণে গণতান্ত্রিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাবাদ আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মপন্থাকে প্রভাবান্বিত হতে দিয়েছি। আমাদের ইউনিয়ন, সঙ্ঘ, দল সর্বত্র এই ব্যক্তি-প্রাধান্য পেয়ে গেছে এবং সকল সামাজিক চিন্তার মূল সূত্র আজও আমাদের ব্যক্তি।

মজুর ও চাষী আন্দোলনে তাই শ্রেণীর কথাটা আমরা তুলি বেশি করে এই অর্থে যে একতা না হলে আজকের এই সংগ্রাম সার্থক হতে পারে না, অর্থাৎ শ্রেণী ঐক্যেব এখানে পলিসিগত প্রয়োজনটা বোধ করছি—শ্রেণীর নিজস্ব প্রয়োজন—শ্রেণীর জন্য শ্রেণীচেতনা, এ কথাটা বুঝতে বা বোঝাতে পারিনি। জীবনের, সমাজের ভিত্তি দাঁড় করাতে হবে শোষিত শ্রেণীর উপর—একটা ঐক্যের সাহায্যে সংগ্রামের সুবিধার কথাটাই এতে নেই—নতুন সমাজের মূলগত ভিত্তি অর্থাৎ সমষ্টি-ভিত্তি এবং ব্যক্তি ভিত্তি নয়—এই কথাটাকে অগ্রাহ্য করেছি। শোষিত শ্রেণীর মুক্তির পথ ব্যক্তি হিসাবে তার সমস্ত সভ্যদের ধনী করার পথ নয়—কেননা সে পথে সমাজের উদ্ধার হতে পারে না। সমষ্টিগত ভিত্তি বা Collective interest-এর উপর ব্যক্তিগত স্বার্থ নির্ভর করবে এই হলো ইতিহাসের নতুন প্রয়োজন। এর ভিতরে একটা Tactical প্রয়োজনে ঐক্যের কথাই নেই—একটা Fundamental বা মূলগত ভিত্তির নতুন কথা রয়েছে। স্বার্থের সন্ধানে স্বার্থকে কয়েম করা যাবে না আর—সমষ্টির স্বার্থেই ব্যক্তিগত স্বার্থ মিটবে এই হলো সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ। কিন্তু এখন যা হচ্ছে সেটা একটা বিকৃত ভঙ্গি, স্বার্থকে কায়েম করবার জন্য সমষ্টির কাছে একটা সুবিধাগত আপীল। অর্থাৎ স্বার্থ থেকে সমষ্টির প্রয়োজন বোধ কিন্তু সমষ্টি থেকে স্বার্থ দেখবার ভঙ্গি নয়। একটা মজুর থেকে মজুর শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি, মজুর শ্রেণী থেকে একটা মজুরকে দেখা নয়। মনে হবে দুটো জিনিসই বুঝি এক। কিন্তু এক নয়—সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটিতে মানুষকে স্বার্থান্বেষীর প্রেরণাটাই বাড়িয়ে দেয়,

অপরটিতে মানুষকে সমষ্টির উপর নজর আকর্ষণ করায়—মানুষের সমষ্টিগত সত্তাকে উপলব্ধি করায়। প্রথমটিতে মানুষকে হীন, ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত করতে পারে না, সুবিধান্বেষী করে ফেলতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে মানুষকে কঠিন সংগ্রাম করতে সমর্থ করে—আত্মত্যাগ করবার প্রেরণা জোগায়, সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে বলিদান করতে শেখায়—যার থেকে আসে নৈতিক সম্পদ, আসে সামাজিক দায়িত্ব-জ্ঞান, আসে উদাব মনুষ্য-চেতনা, দুর্দান্ত কর্ম প্রেরণা ও সৃজনী শক্তি।

এই স্বার্থবাদের পথে ইউরোপীয় ও আমেরিকার মজুরশ্রেণীর নৈতিক দুর্গতি আজ বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। যুগ যুগ ধরে তারা এই বিকৃত মার্কস্‌বাদের পথে, স্বার্থ-সম্বল রাজনীতির পথে যে বিরাট বিরাট শ্রেণী-সংগঠন বা ইউনিয়ন করেছে, তার লক্ষ লক্ষ সভা, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, খবরের কাগজের ও প্রচারের প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই সৌধগুলি দেখতে যতই বিরাট হোক না কেন, তাতে তার মার্ক্সিয় আত্মা একদম অনুপস্থিত। শ্রমিকের ঐক্য হয়েছে কিন্তু তাতে প্রাণ নেই—ইতিহাসের প্রয়োজন তাতে মিটবে না—সমাজতন্ত্র ঐ প্রকার ঐক্যের ভিত্তিতে কোনো কালে আসতে পারে না, বরং ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজতন্ত্রের প্রধান বাধাই হলো বোধ হয় তাদের বিরাট বিরাট রাক্ষুসে ইউনিয়নগুলি। আজ বিলেতে ইউনিয়নের হাতে সরকার এসেছে বলা হয়, অথচ সেই লেবার পার্টি ও লেবার ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের ধারও ধারছে না। বড বড সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ওবাই যোগান দিয়ে থাকে, ওদেরই সভ্যেরা দেশে দেশে যুদ্ধে ধ্বংসকার্যে সমান দুষ্কার্য করে যায়, পিছিয়ে পড়া নিপীড়িত দেশের জাতীয় আন্দোলনের উপর অগ্নিবৃষ্টি করতে কোনো লজ্জা বোধ করে না। কেননা তাদের স্বার্থবোধ আজ সাম্রাজ্যবাদকে আশ্রয় করে চলেছে—একশো বছরের মার্ক্সিয় শিক্ষায় ও সংগ্রামে তাদের এতটুকু নৈতিক জোর ও চেতনার উন্নতি হয়েছে বলে মনে হবে না। তাবা হয়ত দরকার হলে প্রচণ্ড ধর্মঘট করতে পারে কিন্তু তারা সমাজতন্ত্র আনবার প্রয়োজন বোধ কবে না—তারা বিশ্বের মজুর শ্রেণীর ঐক্য উপলব্ধি করে না—তারা বিশ্ব-সংগ্রামকে ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েও ব্যর্থ করতে এগিয়ে আসে না—সমস্ত মানুষের মুক্তি আনবার ক্ষমতা রেখেও তারা চোখের সামনে মানুষের ও সভ্যতার ধ্বংস দেখে যায় এবং এই ধ্বংস কার্যে নির্লজ্জ সহায়তা করে। এরা অ্যাটম বোমাকে ব্যর্থ করতে পারে অথচ এরাই অ্যাটম বোমা তৈরি করতে সাহায্য করে এবং দেশে দেশে তা ফেলেও যাবে ওরাই।

স্বার্থবাদের এই ভয়াবহ পরিণাম ও গতির কারণগুলি আজো কি বিচার করে দেখবার সময় হয়নি? আমাদের দেশের সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা আজো ইউরোপের এই স্বার্থান্বেষী মজুর-আন্দোলনের অনুকরণে মত্ত। তাদের ইউনিয়নের প্রতাপ, মহিমাই আমাদের দেশের মজুর আন্দোলনের আদর্শ ও প্রাণ। খণ্ড-সংগ্রামের ও স্বার্থ-সংগ্রামের একচেটিয়া আন্দোলনের এই হলো পরিণতি—সমগ্র সংগ্রাম বা রাজনৈতিক বৈপ্লবিক সংগ্রামকে পিছে ঠেলে রেখে মজুর ও মানুষের ভাগ্যকে এমনি করে হতাশ করে দিচ্ছে। বিপ্লবকে বাদ দিয়ে মজুরের স্বার্থ কায়েম করবার এই অপূর্ব ফাঁকি দেশের ধনীরাও চট করে বুঝে নিল এবং তারাও অগ্রণী হয়ে, নয়ত পয়সা দিয়ে মজুর আন্দোলনের এই বিকৃত ধারাকে সাহায্য করতে লেগে গেল—বিপ্লবকে বাদ দিয়ে বিপ্লববাদীদের পয়সা, প্রেস ও প্রচারের অভাব রইল না। কোনো বিশেষ মতলব বা উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের এই স্বার্থের বদ্ধ জলায় এসে পৌঁছতে হয়নি, এসেছে তাদের খণ্ড-সংগ্রামের বিশ্বাস থেকে, এসেছে শ্রেণীর ও সমাজের মূলে ব্যক্তি স্বার্থগত চিন্তা থেকে, এসেছে সত্যিকার মার্কস্‌বাদকে বিকৃত করে। ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক

বাস্তববাদকে স্বার্থবাদ, উদরবাদে পরিণত করে। এঙ্গেলস্ তাঁর জীবিতা বস্থায়ই এই বিশ্রী ধারাকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং হুঁসিয়ার করে দিয়েছিলেন—লেনিন জীবনভর সমগ্র-সংগ্রাম বা বিপ্লবের সংগ্রামের নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন ও প্রচুর গবেষণা করেছেন কিন্তু আজ তাঁদেরই চেলারা বুর্জোয়া আইন ও ইউনিয়নের রীতি-নীতি নিয়ে অস্থির। তাদের আদর্শবাদ ও কর্মে সমগ্রতার একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে—সে কেবল রাশিয়া-সেই রাশিয়া নয় যে রাশিয়া কেমন করে বিপ্লব সম্ভব করেছিল—এ হলো স্টালিনের—স্টাখানভের রাশিয়া যেখানে আবার ব্যক্তি-স্বার্থবাদ নতুন রূপে সামাজিক প্রেরণার ভিত্তি বলে দাঁড় করাবার চেষ্টা চলেছে। মার্কসবাদ আজ আর রাশিয়ার মূলগত আদর্শ বা ভিত্তি নয়—স্টাখানভিজম্ বা যে যত পার উপার্জন করো এই ব্যক্তি-স্বার্থের নেশাই হলো আজকের রাশিয়ার শেষ কথা। আজকের রাশিয়া তাই দেশে দেশে বিপ্লবের নৈতিক আগুন সৃষ্টি করতে অসমর্থ।

আবার বলি। আদর্শ ও নৈতিক উদ্দীপনা বা নবজাগরণের উৎস ইতিহাসের নতুন প্রয়োজন থেকে, সে প্রয়োজন ব্যক্তি বিশেষের ধনী হবার প্রয়োজন নয়—আজ আর ধনী হবাব চেষ্টা কোনো নতুন কথা নয়—ধনতন্ত্রকে শেষ করে, ধনী হবার সর্বপ্রকার রাস্তাকে শেষ করে—সমাজতন্ত্র আনয়ন করাই একমাত্র সামাজিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের লড়াই না ওঠালে কোন উদ্দীপনা, কোনো নৈতিক জোর সৃষ্টি করা সম্ভব নয়—ক্রমবর্ধমান নৈতিক পচন ও অবসাদ আর কোনো সূত্র দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়—স-হিংস পন্থায়ও নয়, অ-হিংস পন্থায়ও নয়—বিপ্লবকে বাদ দিয়ে হিংসা আজ যুদ্ধ এবং অ-হিংসা আজ ব্যর্থ এবং এমন কি হিংসারই সহায়ক। যা কিছু নীতিগত আদর্শ—যাঁকে আমরা বাঁচাতে চাই—উদ্ধার করতে চাই তা একমাত্র বিপ্লব অর্থাৎ নতুন সামাজিক প্রয়োজনকে স্বীকার করলেই পাওয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। খণ্ড সংগ্রাম, আংশিক সংগ্রাম সমাজতন্ত্রেরই অংশ সংগ্রাম—এ আর কার্যত ঠিক কথা নয়—সমাজতন্ত্রকে আজ আর আংশিক ভাবে সংগ্রামের সার্থক করা যায় না—আজকের সমাজটাকে সমগ্র রূপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার সমাজতান্ত্রিক রূপ সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং নতুন করে সমাজের দেহে, মনে প্রাণের বান আসতে পারে—অন্যথায় নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনে সাক্ষাৎ উপলব্ধি যার নেই বা হলো না তার নৈতিক শক্তি জাগল না। এবং এমনি এটা ওটা করে যাবা নিজেদের চিন্তায় একটা গোঁজামিল দেবে তারাও কোনো শক্তি অনুভব করবে না। আজ ইতিহাস মাত্র একটি কথাকেই স্বীকার করবে, অন্য সব কথা বাজে কথা, অর্থহীন বাচালতা ও আত্ম-ছলনা।

বামপন্থা ও নৈতিক সম্পদ

এমন অনেক বামপন্থী থাকতে পারেন যাঁরা এই নৈতিক সম্পদ কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইবেন। এ যেন কোনো এক মান্ধাতার আমলের আদিকালের নীতিবাগীশের কথা। নীতির তাদের দরকার নেই—নীতিজাতীয় কথা সবই বুর্জোয়া—বাস্তব বিপ্লবের পরিবর্তে নৈতিক বিপ্লবের স্থান করা হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু যে কোনো কর্মী আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করবে যে জনসাধারণের সংগ্রামে, দলের সংগ্রামে নীতির শক্তি একেবারে অপরিহার্য। অ-হিংস আন্দোলন করতে গেলে যতটা নৈতিক বলের দরকার হয় স-হিংস বিপ্লবেও বিপ্লবীদের ততটাই নৈতিক বলের দরকার হয় বললেও কম বলা হলো, আরো বেশি দরকার হয়। অ-হিংস ও তজ্জনিত রাজনৈতিক চেতনাতে বরং গোঁজামিল আছে—পরাজয় স্বীকারে লজ্জা নেই—অ-হিংসা বাস্তবে সহযোগিতারই আন্দোলন, কিন্তু বিপ্লবে কোনো ক্ষেত্রেই সহযোগিতার বিশ্রামাগার

নেই—সেই অক্লান্ত সংগ্রামে নৈতিক বলের প্রয়োজন আরো বেশি। বস্তুত এই নৈতিকবলের একটা পরিমাপ দিয়েও কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের চেতনাকে মাপ করা যায়। চেতনা অর্থাৎ অবচেতন ঐতিহাসিক শক্তি সজ্ঞান বিকাশের সঙ্গে নিয়ে আসে অপূর্ব মানসিক বল। প্রত্যেক আদর্শকে বহন করবাব শক্তি ঐ আদর্শের মধ্যেই নিহিত রয়েছে—তার বাইরে নয়, সহজ সুবিধাবাদে নয়। আদর্শকে বহন ও ধারণ করবার শক্তি যদি সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি না হতো তবে সে আদর্শ কোনো কালে কায়েম হতো না, সেটা হতো একটা কল্পনা-বিলাস মাত্র।

অস্ত্র বলো, অর্থ বলো, বিরাট সংগঠন বলো, একে ধারণ করবে যাঁরা তাদের কব্জির জোর মনের জোর থেকে প্রতিনিয়ত রসদ পাচ্ছে। মনের ঐকান্তিক আগ্রহ, ইচ্ছা ছাড়া বিপ্লবের বাহ্যিক ও বস্তুসম্পদকে ব্যবহার করা অসম্ভব—হতে পারে না। হতে যে পারে না তা আমরা প্রতি পদে পদে অনুভব করি—মজুর আন্দোলনে মজুরের দুর্বলতা, পার্টির সভ্যদের দুর্বলতা, ঐকান্তিকতা, ধৈর্য, সাহস ও ত্যাগের অভাব আজ প্রতি পদে পদে পার্টিওয়ালাদের লজ্জিত ও অপমানিত করে ছাড়ছে। দলের মধ্যস্থিত সভ্যদের ব্যক্তি-জীবনের লুম্পানিজম জনতার চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছে, দলগুলি জনতার শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে, ক্রমেই বেতনধারী অফিসার বহুল যে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আকার গ্রহণ করতে চাইছে। পরম আদর্শবান নতুন নতুন কর্মী দলের আবহাওয়ায় নষ্টচেতন হয়ে যাচ্ছে। দলে ঢোকবার সময় তার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য—আদর্শের সচেতনতা থেকেই সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু আদর্শহীন অর্থাৎ যে দল বিপ্লবকে নিছক শব্দের ও যুক্তির চালাকিতে মুলতবী রেখে কাজ চালিয়ে চলেছে প্রচলিত গড্ডালিকারই—সেই উদ্দেশ্যহীন দল সেই নতুন কর্মীর উদ্দীপনাকে আবো বাড়াতে পারে না, তাকে স্তিমিত করে দেয়, কিছুদিনের মধ্যে মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক দেয় ঘুচিয়ে, অর্থাৎ মানুষের দুঃখও তাকে নাড়া দিতে পারে না, ফলে ইতিহাসেব তাগিদ তার কানে পৌঁছায় না। তাইতেই Whole-timer বা সর্বক্ষণের কর্মী নাহলে কেউ কাজ করতে পারে না, শ্রমিক হয়ে শ্রমিকের মধ্যে কাজ করতে পারে না, সৈনিক হয়ে সৈনদের মধ্যে কাজ করতে পারে না, প্লাট্‌ফর্মে না গেলে সমাজতন্ত্রের কথা বলতে পারে না, লাউডস্পিকার না হলে কথা বলতে পারে না, ভাল ছাপা না হলে কাগজ পড়তে ভাল লাগে না, কাজ করতে হলে, চাকুরি করতে হলে, রাজনীতির সময়ও লোক খুঁজে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তারপরে দেশের মধ্যে, ইউনিয়নের মধ্যে নিজ নিজ প্রভুত্ব নিয়ে নীতি-হীন দলাদলি কেলেঙ্কারি তো আছেই। দল ভারি দেখাবার লোভ, অতিরঞ্জন করার লোভ তো আছেই—কখনোই একা দাঁড়াবার সাহস রাখে না, একা পড়লে দলের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। পুলিশের মার না খেতেই সব আউড়ে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। রুশ-বিপ্লবের পরক্ষণে দেশে দেশে যে বীর্যবান অসীম সাহসী কমিউনিস্টদের জন্ম হয়েছিল, তাদের আজ বড় একটা দেখা যায় না। সে যুগে আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠুর নির্যাতন তারা কি বিপুল নৈতিক শক্তির সাথে সহ্য করে কাজ করেছে তার উদাহরণ যে কোনো ধর্ম-প্রচারকদের লজ্জা দিয়ে গেছে। তাদের বিশ্বাস ও মনোবল প্রথম যুগের খৃস্ট-শহিদদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। আজ আর তা নেই, আজ গলাবাজি ও Liberal corruption-এ সমস্ত দলগুলি একেবারে দূষিত, তার কারণ বিপ্লব আজ আর তাদের প্রোগ্রাম নয়, আজ যা তারা করে তা হলো গণতান্ত্রিক খেলারই সমাজতান্ত্রিক নামান্তর।

সত্যি কথা বলতে লজ্জা কি—এই দুর্নীতি আজ আমাদের সত্যিই ভিতরে ভিতরে লজ্জা দেয় এবং লজ্জা দেয় বলেই মহাত্মা গান্ধীর কাছে বামপন্থীরা মাথা নত করে থাকে, তারা স্বীকার করে নীতির লড়াইয়ে মহাত্মা তাদের চেয়ে অনেক উঁচু। অথচ মহাত্মার অহিংসার প্রকৃত কমিউনিজমের কাছে মাথা নত করে চলা উচিত। কমিউনিজমের আদর্শ ও তাকে বহন করবার

মত নৈতিক বল ও কাজের নিষ্ঠা যদি কারো থাকে তবে মহাত্মার কাছে তার কোনো দুর্বলতা বা নিকৃষ্টতাবোধ থাকবার কথা নয়। কমিউনিজম সত্যাগ্রহের চেয়ে হাজার গুণ উঁচু দরের বাস্তব নীতি। সত্যাগ্রহ বাস্তব ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রেরই রক্ষাকবচ। অথচ মহাত্মাকে নীতির উঁচু আসনটি ছেড়ে নিজেদের জীবনে নৈতিক রাবিশ কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ানোর অর্থ কি? আদর্শের ঔজ্জ্বল্য যেদিন আবার ফিরে আসবে, অর্থাৎ যেদিন আবার ইতিহাসের প্রয়োজন অর্থাৎ বিপ্লবকে বাস্তব প্রোগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করতে পারব, সেদিন স্পষ্ট দেখতে পাব মহাত্মার মাহাত্ম্য সত্যি অত বড় নয়—সেদিন নিজেদের প্রতি নিজেদেব শ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি ফিরে আসবে, তার আগে নয়। তার আগে মহাত্মাকে নিন্দা কববার মতো নৈতিক জোব মিলবে না—কোনো টিপ্পনী লোকের মন আকৃষ্ট করতে পারবে না।

জনসাধারণের ধারণ শক্তি

এবারে বামপন্থীরা বলতে শুরু করবে যে তাবাও আদর্শকে অগ্রাহ্য করে না কিন্তু সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও তার জন্য সামগ্রিক বিপ্লব রূপায়ণের দাযিত্ব গ্রহণ করবার শক্তি জনসাধারণের একদিনেই আসতে পারে না। যে জনসাধারণ এই বিপ্লবের বাহক ও নেতা তাবা আজও অজ্ঞান-তিমিরে ডুবে আছে, শিক্ষার বালাই নেই, নিজেদের সামান্য দাবি ও স্বার্থ সম্বন্ধে অচেতন, তাই তাদের আমরা প্রথমে সামান্য সামান্য সংগ্রামেব মধ্য দিযে শক্ত কবে নিচ্ছি, ঘটনার ছোট ছোট আঘাত সইয়ে চোখ খুলিয়ে নিচ্ছি। আস্তে আস্তে একদিন তারা সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করবার শক্তি পাবে, এখনই তারা এত বড় আদর্শ ও কর্মপন্থা গ্রহণ কববার যোগ্য নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

জনসাধারণের অক্ষমতার দোহাইটা এসেছে মার্ক্সিয় দর্শনের ডায়ালেক্টিক বা দ্বন্দ্ব-গতির সূত্র বুঝতে না পেরে এবং প্রচলিত লজিক বা বুর্জোয়া ন্যায়শাস্ত্র থেকে।

যারা অশিক্ষিত, যারা মোহান্ধ, যাবা জীবনে সকল রকমে নষ্ট হয়ে গেছে—কমিউনিজম্ তাদেরই জন্য—সাম্যবাদ তাদেরই আদর্শ। অথচ সাম্যবাদকে বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে বুঝতে পণ্ডিতেও হার মেনে যায়, মূর্খেরা তা গ্রহণ করবে কি করে? যে কথা বুঝতে হলে কাণ্ট, হেগেল, মার্কস, এঙ্গেলস্ লেনিন পড়তে হয় এবং পড়ে বুঝতে হয় তা জনসাধারণ কি কবে হৃদয়ঙ্গম করবে? শুধু করবে নয়, এক দেশের এক 'মূর্খ' জনতা তা গ্রহণ করে মানুষ হয়েছে—সে রাশিয়ার দেশে—যে দেশের জনতা ত্রিশ বছর পূর্বে আমাদের দেশের জনতার চেয়ে কোনো হিসাবে উচ্চ শিক্ষিত বা শিক্ষিত ছিল না।

এটা ব্যতিক্রম নয়, আশ্চর্যজনক ব্যাপারও নয়। একে বুঝতে হলে স্বীকার করতে হবে যা কিছু প্রকাশিত, প্রচলিত চিন্তা, বিদ্যা ও সংস্কারের বহুল প্রচার রয়েছে, তার অন্তরালে তারই ভিতরে আরো একটা অনুভূতির ধারা সমানে প্রবাহিত, ফল্গুধারার ন্যায়। ইতিহাসের সেই ফল্গু-ধারা হলো সেই বিরুদ্ধ শক্তি যা ধনতন্ত্রের ভিতরে সমানে বেড়ে চলেছে। ধনতন্ত্রের আর্থিক ভিত ও মানসিক সম্পদ বা চেতনা, চিন্তা, জ্ঞান, আচার, বিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাদের যে ধ্বংসকারী শক্তির জন্ম হয়েছে সেটাই হলো আজকের ইতিহাসের নতুন প্রয়োজন, যার আগমন সকল দিক থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, যার পদধ্বনি সর্বদাই শুনি, অথচ যাকে দেখেও দেখতে পাইনে। সেই শক্তি বর্তমানে চালু চেতনার চিন্তধারায় বা ইডিওলজিতে আত্মপ্রকাশ করে না, আজকের সচেতন মন তাকে অস্বীকার করবার জন্য, ভুল করবার জন্য, না দেখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—সমস্ত অবজ্ঞা, কটুক্তি, মিথ্যা ছলনা, দাম্ভিক অত্যাচার দিয়ে যুগের সেই

নবাগতের আগমনকে অস্বীকার করবার সর্বপ্রকার চেষ্টা হয়ে থাকে। ফলে সেই বিরুদ্ধ শক্তি—ইতিহাসের সে প্রয়োজন বইতে, পুঁথিতে, খবরের কাগজে, পণ্ডিতের ও বক্তার ভাষণে স্থান পায় না। স্থান পায় না বটে সমাজের চেতন মনে, কিন্তু তাকে রুখে রাখবার সাধ্য শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুরই নেই—সে আত্মপ্রকাশ করবেই। সচেতন মনে ঠাঁই না পেলেও অবচেতন মনে ও প্রাণে তার দুর্দান্ত তাগিদ সৃষ্টি হয়—তারপরে ইতিহাসের সঙ্কট মুহূর্তে দুকূল ভাসিয়ে সেই বোবা-শক্তি সমাজের সমস্ত কোণে কোণে প্লাবন সৃষ্টি করে ভেসে ওঠে। সে হলো বিপ্লব। বিপ্লব হলো ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণ যখন অবচেতন ঐতিহাসিক প্রেরণা সচেতন ধারায় এসে মেশে এবং মিশে এক অপূর্ব জগৎ সৃষ্টি করে।

ইতিহাসের এই বোবা প্রয়োজন আজকের যুগে তথাকথিত মূর্খ মজুর, চাষী ও জনসাধারণের বুকে, প্রাণে অবচেতন মনেই বেশি করে আঘাত করতে থাকে কেননা আজকের যুগে সেই নতুন শক্তি ও নতুন সমাজ গড়বার ক্ষমতা রাখে তারাই এবং তারাই ইতিহাসের সত্যিকার বাহন। এই সামাজিক তাগিদ তাদের রক্তে রক্তে প্রবাহিত, তাদের প্রতি মুহূর্তের অনুভূতির খোরাক। এই সহজাত অনুভূতির ভিত্তি-ভূমিতেই সমাজতন্ত্রের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি আছে, কাজেই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করবার জন্য তাদের কঠিন মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় না—কাণ্ট, হেগেল, মার্কস্ পড়তে হয় না, সামান্য ইঙ্গিত মাত্রেই চট করে রক্তে, মজ্জায়, মস্তিষ্কে উপলব্ধি করে নেয়। বস্তুত বুঝবার পরিশ্রম বুদ্ধিজীবীদেরই বেশি, কেননা বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধকে বোঝবার চেষ্টা করা মানে তারা এতকাল যত রাবিশ মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করেছিল তাকে ভোলাবার চেষ্টারই নামান্তর। তার বিকৃত, অপ্রয়োজনীয় সামাজিক শাস্ত্র তার মাথা থেকে সরিয়ে ফেলে যদি কখনো সে ইতিহাসের সহজ ডাকটি শোনবার মতো মনটা পরিচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে, তবে তাকে বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। আককের দিনে তাই তার কাছে যা দুরূহ ও দূরাদর্শ বলে মনে হয়—ইতিহাসের যারা প্রকৃত বাহন সেই শোষিত-শ্রেণীর কাছে তা একমাত্র সহজ ও নিকটের কথা। পণ্ডিতের কাছে তা খুব বড় কথা বলে মনে হতে পারে কিন্তু 'মূর্খের' কাছে অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে তা অত্যন্ত কাজের কথা। সমাজতন্ত্র শিক্ষিতের কাছে কেবলই বড় কথা বলে মনে হবে কিন্তু এই বড় কথায় ভয় পাবে না কোনো শ্রমিক। আজকের দিনে শোষিতের বাস্তব ধর্মই হল সাম্যবাদ।

শুধু এ যুগেই নয়, যুগে যুগে চিরকাল জনসাধারণের এই সহজ গ্রহণ-ক্ষমতার শক্তি ইতিহাসে দেখে এসেছি। চিরকাল দেখে এসেছি যারা বয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, নষ্ট হওয়া শোষিত মানুষ তারাই ধর্মগুরুদের ডাকে দুর্দান্ত সমর্থন দিয়ে এসেছে। মহম্মদ যাদের মধ্যে তার ধর্ম চালু করেছিলেন তারা অতি নিকৃষ্ট ধরনের জীবন যাপন করত। মদ, কু-শিক্ষা, কু-সংস্কার, জুয়া, মিথ্যা কথা ছিল তাদের জীবনের নিত্য সহচর। কিন্তু মহম্মদ সেই ভাঙা মানুষগুলির প্রাণে জাগাল অপূর্ব উদ্দীপনা—জীবনে কঠিন সংযম এনেছিল ও মদের নেশা ঘুচিয়ে নতুন মানুষ সৃষ্টি করেছিল এবং এককালে ইসলাম পৃথিবী জয় করার অভিযান করেছিল। খৃস্ট চমৎকার-শিক্ষিত লোকদের মন আকর্ষণ করেননি—প্রাণ এনে দিয়েছিলেন তথাকথিত মূর্খ ও অন্ধ জনসাধারণের। বুদ্ধও তাই। এমন কি সেদিনের চৈতন্যের শিষ্যাবলিও তারাই ছিল—যারা হিন্দু সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাত। ধর্মের অন্যান্য শ্রেণীগত স্বার্থ যাই থাকুক না কেন, এই সব ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যে তৎকালীন নতুন সামাজিক প্রয়োজনই মুক্তি পেয়েছিল এবং সেই মুক্তি-আন্দোলনে এই সব ধর্মবীরেরা তাদের শিষ্যমণ্ডলীর কাছে দুর্দান্ত ত্যাগ ও অসাধারণ দাবি করতে কোনো কালে ভয় পায়নি এবং তারা তা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে—কোনো বড় দাবি, কোনো উঁচু আদর্শ, কোনো নির্যাতন ও কোনো প্রকার সংযমকেই

অসাধ্য বলে কেউ বর্জন করেনি—অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্য অতি সাধারণ জনসাধারণ প্রাণ এগিয়ে দিয়েছে, মৃত্যু বরণ করতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি। অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে জগতের বড় বড় লোক তারা কখনোই ছোট ছোট কথা নিয়ে উপস্থিত হয়নি বরং অসম্ভব বড় বড় কথা বলেছে অতি সাধারণ লোকের কাছে যাদের প্রতি আমাদের আজ কোনো শ্রদ্ধা নেই বরং আছে একটু করুণা। এবং আরো আশ্চর্য এই যে সাধারণ লোকেরা তাদের ধর্ম ও কর্ম-নেতাদের সব দাবি হাসিমুখে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ অসম্ভব একমাত্র এ জন্যই সম্ভব যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন এমনি করে বিরুদ্ধ পথে অবজ্ঞার ক্ষেত্রে অবচেতন মনে সমাজের অন্তরালে চেতনার জন্য পরিপক্ব হয়ে উঠেছিল বলে। অন্যথায় এই রহস্যকে এতটুকু বোঝা সম্ভব হবে না, ম্যাজিক বলে মনে হবে, মিস্টিক্ বলে মনে হবে। আসলে মিস্টিক্ তাকেই বলে যে আপাত-দৃষ্ট শক্তি ও চিন্তাধারা ছাড়াও অন্য আব একটা শক্তিকেও দেখতে পায়, যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না। 'অন্তরালের এই শক্তি ইতিহাসেরই ফল্গুধারা, কোনো ঐশ্বরিক ব্যাপার নয়। ঐশ্বরিক ব্যাপার যদি হতো তবে আবার কোনো কালে নষ্ট হয়ে যেত না—আবার অপর কোনো রহস্যের প্রয়োজন হতো না। ইতিহাসেব একটা প্রয়োজন এমনি করে প্রকাশিত ও কায়েম করার পব যখন কালে কালে তার প্রযোজন হারিয়ে ফেলে এবং নতুন রূপে একদিন বিপ্লবে দেখা দেয় নতুন কোনো রহস্য আবিষ্কারক নেতার বা দলের হাত।

ভাল মানুষকে ভাল করার বাহাদুরী তাই খুব কম এবং শিক্ষিত লোকের বোঝাবার জন্য শিক্ষাসুলভ বিদ্যাবিতরণ কবাতেও কোনো যুগান্তকারী আদর্শের বিশেষ প্রয়োজন নেই। ববং ভাল মানুষ ও শিক্ষিত মানুষকে মানুষ কবাই কঠিন, কেননা তার মাথায়, মগজে, মনে ও প্রাণে প্রচলিত চিন্তাধারাই গজ গজ করছে এবং প্রচলিত চিন্তাধাবার বলেই সে শিক্ষিত ও ভালমানুষ বলে খ্যাত। বিপ্লবের যেটা শক্তি সেটা প্রচলিত বিদ্যা, প্রকাশিত বীতি-নীতি ও শক্তি থেকে নয়, তার শক্তি যা আজো অপ্রকাশিত, অপ্রচলিত ও অবচেতন—যা সমাজের অভ্যন্তরে এই সমাজের বিরুদ্ধে সকল রকমে বিদ্রোহ করবার জন্য আঁকুপাকু করে বেড়াচ্ছে, তারই উপব নির্ভর করে বিপ্লবীর শক্তি ও সমর্থন। ফলে দেখা যায় যাবা শোষিত, বয়ে যাওয়া লোক, ক্ষয়ে যাওয়া লোক, যারাই আজ পৃথিবী মানুষে মানুষে ভরে দিয়েছে, তাদের অবচেতন বুকে ইতিহাসের অবচেতন ডাক সব চেয়ে প্রথমে ও সহজে বাজে। তাদেরই মানুষ হবার তাগিদ আছে এবং মানুষ হতে পারে তারাই ইতিহাসের ও বিরুদ্ধ শক্তির জোরে, তবে এ সমাজে নয় এক নতুন সমাজে। অতএব সৃষ্টির প্রেরণা, নব জাগরণের ডাক, নৈতিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা আসবে এই নষ্ট হয়ে যাওয়া দুঃখী মানুষের সমুদ্র থেকেই এবং যতদিন এই ঐতিহাসিক দাবি তারা গ্রহণ না করবে ততদিন কিছুতেই দেখা দেবে না কোনো নৈতিক পুনর্জীবন, শত শত মহাত্মার জীবনপণ অনশনেও জাগবে না সেই নীতির রাজ্য। অনেক ছোট ছোট মহাত্মা, অনেক মাংসাশী নেতা ও স-হিংস ধর্ম-গুরু মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে অনেক কম ত্যাগ ও কম পরিশ্রম করেও অনেক মানুষকে সত্যিকারে জাগাতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু মহাত্মা কারো জীবনে তাঁর নৈতিক আদর্শকে কার্যকরী করতে পারেন নি। তার কারণ মহাত্মার নৈতিক দাবি ইতিহাসের দাবিকে স্বীকার করে নি এবং করেনি বলেই সর্বজনীন নব-জীবনের মাদকতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় নি বরং তাঁর সমস্ত সাধনা একদম ব্যর্থ হতে চলেছে। মহাত্মার সাধনা নৈতিক জীবনের ও অহিংস জীবনের প্রয়োজনটা খাটাতে চেয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত ধনতন্ত্রের ওপর সামাজিক দুঃসহ শোষণ ও হিংসা-রাজ্যের ওপর, তাই তার রাম-রাজ্য হচ্ছে না, হচ্ছে রাবণ-রাজ্য। যদি ইতিহাসের নতুন প্রয়োজন বা সমাজতন্ত্রের দাবিকে আশ্রয় করে দাঁড়াত তার অ-হিংসার দাবি, তবে মুহূর্তে জগতে উঠত এক অপূর্ব নৈতিক শক্তি ও নতুন প্রেরণা যা যে কোনো আণবিক-

বোমা-সম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদকে তুড়ে ফেলে দিতে পারত। মহাত্মার ডাক তাই ছুঁই ছুঁই করেও আসল মর্মস্থান স্পর্শ করতে পারছে না—মাথার উপর দিয়ে একটা নিষ্ফল আফশোষ সৃষ্টি করে চলে যাচ্ছে।

কৃচ্ছ্রসাধনা, কঠোর তপস্যা, মরণপণ অনশন ইত্যাদির সাহায্যে যদি মানুষের নৈতিক চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা, অ-হিংসা ও সরলতা ফিরিয়ে আনতে হয়, তবে তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। গান্ধীবাদ একটি মাত্র আত্মাকেই সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে—মহাত্মা প্রাণপাত করে, কঠোর সাধনা ও মরণপণ করে তাঁর প্রদর্শিত সত্যনিষ্ঠা ও প্রেম দেখাতে পেরেছেন। কিন্তু অতটা ধৈর্য অতটা আত্ম-নির্যাতন, অতটা সুযোগ ও সুবিধা সাধারণের ক্ষমতার ও ভাগ্যের বাইরে। যদি সত্য, প্রেম, অ-হিংসা ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলী সাধারণের ধর্ম হিসাবে দাঁড় করাতে হয়, তবে তার পথ অত কঠোর ও সন্দেহজনক হলে চলবে না। বস্তুত মানুষের জৈনধর্মকে অগ্রাহ্য করে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন করা সাধারণের জন্য কখনোই সম্ভব নয়। একটি মাত্র লোকের নৈতিক বাহাদুরী দেখানো সমাজতান্ত্রিকের কাজ নয়—বেশির ভাগ মানুষের প্রাণে ও মনে একটা নতুন নৈতিক মননশীলতা সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য।

অথচ মহাত্মা সকলের কাছে যা চেয়েছেন সে হলো যে মানুষ মানুষকে ঠকাবে না, অসৎ হবে না, হিংসা করবে না এবং সবাই সবাইকে ভালবাসবে। তিনি আশা করেন নি তাঁর পথে মানুষ সব পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও বিদ্যার বাহাদুর হবেন, তিনি বুদ্ধির চেয়ে প্রাণের কাছে বেশি আবেদনা করেছেন। অথচ এই দাবি, কঠিন দাবি নয়, মানুষ মানুষের জন্য ভাববে, মানুষকে ভালবাসবে, স্বার্থপর হবে না এবং এমন কি পরের জন্য প্রাণ দেবে—এ দাবি যুগে যুগে মানুষ স্বীকার করেছে এবং তা কঠিন সাধনার বিষয় বলে মনে করে নি। কিন্তু আজ তা সাধারণের চোখে অসাধারণ বলে মনে হচ্ছে কেন? আজ তা মহাত্মা জন-সুলভ দুর্লভ গুণ বলে মনে হচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে এই জন্য যে মহাত্মা যে দুর্নীতিমূলক সমাজের ভিত্তিতেই সু-নীতির বীজ বপন করতে চেয়েছেন তাতে তার ফলন অসম্ভব। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা গোটাটাই একটা প্রকাণ্ড দুর্নীতি এর উপরে নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ, কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব—একা মহাত্মার জীবনেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে হিমশিম খেতে হয়েছে।

তবে কি মানুষ মানুষ হবে না? নিশ্চয়ই হবে এবং হবে মানুষের সহজসাধ্য উপায়ে, হবে জীবনের স্বাভাবিক সহজ প্রয়োজনে, হবে ভিন্ন সমাজের ভিত্তিতে। মানুষ হওয়া যাকে বলি তা যদি দুরূহ ব্যাপার হতো, কেবল সাধুজন-সম্ভব হতো—তবে সবাই মানুষ হওয়া অসম্ভব। জীবনকে পীড়ন করে ও কষ্ট দিয়ে, উপেক্ষা করে জীবন সম্পূর্ণ হতে পারে না। যে সত্যনিষ্ঠা, অ হিংসা, প্রেম ও উদ্দীপনা মহাত্মারা এত কষ্ট করে কতিপয় জীবনেও কায়েম করতে পারেন নি— তা জনসাধারণ অতি সহজে আয়ত্ত করতে পারবেন, কোনো নঞর্থক পদ্ধতিতে নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রয়োজনে—নতুন সমষ্টিগত সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি-ভূমিতে। বিপ্লব সেই যাদু সৃষ্টি করতে পারে—মনুষ্যত্ব মানুষের সহজাত ও সমাজগত স্বাভাবিক জিনিস বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

যদি সত্যনিষ্ঠা, সহজ সরলতা শিক্ষা ও কৃষ্টির উপর নির্ভর করত তবে সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি বনবাসীদের চরিত্রে ঐ সব গুণের স্বাভাবিক রেওয়াজটা দেখা সম্ভব হতো না। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যত এগিয়েছে, এই সব গুণ তত বেশি পালিয়েছে, ছলনা, শঠতা ও শোষণ তত বেশি চালু হয়েছে। সরল সাঁওতালও কুটিল হতে চলেছে। সহজ সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, সমষ্টিবোধ এসব যে সমাজে থাকতে পারে না, সেই সমাজটাকে যত শীঘ্র দূর করা যায় ততই মঙ্গল, নইলে গাছ কেটে গোড়ায় জল ঢাললে কি ফল হবে? জনসাধারণের নৈতিক ও চেতনার

জাগরণ তাইতেই কেবল একমাত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যেই পুনর্জীবিত হতে পারে, প্রবল বেগে সর্বসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট প্লাবনের মতো নেমে আসতে পারে, বাছাই করা সাধকের তপস্যায় নয়, দৃষ্টান্তেও নয়।

আত্ম-নির্যাতন, সংযম ও নিষ্কাশন প্রথায় যদি ব্যক্তি নিজেরই সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং তা যদি হয় সত্যাগ্রহ, তবে যে সামাজিক ব্যবস্থার জন্য ব্যক্তি-জীবনে স্বার্থসন্ধানী ও মিথ্যা প্রবাহক বৃত্তিগুলি চরিতার্থ ও পুষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত, প্রতি পদক্ষেপে, সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম ঘোষণা কেন সত্যাগ্রহ হবে না? পরন্তু মিথ্যার ও শোষণের মূল ঘরটা অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অসভ্যতাকে দূর করতে পারলেই ব্যক্তির চরিত্রে দুষ্ট বৃত্তিগুলি আর স্থান খুঁজে পাবে না। মানুষের ধর্ম মানুষেব কাছে সহজ হবে।

ভীরু বামপন্থী সাম্যবাদকে জনতার সামনে রাখতে ভয় করছে, কেননা তার চিন্তাধারা ইতিহাসের বিরুদ্ধ শক্তির রহস্য, অবচেতন প্রয়োজনকে স্বীকার করতে শেখে নি—সে আজও সাম্যবাদী নয়। সাম্যবাদেব নামে যা চালু করছে তার নাম Enlarged selfishness যা আজকের যুগে জন স্টুয়ার্ট মিলের Englightened selfishness-এব নামান্তর, অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই সমাজতান্ত্রিক সংস্করণ। মানুষের কাছে দাবি করতে তাই তার এত ভয়, জনতাকে তাই তার শিশু বলে ভ্রম, জনতার ধারণ করবার শক্তিতে সন্দেহ তাব প্রাচীন কালের ধর্ম-গুরুদের কাছেও লজ্জাজনক। মদ খাওয়া যদি খারাপও জানে তবু মজুরদের মদ খেতে নিষেধ করতে তার সাহস নেই, অথচ মহম্মদ নেশাখোব আরবদেব কাছে মদটাকে একটা পাপ বলে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমনি জনতাব প্রতি শ্রদ্ধা বলে কোনো জিনিস নেই এদেব, কেননা ইতিহাসের সত্যিকার প্রয়োজন ও তার বাহনকে তারা এখনো চেনেনি—গোটা কয়েক গৎ আউড়ে যায় মাত্র।

নৈতিক দাবি, আদর্শের দাবি, সমগ্র বিপ্লবের কর্মপন্থা আজ আর জনসাধারণেব কাছে সত্যিকারের আখেরের জিনিস নয়। অশিক্ষিত জনসাধারণ আজ একটা নৈতিক জাগরণ ও যুগান্তকাবী পরিবর্তনের জন্য সত্যি সত্যি আকুল। কিন্তু তাব এই আকুলতা আজও চেতনার রাজ্যে পরিষ্কার নয়, তাব জীবনে, প্রাণে এই আকুলতা এসেছে, এসেছে জমাট ঘন মেঘের মতো। তার প্রকাশ্য মনে যত রাজ্যের রাবিশ এখনো জমাযেত হয়ে আছে—যত বুর্জোয়া দুর্নীতির জঞ্জাল জমে আছে কিন্তু এই জঞ্জাল আর তাব বহন করবার ক্ষমতা নেই, ক্ষণে ক্ষণে তা ফেলে দিচ্ছে এবং একটা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলছে, কিন্তু বিপ্লবী তার সত্যিকার অবচেতন আকুলতা স্পষ্ট করে চোখের সামনে ধরে দিচ্ছে না। তাদের জীবন তাদের চেতনাকে অগ্রাহ্য করে তুলছে—অবচেতন আজ তাই চেতনাতে মুক্তি পেতে চায়। যা আজ তার মাথায় চেতন, চিন্তা তা তো ধনীদেব দেওয়া শিক্ষা, সে শিক্ষা আসল প্রয়োজনটাকে, অবচেতন প্রেরণাটাকে কেবলই এড়িয়ে চলছে। এই ছলনা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে এবং সেই কাজটাই প্রকৃত সাম্যবাদীর। কিন্তু হালের সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা নিজেরা ভাবে অস্থির—চিন্তায় ছলনাপ্রিয়, কর্মে ফাঁকিবাজ ও সুবিধাবাদী, তাই তাদের প্রতি জনতার শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধা করা, বড়কে মানা, সত্যকে স্বীকার করবার প্রয়োজন তাদের এত বেশি যত আর কারো নয়, তাইতেই পর-ধর্মেও তাদের বিশ্বাস, অন্য শ্রেণীর নেতাকেও নিজেদের নেতা করবার সখ—লাখ লাখ লোকের সশ্রদ্ধ প্রণতি জওহরলালের নিকট। নিজেদের নেতা নেই বলেই যে কোনো নেতার পিছনে এত ভিড়। মানুষ হবার তাগিদ ও মানুষ হবার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই আছে, এ কথা বামপন্থীরা কবে বুঝবে?

পার্টি ও ইতিহাসের সকল্প

গত অধ্যায়ে ইতিহাসের অবচেতন শক্তিধারা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাতে হয়ত এমনি ধরনের এক ভ্রম এসে যেতে পারে যে আপনা থেকেই বুঝি সমাজতন্ত্রের অপ্রকাশিত ধারা প্রকাশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশ হতে বাধ্য। প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ইতিহাস তার নূতন জন্ম-বেদনাকে অতি সজ্ঞান চিন্তাধারায় প্রথমে প্রকাশ করবেই। বিপ্লবী প্রতিভা বিপ্লবের বার্তা নিয়ে বাইরে ফুটে বেরুবেই। চিন্তাজগতে ক্রমবিকাশের ধারা—জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শনের ধারা এসে বাস্তব অবস্থার সাথে মিলিত হবে—সেই সংযোগ ক্ষেত্রেই দেখা দেয় বিপ্লব।

এখানেই পার্টি বা দলের প্রয়োজন। পার্টি ইতিহাসের ধাই—নবাগত সভ্যতার নেতা। পার্টিই ইতিহাসের will. ইতিহাসেব অবচেতন ধারা প্রকাশ্য উদ্দেশ্যে বিকশিত করে সমস্ত জনতার সামনে ধরবে পার্টি। কাজে কাজেই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোকের সভ্য নিয়ে একটা দল গঠন করলেও যদি সে দল বিপ্লবের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ কবতে না পারে তবে সে দল ইতিহাসের ইচ্ছাকেই ব্যর্থ করল। পার্টির সভ্য সংখ্যা, ফাণ্ড, প্রেস, অফিস, জন-বল ও সম্পত্তি ইত্যাদি গৌণ, কিন্তু মুখ্য হলো তার উদ্দেশ্য ও বাস্তব আদর্শ। ইতিহাসের আসল উদ্দেশ্যকে ফাঁকি দিয়ে তার বাইরের কলেবরটায় চাকচিক্য করতে গেলে সে পার্টি কার্যক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল।

এমনি উদাহরণ সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে বহু দেখানো যায় যেখানে দেখা যাচ্ছে সাম্যবাদীদল সঙ্কটনজনক মুহূর্তে অথবা পরীক্ষার সময় অথবা প্রতিক্রিয়ার চাপে দলকে বাঁচাতে গিয়ে পার্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং ক্ষুণ্ণ করে ইতিহাসের সর্বনাশ কবেছে এবং শেষ পর্যন্ত দলও রাখতে পারে নি। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণে জার্মান সোসাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি জার্মান পার্লামেণ্টে শতাধিক মেম্বার, শতাধিক সাময়িক পত্র, বহু দৈনিক কাগজ যার দৈনিক বিক্রয় লক্ষাধিক, লক্ষ লক্ষ মজুর নিয়ে বিরাট বিরাট ইউনিয়ন ও তাদের অফিস, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, জাঁকজমক নিয়ে সত্যিই একটা ভারি কায়েমী শক্তি নিয়ে বসেছিল। কিন্তু সেই মহাযুদ্ধকে যদি তারা মার্ক্সিয় বিচার অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সততার খাতিরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করত এবং তাকে গৃহযুদ্ধে পরিণত বা যুদ্ধ-বিরোধী কাজে প্রয়োগ করত, তবে কাইজার পার্টির কাগজ পত্র, ইউনিয়নের অফিস, টাকা সব বায়েজাপ্ত করে দিত এবং দলের কর্মীদের জেলে পুরবার ব্যবস্থা করত, তাতে এই প্রভূত সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী দলের বাহ্যিক কাঠামো যেত চূর্ণ হয়ে—এই ভয়ে সোসাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি ঐ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করল না এবং করল পিতৃভূমি রক্ষার্থে ন্যায় যুদ্ধ বলে। অবশ্য দলের বেশিরভাগ নেতৃ-স্থানীয় লোকের সম্মতি পাবে এই ভরসায়ই কাইজার যুদ্ধে নেমেছিল কিন্তু যারা অতটা বিশ্বাসঘাতক নয় তারাও মনে করল—দলটাকে ও ইউনিয়নগুলিকে বাঁচাতে হলে এখন না হয় কিছুটা পিছু হঠাই যাক ইত্যাদি। ফলে চরম পরাজয় হলো সমাজতন্ত্রের, নষ্ট হয়ে গেল জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট ঐতিহ্য, শ্রমিক আন্দোলনের পিতৃভূমি জার্মানীর এই বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত আজও পর্যন্ত জার্মান ও ইউরোপীয়ান শ্রমিক আন্দোলন সংশোধন করে নিতে পারে নি। সেদিন যদি জার্মান সোসাল ডেমোক্রেসি সাহস দেখিয়ে দলের মত ও পথকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংগ্রামে নামত এবং যদি তাতে ধ্বংসও হয়ে যেত, তাতে কিছু এসে যেত না, কমিউনিজমের নৈতিক জোর ও পুনর্গঠন ক্ষমতা আরো বেশি জোরাল হতো। তার পরেও বারে বারেই আমরা এই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার

ইতিহাস দেখেছি দেশে দেশে, কমিউনিস্ট নেতৃত্বে। ফলে আজ কমিউনিজম জগতের সেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না এবং এমন কি শ্রমিকেরাও তাতে তেমন সাড়া দেয় না। আজকের কমিউনিজম দেশে দেশে নিজ শক্তি অর্থাৎ বিপ্লবের শক্তিতে বিশ্বাস করে না—রাশিয়ার সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতে চায় ফলে পৃথিবীতে বিশ্ব-বিপ্লবের কোথায় কি শক্তি পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা স্টালিনবাদীদের দেখবার কৌতূহল জাগে না, তারা অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাস্ত করতে বিপ্লবের শক্তিকে বিশ্বাস করে না, তারা তাকিয়ে থাকে রাশিয়ার দিকে এবং প্রার্থনা করে রাশিয়াও যেন আণবিক বোমা তৈরি করতে পারে। রাশিয়া আবার বিপ্লবের পথে নেমে আসুক এ তাদের কাম্য নয়, রাশিয়া আণবিক বোমা আবিষ্কার করুক—এই তাদের কাম্য! অথচ রাশিযা আণবিক বোমা আবিষ্কার ও তৈরি করতে পারলে, আগামী যুদ্ধে দুই পক্ষে প্রচুর আণবিক বোমাব ব্যবহারে ইতিহাসের সামাজিক প্রয়োজন অর্থাৎ বিশ্ব-সমাজতন্ত্র কিভাবে এগুতে পারে সে হিসাবও তারা ছেড়ে দিয়েছে। অতএব ইতিহাসের সত্যিকার প্রয়োজন বা তাগিদের কোনো উদ্দেশ্য তাদের দলের আদর্শ, কর্মপন্থা বা চিন্তাধারা নয়।

বিপ্লব তাদের কাছে অতীত ও ভবিষ্যতেব কথা, বর্তমানের নয়। অতীতে রুশ দেশে কি হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে কি হতে পাবে এই তাদেব প্রচাবের সম্পদ। তথাপি কমিউনিস্টদেব মধ্যে যতটুকু ঐকান্তিকতা দেখা যায়, নিজেদেব দল ও মত সম্বন্ধে যে গোঁড়া ভক্তি দেখা যায়, সে তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী থেকে আসে না, আসে রুশিযার কল্পনা থেকে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক রুশ তাদের আদর্শের খোরাক, এই খোরাকটা আছে বলেই তাদের দল টিকে আছে, নানা রকমের ভুল ও মিথ্যা-নীতি সত্ত্বেও রুশেব কল্পনা বা স্বপ্ন তাদের জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু যারা রুশ ভক্ত নয়, অথচ মার্কসপন্থী বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু কাজে বিপ্লবের প্রোগ্রাম বা কমিউনিজমের আদর্শ বাস্তবে চালু করছে না, তাদের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সংগ্রাম ও জীবন একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ-হীনতার অভাবে কেবলই হীনবল হতে থাকে—দলে বিশ্বাস ও আত্মশক্তি নানাভাবে ক্ষয় পেতে থাকে, ফলে কেবলই টুক্‌রো হতে চায়।

ট্রটস্কীপন্থী চতুর্থ আন্তর্জাতিক দলগুলি দেশে দেশে যে আজ বড় দল হয় না, কেবল ভেঙে ভেঙে যায়—পরিণত শক্তি ও বিচার বুদ্ধি অর্জন করতে পাবছে না, তারও একমাত্র কারণ যে তারা সাক্ষাৎভাবে বিপ্লব করবার জন্য ডাক দিতে সাহস পায় না। তারা দলে ছোট, যথেষ্ট প্রচারের সৌভাগ্য পায় নি বলে নিজেদের মনে করে শিশু এবং তারা লক্ষাধিক লোকের ইউনিয়ন, প্রচুর খবরের কাগজ সংগঠন করার পূর্বে বিপ্লবের কথা বাস্তব কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করতে সাহস পায় না। ফলে স্টালিনবাদীদের সমালোচনা করাই বর্তমান ট্রটস্কীবাদ বলে চালু হয়েছে। অন্যের দোষ দেখিয়েই একটা বিপ্লবীদল গঠন হয় না। সাক্ষাৎভাবে ইতিহাসের কোন্ দায়িত্ব তারা গ্রহণ করছে এটারই উপর নির্ভর করবে সমাজ ও ইতিহাস তাদের কি স্থান দেবে। আজ তারা তাই চমক্‌প্রদ বুদ্ধিজীবী হতে পারে, ভাল জার্নালিস্ট হতে পারে এমন কি ইতিহাস-লেখক হতে পারে, ইতিহাস-কারক হতে পারে না। তাদের বিশ্লেষণসম্বল সমালোচনাসার বাক্যবিন্যাস ইতিহাসের কর্তব্য পালন করে না। বৈপ্লবিক চেতনা বলতে যা বোঝায় তাতে কেবল অবস্থার বিশ্লেষণ বোঝায় না, অবস্থাকে পরিবর্তিত করার ঘটনা ঘটাবার মতো শক্তিধারী ইচ্ছা ও প্রেরণাও বোঝায়। নির্বীর্য, অক্ষম অন্তঃসারশূন্য পরনিন্দাবাদ বিপ্লববাদ নয়। বিপ্লববাদ একটা সাক্ষাৎ দায়িত্ব, প্রবল কর্ম-প্রেরণা ও অপরাজেয় অদম্য ইচ্ছা। ইতিহাসের গহ্বরে যে আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়েছে তার সমস্ত শক্তির আভাস ও স্ফুরণ হবে বিপ্লবীদলের নেতৃত্বে। ইতিহাসের সেই বিস্ফোরক ও সৃজনীশক্তি যদি দলের নেতৃত্বে ও সর্বাঙ্গে ফুটে বেরোয় তবে

সেই দলকে প্রতিহত করতে পারে আজ এমন কোনো শক্তি নেই—কেননা ইতিহাস আজ বিপ্লব ছাড়া আর কোনো কিছুকেই বরমাল্য দেবে না—মানুষের আজকের সঙ্কটে এরচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং এর চেয়ে সহজ-সাধ্য কাজ আর নেই।

বিপ্লবের অদম্য শক্তি আজ যদি বিপ্লবীদল স্পর্শ করতে না পারে তবে বুঝতে হবে বিপ্লব তার প্রোগ্রাম নয় এবং শত শত বৎসর ধরে চেষ্টা করলেও বিপ্লবী-হীন তথাকথিত বিপ্লবীদল বড় হতে পারে না—তারা চিরকালই শিশু থেকে যাবে, বিকলাঙ্গ থেকে যাবে। কিন্তু ইতিহাসের আসল দাবি এই বিপ্লবকে যদি একটা ছোট্ট দলও সজ্ঞানে বেপরোয়া শক্তি ও সাহস নিয়ে গ্রহণ করে, তবে তার শক্তি অচিরে অপরাজেয় হতে বাধ্য কেননা ইতিহাসের রহস্যকে সে বুঝতে পারবে, আগ্নেয়গিরি তাকে মাথার মুকুট করে তুলবে, তার কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না।

নইলে অর্থাৎ বিপ্লবকে স্থগিত রেখে বিপ্লবীদল গঠনের চেষ্টা লজ্জাকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পার্টি গঠন করবার জন্য যতই কেননা চাপ দেওয়া হোক, তার নিত্য-নৈমিত্তিক রুটিন কাজে যতই কেননা নিষ্ঠার দোহাই দেওয়া হোক, তাব অভ্যন্তরীণ সেল ও কমিটিগুলিকে যত নিযম করেই না বসাবার চেষ্টা করা হোক—কোনো কিছু সফল হবে না, কেবলই মিইয়ে যেতে থাকবে---কেবল পচন বেড়ে যেতে থাকবে, কেননা সত্যিকার উদ্দীপনার জন্ম যেখান থেকে, উৎস যেখান থেকে সেই বিপ্লবকে বঞ্চিত করে, ইতিহাসকে ফাঁকি দিয়ে দলের ও দলের কর্মীদের নৈতিক জোর সৃষ্টি করা অসম্ভব। আজকের ম্রিয়মাণ ছোট বড় বামপন্থী দলগুলি যদি আত্ম-জিজ্ঞাসা করে তবে নিজেদেব সত্যিকারেব ফাঁকিটা হয়ত বুঝতে পারবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারবে। দলের ভিতরকার সঙ্কটের কাবণই হলো আদর্শ ও বিপ্লবী কর্মপন্থার সঙ্কট। একে সাংগঠনিক সঙ্কট মনে করলে ভুল হবে। সত্যিকার চেতনা ও উদ্দীপনা কর্মীদের থাকলে দল গঠন কবে নিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না, নইলে একটা মৃত অশ্বকে হাজার চাবুকে নাড়ানো যাবে না। বিপ্লবের সাক্ষাৎ অনুভূতি পেলে আজকের কর্মীদের চরিত্রে ও বুদ্ধিতে একটা গুণগত বিপ্লব হয়ে যাবে, এবং চারদিকে এই যে নানা দুর্বলতা, ক্ষয়ের চিহ্ন ও পরাজিত মনোভাব তা মুহূর্তে কেটে যেতে বাধ্য, তখন সমাজতন্ত্র দূরের স্বপ্ন বলে মনে হবে না, খুব কাছের ও আজকের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা ও গতানুগতিকতার অভিশাপে পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের উপব যে একটা হতাশা ও পরাজিত মনোভাব এসেছে এই নিম্নগামী স্রোতটা বন্ধ করতে হলে আজ বিপ্লবীদলের মানসিক তেজ, দৃঢ়তা ও দুর্দান্ত সঙ্কল্প বেড়িয়ে আসা দরকার। স্বয়ংসিদ্ধতার মোহ ঝাঁটা মেরে তাড়িযে দেওয়া দবকার—দৃঢ, দ্বিধাহীন, নিঃসঙ্কোচ ও নির্ভীক চেতনা, প্রেরণা দিয়ে, মানসিক সম্পদের চবম দৃষ্টান্ত দিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। দুর্দিন যত ভয়ানক, আমাদের পণ তত দৃঢ় হতে হবে। মন, প্রাণ, চেতনা সর্বস্ব দিয়ে ইতিহাসের হালটা জোরে কব্জিতে ধরে রাখতে হবে এবং বিপ্লবের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, নির্ভযে, বেপরোয়া সাহস নিয়ে।

হওয়া ও করা—সংঘাত ও চেতনা

সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী হওয়া আজকাল একটা ফ্যাসান। যে কোনো শ্রেণীর লোক, যে কোনো স্তরের লোক নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলতে কুণ্ঠা বোধ করে না। পৃথিবী সমাজতন্ত্রীতে

ভবে গেল, অথচ সমাজতন্ত্র যাচ্ছে পিছিযে। আসলে সমাজতন্ত্রী হওযা যায না যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজতন্ত্রেব জন্য সংগ্রাম কবা শুরু হয। মার্ক্সিয শাস্ত্রে হওযা কবা থেকে বিচ্ছিন্ন কবা যায না, না কবলে হওযা যায না। চিন্তা কর্ম থেকে বিচ্যুত হলে তা হবে অলস কল্পনা এবং তা হবে ভুল। মার্কস্‌বাদেব মতে দর্শন হলো কর্ম-বিজ্ঞান—কাজেব পদ্ধতি নির্ণয—অলস চিন্তাশীলতা নয, অথবা সহসা কোনো কিছু হওযা বা স্রেফ উপলব্ধিব জোবে কোনো কিছু বলে যাওযা নয। ধ্যানেব দ্বাবা সমাজতন্ত্রী হওযা যায না—বিশ্বাসেব সাধন দ্বাবাও নয—কর্মেব সাধনা দিযে সমাজতন্ত্রী হওযা. এবই জন্য কর্মহীন চিন্তা—কাজ থেকে বিচ্যুত মত-বিলাস সাম্যবাদীব চোখে এত হেয। যদি শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রে নাম লেখালেই সমাজতন্ত্রী হতো সমাজ , তবে ইংলণ্ডেব ফেবিযান সোসালিস্টবাই সমাজতন্ত্র এনে দিত। কিন্তু তা হয নি এবং হতে পাবে না। সমাজতন্ত্র আসবে সংগ্রামেব মধ্য দিযে, আসবে বিপ্লবে। সবাই ভালমানুয হযে সমাজতন্ত্রী হতে পাবে না—সমাজতন্ত্র. ধনতন্ত্র ও ধনিকশ্রেণীকে উচ্ছেদ কববাব বাস্তব কর্মপন্থা, এব জন্ম থেকেই সংগ্রাম।

অতএব কোনো বামপন্থীদল তাদেব পার্টিব উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রী হতে সবাইকে উপদেশ দিযে বেডায, কেবলমাত্র এতটুকু দাযিত্ব নিযেই সমাজতন্ত্রী দল হতে পাবে না। তাদেব সাক্ষাৎ সমাজতন্ত্রেব জন্য সংঘাত ও সংগঠন কবতে হবে- Action organise কবতে হবে। কেবল স্রোতে গা ভাসিযে অবস্থাব দিকে সজল নযনে তাকিযে থাকলে চলবে না।

চিন্তাব জডতা, বোঝাবাব ভুল অবচেতন মনেব অপবিচ্ছন্ন রূপটা দূব কবতে হলে চাই Action— বৈপ্লবিক আঘাত। সমস্ত জনতা সজ্ঞানে একসঙ্গে সর্ববাদী সম্মত কর্ম ও বৈপ্লবিক আঘাত একদিন শুরু কববে এই আশা কবলে কোনো কালে বিপ্লব হবে না। পার্টি কেবল যদি সেই চবম মুহূর্তেব জন্য অপেক্ষা কবতে থাকে যখন জনগণেব সবাই বিপ্লবে বিশ্বাসী হযে বিপ্লব কবতে একসাথে এগিযে আসবে, তবে বিপ্লব কবা কঠিন এবং ক্রমশই দুরূহ হযে পডবে। কেননা ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষ নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি কবতে সমর্থ হবে এবং হযেছেও। বিপ্লবীদল সর্বদা মনে বাখবে যে এই সামাজিক যুদ্ধক্ষেত্রে তৎপবতা, সময়, জ্ঞান ও প্রথম আঘাত কববাব কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি তাব একান্ত প্রযোজন। মনে বাখতে হবে—সংগ্রাম শুরু হবে না—এই সমাজ এখনই একটা সংগ্রাম ক্ষেত্র—সংগ্রাম আছেই, তাকে স্বীকাব কবা, সংগ্রথিত কবা, সমগ্র রূপ দিযে শেষ কবাই তাব কাজ। বিশেষ কবে এ যুগে যেখানে বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত মানুষেব ভবিষ্যৎই বিপদসঙ্কুল হযে উঠেছে—সেখানে দুর্বল কর্মপন্থা ও মেকি সার্বজনীনতাব দোহাই সর্বনাশসঙ্কুল। ইতস্তত বিচ্ছিন্নমান সাম্রাজ্যবাদেব ক্ষযেব পথে দৃঢসঙ্কল্প আঘাত আজ যেখানে সেখানে সংগঠন কবা কোনো বিজ্ঞান-বিবোধী কাজ হবে না। পৃথিবীব বুকে আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মবিযা হযে যে প্রকাব যডযন্ত্র কবতে লেগেছে, তাকে ব্যর্থ কবতে হলে পৃথিবীব সর্বত্র বেপবোযা বিদ্রোহ সংগঠন কবতে হবে—স্থানে স্থানে যেখানেই সম্ভব ক্ষমতা দখল করতে হবে, কিন্তু স্থানীয সমাজতন্ত্রেব স্বপ্ন নিযে নয—বিশ্ব-বিপ্লবেব জন্য সর্বপ্রকাব আঘাত হানবাব বৈপ্লবিক প্রযোজনে। এই সর্বাঙ্গীন বিপ্লবে মজুব শ্রেণী কলকাবখানায ভবা শহবে, চাষী ও খেতমজুব গ্রাম্যদেশে কেমন কবে বিদ্রোহ ঘোষণা কবতে পাবে, এই পুস্তিকায তাব বীতি ও নীতি বিশ্লেষণ কবা উদ্দেশ্য নয। উদ্দেশ্য এখানে শুধু এই দেখানো উপযুক্ত চেতনা ও কর্মপ্রেবণা বৈপ্লবিক Action থেকে চ্যুত কবে সৃষ্টি কবা অসম্ভব। এতক্ষণ পুস্তিকায যে মানসিক সম্পদ গঠনেব, মানসিক পদ্ধতিব ধাবাব কথা বলা হযেছে তাতে বৈপ্লবিক আঘাত ও সংগঠন সংযুক্ত না করলে প্রকৃত মানসিক প্রস্তুতি গঠন কবা হয় না।

বৈপ্লবিক প্রস্তুতি ভিন্ন বৈপ্লবিক মনোভাব আসতে পারে না এবং বিপ্লবী দলও গঠন হতে পারে না। বিশেষ করে চিন্তার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবনার যুগ থেকে প্রত্যক্ষ আঘাত হানবার যুগ এসেছে। এই আঘাত হানবার প্রোগ্রাম তাই আজকের যুগে চিন্তা-সঙ্কট ও বুদ্ধি-জটিলতা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়—দুর্দান্ত ও অপরাজেয় মানসিক শক্তিবিকাশের একমাত্র রাস্তা।

বাস্তব অবস্থা বহুকালই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। মানসিক প্রস্তুতির অভাবটাই বড় দোহাই। উপযুক্ত মানসিক সম্পদ, সংগঠনের অভাব ইত্যাদি দূর করতে পারে যে সঙ্কল্প তা আসতে পারে বিপ্লব করবার সঙ্কল্প থেকে এবং সে সঙ্কল্পকেই সর্বব্যাপক করতে হলে সবার আগে বিপ্লবীদলকে সত্যি সত্যি সে সঙ্কল্প নতুন করে নিতে হবে এবং সেই সঙ্কল্প সত্যিকার সঙ্কল্প হবে তখনই যখন তা সাক্ষাৎ ভাবে বিপ্লবের কাজে হাত দেবে। মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও চেতনা একসাথে ইতিহাসের অবচেতন আগ্নেয়গিরিকে চেতনার রাজ্যে টেনে নিয়ে আসবে এবং দেখা দেবে দুর্জয় সাহস, প্রবল উদ্দীপনায় ভরা বিপ্লব।

লজিসিয়ানের চোখে এ স্বপ্ন বহুদূরের ও অসম্ভব কিন্তু ডায়ালেক্‌টিসিয়ানের কাছে এ স্বপ্ন নয়, আজকের কাজ এবং একমাত্র সহজ কাজ, একমাত্র সম্ভব কাজ।

এই প্রসঙ্গে মিঃ মানবেন্দ্র রায়ের আধুনিক মতামত সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। মিঃ রায় ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ কোনো স্থান অধিকার করে নেই, কিন্তু তিনি নীরবে অনেক কথা বলে চলেছেন, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

তাঁর Radical Democracy এখন Moral Democracy-তে পরিণত রূপ নিয়েছে। তিনি মনে করেন সংগ্রাম বা রাজনৈতিক 'অ্যাক্‌সন্‌' আজকের দিনে অবাস্তব কথা। সংগ্রামে মানুষের জিঘাংসামূলক বৃত্তিগুলিকেই জাগিয়ে দেয়, কোনো গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে না। সোসালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের রাজনৈতিক পতাকায় 'স্ট্রাগল্‌' বা সংগ্রাম কথাটা জুড়ে রেখে মানুষের নিম্নজাতীয় মানসিক বৃত্তিগুলির উপর ভরসা করে যে আন্দোলন সৃষ্টি করতে চায়, তাতে সত্যিকার গণচেতনা আসে না, কোনো রকমে দল ভারি করে কাজ হাসিল করে নেবার চেষ্টায় সত্যিকার নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। তাঁর মতে জনসাধারণের শত্রু আজ অজ্ঞতা, অন্ধতা, অন্ধভক্তি ইত্যাদি—ধনী ধনতন্ত্র, রাজা রাজতন্ত্র ইত্যাদি নয়। কাজেই আজকের গঠনগত কাঠামো পাল্টালেই মানুষের মানসিক চেতনা পুনর্জীবিত হওয়া সম্ভব নয়—জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র যা কিছুই এই মানসিক গঠনের উপরে দাঁড় করানো যাক না কেন, তাতে কোনোটাই কার্যকরী হবে না—দলবিশেষের স্বৈরতন্ত্র কায়েম হবে মাত্র। দল, সংগঠন ও সমাজ যাদের নিয়ে তৈরি—অর্থাৎ এই সব নরনারী, তাদের দিকে এবারে নজর ফেরাতে হবে, তাদের অন্ধ-ভক্তি ও অজ্ঞতা দূর করতে হবে এক বিরাট নৈতিক আন্দোলন দিয়ে, আজকের দিনে তাই তার রাজনীতি হলো একটা নৈতিক-আন্দোলন বা Cultural Movement. মানুষের মানসিক দুর্গতির পাঁক থেকে উদ্ধার পেতে হলে এমনি ধরনের এক গণ-নৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে—নৈতিক-বিপ্লব আনতে হবে। নৈতিক-বিপ্লব অর্থনৈতিক বিপ্লবের পরে আসবে, আগে আসতে পারে না, এ কথা মিঃ রায় বিশ্বাস করেন না এবং Economic Determinism-এর পরিবর্তে Moral Determinism তিনি দাঁড় করাতে চাইছেন।

যার মুখ দিয়েই বেরুক, কথাটা আপাত দৃষ্টিতে লোভনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এতে নতুনত্ব কিছুই নেই, আবিষ্কারও কিছু নেই। Fabian Socialist-পন্থীরাও এই নৈতিক-বিপ্লব বা Moral Revolution আগে সৃষ্টি করে পরে সমাজ বিপ্লব বিনা রক্তপাতে করবার চেষ্টা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতারাও এই কথাই অন্য ভাষায় প্রচার করেছেন।

চীন দেশে নৈতিক উন্নতি করার জন্য খুব ঘটা করে মার্শাল চিয়াং কাইশেক 'নতুন জীবন আন্দোলন' বা 'New life movement' করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ফল কিছুমাত্র হয় নি, মানসিক পতন দুর্দান্ত বেগে বেড়ে চলেছে, তথাকথিত অন্ধভক্তি ও অজ্ঞতা বেড়েই চলেছে।

দল করি, আন্দোলন করি, বক্তৃতা করি, কাগজপত্র, বই ও পুস্তিকার ছড়াছড়ি করি, এমনকি জেলে যাই, নৈতিক উন্নতির জন্য প্রাণ দেই—কত কি দেশ করে চলেছে, তথাপি নৈতিক উন্মেষ হচ্ছে না কেন? শুধু কি কেবল ঈর্ষা, ঝগড়া ও যুদ্ধং দেহি মনোভাবটাই প্রচারিত হচ্ছে—বরং ওটা তো সজ্ঞানে খুব কমই প্রচার হয়—বেশিরভাগ প্রচারই তো গঠনমূলক, দায়িত্বমূলক, শিক্ষামূলক। রাজনীতিতে দুষ্ট কূটনীতি, দলাদলি, খেয়োখেয়ি দেখে মনে হবে হয়ত রাজনীতিটাই দেশটাকে ডুবিয়ে দিল—যদি ধর্মের মতো একটা প্লাবনকারী নৈতিক অথচ বিজ্ঞান-সম্মত আন্দোলন সৃষ্টি করা যায় তবে বাঁচোয়া—সভ্যতার অন্ধ গলি থেকে মুক্তি সম্ভব। কিন্তু তা নয়, একেবারে নয়। নবচেতনা, সংগ্রাম বা Action-এর মধ্যেই সুপ্ত আছে। জনসাধারণের অজ্ঞতা ও অন্ধতাকে মিঃ রায় পূজা করতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু মিঃ রায় জানেন না জনসাধারণের আর একটা মনও আছে, যে সব দেখছে, সব জানছে, নিজেদের বুক দিয়ে, পিঠ দিয়ে, পেট দিয়ে, জীবন দিয়ে প্রতি মুহূর্তে এই অন্যায় অসভ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে মত তৈরি করছে এবং সেই মন অবজ্ঞাত, অবচেতন—অজ্ঞ নয়, অন্ধ নয়। সেই মন বর্তমান অজ্ঞতা ও অন্ধ ভক্তির ঠিক পাশে পাশেই বাস করছে। বস্তুত অজ্ঞতা মনোজগতে একটা অ-বিকাশপ্রাপ্ত প্রাথমিক অবস্থা নয়, অজ্ঞতা একটা বিশেষ সামাজিক চেতনারই স্পষ্ট দাগ—ধনতান্ত্রিক মননশীলতার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া, তার প্রতিবাদ, তার সমালোচনা ঐ একই মনে স্থান করে আছে, কিন্তু কোনো অ্যাক্সনের সহযোগিতা ভিন্ন, বিপ্লবের সরল আঘাত ভিন্ন ঐ বিরুদ্ধ মনটা তার অজ্ঞ মনটাকে পরাজিত করে বেরিয়ে আসতে পারে না—দ্বিধা, জড়তা, ভীরুতা তাকে আরো অর্থহীন অজ্ঞতায় ডুবিয়ে দেয়। চিন্তা কাজকে এগিয়ে দেয় আবার কাজ চিন্তাকে অগ্রগামী করতে সমর্থ করে। বিপ্লবের পূর্বেও বৈপ্লবিক চেতনাব দরকার কিন্তু সেটা সর্বব্যাপক ও সর্বদর্শী হতে পারে না যতক্ষণ বিপ্লব কোথায়ও না কোথায়ও শুরু হয়েছে। একবার শুরু হলে চিন্তার অজ্ঞতা, জড়তা, হীনতা, দীনতা মুহূর্তে দূর হতে থাকে, ম্যাজিকের মতো কাজ করতে থাকে। এই বিপ্লব তাই বিপ্লবীদলের মধ্যে প্রথমে দেখা দেওয়া চাই। বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভিন্ন নৈতিক-বিপ্লব আনবার চাতুরী হলো বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা, দূরে ঠেলে দেওয়া। অথচ এই জাতীয় প্রতারণা করেও যারা নৈতিক উন্নতির, একটা নৈতিক প্লাবনের স্বপ্ন দেখে তাদের অবস্থা মিঃ রায়েরই মতো হয়, অর্থাৎ কেউ গ্রাহ্যও করে না। টন টন লেখা না লিখে যদি মিঃ রায়রা একটা মাত্র বৈপ্লবিক অ্যাক্সন-এর সবল আঘাত দিতে পারেন, তবে দেখতে পারেন সমাজে, দেশে কি নৈতিক শক্তির যাদু সৃষ্টি হয়েছে। তাদেব নৈতিক-আন্দোলনের চালাকি দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থাকে মেনে নেবার উপদেশ যে জনতা গ্রাহ্য করছে না এতেই বোঝা যায় জনতা ততটা অজ্ঞ বা অন্ধ নয় যতটা মিঃ রায় নিজে। মার্কসবাদকে বিকৃত করতে করতে তিনি এমন এক অবস্থায় এসে পড়েছেন যে ধনতন্ত্রের চতুর চালাকিতে পড়ে একদম অজ্ঞ ও এতটা অন্ধ হতে হয়েছে তাঁকে নিজে। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে চায়, আশ্চর্য! বিপ্লব অসম্ভব বলে কেউ বিপ্লবকে বাদ দিয়ে নীতিকে ধরেছে, বিপ্লব এখন নয়, কোনো কালে হবে বলে কেউ বিপ্লবকে বাদ দিয়ে চলেছে—কাজেই উভয়েই যা করছে সে হলো দিন গত পাপক্ষয়।

ছোটনাগপুরের আদিবাসী টেড়ী ও ঘাড়োয়ালের প্রজা আন্দোলন, নীলগিরির নির্যাতিত মানুষেরা যখন এই স্ট্রাগল্ বা Action-এর ওপর এগিয়ে আসে তখন তাদের মাথায় রায়ের

চেতনার ও নীতির সামান্যই সাহায্য পায়, কিন্তু সংগ্রামের মধ্যে তাদের নৈতিক চেতনা ও চরিত্র বোধহয় যে কোনো অগ্রবর্তী দল ও দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের চেতনা যেখানে দ্বিধায় ভুগছে, তাদের Action সেখানে যাদু সৃষ্টি করেছে, অপূর্ব সাড়া ও চেতনার সৃষ্টি করেছে। মিঃ রায় তাঁর চেতনার, বুদ্ধির, বিদ্যার ও অভিজ্ঞতার বর্তমান অপব্যয় না করে যদি এর কোনো একটা আন্দোলনকে ধরতে পারতেন তবে ঢের বেশি বৈজ্ঞানিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারতেন, যা সভ্য সমাজের জন্য টন টন কাগজ ছাপিয়েও কোনো কালে সম্ভব হবে না। শুধু মিঃ রায়ই নয়, ভারতের যে কোনো নামকরা বিপ্লবীদল সম্বন্ধেই একথা বলা যায়।

নৈতিক-শক্তি ও চেতনা যে সংগ্রামহীন প্রচারের দ্বারা উদ্দীপিত করতে পারা যায় না মহাত্মার কার্যাবলী থেকেও তা প্রমাণ করা যায়। মহাত্মা ভারতীয় জন-মন আকৃষ্ট করেছিলেন তাঁর প্রচারের দ্বারা নয়, সংগ্রামের দ্বারা। সংগ্রামহীন বন্দী ভারত কথার ও নীতির বিড়ম্বনায় যখন জর্জরিত—তখন মহাত্মা ভারতীয় রাজনীতিতে দিলেন গণ-আন্দোলনের আঘাত। বন্দী ও নির্যাতিত মানুষ সংঘাতের মধ্যে পেয়েছিল মুক্তির আলো। যে পরিমাণে মহাত্মা জনগণকে সাক্ষাৎ সংগ্রামে টেনে এনেছিলেন সে পরিমাণে ভারত জেগে উঠেছিল এবং যে পরিমাণে তিনি জনগণকে শৃঙ্খল ও অ-হিংসার নামে শান্ত, ক্ষান্ত ও নিরস্ত্র করেছিলেন সেই পরিমাণে তিনি জাগ্রত চেতনাকে শৃঙ্খলিত—শেষ পর্যন্ত বিকল করে দিয়েছেন। আন্দোলনে ও চেতনায় একটা লৌহ-সীমানা টেনে দিয়ে তিনি জনতাকে কতকটুকু এগিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের যাত্রাপথ রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নইলে সত্যি যদি মহাত্মা সমাজতন্ত্রী হতেন, সত্যি যদি মহাত্মা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতেন তবে দেশে অপূর্ব চেতনা ও প্রেরণার সৃষ্টি হতো, তিনি বিশ্ব-বিপ্লবের অপ্রতিহত নেতা বলে পরিচিত হতে পারতেন। কেননা লেনিন বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় যতটুকু পরিচিত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন, গান্ধীজী ভারতে তাঁর চেয়ে হাজার গুণ পরিচিত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন, গান্ধীজী জনগণের হয়ে দাঁড়ালে—সমস্ত শোষণ-প্রথার আমূল উচ্ছেদ করবার জন্য জনতাকে ডাক দিলে, এক অপূর্ব জিনিস ঘটতে পারতো। তিনি তা করেন নি, জনতাকে মুক্ত হস্তে লড়াই করতে দেন নি, জনতার সম্পূর্ণ চেতনাকে জাগ্রত করেন নি, তিনি অর্ধেক সত্য বলেছেন—তিনি জনতার যাত্রাপথ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি ধনতন্ত্রকে জনতার শত্রু হিসাবে ঘোষণা করেন নি ; ফলে, জনতার নৈতিক উন্মেষটা আধাপথে গিয়ে প্রতিক্রিয়ার পথে ভিড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মহাত্মা ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট জটিলতা ও Bungling করে ফেলেন। এই অর্থে বলা যেতে পারে যে তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কটি অর্থাৎ লেলিহান সাম্প্রদায়িকতা দমন করতে আততায়ীর হাতে প্রাণদান—তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি না বলে একটা প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়। ভারতের ইতিহাসে ও জনতার জাগরণে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান সেখানেই যেখানে তিনি জনতার জন্য সংগ্রাম সৃষ্টি করেছিলেন—১৯২০, '৩০, '৩২ ও '৪২ সালে। গান্ধীজীর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ও তাঁর শেষ অনশনের পরে সাম্রাজ্যবাদের এক ধুরন্ধর প্রচারক মিঃ আর্থার মূর গান্ধীজী সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলেন যে আজই তিনি সবচেয়ে বেশি গান্ধীপন্থী হতে পেরেছেন কেননা তাঁর মতে গান্ধীজী আজ আর কারো বিরুদ্ধে সংগ্রাম-বিশ্বাসী নন। গান্ধীজী যখন সংগ্রাম-বিমুখ, শান্ত, নির্বীর্য—তখনই আর্থার মূরের কাছে সবচেয়ে তিনি প্রতিভা-দীপ্ত কিন্তু অশান্ত, ক্রুদ্ধ, সংগ্রামশীল-গান্ধী তাঁর কাছে আকর্ষণের বস্তু হন নি। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার একজন সাম্রাজ্যবাদীর মুখেই শোভা পায়, কিন্তু ভারতীয় জনতা মহাত্মার সংগ্রাম-বিমুখ ছবিটাকে কোনো কালেই পূজা করে নি—তাদের কাছে গান্ধীজীর মূল্য সংগ্রামের নেতা হিসাবেই—সংগ্রাম-বিমুখতার প্রশংসা দেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র।

মনের দ্বন্দ্ব গতি

ইতিহাসের গতিপথে আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গির যে হেগেলীয় ও মার্ক্সিস্ট ডায়ালেক্‌টিক-এর বিচার করবার সময় সাধারণত এর পৃষ্ঠপোষকেরা এই শাস্ত্রকে প্রমাণ করবার জন্য এমন সব বিষয় নিয়ে ও উদাহরণ নিয়ে উপস্থিত হন যেগুলিতে এই ডায়ালেক্‌টিক-এব প্রধান ক্ষেত্রটাকেই উপেক্ষা করা হয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য গবেষণা ক্ষেত্রে যথা রসায়নে, শরীরতত্ত্বে, প্রকৃতিজ্ঞানে কোথায় কোথায় এবং কেমন করে এই দ্বন্দ্বমূলক গতি পরিলক্ষিত হয় তারই উপর বিশেষ জোর দেয় এবং ইতিহাসের অভ্যন্তরে কি কি পরস্পর-বিরোধী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে থাকে, তার বিচার করতে গিয়ে শ্রেণীগত সংগ্রামের উল্লেখ করেন। মোটামুটিভাবে প্রকৃতিতে এবং মানুষের ইতিহাসে এই দ্বন্দ্ব দেখানোই ডায়ালেক্‌টিক-এর একমাত্র ক্ষেত্র নয়। মানুষের চিন্তা ও চেতনার বিজ্ঞান হিসাবেই ডায়ালেক্‌টিক প্রথম লজিকের একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। মানুষের মনের ধারণার অথবা মানসিক কার্যাবলীর রীতিনীতি অর্থাৎ বুঝবার নিয়ম বা একটা কায়দা হলো ডায়ালেক্‌টিক। Dialectic is primarily a system of entology. মনোবিজ্ঞানের বিশিষ্ট এক বিচাব ভঙ্গিই হলো ডায়ালেক্‌টিক। ডায়ালেক্‌টিক মনের কার্যকলাপ বুঝবার উপায় অর্থাৎ সামাজিক চেতনাব গতিবিধি ডাযালেক্‌টিক পথে বোঝবার উপায়। ডাযালেক্‌টিক শুধু ইতাহাস ও প্রকৃতিতে বুঝতেই প্রয়োজনীয় নয়—বস্তুত প্রাকৃতিক যাবতীয বিজ্ঞানে কি ভাবে ডাযালেক্‌টিক বয়েছে এ জানলেই প্রকৃতিকে বোঝা হলো না—প্রকৃতিব কার্যাবলী, গুণাগুণ, কার্যকাবণ ও নিযমাবলী বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের প্রভূত গবেষণাব বিষয়—কিন্তু শুধুমাত্র তাকে দ্বন্দ্বমূলক গতিবিধি কতটুকু এ জানলেই প্রকৃতিকে জানা হলো না। গুড় কেন মিষ্টি আর কুইনিন কেন তেতো এ বুঝতে ডাযালেক্‌টিক কিছুমাত্র সাহায্য কবে না এবং মিষ্টত্ব ও তিক্ততার পার্থক্যকে একটা বিরোধিতার আপাত লক্ষণ দেখে কেউ যদি এতে ডায়ালেক্‌টিক আবিষ্কার করে খুব বুঝেছেন মনে করেন তবে তাঁকে গাধা ছাড়া আর কি বলা যায়। চিনির মিষ্টত্ব অথবা কুইনিনের তিক্ততা যে জল-মাটি ও হাওয়া থেকে রসদ নিয়ে আখের অথবা সিন্‌কোনিন গাছেব জীবন তাতে কি করে মিষ্টত্ব ও তিক্ততা এল—যা মিষ্টি ছিল তা মিষ্টি হলো—যাতে তিক্ততার কিছুমাত্র ছিল না তাতে তেতো হলো, এতে পদার্থের গুণগত রূপান্তবের—বৈপ্লবিক রূপান্তরের নমুনা মেলে, অর্থাৎ ডায়ালেক্‌টিকের একটা ধারা মেলে কিন্তু এই ধারা দিযেই চিনি ও কুইনিনকে বোঝা হলো না, অর্থাৎ রসায়নিককে অন্য সব গবেষণা ফেলে দিয়ে চিনি ও কুইনিনের গুণাবলী বুঝতে ডাযালেক্‌টিক নিয়ে বসলে হাস্যকর ব্যাপার হবে। Dialectic is essentially a science of understanding. জানবার, বুঝবার, গবেষণা করবাব প্রথমে যে দৃষ্টিভঙ্গি দরকার তাতে এর স্থান নির্ণয় করতে হবে। জানা জিনিসটা সম্পূর্ণ মনেরই কাজ—অতএব মনের গতিবিধি, নিয়মকানুনটা বোঝা এ ক্ষেত্রে ডায়ালেক্‌টিকের প্রধান ক্ষেত্র।

মানুষের অনুভূতি শুধুমাত্র চেতনাতে সীমাবদ্ধ নয় এবং অনুভূতির রাস্তাও একমাত্র চেতনা নয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা মানুষের প্রতিনিয়ত বাস্তব জগতের ঘটনার স্পর্শে যত অনুভূতি গ্রহণ করছে সচেতন মন তার সামান্য কয়েকটা জিনিসকেই গ্রাহ্য করে, অর্থ দেয়, যুক্তিসম্মত করে ও চেতন মনে স্থান দেয়—কিন্তু অনেক ঘটনা, অনেক আঘাত, অনেক অপমান, অনেক লোভ, অনেক প্রতিক্রিয়াকে অসামাজিক ও অস্বাভাবিক বলে চেতনরাজ্যে স্থানও দেয় না। এমন অনেক জিনিসকে আমরা দেখি যা চোখে স্পষ্ট নয়—এমন অনেক লোককে পছন্দ ও অপছন্দ করি যার যুক্তিসঙ্গত দৃশ্যমান কারণ নেই, এমন অনেক মতবাদকে

গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করি যাকে যুক্তির মাপকাঠিতে পরীক্ষিত হবার সুযোগ দেই নি। মানসিক চেতনার ও ধারণার স্থান সব সময়েই ব্যক্তির কাজে কার্যকারণ সূত্রের কারণ হতে হবে এমন কোনো মানে নেই বরং প্রায়ই তা কার্যকারণ সূত্রের পরিণতি—যে কার্যকারণ সূত্রের সূত্র সচেতন মন নয় বরং তার বাইরে, অথবা অন্তরালে।

অতএব যা কিছু ধারণা, যা কিছু চেতনা আজ মানুষেব মনে স্পষ্ট, কার্যকারণবত ও সক্রিয়—বোধগম্যের প্রতিক্রিয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা নয়। অর্থাৎ চেতনশীল মন আজ যা কিছু সজ্ঞানে গ্রহণ ও বর্জন করছে- -সেটাই শেষ কথা নয়, মন ফাঁকি দিয়েও বিস্তর জিনিস গ্রহণ করে নিচ্ছে, বিস্তব ঘটনা সজ্ঞানে মনের অলক্ষেতেই মনের পিছন দেশে ঠাঁই করে আছে—যারা মুক্তির অবকাশ খুঁজে বেড়াচ্ছে, উপযুক্ত সময় ও সুবিধার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে, অন্ধকারে হাতড়ে বেডাচ্ছে। সচেতন সত্তাই একমাত্র সত্তা নয, ববং এমন কি তাব আসল সত্তার সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ, ছলনাময রূপও হতে পারে। যে পবিমাণে আমরা শিক্ষিত সেই পরিমাণে আমরা প্রচলিত নীতি-ধারণার দাস এবং যে পরিমাণে আমবা মূর্খ সেই পবিমাণে আমরা নতুন চেতনা-প্রবণ। জনগণেব মনে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আমাদের চেতনার ধাবা থেকেই সংযুক্ত হচ্ছে এবং হবে এ যদি হতো তবে হাজার বছরেও বিপ্লব গণমনে গ্রাহ্য হতো না। জীবনে প্রতিদিন যত আঘাত, যত অপমান, যত নির্যাতন, যত অর্ধাশন ও অনশন তাদের মিলে থাকে, চেতনায় তার বিচার কবে না বটে, কিন্তু অবচেতনা তা ক্ষমা করে না, উপেক্ষা করে না, অস্বীকার কবে না। মন বেইমান হতে পারে কিন্তু অন্ধ জীবন বেইমান নয়। কুৎসিত, জরাগ্রস্ত, পচনশীল ও ব্যাধিগ্রস্ত জীবনেব মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা লাভের স্পষ্ট পদক্ষেপ স্থির, অনিবার্য ও দুর্দমনীয়। এখানেই, এই অন্ধ জীবনগর্ভেই বিপ্লবের দুর্দান্ত আগ্নেয়গিরি প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে অদমনীয় হয়ে বেড়ে চলেছে—বেড়ে চলেছে লোকচক্ষুব অন্তরালে—চেতনাকে অগ্রাহ্য করেও। অবচেতন মনে নানারকমের মানসিক মডেল ও সিম্বল তৈরি হতে থাকে যার থেকে শুধু আদর্শের রঙই সৃষ্টি হয় না, অনেক বিকৃত ভূত-প্রেত ও আশঙ্কাব জন্ম হতে থাকে। বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের কদর্যতা, ভয়ঙ্করতা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের উদারতা ও উদ্যমের উৎস ওখানেই।

ফ্রয়েডের অবচেতন মনের আবিষ্কার কেউ আর একদম অগ্রাহ্য করতে পারে না। অন্তত মনের চেতনার বাইরেও মনের কার্যকলাপ রয়েছে, যেগুলি নানা ভাবে সময়ে অসময়ে নানারূপে দেখা দেয়, এই সাধারণ সত্যটা নিত্যকার ঘটনা। কিন্তু এই অবচেতন মনের কার্যাবলী কোনো এক Super-ego নিয়ন্ত্রণ করছে অথবা অতি-প্রাকৃতিক শক্তিব ইচ্ছাধীন রয়েছে—এক্ষেত্রে ফ্রয়েড অযথা এক শক্তির অবতারণা কবেছেন। চেতন ও অবচেতন মনের দ্বারপথে সশস্ত্র সামাজিক-নীতির যে শাস্ত্রীকে ফ্রয়েড দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সে তো সামাজিক প্রচলিত নীতি বা সংস্কার—এই শাস্ত্রীকে বুঝতেও কোনো কিছু কঠিন হচ্ছে না। অবচেতন মনের আদিম ও মৌলিক জৈবচেতনাকেও অস্বীকার করবার কিছু নেই, অবচেতন মনে ব্যর্থ ও সংক্ষুব্ধ কামনা-বাসনার নরক-কুণ্ডটাও স্বীকার করা চলে। কিন্তু অবচেতন মনে সামাজিক নীতির প্রহরী একমাত্র দুর্দান্ত ও বেয়াড়া কামনাগুলিকেই বন্দী করে রাখবে শুধু এই কেন? যে সমস্ত অন্যান্য সামাজিক চিন্তা, প্রেরণা ও ইচ্ছা আজকের জগতে নিষিদ্ধ অথবা মারের ভয়ে, নির্যাতনের ভয়ে দুর্বল, যারা প্রকাশ্য সভায় প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো উপায় দেখে না এবং যাদের কায়েম করাবার মতো শক্তি খুঁজে পায় না, তাদের জন্য স্থানও ঐ অবচেতন মনের বন্দীশালায় হওয়া স্বাভাবিক। একমাত্র উলঙ্গ যৌন-চেতনাই সমাজের নিষিদ্ধ বস্তু নয়—যে সব সামাজিক চিন্তা বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধবাদী, তাদেরও জন্য ঐ সব মনের কারাকক্ষ বিদ্যমান যেখানে ঐ সব অনুভূতি

নির্মম আঘাতে অথবা দুরন্ত অবজ্ঞায় মাথা নত করে ঝিমুতে থাকে এবং অপেক্ষা করতে থাকে সেই সুযোগেব জন্য যখন শাস্ত্রীকে পরাস্ত করে অথবা ফাঁকি দিয়ে তারা নানারূপে আত্মপ্রকাশ কবতে পারে। ঘুমের সুযোগ নিয়ে যদি যৌন-চেতনা মনেব সাধাবণ বৈঠকখানায় এসে নৃত্য করতে পারে, তবে পবাজিত যে কোনো বাসনা, যে কোনো লোভ, যে কোনো প্রেরণা শাস্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে ভাবের ঘরে চুরি করে, ছলনার বেশে এমন কি ধর্মেব বেশেও বেরিয়ে আসতে পারে। একমাত্র যৌন-চেতনাই সমগ্র জৈব-চেতনা নয এবং মানুষের জৈব-চেতনা সর্বদা স্বার্থকেন্দ্রিক নয়—নইলে প্রাণের উদারতা, সমষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার, সমাজ-চেতনার ঐকান্তিকতা, আবেগ—যা মাঝে মাঝেই দেখা দেয়—তাকে বোঝা সম্ভব হবে না। মানুষের মনে স্বার্থকেন্দ্রিক চেতনা কতটা স্বাভাবিক ও কতটা সামাজিক এ তো বিচারের বিষয়। কেন ধরে নেওয়া হয় যে নরনারীর ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণাই স্বাভাবিক প্রেরণা? তা যদি হতো তবে মায়ের সন্তানের প্রতি জীবন-সঙ্কুল-টানটা ব্যাখ্যা করা চলত না। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ লিটারলু ও ক্রোপোটকিন্ (Mutual Aid) বিস্তর প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে জীবন সংগ্রামে তথাকথিত ডারুইনি স্বার্থবোধ একমাত্র জৈবিক প্রেবণা নয়—মানুষের অন্তরে ও ইতিহাসে সমষ্টিবোধ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও জৈবিক প্রেরণা পুষ্ট। Creative Evolution-পন্থী বার্নার্ড'শ জীবনকে এক গোষ্ঠীগত স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বা অভিযান বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। মানুষেব সমষ্টিগত সত্বাকে ধনতন্ত্র ও তাব পূর্বে সামন্ততন্ত্র মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবে ছেড়েছে—সহযোগী হিসাবে না দেখে প্রতিযোগী হিসাবে, শত্রু হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। মানুষের সমষ্টিগত চেতনাকে চূর্ণ করতে ধনতান্ত্রিক সমাজকে কম বেগ পেতে হয় নি, টুক্‌বো টুক্‌রো, ছিন্ন ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, বিবোধী-স্বার্থচেতনা আজ মানুষকে সত্যি অসুখী কবে ছেড়েছে, অর্থহীন সম্পত্তি-বিলাস মানুষের অন্তরে শান্তি আনতে পাবে নি—সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের অসংখ্য ব্যারিট সৃষ্টি করছে মাত্র। আপন হীনতায়, অন্তরের দীনতায়, একাকীত্বে মানুষেব মনেব অসন্তোষ আজ সর্বব্যাপক। প্রতিযোগিতাব নির্বোধ উত্তেজনা হযেছে বটে—কিন্তু কোনো শান্তি, সৌম্য ও অর্থ খুঁজে পায় নি। ম্যাথু আর্নল্ড কবিতায় বলেছেন যে আমরা যেন কোনো এককালে এক মহাদেশে মিলিত ছিলাম—কিন্তু বিরাট মহাসাগবে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে দ্বীপান্তরিত হয়েছি—অন্তর আমাদের সেই মহাদেশের জন্য বিরহাকুল। আমাদের ব্যক্তিকে নিযে আজ বড় ক্লান্ত।

সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সমষ্টিকে বঞ্চিত করে, ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠালাভেব ধনতান্ত্রিক প্রয়োজন ও প্রেরণা মানুষকে আজও সর্বৈব ব্যক্তিকেন্দ্রিক করতে পাবে নি। প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মধ্যে তাব বিকৃত ও ব্যর্থ সমষ্টিচেতনা প্রবল আবেগে, অর্থহীন অতিশয়োক্তিতে, অকারণ আতিশয্যে পবিশোধ কবে নিতে চায। স্রেফ্ যৌন্-চেতনার মধ্যেও প্রেম, আদর্শ, সমষ্টিবোধ ও অন্যান্য এমন সব অবাস্তর অনুভূতির সন্ধান খুঁজে বেড়ায়—অদ্ভুত অর্থহীন অর্থ খুঁজে বেড়ায়, উপরন্তু প্রেমাস্পদকে তার একান্ত করে নিজেরই জন্য পাবার যে একটা অদ্ভুত খেয়াল দেখা যায় সে কেবল সমষ্টিচ্যুত ও একাকীত্ব জীবনেব বিরহবোধ। নইলে যৌনচেতনার মধ্যে একান্ত করে পাবার কোনো জৈবিক প্রয়োজন নেই।

মার্কসের কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদ স্বার্থের সমুদ্রে দ্বীপান্তরিত মানুষকে আবার এক মহাদেশে মিলিত করে দেবে। এখানে এসে বুদ্ধি ও বেদনা, চেতনা ও প্রয়োজন, স্বভাব ও সমাজ, ব্যক্তি ও সমষ্টি মিলিত হবে। এই অপূর্ব দৃশ্য যে কোনো ধর্ম, যে কোনো নীতি, যে কোনো স্বপ্নকে হার মানিয়ে দেয়। হীনতা, দীনতা, জটিলতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মানুষ আবার সত্যি মানুষই হবে। স্টাখানভিজমের স্বার্থবাদ মানুষের কাজের ও ভোগের প্রেরণা হবে না,

ভোগের লড়াই শেষ হবে। তখনই সৃষ্টি হবে সত্যিকার রামরাজ্য, অ-হিংস সমাজ, এক মানুষের মহাদেশ।

এই যে মানুষের সমষ্টি-বেদনা ও সমাজচেতনা এরা ফ্রয়েডের অবচেতনে ঠাঁই পেয়ে আছে আরো অনেক অসন্তোষ বিদ্রোহ প্রেরণার সাথে—কেবল মাত্র যৌন প্রবৃত্তিগুলিই নয়। যৌন প্রবৃত্তিগুলি ঘুমের সুযোগে আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু উপরোক্ত প্রেরণাগুলি—যেগুলি সমষ্টিগত প্রেরণা ও সামাজিক প্রেরণা সেগুলি বিদ্রোহে ও বিপ্লবে দোর্দণ্ডপ্রহরীকে পরাস্ত করে আত্মপ্রকাশ করে। এই অবরুদ্ধ ও প্রকাশাকুল অবদমিত মানসিক প্রবাহগুলি যে স্বীকার করে না, সে বিপ্লবও চোখে দেখে না। এতো গেল মনের এক দিক, অর্থাৎ চেতন ও অবচেতন-রাজ্যের সংঘাত ও লুকোচুরির লড়াই।

অপর দিকে চেতন-রাজ্যে মানুষের মনে একই সাথে পরস্পর-বিরোধী প্রেরণা ও চেতনা কাজ করে চলেছে। দ্বন্দ্বই চিন্তার ক্রমপ্রসারমান ধারার কারণ—হ্যাঁ এবং না-র পরিণয়মালা। একই সাথে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, সাহস ও ভয়, আক্রমণেচ্ছা ও হার মানবার ইচ্ছা, হিংসা ও অ-হিংসা. দ্বেষ ও ভালবাসা দুর্দান্ত বেগে কাজ করে চলেছে। প্রচলিত চিন্তা ও বিপ্লবী চিন্তা আজকের যুগে এমন কোনো মানুষ নেই যার মনে ওই দুই ধারাই নেই। বাইরের বিপক্ষ দলের সাথে লড়বার সময় তার নিজেরই মনে পক্ষ টেনে মনের অপর দিকটাকে ক্রমাগত অস্বীকার, অবজ্ঞা করে এড়িয়ে চলেছে। এই দুই ধারা সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা দুই ধারা থেকে জন্ম লাভ করছে, পুষ্টি লাভ করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজের পড়তি ধারা পরাজিত হতে বাধ্য এবং এই পরাজয় ধীরে ধীরে হচ্ছে না—এক কঠিন ধ্বস্তাধ্বস্তির সংগ্রামের মধ্যে সম্পূর্ণ দপ করে পড়ে মরে যাচ্ছে। মানুষের মনে আজ বিপ্লবকে অস্বীকার করবার জন্য প্রচলিত পড়তি মতটা দুর্দান্ত বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে, কিন্তু পেরে উঠছে না, তাই ধৈর্য রাখতে পারছে না, রেগে উঠছে—কিন্তু হার তার অনিবার্য এবং খুব শীঘ্রই এই মল্লযুদ্ধে বিপ্লবী চেতনা সগৌরবে ও দুর্দান্ত বেগে জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবে—কেননা প্রতিক্রিয়ার দম সমাজে, অর্থনীতিতে ও রাষ্ট্রে ফুরিয়ে এসেছে। ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস, সন্দেহ, প্রতিবাদের সুরটাকে বন্ধ রাখার জন্য বিশ্বাসের পাত্রটা জোর করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, বর্তমান নেতৃত্ব ও স্থিতিস্থাপকতাটা যত বেশি মেকি বলে মনের ধারায় গুনগুনিয়ে উঠতে চাইছে তত আরো নব নব যুক্তির অবতারণা ও কল্পনা দিয়ে বিশ্বাসের নেতৃত্বকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে—এই আঁকড়ে ধরে বিশ্বাসের পাত্রটার শক্তি যাচাই করে নিচ্ছে। অপর দিকে বিপ্লবের সুরটাকে, বিদ্রোহের সুরটাকে অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করেও তার প্রকৃত শক্তিটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে। নেতাদের হাতে সর্ব ক্ষমতা দিয়ে দেখতে চাইছে তারা সত্যি কিছু করতে পারে কি না—বিপ্লবী চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধতা করেও দেখতে চাইছে সেটা মিথ্যা-শক্তি কি না। কিন্তু এই দোটানা ও দ্বন্দ্বের তীব্রতা অবস্থার চাপে আরো বেগমান করে দিচ্ছে, ফলে একদিন সমস্ত ধারাটাই উল্‌টিয়ে যাবে এবং আশ্চর্য ও অদ্ভুত বেগে অবজ্ঞাত বিপ্লবটাই সকলের মাথায় একমাত্র কাজ বলে পেয়ে বসবে। এবং এই ধারা ও ঘটনাটি তত সত্বর হবে যত সত্বর বিপ্লবীরা বিপ্লবকে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে।

ফ্রয়েডের চেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্ব—প্যাভলভের Excitation ও inhibition-এর দ্বন্দ্ব সামাজিক মনের আংশিক চিত্র মাত্র, কেননা মানুষকে এই সব মনোবৈজ্ঞানিক সমাজ থেকে চ্যুত, বিচ্ছিন্ন গবেষণাগারে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মার্ক্সিস্ট ডায়ালেক্‌টিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় সামাজিক মনের দ্বন্দ্বকে বোঝবার বিরাট পরিমণ্ডলটি তৈরি করে রেখেছে যেখানে বিশিষ্ট কোনো ধারার অন্বেষণকারী মনোবৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ আলোকিত কক্ষে বসে মনকে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

সমাজের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তি, অর্থনীতিতে সঙ্কট, পৃথিবীতে যুদ্ধ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম—এই সংগ্রামশীল ছবিটা মনের আয়নায় যে সংঘর্ষের ছবি তুলেছে এবং মন সেই ছবিকে নিয়ে আবার এই বিশ্ব সংগ্রামে কি নতুন ইন্ধন যুগিয়ে দিচ্ছে, মনের সেই সংগ্রামশীল বিকাশটা বুঝতে হলে কেবল প্রচলিত সম্মতির, বিকৃতির, বিনষ্টির ও পরাজয়ের চেতনাটা দেখলেই চলবে না—বিরুদ্ধবাদী, সংগ্রামশীল, প্রতিরোধকারী, বিদ্রোহী ও বিপ্লবী ফল্গুধারা ও সংঘর্ষটাও দেখতে হবে। এবং এটা দেখতে কোনো কঠিন হয় না যখন অহরহ দেশে বিদেশে, শহরে, মাঠে, জঙ্গলে, পর্বতের আড়ালে চারদিকে যে অশান্তি ও সংগ্রাম ইতস্তত ছিন্ন-ভিন্ন ও নানা ভঙ্গিতে নানা সংঘর্ষ চলেছে তার দিকে তাকাই। নইলে কিছুতেই বুঝতে পারব না—বিশ্বাস, দৃঢ়তা, আদর্শ এমন কি ধর্মান্ধতাকেও। সমাজ-বিবর্তনে ও বিপ্লবে বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আদর্শ ও ধর্মপ্রবাহ প্রভৃতি সামাজিক মনের প্লাবনগুলি এই ডায়ালেক্‌টিক না বুঝলে কেবলই মনে হবে রহস্য। রহস্য ইতিহাসেরই অবচেতনা, ধর্মবীরেরা তাকে স্পর্শ করেছে আগের যুগে কিন্তু এবারে সত্যিকার সাম্যবাদী শুধু স্পর্শই করবে না, আবিষ্কার করবে সজ্ঞানে, জীবনের কাজে ব্যবহার করবে। শান্তির কামনা, সংগ্রামের ইন্ধনকে অগ্রাহ্য করেও আপন ক্লান্তিতে কখনো কখনো মহাত্মা গান্ধীব বাণীতে জনতা কান পাততে চায়, সাময়িক ভাবে সাম্প্রদায়িক শান্তির স্থিরতা এনে দেয়, কিন্তু স-হিংস সমাজের অন্তর্দাহ আবার তাকে সংগ্রামের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। মহাত্মা তাই শান্তি আনতে পারেন না, অ-হিংসা স্থায়ী করতে পারেন না। হিংসাব ভিত্তিকে নষ্ট করে দিয়ে সমাজে শান্তি ও অ-হিংসার প্রতিষ্ঠা করবে সাম্যবাদ—সাম্যবাদ গান্ধীবাদী রহস্যবাদীদের চেয়েও রহস্যকে ভাল করে বোঝে এবং বোঝাতে পারে। প্রাণেব কোনো সাড়াকেই তার অবজ্ঞা করার কথা নয়, বিশ্বাস ও আদর্শের কোনো শক্তিকেই অগ্রাহ্য করার কথা নয়—তাদের সত্যিকার ব্যাখ্যা ও প্রয়োজন মার্কস্‌বাদীকে নিজ হাতে নিতে হবে। তা ছাড়া বিপ্লবের দোহাই হাস্যাস্পদ এবং সত্যিকারের ছবিটা দেখলে মনে হবে বিপ্লবী কোথাও বিপ্লব দেখতে পাচ্ছে না। বিপ্লবেব মানসিক চেতনা ও প্রস্তুতির সামগ্রী তাই আজকের এই মেকি সাম্যবাদীদের নজরে পড়ছে না। চোখের দৃষ্টি ও কানের বধিরতা যদি তাদের না আসত, তাহলে বোধ হয় তাদের প্রাণও আজ তাদের বুদ্ধিব চেয়ে চতুর হতো।

অ্যাক্‌সনহীন বুদ্ধিবাগীশ ভাবতের সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা আজও চেতনার একদেশদর্শিতা-রোগে ভুগছে—অবচেতন ও অর্ধচেতনশীল ধারাটা ধরতে পারছে না। ভারতের কোনো সংগ্রামে তার এত বিদ্যা থাকতেও কোনো নেতৃত্ব করা চলছে না। তাদের দলের শতভাগের একভাগ বিদ্যা ও বুদ্ধি নিয়েও আজকে দেশের প্রজা-আন্দোলনকে নেতৃত্ব করছে অখ্যাত, অজ্ঞাত লোক—জনসাধারণের ভয়, ভাবনা, আকাক্ষণ্ডা, চেতনা ও অবচেতন বেদনাকে নিয়ে অদূরদর্শী ভুঁইফোড় নেতারা কত কি কাণ্ড লণ্ডভণ্ড করছে, কিন্তু তথাকথিত বিপ্লবী বিপ্লব দেখতে পাচ্ছে না, কেননা ইতিহাসের সমাজের অন্য দিকটা এবং দ্বন্দ্বটা আর নজরেই পড়ে নি, অথচ সে ডায়ালেক্‌টিক বোঝে! যদি সত্যি ডায়ালেক্‌টিক বুঝত তবে দেখতে পেত যে আজকের জনতা তাদেব শত কু-সংস্কার, অন্ধ-চেতনার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে পরিবর্তনের জন্য কাতর প্রার্থনা করে চলেছে—নিজেদের দুষ্ট-চেতনায় তারা ক্লান্ত—তাদের অবচেতন ও সংগ্রামশীল ভিন্ন চেতনা আজ মুক্তির অপেক্ষায় প্রতীক্ষমান—এবং তা দ্রুত বেরিয়ে আসবে, অবস্থার নির্মম আঘাতে, নেতৃত্বের সাহসী পদক্ষেপে ও স্পর্শে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন?

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সাধারণ লোকের ঘাড়ে আজ এসে পড়েছে এক অসাধারণ দায়িত্ব। কেননা যারা অসাধারণ যারা নেতা, যাদের হাতে সমাজের দায়িত্ব ছিল এতকাল, তারা অসাধারণ সমস্যাগুলিকেও সাধারণ সমস্যা বলে চালাতে চাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরে যায়- যুদ্ধের পর যুদ্ধ এসে এক একটা দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিচ্ছে, দেশবিদেশ দাঙ্গায় জ্বলে যাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, চারিদিক থেকে অন্ধকার আসছে নেমে, মান ইজ্জৎ ধন প্রাণ ধর্ম কোনো কিছুই রক্ষা করবার যেন কোনো উপায় পাচ্ছে না সাধারণ লোক। তথাপি দেশনায়করা বোঝাতে চাচ্ছেন এ এমন কিছু নয়—পরিবর্তনের যুগে এমন হয়েই থাকে, একটু সবুর করলে সাধারণ নিয়মেই তা ঠিক হয়ে যাবে। শান্তিপ্রিয় সোয়াস্তিপ্রিয় মানুষ সেই কথা শুনেই আশ্বস্ত হতে চেষ্টা করে। উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে যেন আশু বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চায়। সভ্যতার এই ভয়াবহ সঙ্কট আজও কি সাধারণ ব্যাপার।

বিপদটা যে কত বড়, কত ব্যাপক, সে সম্বন্ধে সচেতন না হওয়া আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বিপদ। যদি মানুষ জানত যে সত্যি তার সর্বনাশ হতে চলেছে—তবে সে চকিতে উঠে বসত, সজাগ দৃষ্টি নিয়ে সবটা দেখতে চাইত এবং শেষ পর্যন্ত যে কোনো বিপদই হোক না কেন তা অতিক্রম করেও যেতে পারত। হাজার হাজার বছর ধরে যে মানুষ প্রকৃতির অজস্র বাধা অতিক্রম করে এসেছে শেষ পর্যন্ত সে আজ মানুষের হাতের তৈরি বাধায় নিঃশেষ হয়ে যাবে এ কখনও হতে পারে না। মানুষ বাঁচবেই এবং মানুষের মতোই বাঁচবে। কিন্তু মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা আশা দেখিয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা শুধু অপরাধই নয়- -জঘন্যতম অপরাধ। সত্যি কথা বলতে হবে---লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

বিপদ এসেছে এই জন্য যে সাধারণ মানুষ নিজ হাতে তার দায়িত্ব নিতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। অসাধারণ কাজে সাধারণকে হাত দিতে হবে আজ, নইলে উপায় নেই। একটি গ্রামের চাষীকেও সমস্ত দেশের কথা ভাবতে হবে -- সমস্ত মানুষের সঙ্গে তার যে কি সম্বন্ধ তাকে তা বুঝতে হবে। সমগ্রভাবে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে —খণ্ড চিন্তার, ব্যক্তিগত চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে হবে।

বড় কথা বলে সব উড়িয়ে দিলে চলবে না--কেননা সমস্যাটা ছোট নয়, এবং ছোট করে তার কোনো সমাধানও নেই।

দূরের স্বপ্ন বলে তাকে দূরে ঠেলে রাখলে চলবে না কেননা এই স্বপ্ন আজই সার্থক করা চাই -শুধু ভবিষ্যৎই নয় বর্তমানও আজ আমাদের রুদ্ধ হয়ে গেছে। এক পা এগোবার উপায় নেই বরং ক্রমেই আমাদের পিছনে হটে আসতে হচ্ছে। সমস্ত বাধাটাকে যদি আজ আমরা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে একেবারে উল্টে না ফেলে দিই তা হলে সামনে এগোবার পথ আমরা পাব না। এ এক অসাধারণ কাল এবং অসাধারণ শক্তি দিয়ে সাধারণকে দিতে হবে এক ধাক্কা- এক যুগান্তকারী ধাক্কা।

অতি সাধারণ লোক যাতে বুঝতে পারে তার বিপদ কোথায়, তার মুক্তি কোথায় সেই চেষ্টা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় করা হয়েছে। দেশের সাধারণ লোকের মনে যে একটা জানবার ইচ্ছে জেগেছে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাতে সাহায্য করবে বলে আশা করি। [illegible] প্রায় চার মাস পূর্বে

লেখা—নানা কারণে ছাপাতে দেরি হয়েছে। চার মাস পরে আজ ভারতের রাজনীতি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে—কিন্তু মূল সমস্যার একটিও সমাধান হয়নি—বরং আরো জটিল আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তার জন্য পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি কিছুমাত্র সেকেলে হয়ে যায়নি বরং তার তীব্রতা আরো বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে পড়েছে।

১লা অক্টোবর ১৯৪৭

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বছরখানেক আগে যখন এর প্রথম সংস্করণ বের হয় সেদিনকার অবস্থা থেকে আজকার অবস্থা দেশ-বিদেশে অনেক বদলে গেছে—সমাজের ভিতরকার সংঘর্ষ অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেদিন এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল এই পুস্তিকায় যা সাধারণের চোখে স্পষ্ট ছিল না—যা ভবিষ্যতের চিন্তা বলে মনে হয়েছিল তা আজ বর্তমানের জ্বলন্ত আলোচ্য বিষয়। সেদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা মনে হয়েছিল একটা কল্পনা বিলাস মাত্র, কিন্তু আজ তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামরূপে অনেক দেশে ফুটে উঠেছে এবং ভারতের মাটিতেও ফুটে উঠতে চাইছে। আবার এমন অনেক প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন সেদিন ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন করেছিল—যেমন সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগের নেশা - সে সব আজ আপন অপদার্থতায় স্তিমিত হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতা আজ তেমন নাড়া দিতে পারে না। প্রাদেশিকতা তার স্থান নেবার চেষ্টা করছে কিন্তু এরও আয়ু ও জীবনশক্তি খুব বেশি নয়। অনেক প্রকারের মোহ আজ জনসাধারণের অসহ্য জীবনযাত্রার দুর্ভোগে দূর হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মহাত্মা গান্ধীর হত্যাটাকেও লোক ভুলে যাচ্ছে। "শিশু রাষ্ট্রের" প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসটাকে আর বেশি ভাঙানো সম্ভব হচ্ছে না। এসব 'শিশু রাষ্ট্রের' জন্মদাতা যে জনসাধারণ নয় একথাও খুব দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান শাসকশ্রেণীর অপদার্থতা ও অযোগ্যতা আজ সর্বত্র আলোচ্য বিষয়। মোট কথা এই পুস্তিকায় যে সব কথা বলা হয়েছিল তা চাক্ষুষ প্রমাণ হতে চলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এমন ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যা লেখকও জোর করে বলতে তখন সাহস করেন নি।

বিপ্লব পৃথিবীতে আজ নানা দেশে গৃহযুদ্ধের রূপে, কোথাও কোথাও বিশৃঙ্খলরূপে দেখা দিয়েছে। অনিচ্ছুক বিপ্লবীরা ধীরে ধীরে একথা স্বীকার করতে শুরু করেছে। যে বিপ্লব আজই চাই বলে সেদিন জোর দেওয়া হয়েছিল—চোখ মেলে পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা শক্ত নয় যে বিপ্লব সত্যিই শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় বিপ্লবী শক্তিগুলি যে আজ স্পষ্টত আত্মসচেতন হতে চলেছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই—তবে একথা ঠিক প্রতিবিপ্লব আজ যতটা সজাগ—বিপ্লববাদীরা ততটা সজাগ নয়।

অতএব এ পুস্তিকার প্রয়োজন আজো আছে জেনে দ্বিতীয় সংস্করণ করাতে হলো। কোনো পরিবর্তন করার আজো কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। তবে বিপ্লবের রীতি নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে আজকের দিনে গুরুতর আলোচনা উঠেছে—বিপ্লব আজ সমাজের বাস্তব কার্যক্রম। কিন্তু সেটা একটা ভিন্ন বিষয় যার পৃথক আলোচনা হওয়া দরকার।

১৮ই জুলাই, ১৯৪৮

তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশকের নিবেদন

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর জনসাধারণের কাছ থেকে তৃতীয় সংস্করণ ছাপার অজস্র তাগিদ এসেছে, কিন্তু ছাপা এতদিন হয়ে ওঠে নি কারণ লেখক বইখানিকে কিছু কিছু সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কংগ্রেসী শাসনের শুরুতেই বইখানি লেখা হয়েছিল। আজ চার বছর পরে বইখানির প্রয়োজনীয়তা যেন আরও বেশিভাবে দেখা দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন?' এই প্রশ্ন আজ শুধু লেখকের মনের প্রশ্নই নয়, অগনিত মানুষের মনের প্রশ্ন। সুবিধাবাদীদের ভুল, শত্রুর অপপ্রচারকে উপেক্ষা করেও আজ এই প্রশ্ন দেশের শোষিত মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চার বছর আগের লেখা বিষয়বস্তুগুলিকে আরও ধারাল এবং স্পষ্ট করে তোলার জন্য হয়ত লেখক আধুনিকতম ঘটনাগুলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন অথবা নতুন তথ্য এবং যুক্তির দ্বারা বইখানিকে আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার কর্মব্যস্ত জীবনে একটি দিনও অবসর করে উঠতে পারেন নি। আজ কিন্তু তার প্রচুর সময় এবং অবকাশ রয়েছে, কিন্তু তিনি জনসাধারণের নাগালের বাইরে।

চতুর্দিক থেকে অজস্র অর্ডার আসতে থাকায় অবশেষে খুব কম সময়ের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। অদূর ভবিষ্যতে লেখকের পরিচয় এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত করে পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

১৫ই জুলাই
সন ১৯৫১ সাল
কলিকাতা

প্রকাশক

স্বাধীনতা ভারতের ন্যূনতম কর্মতালিকা

আগে স্বাধীনতা পরে সমাজতন্ত্র

দেশ আগে স্বাধীন হোক—সরকার আগে দেশের লোকের হাতে আসুক, তখন যেমন ইচ্ছে আমরা আমাদের ঘর তৈরি করে নেব। সবাই মিলে এখন ইংরেজকে তাড়াই, তারপরে চাষী মজুরের সমাজতন্ত্রীরাজ তৈরি করতে লাগা যাবে। এই ছিল কংগ্রেস নেতাদের যুক্তি, এবং এই যুক্তি সবার কাছেই খুব চমৎকার মনে হতো। যারা বামপন্থী, যারা সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী তারাও এ যুক্তিতে স্বীকার পেয়ে যেতেন। তারা বোঝাতেন যে সবাই মিলে—ধনী গরিব সবাই মিলে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশে যে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হবে তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে, আন্দোলন করবার স্বাধীনতা থাকবে এবং কংগ্রেস জমিদারী প্রথা ও সামন্ততন্ত্র উঠিয়ে দেবে, দেশে শিল্প-বিপ্লব আনবার স্বাধীনতা আনবে—এবং মোটামুটিভাবে দেশের স্বার্থে—দেশ-গঠনের কাজে কংগ্রেসের প্রোগ্রাম চালু হবে। ইতিহাসের দিক দিয়ে কংগ্রেসের এই কাজ শেষ না হতে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন অকাল আন্দোলনের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে কায়েম হবার পরেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করা সম্ভব—যখন জমি, কলকারখানা, ধনসম্পত্তি ইত্যাদি যাবতীয় উৎপাদনের ক্ষমতা একমাত্র শ্রমজীবীদের হাতে সমাজের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবার আন্দোলন শুরু হবে।

এতএব বেশির ভাগ বামপন্থীর মতেও ভাবতে দু'টি বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে এবং একটির পর অপরটি। এই দুটির মধ্যে কতটা সময় থাকবে—কত বছর বা কত যুগ সেটা অনিশ্চিত—কেউ বলতে পারে না। একটা হলো **স্বাধীনতা বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক** বিপ্লব আর অপরটি হলো **সমাজতন্ত্র বা মজুর-কৃষকরাজ**। এ দুটি বিপ্লব আলাদা এবং একটি শেষ করে তবে অন্যটিকে হাতে নিতে হবে।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মূল ভিত্তি বা ন্যূনতম দাবি কি কি?

১। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা।

২। সমগ্র ভারতের গণতান্ত্রিক ঐক্য—অর্থাৎ এক জাতি—এক দেশ—একতা।

৩। সমস্ত প্রকার জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের মুক্তি বা কৃষি বিপ্লব।

৪। দেশের শিল্পশক্তির মুক্তি বা শিল্প বিপ্লব এবং এরই উপর দেশ গঠনের কাজ আরম্ভ।

৫। মজুর ও কেরানী প্রভৃতি নিম্নমধ্যবিত্তদের নিম্নতম ন্যায়সঙ্গত জীবিকার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা।

৬। দেশে সমগ্রভাবে গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যবস্থা কায়েম করা।

৭। দেশীয় রাজ্যের আমূল উচ্ছেদ।

মোটামুটিভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই কয়টিই হলো প্রধান ভিত্তি। কংগ্রেস বারবার প্রস্তাব করে এই ক'টি ভিত্তিকে দেশের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল, উপরন্তু আরো

অনেক অনেক আশ্বাস দিয়েছিল যাতে সমাজতন্ত্রেরও গন্ধ পাওয়া যায়। সেকথা বাদ দিলেও কংগ্রেস যে উপরোক্ত কাজ কয়টি করবেই—করতে পারবেই এ ধারণা কংগ্রেসী বামপন্থী ও কমিউনিস্টদেরও আছে, কেননা পৃথিবীতে যেখানে এর আগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে—যেমন বিলেতে, ফরাসী দেশে, আমেরিকায়, সর্বত্র বুর্জোয়ারা উপরোক্ত প্রোগ্রাম চালু করেছে এবং এদেশের বুর্জোয়ারাও নিজেদের প্রয়োজনে এবং জনসাধারণের চাপে এগুলি করবে এবং করতে পারে এবং বামপন্থীরা চাপ দিয়ে করিয়ে নেবে ইত্যাদি। এগুলি করার পর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাজ শেষ হলো- তখন শুরু হবে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন, চাষীমজুরের রাজত্বের আন্দোলন—বিশ্ব বিপ্লবের আন্দোলন।

বিপ্লবী সাম্যবাদীদলের অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি থেকে পার্থক্য কোথায়?

আমরা যারা বিপ্লবী সাম্যবাদী তারা কিন্তু একথা বলিনি। আমরা কখনো স্বীকার করিনি যে এই দু'টি বিপ্লব আলাদা। আমরা বলেছি যে আজকের যুগে বিপ্লব একটাই এবং সেই বিপ্লবের নেতা কখনোই ধনীরা বা তাদের কোনো প্রতিষ্ঠান বা দল - কংগ্রেস বা লীগ নয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার যে সমস্ত কাজ আজ বাকি রয়েছে তা বুর্জোয়ারা অর্থাৎ ধনীরা শেষ করতে প্রস্তুত নয়—পারে না। পূর্ণ স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, কৃষি-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব প্রভৃতি কাজ একমাত্র মজুর কৃষকরাজেই সম্পন্ন হতে পারে। পৃথিবীতে এবং ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই আজ মানুষের বন্ধদ্বার খুলে দিতে পারে—এই বিপ্লবের পথেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অনেক অসমাপ্ত কাজ শেষ করা সম্ভব এবং তাকে অতিক্রম করে দেশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব। নতুবা বুর্জোয়াদের বা ধনীদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বজায় রাখলে বারে বারে হতাশ হতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত অনেক ভুল ভাঙবার পরে দেশের জনগণ একমাত্র নিজেদের হাতে সব ক্ষমতা দখল করবার বিপ্লব-- সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। অতএব কোনোকালেই ধনীদের সাথে অথবা ধনবাদের সাথে আপস করতে আমরা নিষেধ করেছি—ভারতের ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সবটার বিরুদ্ধেই আপসহীন সংগ্রাম চালাতে বলেছি--শ্রেণী সংগ্রামের নীতিতে। গঠনতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক সকল প্রকার ফাঁদ এড়িয়ে, সর্বশ্রেণীর জাতীয় ঐক্যের সহজ মোহ কাটিয়ে--স্বাধীনতা ও মজুর কৃষকরাজের জন্য আপসহীন বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়া ভারতের মুক্তি নেই একথা আমরা বার বার বলেছি।

কিন্তু কেন এবং প্রমাণ কি?

আজ যুগান্তকারী পরিবর্তনের চৌরাস্তায় এসে ভারত উপস্থিত। দূরতম পল্লীর লোকেরাও আজ বুঝেছে যে তাদের হয়ে আজ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেক কথা উঠেছে। আজ দেশের প্রধান খাদ্য রাজনীতি। আজই প্রথম রাজনীতির কঠিন কঠিন তত্ত্বগুলি আলোচনা শুরু হয়েছে এতদিন কেবল রং দেখিয়ে রাজনীতি চলেছিল -অর্থাৎ যারা সাদা তারা শত্রু, আর যারা কালো তারা মিত্র। আজ দেশবাসীর কাছে রাজনীতির তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সম্ভব এবং বিভিন্ন নীতির বিভিন্ন পথের যাচাই করা সম্ভব।

আজ নাকি দেশ স্বাধীন হয়েছে। হিন্দুস্থান পাকিস্তান দু'টি স্বাধীন দেশ বেরিয়ে আসছে পরাধীন ভারত থেকে। কংগ্রেস অবশ্য ক্ষমতা পেয়েছে খণ্ডিত ভারতে। এখন বিচার করে দেখতে হবে এই স্বাধীনতার অর্থ কি? একটি গাছকে যেমন তার ফল দিয়ে চেনা যায়—এই

স্বাধীনতার স্বরূপও বোঝবার একটি উপায় হলো তার ফল দিয়ে—অর্থাৎ আমরা এবারে বিচার করে দেখব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ন্যূনতম ভিত্তি বা প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যে ৭ দফা কাজের তালিকা রেখেছি তা হিন্দুস্থানে অথবা পাকিস্থানে কংগ্রেস বা লীগের দ্বারা কার্যকরী করা সম্ভব কি না। যদি সম্ভব হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে দেশে সত্যি স্বাধীনতা এসেছে—এবং কংগ্রেস ও লীগপন্থীরাই ঠিক এবং আমরা ভুল। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মানতে হবে অন্য সবাই ভুল এবং আমরাই ঠিক। অতএব আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের কোনো প্রকার ছেদ না টেনে আবার বিপ্লবের পথেই জনগণকে এগিয়ে যেতে হবে এবং কোনো প্রকার মোহ বা ফাঁদে পা দিলে চলবে না। একটি একটি করে উক্ত ৭ দফা কর্মতালিকার সম্ভাবনা সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা শুরু করব। স্বাধীনতা ও ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনাটি সবার শেষে আনব কেননা অন্যান্যগুলির বিচারের মধ্যেই প্রথম দু'টির বিচার নিহিত আছে।

কৃষি-বিপ্লব

ভারতবর্ষ আজও কৃষকের দেশ। শতকরা ৮০টা লোক জমির উপর নির্ভর করে আছে। ভারতের সমস্যা কৃষকের সমস্যা একথা বললে বেশি বলা হয় না। ভারতে ৭ লক্ষ গ্রামের সমস্যাই ভারতের সমস্যা। কৃষকের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি তা না বুঝলে ভারতবর্ষকেই বোঝা যাবে না। দেশগঠনের কোনো কাজে হাত দিতে গেলেই এই ভারি সমস্যায় হাত দিতে হবে। এই ৪০ কোটি লোকের সমস্যার কথা যখন ভাবা যায়—তখন এই লোকবলটাকে ভারতের বল হিসাবে না ধরে, অভিশাপ হিসাবে এদেশের শাসনকর্তারা আরোপ করে এসেছে। তাদের মতে এই অবাধ লোকবৃদ্ধিই সমস্ত দুর্দশার কারণ—অভাবের কারণ— তাই তারা লক্ষ লক্ষ লোককে দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে মরে যেতে দিয়েছে—লোক দেখানো আফশোষ ছাড়া সত্যিকার দুঃখ পায়নি—বরং রেহাই পেয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এত লোকের ঠাঁই নেই -সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আজ দেশের লোকগুলি অপ্রয়োজনীয়—ফালতু। তারা লাখে লাখে মরে গেলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঘা লাগে না। অথচ ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায়—এই অসংখ্য লোক আমাদের দায় না হয়ে সত্যিকারের বল ও শক্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে—দেশ গঠনের কাজে ওরাই হবে প্রধান সহায়—দেশগঠন হবে ওদেরই জন্য। এর জন্যও চাই স্বাধীনতা।

এই অপ্রয়োজনীয়তা বা লোকবহুলতার মানে কি এবং জন্ম কোথা থেকে?

প্রথমেই স্মরণ করুন সেদিনের কথা যেদিন ইংরেজরা আমাদের দেশে ব্যবসায় করতে আসে। ব্যবসায় করতে এসেছিল বটে কিন্তু এদেশে বিক্রয় করতে পারে এমন কোন সওদা বা পণ্য তাদের ছিল না। এদেশের রাজনীতিতে সেদিন যত অশান্তিই থাকুক না কেন, শিল্পসম্ভারে ভারত সেদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সবার অগ্রণী ছিল। এদেশের কাপড়, এদেশের সিল্ক তখন বিশ্বের বাজারে বিখ্যাত, এদেশের তৈরি সমুদ্র যান সবার চেয়ে ভাল। ইংরেজরা এদেশ থেকে লুটেপুটে জোচ্চুরি করে জিনিস নিয়ে ইয়োরোপের হাটে হাটে বিক্রি করত। ভারতের মাল যাতে বিলেতের বাজার দখল করতে না পারে সেজন্য নানা আইন পাস করেছিল ওদেশের সরকার। রূপো ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর ছাড়া ইংরেজের বিনিময় করবার কোনো সওদা ছিল

না। পৃথিবীর অন্যান্য বাজারে দাস-ব্যবসায় করে তারা এই পাথর রূপো সংগ্রহ করত। তা ছাড়া এদেশে কোনো শক্ত কেন্দ্রীয় রাজশক্তি না থাকার দরুন তারা বন্দরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে চালিয়ে যেত অবাধ লুট। এদেশের বেনেরা তখন একাজে ইংরেজকে করত সাহায্য। তারপর একদিন পলাশীর রণাঙ্গনে ইংরেজ এদেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিল। দেওয়ানির যুগে যে অকথ্য অত্যাচার ও অবাধ লুণ্ঠন করেছিল তার ইতিহাস আজ ইংরেজকেও লজ্জিত করে। সেই অবাধ লুণ্ঠনজনিত সঞ্চিত অর্থ থেকে বিলেতের যন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠে। স্টিম ইঞ্জিন, সুতাকল, ইত্যাদি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তখনই সম্ভব হয়। বিলেতের শিল্প-বিপ্লবের গোড়াকার অর্থ জুগিয়েছে, এই ভারত। ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করেছেন যে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যেই ইংরেজের প্রধান প্রধান আবিষ্কারগুলি কার্যকরী হয়। তদুপরি সেদিনকার শ্রমিকদের দৈনিক ১৬/১৭ ঘণ্টা খাটিয়ে ছাড়ত সেদিনকার ইংরেজ। যন্ত্র-শিল্প ও অবাধ শোষণের যোগে ইংরেজ ভারতের ও বিলেতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে এক যুগান্তর এনে দিল এবং বিলেতের কাপড়, বিলেতী জিনিস ভারতের বাজারে আসতে শুরু করল। বহু মেহনত—বহু অত্যাচার করে ভারতকে শিল্পে পরাজিত করতে হয়েছিল এবং ভারতের উপর একচ্ছত্র শাসন কায়েম করে ভারতের কুটির শিল্পকে ও ভারতের বৃত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। ইংরেজ শাসনের এই দ্বিতীয় স্তরে ভারতের শিল্পের ধ্বংস দেখতে পাই, এখন বুঝতে পারি কেন দেশটা পাড়াগেঁয়ে রয়ে গেল—এত আগে এগিয়ে গিয়েও আজ সবার পিছনে কেন।

তার পরবর্তীযুগে ইংরেজ বাড়তি মূলধন এদেশে চালান করে এদেশের সস্তা মজুর খাটিয়ে বেশি লাভ করতে শুরু করল। চা বাগান, পাটকল, রেল, কয়লাখনি দেশের সরকারকে মোটাসুদে টাকা ধার দিয়ে শোষণের সাম্রাজ্যবাদী কায়দা চালু করল। কাঁচা মালের চালান, তৈরি মালের একচেটিয়া বিক্রয়, সস্তা মজুর খাটিয়ে অতিরিক্ত লাভ, লগ্নী টাকায় মোটা সুদ, মোটা বেতনধারী রাজকর্মচারীর বেতন ও পেন্সন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খরচ তোলা প্রভৃতি নানা কায়দায় সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণরূপ প্রকাশ পেল। পৃথিবীর বাজারে ততদিনে জার্মান, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান হয়েছে—তাই তাদের (ইংরেজের) সহায় হিসাবে এদেশেও একদল ধনিক শ্রেণী তৈরি করতে লাগল এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলিকে শক্ত করতে লাগল—জনগণের বিদ্রোহ দমন করবার সহায় হিসাবে।

কৃষক-জীবনে এর পরিণাম কি?

প্রথমত মনে করুন, আমাদের দেশে যত জাত ছিল—কামার, কুমার, তাঁতি, লোহার, আগুরী, নাপিত, ধোপা, বামুন, কায়েত, বদ্যি, ছত্রী, ইত্যাদি—এদের প্রত্যেকেরই এক একটা বৃত্তি ছিল—অর্থাৎ সমাজের কোনো না কোনো উৎপাদন প্রণালীর সাথে তারা যুক্ত ছিল। আজকের মতো সবাই চাষী বা চাষ-নির্ভরশীল ছিল না। গ্রামজীবনে এই সব জাতের বৃত্তি ও জীবিকা নির্দিষ্ট ছিল। আর যারা চাষী তারাই একমাত্র চাষ করত— সবাই চাষ করত না বা চাষের উপর নির্ভর করত না।

ক্রমে ক্রমে অসংখ্য তাঁতির ভাত মেরে দাঁড়িয়ে গেল দেশী বিদেশী কাপড়ের কল—অসংখ্য কামার,লোহার ও আগুরীর ভাত মেরে দাঁড়িয়ে গেল বার্মিংহাম, শেফিল্ড আর টাটা বার্ন ইত্যাদির মতো কোম্পানি ; অসংখ্য চামারের কাজ কেড়ে নিল বাটা কোম্পানিরা, কুমারের কাজ কেড়ে নিল পটারি ওয়ার্কস, অসংখ্য ঢেঁকি মেরে দাঁড়াল ধানকল, অসংখ্য গুরুর ভাত মারল বর্তমান যুগের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, অনেক বদ্যির ব্যবসায় মাটি করে দাঁড়াল

এক একটা বিরাট বিরাট ঔষধাগার। কিন্তু খুব কম লোকই বৃত্তি হারিয়ে এই সব বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানে চাকুরি বা মজুরি পেল। দেশের শতকরা ৪০টা লোক হারিয়েছে তাদের সাবেক বৃত্তি বা জীবিকা কিন্তু আজ শতকরা ৫টার বেশি লোক ভারতের আধুনিক যন্ত্র-শিল্পে মজুর হিসাবে কাজ পায় নি।

এই লোকগুলি বৃত্তি হারিয়ে গেল কোথায়? তারা সব গিয়ে পড়ল জমির উপর। জমি ছাড়া তাদের দাঁড়াবার জায়গা আর রইল না। বন জঙ্গল কেটে সাফ হতে লাগল—ফলে বৃষ্টি তেমন হয় না। জমি ক্রমেই ভাগে কম পড়তে লাগল—ক্রমশ ছোট থেকে ছোট্ট হতে লাগল জমির আইল। তাতে চাষ ভাল হলো না—চাষে যেমন খরচ করতে হয়, সার দিতে হয়, জলসেচন করতে হয়, বদলা বা মুনিষ লাগাতে হয়, সে খরচা চাষী কুলোতে পারল না ; বলদ নেই, যথাসময়ে মজুর খাটাতে পারছে না, গোচরণ ভূমি নেই, গরু বলদের খাবার নেই—গরুর খাবারের অভাব ও মানুষের খাবারের অভাব সমান তালে বাড়তে লাগল। এদিকে পুকুরের সংস্কার নেই, নদী বালি ফেলে চাষের জমিকে পতিত করে দিয়ে যাচ্ছে—খাল যাচ্ছে শুকিয়ে, নৌকা চলাচল দুর্গম হয়ে উঠছে—কোনো সংস্কার নেই। এত অল্প জমিতে আয় নেই—দেনা পড়ে গেল। এদিকে একদল জমিদার সৃষ্টি করে চাষীর উপরে আর এক বোঝা চাপানো হয়েছে—ক্রমে দেনার দায়ে, খাজনার দায়ে জমি হস্তান্তরিত হতে লাগল প্রচুর, আর একদল ভূমিহীন নিঃস্ব লোক সৃষ্টি হলো—যারা কোনো কাজ না পেয়ে, না খেয়ে মহামারী আর দুর্ভিক্ষের খোরাক হলো। মহাজন বলে এক পরগাছার সৃষ্টি হলো—জমিদার তো আছেই। ফলে গ্রাম্যজীবনে একটা হাহাকার এসে উপস্থিত হলো—ম্যালেরিয়া এসে দেশকে দেশ দিল ডুবিয়ে—বিস্তর শ্রমশক্তি আজ অসুস্থের জন্য যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। ফসল আর তেমন ফলে না—আজ ভারতের খাদ্যে ভারতের চলে না—দুনিয়ার বাজারে ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়। শিল্প অনেক দিনই গিয়েছে—এবারে খাদ্যশস্যও গেল।

বুর্জোয়া-বিপ্লবে কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে থাকে এই আমরা ইতিহাসে দেখেছি—এবারে দেখলুম তার উল্টো। ভারতে ইংরেজ বুর্জোয়ার বিপ্লবে ও শাসনে চাষীর বন্ধন গেল বেড়ে, তার উৎপাদিকা শক্তি গেল গুঁড়িয়ে—গ্রাম্যজীবনের হলো সর্বনাশ।

প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে দেশের লোকসংখ্যা দিয়েছে বাড়িয়ে একথা সত্য। কিন্তু জীবনীশক্তি কমিয়ে তার পরিশোধ করেছে। সেকালের মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল ৮০ বৎসর আর আজকাল দাঁড়িয়েছে ২৫ বৎসর। কাজেই লোকের সংখ্যা বেশি হলেও মোট জাতীয়-জীবন বাড়েনি—কমে গেছে, শ্রমশক্তিও গেছে সেই অনুপাতে কমে। যারা আছে তারা আজকের এই সঙ্কীর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয়—তারা মহামারী ও দুর্ভিক্ষের অপেক্ষায় বসে আছে। যারা আছে তারা শ্রমশক্তি ব্যবহার করবার উপযুক্ত উপায় না পেয়ে উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে পারছে না—শ্রমের অপব্যয় হচ্ছে—ইউরোপ ও আমেরিকার একটি চাষী যে কাজ করতে পারে আমাদের দেশের ৭টি চাষীও সে কাজ করতে পারে না—সে উৎপাদনও ওঠাতে পারে না—কেননা তার না আছে মূলধন, না যন্ত্রপাতি, না যথেষ্ট জমি ও তার প্রয়োজনীয় জলসেচন ও সারের ব্যবস্থা ও বাজারের সুবিধা।

জাতীয় সরকার ও কৃষি-বিপ্লব

আজ হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে যে জাতীয় সরকার কায়েম হয়েছে বা যে স্বাধীনতা মিলেছে তা থেকে গ্রাম্যজীবনে কৃষকের জীবনে কোনো সামাজিক উন্নতি আশা করা যায় কি?

ধনতান্ত্রিক প্রথায় ভারতীয় নেতারা কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারে কি? কৃষকের মুক্তি আজ কি এই স্বাধীনতা থেকে মিলবে? মোট কথা কৃষি বিপ্লব বলতে যা বোঝায় তা এই থেকে সম্ভব কি? কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন বা বিপ্লব আনতে হলে চাই ঃ

১। অসংখ্য লোককে জমি ছাড়া অন্যান্য কাজে লাগাতে হবে।

যেখানে ভারতীয় চাষীর গড়ে আড়াই একর জমি জাপানে সেখানে (সেখানেও লোকসংখ্যা খুব বেশি) প্রতি চাষীর ভাগে সাড়ে ১৭ একর জমি রয়েছে। অথচ এ সত্ত্বেও জাপান আমাদের চেয়ে বিঘা প্রতি ৮ গুণ বেশি ফসল ফলায়। উন্নত প্রণালীতে চাষ করতে পারে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। কলের লাঙল—ট্রাকটর, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রচুর জলসেচের ব্যবস্থা ও রাসায়নিক সার ইত্যাদির প্রচলন করতে হবে আজ চাষের কাজে, তাহলেই অনেক ফালতু লোক চাষ থেকে সরিয়ে নিলেও চাষের উন্নতি হবে—খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে—এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথেষ্ট তৈরি হবে।

২। সঙ্গে সঙ্গে দেশে কলকারখানা ইত্যাদি শিল্প প্রচুর পরিমাণে না গড়ে ওঠে, তবে চাষ থেকে সরিয়ে আনা লোকদের উপযুক্ত কাজ দেওয়া যাবে না অর্থাৎ তারা বেকার হয়ে পথে পথে মারা যাবে। কাজেই কাজেই কৃষি বিপ্লবের সাথে শিল্প বিপ্লব হওয়া চাই। ট্রাক্টর ইত্যাদি তৈরির কারখানা ও বিদ্যুৎ শিল্প গ্রাম দেশে চালু করতে হলেও দেশে শিল্প বিপ্লব চাই। শিল্পকে বাদ দিয়ে কৃষি-বিপ্লব ভাবা যায় না। একটার সাথে আর একটার অবশ্যম্ভাবী যোগাযোগ রয়েছে। কৃষিজাত কাঁচামাল শিল্পে ব্যবহার না হতে পারলে চাষী তা তৈরি করবেই বা কবরে কি? অতএব চাষীর অন্যান্য সমস্যার আলোচনার পূর্বেই এক্ষুনি দেশে শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা কি—তার আলোচনা করা দরকার হয়েছে। পরে আবার চাষীর সমস্যায় ফিরে আসা যাবে

শিল্প-বিপ্লব (Industrialisation)

দেশে শিল্প বিপ্লবের একটা স্বপ্ন জেগেছে। জহরলালের জাতীয় পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে টাটা বিড়লা প্ল্যান ইত্যাদি নানা প্রকারের শিল্প বিপ্লবের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। ইংরেজের জুলুম আর চলবে না—দেশে এবার যা ইচ্ছে করবার স্বাধীনতা মিলেছে বলে সাধারণ লোক উৎফুল্ল। দেখা যাক এই শিল্প বিপ্লব সত্যি কতটুকু কার্যকরী হবে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। বলা বাহুল্য বর্তমান পরিকল্পনাকারীরা সকলেই ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই শিল্প বিপ্লব আনবার স্বপ্ন দেখছে। অর্থাৎ বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বাধীনতায় যেমন ইউরোপ ও আমেরিকা শিল্প প্রধান দেশ হয়েছে ভারতবর্ষও তেমনি শিল্প-বাণিজ্যে ভরে উঠবে। দেখা যাক এই প্রকার চিন্তার পেছনে কতটা যুক্তি আছে।

সমগ্রভাবে পৃথিবীর ধনতন্ত্রের অবস্থা কি?

ধনতন্ত্র নির্ভর করে প্রধানত দু'টি জিনিসের উপর। এক—মূলধনের ক্রমাগত বৃদ্ধি, আর দুই—এ বর্ধমান বাজার। প্রথমটি নির্ভর করে লাভের উপর অর্থাৎ মূলধন খাটিয়ে জনসাধারণের শোষণের ওপর, দ্বিতীয়টি নির্ভর করে জনসাধারণের আয়ের উপর অর্থাৎ জনসাধারণ, যারা বাজারের প্রধান ক্রেতা—তাদের আয় না বাড়লে তৈরি মাল শেষ পর্যন্ত বিকোয় না এবং মূলধনীদের লাভ উসুল হয় না। ধনতন্ত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকার জন্য ধনীদের উৎপাদন প্রণালী ক্রমাগত উন্নত করে যেতে হয়—অর্থাৎ যন্ত্রপাতির নিত্য নতুন উন্নতি করতে হয়—

যার ফলে মোট উৎপাদন যায় বেড়ে। এই অতিরিক্ত মাল কাটতির জন্য ধনীদের নিত্য নতুন বাজার অন্বেষণ করে বেড়াতে হয়—যার ফলে দাঁড়ায় যুদ্ধ।

মোট কথা দেখতে হবে ধনতন্ত্রের নিয়মে প্রথম কারণে জনসাধারণ—যারা উৎপাদন প্রণালীতে মজুর ও চাষী হিসাবে কাজ করে তারা যায় গরিব হয়ে—দ্বিতীয় কারণের জন্য অর্থাৎ তৈরি মাল কাটতি হবার জন্য তাদের আয় বাড়া দরকার। এই দুই পরস্পর বিরোধী পরিণাম হলো ধনতন্ত্রের প্রধান সমস্যা। এই দুই সমস্যা থেকেই ধনতন্ত্রের আরো হাজারো রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা দূর করবার জন্য ধনতন্ত্রীদের হিমসিম খেতে হয়—বিরাট বিরাট যুদ্ধ বিগ্রহ করেও কোনো সত্যিকার সমাধান হয় না—সাময়িকভাবে নিজের অঙ্গচ্ছেদ করে বেঁচে উঠতে পাবে মাত্র কিন্তু পরক্ষণেই আবার ততোধিক সঙ্কটজনক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দেশ বিদেশে পৃথিবীর ধনপতিরা আজ যে শিল্প-বাণিজ্যের অবাধ প্রসারের স্বপ্ন দেখছে তার মূল উৎস হলো তাদের মূলধন বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা, আবার পৃথিবীর জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র অর্থাৎ ক্রয়শক্তির অভাব দেখে তাদের প্রাণ ভয়ে আঁৎকে উঠছে। বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি, আধুনিক সংগঠন ও শিক্ষিত মজুরের সহযোগিতায় আজকের দুনিয়ার উৎপাদিকা শক্তি যে বিরাট ক্ষমতা অর্জন করেছে তার তৈরি সব মালই বিক্রি না হলে তাদের লাভ সব পণ্ড হয়ে মূলধন যাবে বসে। এই হলো ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান সমস্যা এবং এইখানেই তার সীমা। এই সীমানার শেষ প্রান্তে এসে আজ পৃথিবীর ধনতন্ত্র উপস্থিত—কখনো সঙ্কট, কখনো যুদ্ধ, সঙ্কট থেকে যুদ্ধ, যুদ্ধ থেকে সঙ্কট, এই দুই সমুদ্রে ক্রমাগত হাবুডুবু খাচ্ছে, ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ছে।

এই যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড, জার্মানী, ফরাসী, ইটালী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি শিল্প প্রধান দেশগুলির তৈরি মাল পৃথিবীর বাজারে সবই বিক্রি হয়ে উঠত না কেননা পৃথিবীর জনসাধারণ দরিদ্র হয়ে পড়েছে—এই ছিল প্রধান সমস্যা। ১৯৩০ সাল থেকে যে মন্দা বা অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয় তা থেকে স্বাভাবিকভাবে যখন কিছুতেই উদ্ধার পাবার আর কোনো উপায় রইল না তখন এরা যুদ্ধের জন্য আয়োজন করতে লাগল, কেননা স্বেচ্ছায় কেউ নিজেদের গুটিয়ে বাজার থেকে সরে যাবে না। তখন চারিদিকে লেগে গেল যুদ্ধোদ্যম। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন তৈরি করার দরুন ধনীদের মূলধন ও যন্ত্রপাতি কাজ পেল, আবার যুদ্ধের ফলে কয়েকটি দেশের শিল্পশক্তি ও বাণিজ্য গেল চূর্ণ হয়ে। আগ্নেয়-বোমা ও বিস্ফোরণের লক্ষ্য হলো দেশের শিল্প-প্রধান শহরগুলি—শিল্পকে ধ্বংস করাই যুদ্ধের লক্ষ্য, শিল্পকে সঙ্কুচিত করাই ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য, মানুষ মারা নয়। মানুষ বেঁচে থাকুক নইলে বিজেতা দেশের মাল কিনবে কে? যেমন ভারতবাসী বেঁচে থাকুক, কোটি কোটি লোকের আরো জন্ম দিক তাতে দেশবিদেশের মালের চাহিদা থাকবে কিন্তু ভারতবাসীরা উৎপাদনকারী হিসাবে শিল্প বাণিজ্য নিয়ে যেন তাদের সাথে প্রতিযোগিতা না করে এই হলো ধনতন্ত্রীদের ইচ্ছা।

এই যুদ্ধের পর দেখা গেল জার্মানী, জাপান প্রভৃতি পক্ষের শিল্পপতি গেছে গুঁড়িয়ে, ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্যও অনেক ধসে গেছে, রাশিয়ারও প্রায় সেই অবস্থা। সমস্ত ইউরোপের শিল্পশক্তি আজ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, একমাত্র আমেরিকা তার শিল্পশক্তিকে অক্ষত রেখেছে এবং বিস্ময়করভাবে বাড়িয়ে নিয়েছে। আণবিক শক্তিকে এখনো উৎপাদনের কাজে লাগায়নি। যদি লাগাতে পারে তবে এক আমেরিকার শিল্পজাত মাল দিয়েই পৃথিবীর বাজারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হতে পারে কেননা এদিকে যুদ্ধে সর্বস্বান্ত পৃথিবীবাসীদের আয়ও গেছে কমে। ধনতন্ত্রের সীমানাতে আণবিক শক্তি কখনো উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারে না কেননা আজ

যদি আমেরিকা আণবিক শক্তি কাজে লাগাতে চায় তবে তাকে প্রথমেই ধ্বংস করতে হবে তার প্রধান প্রধান শিল্প কেন্দ্রগুলি যেগুলিতে কয়লা তেল আর বিদ্যুৎ দিয়ে উৎপাদনের কাজ চলেছে। মোটকথা শিল্পশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করা তো দূরের কথা শিল্পশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার নামে নষ্ট করা, খর্ব করা, সঙ্কুচিত করাই হলো আজকের যুগের ধনতন্ত্রের প্রধান কাজ। এরই জন্য বলা হয় ধনতন্ত্র — যার বিশ্বরূপ হল সাম্রাজ্যবাদ, আজ সাম্রাজ্যবাদ শেষ সীমায় উপস্থিত, মৃত্যুর দিন তার ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যেই আমেরিকা তার বিরাট শিল্পশক্তি নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গেছে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপ সঙ্কটজনক তাতে তার তৈরি মাল সব কাটতি হয়ে যাবে এ আশা তার ক্রমেই কমে যাচ্ছে। যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করার কারখানাগুলি এখন সাধারণ নাগরিক প্রয়োজনে জিনিস তৈরি করার কারখানায় পরিণত করার ব্যবস্থা হচ্ছে, তদুপরি জাপানের শিল্প যেমন করে চালু করলে তাদের শ্রম শোষণ করা যায় তারও ব্যবস্থা হচ্ছে এবং এসব মিলে আমেরিকার শিল্প বাণিজ্যে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট উপস্থিত হতে যাচ্ছে। ইউরোপ, ইংলণ্ড, চীন মধ্য প্রাচ্য সর্বত্র টাকা পয়সার সাহায্য করতে অগ্রণী হয়েছে এইজন্য যে, ঐ টাকা দিয়ে তারা আমেরিকার মাল কিনবে এবং পৃথিবীতে পুনর্গঠন করার কাজ যদি দ্রুত চালু না হয় তবে যে সঙ্কট ও বিপ্লব দেখা দেবে তাকে একা আমেরিকার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। যাতে ইউরোপ ও ইংলণ্ড রাশিয়ার দিকে ঢলে না পড়ে তার জন্যও আমেরিকাকে অগ্রণী হয়ে ইউরোপকে সাহায্য করতে হবে - তারই জন্য বর্তমান মার্শাল প্ল্যান। মোটকথা আগামী অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমেরিকার আজ রাত্রিদিন ঘুম নেই এবং দেশের ভিতরও অর্থনৈতিক রাশ টেনে ধরবার জন্য তার নিজের শ্রমিক শ্রেণীর উপর জুলুম চালাতে চাচ্ছে, ফলে বিরাট বিরাট ধর্মঘট সৃষ্টি হচ্ছে, মোটকথা বিশ্ব ধনতন্ত্রের নেতা ও একমাত্র রক্ষাকর্তা আমেরিকা প্রচুর মূলধন ও উৎপাদিকা শক্তির মালিক হয়েও দুর্লঙ্ঘ্য বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। যারা মনে করত যে একমাত্র আমেরিকাই পৃথিবীর ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তারা এবারে বিস্ময়কর ঘটনা দেখবার জন্য প্রস্তুত হোন। ধনতন্ত্রের ভিতরকার অর্থনৈতিক সঙ্কট আণবিক বোমার সাহায্যে চূর্ণ করা যায় না। যদিও এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাবার জন্য, আর একটা যুদ্ধ করবার জন্য আমেরিকা প্রস্তুত হতে চাইবে কিন্তু আরও একটা যুদ্ধ সহজ নয় এবং যুদ্ধের ফলে রাশিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে ধনতন্ত্রের ভিতরকার অর্থনৈতিক সঙ্কট বাড়বে বই কমবে না।

পৃথিবীর ধনতন্ত্রের এই পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে ভারতের পক্ষে কখনোই নিজের ধনতন্ত্র বাড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। পৃথিবী আজ একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। নিউইয়র্কের বাজারে ও লণ্ডনের বাজারে সঙ্কট দেখা দিলে কলকাতা বোম্বাই এর বাজারেও সঙ্কট দেখা দিতে বাধ্য এবং তার বেশির ভাগ ধাক্কাটা পিছিয়ে পড়া দেশগুলিই পেয়ে থাকে কেননা সবাই পিছিয়ে পড়া জাতের উপর দিয়ে বেঁচে যেতে চায়।

ভারতীয় ধনতন্ত্রের সম্ভাবনা

এ হেন যুগে—অর্থাৎ ধনতন্ত্রের এই গতায়ু দশায় ভারতীয় ধনীদের স্বপ্ন যে, তারা ধনতন্ত্রের মধ্য দিয়েই দেশটাকে কলকারখানায় ভরে দিয়ে একটা শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করবে। সাধারণ লোকেরও এই ধারণা, বুঝিবা এই পথেই একদিন আমরা আমেরিকার মতো শিল্প-প্রধান দেশ হয়ে উঠতে পারি। এবারে নিচে থেকে--অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতির ত্রিসীমানা থেকেই আমরা ভারতের শিল্প-বিপ্লবের ভবিষ্যৎ দেখতে চাই।

এখানেও সেই একই দিক থেকে আমরা ধনতন্ত্রের শক্তি বিচার করব, অর্থাৎ দেখব দেশীয় ধনীদের মূলধন ও তার ক্রমাগত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায় এবং এদেশের বাজার কতটা প্রসার লাভ করতে পারে।

ভারতে মূলধনের সমস্যা

বোম্বাই প্ল্যান কায়েম করতে গেলে যে মূলধন লাগে—অর্থাৎ বাইরে থেকে যন্ত্রপাতি আনবার টাকা, দেশে কলকারখানা বসাবার টাকা, মজুর খাটাবার টাকা ও কাঁচামাল কেনবার টাকা, এত টাকা কোথা থেকে আসবে সেকথা বলতে গিয়ে টাটা বিড়লারা বোম্বাই প্ল্যানে দেখিয়েছেন যে সরকারকে সে টাকা জোগাতে হবে, কেননা অত টাকা দেশে নেই। সে কেবল চাট্টিখানি টাকার দরকার নয়। এত টাকা সত্যি দেশে নেই। তাই তাঁরা বলেছেন—বিলেতে স্ট্যার্লিং ব্যালেন্স বাবদ যে টাকাটা আছে তাতেও কুলোবে না, সরকারকে বিদেশ থেকে ধার করতে হবে। যদি ইংরেজ সে টাকা ধার না দেয়, তবে আমেরিকার কাছ থেকে নিতে হবে। দেশের লোকের কাছে ধার তুলে এবং ট্যাক্স বাড়িয়েও কিছু টাকা তোলা যায়।

আর একটা জিনিসও লক্ষ্য রাখতে হবে আজ যা কিছুই আমরা তৈরি করি না কেন পৃথিবীর বাজারের তুলনায় তার তৈরি খরচ অত্যন্ত বেশি হলে চলবে না। চাষের জিনিসই হোক আর শিল্পজাত জিনিসই হোক পৃথিবীর প্রতিযোগিতামূলক দরের মধ্যে তাকে রাখা চাই। অর্থাৎ শিল্পপ্রধান দেশগুলির সাথে আমাদের ক্ষমতা তোলে আনা চাই অন্তত কাছাকাছি থাকা চাই, নইলে অন্য দেশের মাল চিরকাল শুল্কের দেয়াল তুলে রোখা যাবে না। কারণ তাতে যা দাম পড়বে তা ভারতের বাজারেও বিক্রি হতে চাইবে না। ফলে শিল্প বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেবে, শিল্পের প্রসার বন্ধ হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে ভারতীয় ক্রেতারা দুনিয়ার সব চেয়ে দরিদ্র ক্রেতা। উন্নত দেশগুলির উৎপাদন প্রণালীতে এমন উন্নতি এনেছে যে দেশের এই দরিদ্র জনতার কাছে তারা সস্তা দরের মাল উপস্থিত করতে পারে। যদি ভারতীয় ধনপতিরা ভারতীয় বাজার উপেক্ষা করে এশিয়া বা মধ্য প্রাচ্যে তাদের তৈরি মাল কাটতির চেষ্টা করে যেমন আজই তা শুরু হয়েছে, তবে তাদের পৃথিবীর প্রতিযোগিতার সাথে সমানে লড়তেই হবে। অতএব যে কোনো দিক দিয়েই দেখতে যাই না কেন, যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলি কারখানা বসালেই চলবে না, এমন আধুনিক কলকারখানা বসাতে হবে এবং উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য আধুনিক সংগঠন ও তার অভিজ্ঞতা দেখাতে হবে যাতে বিশ্বের প্রতিযোগিতা তারা সহ্য করেও দাঁড়াতে পারে। এর জন্য চাই প্রচুর টাকা প্রচুর মূলধন, নইলে অতি আধুনিক কলকারখানা বসানো সম্ভব নয়।

এদেশে ইতিমধ্যে যে সমস্ত কাপড়ের কল, কাঁচকল, চিনিকল, লোহার কারখানা তৈরি হয়েছে তাও আজকের যুগে সেকেলে। এমন কি ইংলণ্ডের কারখানাগুলিও জার্মানী, রাশিয়া বা আমেরিকার তুলনায় সেকেলে, ইংলণ্ডেও আর একটা আধুনিক শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নইলে তার পুরানো কলকব্জা নিয়ে আমেরিকার সাথে কিছুই করে উঠতে পারবে না। তাছাড়া যুদ্ধের সময় ভারতের যে কয়টি কারখানা ছিল, সেগুলির অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য প্রায় সব ক্ষয়ে গেছে। সেগুলির আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন চাই। এর জন্যও চাই প্রচুর মূলধন।

কৃষিজাত কাঁচামাল বাড়াতে এবং খাদ্যদ্রব্য বাড়াতে যে কৃষি বিপ্লব করা দরকার—এবং যা না হলে শিল্প-বিপ্লবও সম্ভব নয় তার জন্য চাই প্রচুর চাষের যন্ত্রপাতি, নদী নালার উপর

আধুনিক বাঁধ, বিদ্যুৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠান, কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এবং তারও জন্য চাই প্রচুর মূলধন কেননা এই মূলধন চাষীর হাতে নেই।

দেশ স্বাধীন হবার জন্য এবং এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চাই আত্মরক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা অর্থাৎ যন্ত্রচালিত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও তদনুরূপ শিল্প (যুদ্ধাস্ত্র ও মূল শিল্প) ও যানবাহন ব্যবস্থা -তার জন্য চাই প্রচুর মূলধন। একটির জায়গায় দু'টি দেশ হবার দরুন তাতে খরচ ডবল হলো।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মামুলি জিনিসগুলি চালু করতে হলেও কম মূলধনের দরকার নয়। কেননা এগুলি না হলেও শেষ পর্যন্ত দেশগঠনের কাজে বিরাট অন্তরায় দেখা দেয়।

এখন কথা হচ্ছে এই যে এত মূলধন আসবে কোথা থেকে? দুটি মাত্র রাস্তা আছে—এক, ট্যাক্স বাড়ানো, দুই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা—যাদের হাতে প্রচুর টাকা আছে এবং সুদে খাটাতে চায় বা লাভের অংশ নিতে চায় তাদের কাছ থেকে ধার করা। কিন্তু ভারতবাসীদের ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা শেষ হয়ে আসছে, আর ট্যাক্স বাড়ালে তাদের ক্রয়শক্তি যাবে একেবারে কমে যার ফলে দেশে বাণিজ্য চলবে না। কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যথা--ইংলণ্ড ও আমেরিকা, এদেশে তাদের নিজেদেরই মতো শক্তিশালী ধনতন্ত্রী শিল্প বাণিজ্য গড়ে উঠুক এ হতে দিতে চাইবে না। যদি তাই চাইত তবে জাপান, জার্মানী বা ইউরোপকে ধ্বংস করত না। নিজেদেরই টাকা ও যন্ত্রপাতি দিয়ে তারা আর একটা নয়া শত্রু তৈরি করবে যাকে আর একটা বিপদজনক যুদ্ধ দিয়ে ধ্বংস করতে হবে এমন আত্মঘাতী পথ তারা কিছুতেই নিতে পারে না। নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাই তাদের দায়। তারা আরো একটা শিল্পপ্রধান দেশ তৈরি করে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র আরো বাড়িয়ে দেবে এমন বোকা তারা নয়।

এদেশের ধনপতিরাও দেখছে আজ আর আমেরিকা বা ইউরোপের সাথে প্রতিযোগিতা করার সাধ্য নেই, তাই সহযোগিতা করে যতটা সম্ভব লাভের অংশ রাখা যায়, সেই চেষ্টা করাই একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ বলে মেনে নিয়েছে। অতএব দেখতে পাই এদেশের প্রধান প্রধান শিল্পপতিরা আজ আর শিল্পের কথাই করে না। বাণিজ্যের তালে, এজেন্সীর সন্ধানে পৃথিবীর বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধনতান্ত্রিক উপায়ে ভারতে শিল্প প্রসারের অবাধ সম্ভাবনা নেই বলেই আজ ভারত খণ্ড বিখণ্ড হতে চলেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় একচেটিয়া ব্যবসা করে কিছু লাভ বজায় রাখা আজকের ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান ধনীদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য। ধনতন্ত্রের উন্নতি পথে ছোট ছোট দেশ এক হয়ে যেত, বিকেন্দ্রীভূত জাত এক জাতিতে পরিণত হতো (যেমন জার্মানী, ইটালী, আমেরিকা) —কিন্তু আজ ধনতন্ত্রের অবনতি পথে কেন্দ্রীভূত দেশগুলি টুকরো টুকরো হতে চাইছে যেমন দু'শ বছরের একচেটিয়া কেন্দ্রীভূত শাসনের শেষ হতে না হতেই ভারত বিভক্ত হতে চলেছে। এর পিছনেও রয়েছে ধনতান্ত্রিক শিল্পোন্নতির অবসান।

লক্ষ্য করবার বিষয় আজ টাটা, বিড়লা, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পপতিরা বিদেশের মর্গ্যান, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল বোর্ড, ন্যাফিল্ড প্রভৃতি বিরাট বিরাট রাক্ষুসে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এজেন্সী নিয়েছে, এবং ওদের তৈরি মাল এদেশের কারখানায় সংযুক্ত করে (assemble) দেশী জিনিস বলে কংগ্রেস পতাকা উড়িয়ে বাজারে চালু করছে। শিল্প-বিপ্লবের স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে সহজ বাণিজ্যের দিকে এই ঝোঁকটা লক্ষ্য করবার বিষয়। অন্তর্বর্তী সরকার কয়েকটা গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপন করলেও সে গবেষণা কার্যকরী করবার মত সামর্থ্য ধনতন্ত্রের আজ আর নেই। গবেষণা চুলোয় যাক -পৃথিবীতে আজ যে গবেষণা হয়ে গেছে-- তারই ফলস্বরূপ দেশে ইস্পাতের কারখানা, বিদ্যুৎশিল্প, মোটরের কারখানা-- মোটকথা শিল্প

বাড়ানো হচ্ছে কই? বিজ্ঞানের গবেষণা এক্ষেত্রে লোক ভোলানো বাহাদুরী মাত্র। কোনো একটা দেশ শিল্প-প্রধান হলো কিনা তার প্রমাণ হয় এই দেখে যে সেদেশে কল তৈরি করবার কারখানা তৈরি হয়েছে কিনা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আজ আমাদের দেশে যে সামান্য কারখানা দেখতে পাই সেগুলি মূল শিল্প নয়। দেশে আবোল তাবোল কিছুটা কারখানা তৈরি হয়েছে—দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির কারখানা কিছু হয়েছে, কিন্তু মূল শিল্পের ভিৎ তৈরি হয়নি। এ সমস্ত কলকারখানার মূল কলঘর আজও বিদেশে। শিল্পকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা তাই আজ হাস্যকর। দেশের প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন, মোটর, এসিড প্রভৃতির অর্ডার বিদেশে দিয়ে এদেশের গবেষণাগারে আণবিক শক্তির রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা হাস্যকর—যেমন হাস্যকর দেশে কালচার আন্দোলনের, যে দেশে শতকরা ৯০টা লোক নিরক্ষর।

আরো একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে অন্তর্বর্তী সরকার বিদেশ থেকে (বিশেষ করে আমেরিকা থেকে) মাল আনবার জন্য যতটা ডলার লাইসেন্স অনুমোদন করেছিল, তাতে দেখা যায় এই অনুমতির সুযোগ নিয়ে প্রায় সব ডলার দিয়েই এমন সব জিনিস আনার ব্যবস্থা করেছে এদেশের ধনপতিরা ও ব্যবসায়ীরা, যেগুলিতে দেশের কোনো শিল্পই বাড়ে না, বরং যা আছে তার ধ্বংস হয়। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, পেন্সিল, চিরুনী, কলম, কাপড় সিল্ক, মোটরগাড়ি, এসেন্স, টয়লেট দ্রব্য ইত্যাদিতেই লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় হয়ে গেছে। মূল শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির অর্ডার সামান্যই আছে। এ থেকেই বোঝা যায় এদেশের ধনপতিদের লক্ষ্য কোন দিকে। অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্যই এই মারাত্মক লক্ষণ লক্ষ্য করেছে এবং আমদানির উপর খবরদারী করবার হুঁসিয়ারী দিয়েছে, তথাপি শেষ পর্যন্ত এই বাণিজ্যের লোভকে দমন করবার ক্ষমতা তার থাকবে না। অবস্থার চাপে তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে যে বিদেশের মাল এদেশে অবাধ প্রবেশের অধিকার পাবেই।

বিদেশী মালের অবাধ প্রবেশ অধিকার এদেশে—কি হিন্দুস্থানে, কি পাকিস্তানে থাকবেই, তার কারণ দেশীয় ধনতন্ত্রের ভিতরের ও বাইরের দুর্বলতা। মূলধনের প্রয়োজনে, বিশ্বের বাজারে সুবিধার জন্য, সস্তায় তাড়াতাড়ি পয়সা করার লোভে, যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, বিপ্লব রুখবার প্রয়োজনে, ভারতীয় ধনতন্ত্র আজ সর্বপ্রকারে পরমুখাপেক্ষী—অত্যন্ত দুর্বল। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সাথে লড়বার ক্ষমতা তার নেই, তাই তাদের সহযোগী হিসাবে যতদিন পারে বেঁচে থাকা ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই।

মূলধন বিদেশীরা দেবে—এই শর্তে যে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য তাদের সাথে টেক্কা দিতে চাইবে না—ভারতীয় বৈদেশিক নীতি অ্যাংলো আমেরিকান বৈদেশিক নীতির অনুচর হয়ে চলবে। সেই সব শিল্প গড়বার হুকুম মিলবে এবং তার জন্য অর্থও মিলবে যেগুলি সাম্রাজ্যবাদী শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না। এই হলো বর্তমান রাষ্ট্র পরিবর্তনের—বর্তমান তথাকথিত স্বাধীনতার ভিতরকার শর্ত বা ভিত্তি। এই ভিত্তিতে ভারতে কখনো শিল্প-বিপ্লব হবে না এবং অনেক ছোটখাটো শিল্প—ছোটখাটো ব্যাঙ্ক—কুটির-শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। বেকার সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।

ভারতে ধনতন্ত্রের বাজার

পূর্বেই বলেছি ধনতন্ত্রের প্রথম ভিত্ হলো মূলধনের ক্রমাগত বৃদ্ধি আর দ্বিতীয় শর্ত হলো বাজার বৃদ্ধি।

ভারতীয় বাজারের ' ন ত্রে ' ' লো ৭ লক্ষ গ্রামের ৩৮ কোটি লোক। এই বিরাট লোক সংখ্যার আয় জন প্রতি এক টাকা বাড়ে, ও ৩৮ কোটি টাকার মতো বেড়ে যেতে পারে। ভারতীয় জনসাধারণের আয় যাতে বাড়ে ত ' জন্য ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদীরা কম ভাবে না। নানা তুক্ তাক্ করবার চেষ্টা করে থাকে— চাষের আয় বাড়াতে চায়—এদিক সেদিক করে যাতে দু'পয়সা বাড়তি আয় হয়, তার জন্য কুটির শিল্প হাতের কাজ ইত্যাদির পথ দেখাতে চায়, কৃষি ঋণ ও মাঝে মাঝে জলসেচের ব্যবস্থা করে দিতে চায়। মোট কথা এই অগণিত মানুষগুলিকে মেরে ফেললে তাদের চলে না—এরা চাষ করুক, উৎপাদন বাড়াক, আয় বাড়াক এই সদিচ্ছার পেছনেও যন্ত্রশিল্পজাত জিনিস বিক্রয়ের বাজারের উৎসাহ রয়েছে। ভারতের বাজার বাড়াবার একমাত্র উপায় হলো ভারতবাসীর আয় বাড়ানো। এই আয় কল্পিত শিল্প-বিপ্লবের বাজার জোগাতে না পারলে সমস্ত শিল্পই ধ্বংস হয়ে যাবে, শিল্পের প্রসার তো দূরের কথা। অতএব লোকের আয়—জনসাধারণের আয় বাড়াবার রাস্তা কি?

১। ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া।
২। খাজনা কমিয়ে দেওয়া বা উঠিয়ে দেওয়া।
৩। মজুরি বাড়ানো, বেতন বাড়ানো।
৪। ঋণ মকুব করে দেওয়া এবং নামমাত্র সুদে টাকা ধারের ব্যবস্থা করা।
৫। কুটির-শিল্প করে বাজে আয় বাড়ানো।
৬। চাষজাত জিনিসের উপযুক্ত দর পাওয়া।
৭। শিল্পজাত জিনিস উপযুক্ত ও সহজ দরে পাওয়া।
৮। বেকার সমস্যা দূর করা।
৯। ভূমিহীন চাষী ও বৃত্তিহীন লোকদের উপযুক্ত কাজের ও আয়ের ব্যবস্থা করা।

এ কযটি কাজ করতে পারলেই জনসাধারণের আয় বেড়ে যাবে এবং তাদের কেনবার ক্ষমতা বেড়ে যাবার দরুন দেশে শিল্পও বেড়ে যাবে—বাণিজ্যও বেড়ে যাবে। এগুলি দেখতে যত সহজ, কাজে তত সহজ নয়। এবং এত লোকে এতবার এসব কথা বলেছে যে, শুনে শুনে মনে হয় ওগুলি বুঝি স্বরাজ পেলেই তক্ষুনি করে দেওয়া সম্ভব। এক্ষণে আমরা এগুলির একটি একটি করে বিচার করে দেখব।

ট্যাক্স কখনও কমতে পারে কি?

ট্যাক্স কমলে লোকের আয় বাড়বে একথা সবাই জানে—অথচ আমরা দেখছি ট্যাক্স দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এমন কোনো জিনিস নেই, এমন কোনো কাজ নেই যাতে আজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স পড়েনি (এমন কি চুরিতেও পুলিশকে বা অফিসারকে আজকাল রীতিমত ট্যাক্স (!) দিতে হয়)। শাসনকর্তাদের ও মন্ত্রীদের প্রধান কাজই হলো আজকাল ট্যাক্স আর কিসে বসাতে পারে এবং কত বাড়াতে পারে সে চেষ্টা করা।

'স্বাধীন' হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের কর্ণধারদের এই ট্যাক্সের মাত্রা আরো বাড়াতে হবে। তার লক্ষণ এখনই দেখতে পাওয়া যায়। দেশ গঠনের জন্য টাকা চাই, শিল্প গড়বার জন্য টাকা চাই, শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য টাকা চাই, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আধুনিক সৈন্যসম্ভার, দুর্গ, অস্ত্রাগার প্রভৃতি গড়বার জন্য প্রচুর টাকা চাই, সরকারের কলেবর বড়াতে হবে তার জন্য টাকা চাই, চাষের জন্য জলসেচের ও সারের কারখানার ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য টাকা চাই, বিদেশে রাষ্ট্রদূত বসাবার টাকা চাই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতে হবে তার জন্য টাকা চাই,

পেন্সন জুগিয়ে যেতে হবে তাতে চাই টাকা—এমন কি শেষ পর্যন্ত জমিদারী প্রথা তুলে দেবার জন্য যে খেসারৎ দিতে হবে তার জন্যও টাকা চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এত টাকা যোগাতে রাষ্ট্রের প্রধান আয় অর্থাৎ ট্যাক্স অন্তত চার ডবল করতে হবে। অতএব ট্যাক্স কমবে না—কেবলই বাড়তে থাকবে-- কি হিন্দুস্থানে, কি পাকিস্তানে। অতএব এদিক থেকে জনসাধারণের কোনো রিলিফ্ মিলবে না—আয় বাড়বে না। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্র হবার ফলে খরচ আরো ডবল হলো—কিন্তু আয় ডবল হলো না—তাতে লোকের দুর্দশা আরো বাড়ল মাত্র। তাছাড়া দাঙ্গা, যুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদি দমন করার প্রয়োজনে সরকারি খরচ আরো বেড়ে গেল—অতিরিক্ত পুলিস আর কর্মচারীর খরচ যোগাতেও ট্যাক্স আরো বেড়েই যাবে।

খাজনা ও জমিদারী

জমিদারী প্রথা তুলে দেবার আন্দোলন চাষীরা করেছে—বিনা খেসারতে তুলে দেবার আন্দোলন করেছে। কিন্তু বিনা খেসারতে জমিদারী তুলে দেবার দায়িত্ব ধনতন্ত্রীরা কখনোই নিতে পারে না। কেননা দেখা যায় জমিদার ও ধনী-ব্যবসায়ীর স্বার্থ আজ এক। ধনীরা জমিদারীর সত্ব দেখিয়েই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়েছে—জমিদারী ধ্বংস হলে ধনতন্ত্রের ক্ষতি হয়—অতএব ধনতন্ত্র আজ জমিদারী স্বার্থ নষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। তাই খেসারৎ দেবার কথা তুলেছে এই খেসারতের টাকাও শেষ পর্যন্ত চাষীকেই দিতে হবে অথচ লাভ তাতে তাদের কিছুই নেই। কেননা অনেক জমিদারের বদলে এখন একটি জমিদার কায়েম হবে, সে হবে সরকার—যাকে তাদের খাজনা এক বাংলাদেশেই ১৭ কোটি টাকা বছর বছর জুগিয়ে যেতে হবে। জমিদার একই থাকুক আর বহুই থাকুক - চাষীর স্বার্থ খাজনা মকুবে বা খাজনা কমিয়ে দেওয়ায়। কিন্তু খাজনার এক পয়সা কমতির আশাও হিন্দুস্থানে বা পাকিস্তানে নেই। অর্থাৎ খাজনা ও জমিদারী সম্পর্কে চাষীর দাবি আজ ধনতন্ত্র মেটাতে পারে না।

চাষীর ঋণ

১৯৩৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটির (Central Banking Enquiry Committee) হিসাব মতে চাষীর ঘাড়ে ঋণ দাঁড়িয়েছিল ১৮০০ শত কোটি টাকা। এই টাকার সুদ দেওয়া চাষীর পক্ষে অসম্ভব এবং এই দায় থেকে মুক্তি না পেলে চাষীর উন্নতি আশা করা যায় না। যুদ্ধের সময় কিছু কিছু মোটা চাষী দেনামুক্ত হলেও সাধারণ চাষী ও ভূমিহীন চাষীর ঋণ বেড়েই গেছে, শেষ পর্যন্ত এই দেনার দায়ে ঘটি বাটি বিক্রি করে দুর্ভিক্ষে মরতেও দেখেছি লক্ষ লক্ষ লোককে। এই ঋণ মকুব করে দেবার জন্য চাষীরা আন্দোলন করেছে—কিন্তু ঋণটা মকুব করে দিলে ধনীদেরই ক্ষতি এবং ধনতন্ত্রের ক্ষতি। কাজে কাজেই চাষীর দেনা ধনতন্ত্রের আমলে আর মকুব হবার উপায় নেই। কৃষিঋণ দেবার নামে সরকার থেকে যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রচলন করা হয়েছিল তারও অপব্যবহার করে গ্রাম্য মহাজনেরা সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থে তা লাগিয়ে নেয়—ফলে কো-অপারেটিভ স্কীম ব্যর্থ হয়ে যায়। সরকারি ঋণের ব্যবস্থাও এত কড়াকড়ি থাকে যে চাষী মহাজনের কাছে উঁচু সুদে টাকা নিতে বাধ্য। তাছাড়া জমিতে আজকাল মূলধনের অবাধ প্রবেশ কায়েম হয়েছে—ফলে মহাজনী সূত্র ধরে ক্রমে জমি, যারা চাষী নয় তাদের হাতে চলে যাচ্ছে। এরূপে হাজার হাজার একর জমির মালিক হয়েছে চোরাকারবারী কালোবাজারের ব্যবসাদার মহাজনেরা। জমি চাষের জন্য যে মূলধন থাকার দরকার তা চাষীর হাতে না থাকার দরুন জমি ক্রমেই হস্তান্তর হতে চলেছে। চাষীর ঋণ এই

কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে ধনতন্ত্রকে। ধন-সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে জন কয়েকের হাতে চলে যাবার নীতি ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত নীতি। চাষীর ঋণ মকুব করে দেবার কোনো উৎসাহ তাই ধনতন্ত্রের থাকতে পারে না।

কৃষিজাত ফসলের দর

প্রত্যেক চাষী জানে ফসল সে যতই ফলাক ফসলের উপর কর্তৃত্ব তার নয়—কর্তৃত্ব বাজারের। ফসলের দর তার কি মিলবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। বাজারের দর ওঠানামার উপর তার জীবন নির্ভর করে। ব্যবসায়ীরা ও বর্তমানে সরকার নানা চক্রান্ত করে তার কাছ থেকে ফসল এক রকম কেড়ে নেয়। ধরে রেখে উপযুক্ত দাম আদায় করে নেবার মতো আর্থিক জোর তার নেই। তাছাড়া বর্তমান সরকারি সংগ্রহ নীতিতে জোর করেই ফসল কেড়ে নেওয়া হয়। সরকার সেগুলি উঁচুদরে রেশনের নামে বিক্রয় করে ও একদল পোষ্য বা কর্মচারী পোষে। দামের এই পার্থক্য থেকে কালোবাজারের সৃষ্টি হয়। বিস্তর চাল, গম চোরাই পথে কালোবাজারের হাতে চলে যায়। চাষী দশ টাকা পনেরো আনা দরে চাল বিক্রি করে দিয়ে খালাস—কিন্তু সেই চাষীকেই শেষ পর্যন্ত ৪০ টাকা দরে চাল খুঁজে বেড়াতে হয়।

১৯২৯ সালে বাণিজ্য জগতে যে অর্থসঙ্কট দেখা দিয়েছিল তার ধাক্কায় চাষীদের সর্বনাশ হয়ে যায়। ধান, পাট, গম, তুলো, তরিতরকারি এমন মাটির দরে নেমে যায় যে, ছোট চাষীদের চাষ করা অসম্ভব হয়ে উঠে। এই মন্দা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সমানে বছরের পর বছর ধরে চাষীকে নিঃস্ব করতে থাকে—এবং পর্বতপ্রমাণ দেনা বাড়িয়ে দিয়ে যায়। সেই কয় বছরে শতকরা ২৫ ভাগ চাষী আরো ভূমিহীন হয়ে যায়। বর্তমান ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫২ জন। শিল্পজাত জিনিসেও মন্দা এসেছিল—শিল্পপতিরা তাদের তৈরি জিনিসের দর আরো বাড়িয়ে নিতে লাগল—কিন্তু চাষীর তৈরি জিনিসের দর তেমনি পড়ে রইল। কৃষিজাত জিনিসের দর ও শহরের শিল্পজাত জিনিসের দরে যে পার্থক্য রয়ে গেল তাতে শিল্পপতিরা অনেকটা ক্ষতি শুধরে নিল। আজও শহরজাত জিনিস যেমন তেল, কাপড়, চিনি ইত্যাদি কালোবাজারের দরে চাষীকে অগ্নিমূল্যে কিনতে হয় কিন্তু চাষীকে তার ধান ছয় টাকা চার আনা মনেই ছাড়তে হবে নইলে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে সরকার। অর্থনৈতিক সঙ্কট এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয় ধনতন্ত্রের যুগে, ১০/১২ বছর অন্তর অন্তরই এই সঙ্কট আসে—বাজারের দরের ওঠানামার অত্যাচারে চাষীর জীবনে অস্থির করে তোলে।

চাষীরা বার বার চিৎকার করেও কৃষিজাত জিনিসের নিম্নতম ন্যায্য দাম বেঁধে নিতে পারে নি। ধনতন্ত্রী সরকার তা পারে না। কেননা বেনেদের এই রাজ, ধনতন্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না। কৃষিজাত ফসলের দর অথবা জমি জায়গা জিনিসপত্রের দর বেঁধে দিয়ে যার যার আয় ও জীবিকা চিরকালের মতো নির্দিষ্ট করে দেওয়া ধনতন্ত্রের নিয়ম নয়। অবাধ প্রতিযোগিতার নামে পরস্পরের মধ্যে লুণ্ঠন প্রথা চালু করে ধনীকে করে অধিকতর ধনী। আর মূলধন বাড়াবার সুযোগ ধনতন্ত্রের থাকা চাই-ই চাই। তার উপর উপরতলার ধনী অর্থাৎ যারা কোটিপতি তারা বাজারের উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে—ফটকা বাজার সৃষ্টি করে—ইচ্ছে করে দর চেপে দিয়ে চাষীকে বেকায়দায় ফেলে মাটির দরে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করে থাকে।

যুদ্ধের সময় সরকার যখন রেশন প্রথা হাতে নিল—অর্থাৎ দেশের খাদ্য ও বস্ত্রের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে সমস্ত দেশটাকে চরম বাঁধনে বেঁধে নিল—যাতে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না করতে পারে। তখন অবশ্য ফসলের দর বেঁধে নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীদের মারফৎ

সমস্ত ফসল হস্তগত করল। সরকারের এই কেনা ও বেচার মধ্যে ও বাইরে চোরাকারবারীরা ফসলের দর নিয়ে কি ছিনিমিনি আর লুট চালিয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে এই বাংলায়ই ৪০ লক্ষ লোক খুন করেছিল সে কথা ভুলবার উপায় নেই।

সকলের জন্য জিনিস পাবার সুবিধার নামে ধনতন্ত্রী সরকারগুলি আজকাল যে কনট্রোল আর রেশনের প্রথা চালু করেছে তার উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস সকলকে সমান ভাগ করে দেওয়া নয়—নিরীহকে বঞ্চিত করে, চাষীকে বঞ্চিত করে, ধনীদের ভোগ নিশ্চিত করা এবং সরাসরি কণ্ট্রোলের নামে মুষ্টিমেয় ধনীর বাজারের উপর একচেটিয়া শাসন ও শোষণ বজায় রাখা। এই প্রথার ফাঁকে ফাঁকে যে নোংরা ঘুষ ও চোরাকারবার চালু হয়েছে তা আর ধনতন্ত্রের মধ্যে দূর করার উপায় নেই। কংগ্রেস মন্ত্রীদের দেশই হোক —লীগ শাসিত দেশই হোক, ঘুষ ও চোরাকারবার আজ সামাজিক জীবন অসহ্য করে তুলেছে। চাষীর ধান, পাট, গম, আইনের বলে কেড়েই নিচ্ছে উপরন্তু প্রতিদানে কাপড়, তেল, নুন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে চাষীকে যে কত হয়রানি ও অভাবের মধ্যে দিন কাটাতে হয় তা বলে শেষ করা যায় না। চাষীর ফসলের দাম কিঞ্চিৎ বাড়লেও যে দরে শিল্পজাত কাপড় জামা ইত্যাদি জিনিস কিনতে হয় তাতে সত্যিকার আয় তার কমেই গিয়েছে। এক মাত্র মোটা চাষী ও জোতদারেরাই ফসলের চড়া দামের সুবিধা পায় এবং কালে সাধারণ চাষীর জমি হস্তগত করে নেয়।

মোটকথা ফসলের দর ন্যায্য রূপে বেঁধে নেবার সুবিধা আজ আর চাষী ধনতন্ত্রের কাছে আশা করতে পারে না। কণ্ট্রোল উঠিয়ে নিলে বাজারের অবাধ প্রতিযোগিতা চালু হলে ব্যবসায়ীরা ও মহাজনেরা গরিব চাষীর ফসল সস্তা দামে কিনে নিয়ে দেশে অরাজকতা আর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে—আবার কণ্ট্রোল চালু রাখলে তা কার্যত চালু থাকে না চোরাবাজারে সব উবাও হয়ে যায়। ধনতন্ত্র আজ এমনি এক অরাজক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে—কি কণ্ট্রোল বাজার—কি খোলাবাজার কোনোটাতেই চাষী ন্যায্য দর পাবার আশা করতে পারে না।

কুটির শিল্প

কুটির শিল্পের প্রধান শত্রু ধনতন্ত্র। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ভারতের কুটির শিল্প কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তার কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। আজো কিছু কিছু কুটির শিল্প রয়ে গেছে—তার কারণ শিল্প-বিপ্লব ভারতে পুরাদমে চালু হতে পারেনি নিজেরই অক্ষমতার জন্য। যুদ্ধের সময় যখন জিনিসপত্রের খুবই অভাব এবং বাইরে থেকে মাল আসা বন্ধ ছিল তখন কিছু কিছু কুটির-শিল্প বেড়ে যায় কিন্তু যুদ্ধের পরে বাইরে থেকে অবাধে জিনিস আসতে শুরু করেছে এবং এখানেও যে পরিমাণে যন্ত্রশিল্প কায়েম হবে সেই পরিমাণে এই কুটির-শিল্প নষ্ট হতে থাকবে। সমাজতন্ত্র কুটির-শিল্পে বিশ্বাস করে না বলে একটা প্রবাদ চলে থাকে কিন্তু কুটির শিল্পের প্রধান শত্রুই হলো অরাজক ধনতন্ত্রের নির্মম প্রতিযোগিতা। গান্ধীজী জানেন ভারতের অসংখ্য লোকের কাজ দেবার ক্ষমতা ধনতন্ত্রের নেই—বেকার করবার ক্ষমতা আছে—কিন্তু তিনি ধনতন্ত্রকে বজায় রেখেই কুটির শিল্পের রক্ষা চান, ফলে ধনতন্ত্র আস্তে আস্তে কুটির শিল্পকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, গান্ধীজীর শত প্রচারেও তাকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। বরং সমাজতন্ত্রেই যতদিন পর্যন্ত না সবাইকে উপযুক্ত কাজ দেওয়া যায় ততোদিন পর্যন্ত কুটির শিল্পকে একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী রক্ষা করা যেতে পারে কিন্তু ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিযোগিতা কুটির-শিল্পকে কোনো রক্ষাকবচ দিয়ে রক্ষা করতে পারে না। অতএব কুটির-শিল্প থেকে সাধারণের আয় বাড়বে এ আশাও ক্রমেই দূর হয়ে যাচ্ছে।

ভূমিহীন কৃষক, বৃত্তিহীন মানুষ বা বেকার

আজ যে শতকরা ৫২ জন চাষী ভূমিহীন হয়ে পড়েছে তাদের জমি দেওয়া একটা সমস্যা এবং তাও ধনতন্ত্র দূর করতে পারে না। ধনতান্ত্রিক উপায়ে বৈজ্ঞানিক চাষ প্রবর্তন করতে হলে আরো চাষীকে ভূমিহীন করতে হবে অর্থাৎ বড় বড় শস্যক্ষেত্রে কলের চাষ প্রবর্তন করার সাথে বহু চাষী ভূমিহীন হয়ে পড়বে। এক একটি চিনিকলে চাষ ও তৎসংলগ্ন জমির স্বত্ব দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাজার হাজার চাষীকে উৎখাত করে চিনির কলগুলি নিজেরাই আখের চাষ প্রবর্তন করছে—ফলে বিস্তর চাষী বেকার হয়ে পড়ছে। জমিদারের খাস জমি অথবা মহাজনদের খাস জমি দখল করে ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, একাজেও ধনতন্ত্রী মন্ত্রীরা কখনোই হাত দেবে না।

মনে রাখা উচিত যে পরিমাণে দেশে কলকারখানা বসে সেই পরিমাণেই মজুর কাজ পায় না। আজকালকার যন্ত্রপাতির লক্ষ্যই এই—অল্প লোক লাগিয়ে বেশি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। দেশে কলকারখানা বাড়ালেই সকলে কাজ পাবে তা যদি হতো তবে আমেরিকায় যুদ্ধের পূর্বে ৮ লক্ষ লোককে বেকার ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হতো না। একদল বেকার সৃষ্টি করে তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে মজুরির হার কমিয়ে রাখার এই হলো একমাত্র উপায়। আজ ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা চারদিক থেকে হু হু করে বেড়ে যাবে—দেশে শিল্প বাণিজ্য বাড়লেও।

মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি

পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সাথে তালে তাল রাখতে গিয়ে আজকের ভারতীয় শিল্পপতিরা মজুরির হার কমাবার জন্য ব্যস্ত। মূলধন বাড়াবার অন্যান্য সুযোগ যত কমে আসবে—তত মজুরির উপর হাত পড়তে বাধ্য। এরই জন্য আজকালকার ধর্মঘটগুলিকে এত কঠোর হস্তে দমন করবার জন্য তারা সবাই একমত। মাগ্‌গি ভাতা ইত্যাদি বাবদে যে সুবিধা তারা যুদ্ধের সময় দিতে বাধ্য হয়েছিল—তা কমিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং বাজারের দর বাড়িয়ে রেখে সে সুবিধা সুদে আসলে উসুল করে নিচ্ছে। সাধারণ কেরানী ও মধ্যবিত্তদের বেতনের হার সম্বন্ধেও এই কঠোর নীতি চলেছে। মজুরি ও বেতন আজ যুদ্ধের পূর্বের হার থেকে একটুও বাড়েনি এবং মাগ্‌গি ভাতা দিয়ে একটা মোটা অঙ্ক দেখাবার চেষ্টা করছে। আসলে জীবিকার খরচ এত বেড়ে গিয়েছে— জিনিসপত্রের দর এত বেড়ে গিয়েছে যে আসল আয় যুদ্ধের আগের চেয়েও কমে গেছে। অতএব মজুরি বৃদ্ধি ও জীবিকার নিম্নতম মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি কথা প্রকাণ্ড ধাপ্পা মাত্র। বেকার সমস্যা আর একটু বেড়ে গেলে এই মানদণ্ডেও আঘাত পড়বে। সাধারণের আয়ের এই রাস্তায়ও কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নেই আজকের ধনতন্ত্রে—অতএব এদের ক্রয়শক্তি বাড়াবার উপায় এতে মিলবে না।

কৃষক সমস্যা ও ধনতন্ত্র

কৃষকদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি আজ ভারতের কৃষকদের প্রত্যেকটি ছোট বড় সমস্যার মূল কারণই হলো ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্রে কৃষকের মুক্তি নেই, ধনতন্ত্রে কৃষি বিপ্লব আজ আর সম্ভব নয়। অথচ এমন একদল বামপন্থী আছেন যেমন মেকি কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট, যারা কৃষকের দুর্দশার কারণ একমাত্র জমিদারী ও জোতদারী প্রথাকেই

সাব্যস্ত করেছেন। অথচ আমরা দেখেছি জমিদারী ও জায়গিরদারী শোষণ সমস্ত শোষণ ব্যবস্থার একটি সামান্য অংশ মাত্র—বৃহৎ অংশটার জন্য দায়ী ধনতন্ত্র, পরিষ্কার ধনতন্ত্র। আর জমিদারী ও জায়গিরদারী প্রথা যা আছে তাও বেঁচে আছে ধনতন্ত্রেরই কল্যাণে—ধনতন্ত্রের মধ্যে আশ্রয় নিয়েই আজ সামন্ততান্ত্রিক ভগ্নাবশেষ যা কিছু বেঁচে আছে—ধনতন্ত্র তা সযত্নে রক্ষা করে যাচ্ছে। অতএব যারা ধনতন্ত্রকে আঘাত না করে কৃষকের মুক্তি চান তারা হয় কিছু বোঝেন না নচেৎ ইচ্ছে করে ধনতন্ত্রের দালালি করেন। গ্রাম্য জীবনের আমূল পরিবর্তন করার বাধা আজ ধনতন্ত্রের—কলের চাষ ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষের প্রধান অন্তরায় ধনতন্ত্রের বার্ধক্য—চাষীর ঋণ থেকে মুক্তির প্রধান বাধা ধনতন্ত্র—কুটির-শিল্পের ধ্বংস করেছে ধনতন্ত্র, জমি হস্তান্তর ও ভূমিহীন কৃষকের অবস্থা ধনতন্ত্রেরই দান, বাজার দরের অত্যাচার এবং কালোবাজারের সৃষ্টিও ধনতন্ত্রের জন্য—মোট কথা ধনতন্ত্রই আজ ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের প্রধান শত্রু। অথচ এইসব মেকি বামপন্থী কৃষক দরদীরা ধনতন্ত্রের ওপর এক্ষুণি আঘাত করবার প্রোগ্রাম চালু করতে বললে আঁৎকে ওঠেন এবং চাষীরা সমাজতন্ত্র প্রতিরোধ করবে বলে খুব ভয় দেখাতে থাকেন। এরা মিথ্যা শত্রু তৈরি করবেন এবং মিথ্যা সমাধানের মোহ সৃষ্টি করবেন। এরা ধনতান্ত্রিক উপায়ে দেশ গঠনের কাজে কংগ্রেস ও লীগকে সাহায্য করবেন। সমস্ত সমস্যার মূলে আঘাত করার সাহস ও ইচ্ছে এদের কোনো কালেই হবে কিনা সন্দেহ—দলীয় স্বার্থের সুবিধাবাদের খাতিরে সহজ সুলভ জনপ্রিয়তার খাতিরে চাষী ও মজুরের স্বার্থ কোথায় তাও দেখাতে রাজি নন। সুবিধাদের একটা মোটা নীতিই হলো এই আসল শত্রুকে এড়িয়ে আশু কর্তব্যকে এড়িয়ে নকল শত্রু সৃষ্টি করা এবং মিথ্যা দম্ভ করে বেড়ানো।

ভারত সরকারের নানাবিধ দেশগঠনের কল্পনা

পূর্বতন ভারত সরকার অথবা বর্তমান জাতীয় সরকারের কিছু কিছু স্কীম বা পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে কৃষিজাত জিনিসের উৎপাদন বাড়াবার জন্য। দামোদর নদীকে বেঁধে বাংলা ও বিহারের গ্রামের জল সরবরাহ করবার স্কীম হাতে নিয়েছে—সে স্কীম ১৯৬০ সালের আগে ফলপ্রসূ হবে না। এতে খরচ হবে ৫০ কোটি টাকা। তা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে এবং ঐ এলাকায় সস্তায় বিদ্যুৎ সাপ্লাই করতে পারবে। বর্ধমান জেলার কতক অংশ এতে চাষের জল পাবে এবং বিহারের দু'তিনটি জেলাও জল পাবে। কিন্তু আসল কথা এই টাকাটা ট্যাক্স করে ওঠাতে হবে। জল পেয়ে ফসল পাবার সুবিধা হবার পূর্ব থেকেই ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে এবং বিদ্যুৎ সাপ্লাই করার সুবিধা থাকলেই হলো না—ঐ বিদ্যুৎ নিয়ে লাভজনক শিল্প বাণিজ্য না গড়তে পারলে গোটা বিদ্যুতের স্কীমটাই লোকসানি। এমনি ধরনের আরো ২/৪টা স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে—তবে সবগুলি কার্যকরী হতে ১৯৬০ সালের আগে নয়। এবং সবগুলি স্কীম কার্যকরী হলে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের এক লক্ষ গ্রামও তাতে লাভবান হবে না। তা হোক। ধীরে ধীরেই দেশের উন্নতি হোক। ধীরে ধীরে ধনতন্ত্র এমনি করে তো এগুতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে এগুবার সময় নেই আর। পৃথিবীর ধনতন্ত্রে যে অহর্নিশি প্রতিযোগিতা আছে, তাতে সবুর সয় না। বেদম পাল্লায় ধনতান্ত্রিক দেশগুলি একটা আর একটাকে জব্দ করতে ধ্বংস করতে ব্যস্ত। গয়ংগচ্ছ চালে ভারতে আমেরিকার মতো শিল্প বাণিজ্য গড়ে ওঠবার সময় আমেরিকাও দেবে না; অর্থনৈতিক সঙ্কট ও যুদ্ধ এসে এই সব প্ল্যান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। [illegible] পরিকল্পনা করে জনসাধারণ যেদিন মরিয়া হয়ে নিজেদের দেশ [illegible] সেদিনই একমাত্র দেশ গঠনের কাজ শুরু হবে।

নইলে লোক দেখানো গয়ংগচ্ছ স্কীম মাথাতেই থেকে যাবে এবং ততদিন ভারতীয় দরিদ্র জনসাধারণও ধনতন্ত্রকে সময় দেবে না। আর আমরা দেখেছি ধনতন্ত্রের মধ্যে আজ এত জঘন্য দুর্নীতি ঢুকেছে যে ঘুষ ও চুরি ছাড়া তাতে কিছুই নেই। ৫০ কোটির একটা প্ল্যান চালু করলে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করবে কনট্রাক্টার অফিসারের দল—বাকিটা দিয়ে কোনো রকমে এমন একটা দায়সারা গোছের জিনিস হবে যাতে শেষ পর্যন্ত কোনো কাজই হবে না। চোরাকারবারি ঘুষখোর অফিসার ও কনট্রাক্টার দিয়ে আর দেশ গঠন হবে না- দেশ ধ্বংস হবে মাত্র।

স্বাধীনতা ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি

দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে তার একটা প্রমাণ হলো সেই দেশের বৈদেশিক নীতিতেও স্বাধীনতা। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান যদি সত্যিই স্বাধীন হয় তবে দেখা যাবে যে তথাকার জনসাধারণের স্বার্থে এই সব দেশ এমন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছে যে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তারা পোঁ ধরে নেই। আগামী মহাযুদ্ধের বা তৃতীয় মহাযুদ্ধের মাপকাঠিতে এদের স্বাধীনতা বিচার করা সম্ভব। ভারতের মতো দরিদ্র দেশের যে যুদ্ধ শোভা পায় না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা দেখেছি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমরা অ্যাংলো আমেরিকান খপ্পরে পড়ে যাচ্ছি। আজও যখন পণ্ডিত জহরলাল দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছেন তখন ভারতীয় সৈন্য বর্মায় বিদ্রোহ দমন করতে ব্যস্ত। এই অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নীতিতে আমরা জড়িয়ে পড়ছি কেন?

এর মূল কারণ অর্থনৈতিক। কোনো দেশের বৈদেশিক নীতি তার দেশের ভিতরকার অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। যেহেতু হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের ভিতরকার অর্থনীতি ধনতন্ত্র—এবং ধনতন্ত্রের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী অর্থের উপর নির্ভরশীল—সেইহেতু বৈদেশিক-নীতিতেও ভারত সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপোষক। দেশে ধনতন্ত্র বজায় রাখলে বিদেশেও ধনতন্ত্রকে সায় দিয়ে যেতে হবে। যত বাকচাতুরী করা হোক না কেন আজ দেশের ধনতান্ত্রিক শোষণ কায়েম রাখতে হলে—বিপ্লব বিরোধী কর্মপন্থা চালু রাখতে হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অতএব তৃতীয় মহাযুদ্ধে আমাদের অ্যাংলো আমেরিকান দলেই যোগ দিতে হবে এবং বলতে হবে ওটা জনযুদ্ধ, আমাদের নিজেদের যুদ্ধ!

তাছাড়া দেশের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা মানে যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া। আধুনিক যন্ত্র-যুদ্ধ চাট্টিখানি জিনিস নয়। যন্ত্রচালিত সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, আধুনিক অস্ত্রাগার, মোটর শিল্প ইত্যাদির খরচ জোগাড় করতে পারে এমন সাধ্য ভারতের দরিদ্র চাষী মজুরের নেই। যে দেশে একটি মোটরের কারখানা তৈরি হয়নি, যে দেশে একটি যুদ্ধ জাহাজ তৈরির ডক নেই সেদেশ স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি চালাবে—অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাপারে নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াবে এমন কল্পনা করা বাতুলতা।

এই যুদ্ধোদ্যমের জন্য হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের অন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়েও যদি টাকা জোগান দেওয়া হয় তাহলেও সম্ভব নয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ অবশ্য টাকা দেবে—কিন্তু এই শর্তে যে এই দুই রাষ্ট্র ধনতন্ত্র বজায় রাখবে, তাদের সঙ্গে শিল্পে টেক্কা দেবে না বরং সহযোগিতা করবে এবং যুদ্ধ লাগলে তাদের সাথে থাকবে।

অতএব এখন বুঝতে বাকি রইল না এই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি? কি দেশ গঠনের কাজে, কি দেশ রক্ষার ব্যাপারে কোনোটাতেই প্রকৃত স্বাধীনতা এতে নেই—একটা মৌখিক স্বাধীনতা মাত্র।

গণতন্ত্র

ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমালোচনার স্বাধীনতা, ইউনিয়ন, সঙ্ঘ, দল গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি যে সমস্ত মামুলি স্বাধীনতার কথা কংগ্রেস ও লীগ এতকাল বলে এসেছে তা ক্রমেই দূরে হটে যাচ্ছে। পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট অ্যাক্ট, ও ১৪৪ ধারায় দেশটা ভরে গেল। দেশ যত স্বাধীন হচ্ছে দেশবাসীরা যেন তত পরাধীন হচ্ছে। নানা রকমের আইন ও কণ্ট্রোলে ভারতীয় জীবনকে নাগপাশে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। ক্রমে এই স্বাধীনতার জন্য কোনোখানে এতটুকু উৎসাহ পর্যন্ত দেখা যায় না। দেশে গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার কথাটা বাদ দিয়ে কেবল দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা শোনা যাচ্ছে।

দেশীয় রাজ্যের রাজাদের কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই মেনে নিয়েছে। সেখানে প্রজা আন্দোলনকে ধনতান্ত্রিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে বলে তা সত্যিকারের বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হতে পারছে না। দেশীয় রাজ্যের রাজা বাদশারা আজ ধনতন্ত্রের সাথে আপস করে নিয়েছে। বৃটিশ ভারতের বহু শিল্পপতি দেশীয় রাজ্যে শিল্প গড়ার আয়োজন বহুদিন থেকে করে আসছে, কেননা বৃটিশ ভারতের চেয়ে দেশীয় রাজ্য বেশি নিরাপদ স্থান বলে তারা মনে করে, সেখানে মজুর ও চাষী আন্দোলন এত বেপরোয়া রূপ নিতে পারেনি বলে। এদিকে অনেক দেশীয় রাজ্যে বৃটিশ মূলধনও ঢুকে গেছে। দেশীয় নৃপতিরা নিজেরাই শিল্পবাণিজ্যে মনোযোগ দিয়েছে। সেকেলে শাসন পদ্ধতির জুলুমের সাথে নয়া ধনতন্ত্রের নির্মম শোষণ মিসে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আছে। ভারতের কংগ্রেসী নেতারা দেশীয় রাজাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যোগ দিতে পারে এই লোভ দেখিয়েছেন--ফলে অনেকেই ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যোগ দিয়ে নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখতে রাজি। অনেকে আবার পাকিস্তান ও ইংরেজের সঙ্গে পরামর্শক্রমে চলেছে-- ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ কায়েম রাখবার সুড়ঙ্গ হিসেবে কাজ করবার জন্য প্রস্তুত। মোটকথা দেশীয় রাজ্যের স্বৈরতন্ত্র আজ কোনো না কোনো ধনতন্ত্রের আশ্রয়ে বেঁচে আছে এবং থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত না সর্বভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিপ্লবে পরিণত হবে ততদিন পর্যন্ত এরা বেঁচে থাকবেই এবং কোনো না কোনো খেলা খেলতে থাকবে। অতএব প্রজা আন্দোলনকে আরো এক ধাপ এগুতে হবে যদি তারা সত্যিই রাজতন্ত্র শেষ করে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করতে চায়। অর্থাৎ প্রজা-আন্দোলনকে মজুর ও কৃষক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে এবং প্রজাজাতীয় শব্দ ও তার দুর্বলতা ত্যাগ করতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে ভারতের অন্যান্য শ্রমজীবীদের আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রেও ভারতীয় বামপন্থী দলগুলির ফাঁকিবাজি দেখা যায়—তারা ধনতান্ত্রিক প্রথা বজায় রেখেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ কামনা করে, ফলে প্রজা আন্দোলন দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। পারে না বলেই দেশীয় রাজ্যেও সাম্প্রদায়িক হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই প্রকার দ্বিধাগ্রস্ত নীতি চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীর রাজ্যের প্রজারা মুসলিম লীগের আওতায় চলে যাবে-- তখন বামপন্থীদের হায় হায় করা ছাড়া কোনো কাজ থাকবে না—যেমন আজকের ভারতে তাদের দুর্বলতা ও দ্বিধার সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং বামপন্থীরা অবস্থার দোষ দেখিয়ে হায় হায় করছে।

জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

একজাতি—একপ্রাণ—একতার আদর্শ জাতীয়তাবাদ আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। হিন্দুরাও আজ আর এতে বিশ্বাস করে না। কংগ্রেসও এ বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে—যখন লীগের দাবিকে মেনে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান মেনে নিয়েছে। আজ যেন ভালয় ভালয় হিন্দু মুসলমান আলাদা হয়ে গেলে বাঁচা যায়—এমনি ভাব। এর কারণ কি? ইংরেজ ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে জিন্নাকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছে এ হলো অর্ধ সত্য। বাকি কথাটা এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এমন কোনো শক্তি নেই আজ যে এই বিভেদনীতিকে পরাস্ত করতে পারে। এ হলো বাকি সত্যটুকু। ইংরেজ আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগায় কিন্তু আমরা লাগি কেন? আমরা লাগি এই জন্য যে আমাদের নিজেদের দাবিতে, কর্মপন্থায়, আদর্শে এত দুর্বলতা যে সমস্ত ভারতের লোকদের এক করবার ক্ষমতা তাতে নেই। অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই দেশের এক জাতীয়তার প্রয়োজন আসে। দুর্বল ধনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমাদের এই জাতীয়তাবাদ এই বিরাট দরিদ্র দেশের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ দেখাতে পারেনি—এই ধনতন্ত্র কোনো কায়েমীস্বার্থকে অস্বীকার করতে নারাজ—এই দুর্বল ধনতন্ত্র জনগণের উপর সকল শোষণকারী ব্যবস্থা কায়েম রাখতে চেয়েছে—কাউকে বঞ্চিত করতে নারাজ—এবং যে সমস্ত শোষকশ্রেণী নিজেদের দুর্বলতায় নিজেরাই ভেঙে পড়ছিল—যেমন জমিদার, রাজা ও নবাব বাহাদুর এরা তাদেরকে খেসারৎ দিয়ে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে চায়—এই দুর্বল ধনতন্ত্র দেশ গঠনের কোনো মৌলিক যুগান্তকারী পরিকল্পনা হাতে নিতে অসমর্থ। ধনতন্ত্রকে ভিত্তি করে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে চেয়েছিল, বাস্তবের একটু সামান্য আঘাতেই তা চুরমার হয়ে গেল—কেউ দুঃখ পর্যন্ত করল না, সকলেই সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। এই জাতীয়তাবাদের কর্ণধার হলো যারা তারাই ধনতন্ত্রের পোষক এবং একদল সুবিধাবাদী কংগ্রেসের সংগঠনে হু হু করে ঢুকে পড়ে তাকে কায়েমী স্বার্থের দুর্গ করবার চেষ্টায় যত্নবান হলো। মুসলিম লীগের মতো একটা আদর্শহীন সুবিধাবাদী সংগঠনও তাই এক ধাক্কায় এই তাসের ঘরটি ভেঙে দিতে সমর্থ হলো। বামপন্থীরা দ্বিধা ও জড়তায়, দুর্বলতা ও ক্লৈব্যে ঝিমুতে লাগলো এবং বারে বারে বিপ্লবের ডাক ও সুযোগ উপেক্ষা করাতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সুযোগ পেল, অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা ও নিরাশাগ্রস্ত জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করে বসল।

জাতীয়তাবাদ আজ তাই ভারতবর্ষে—একেবারে পরাজিত এবং লজ্জিত। অথচ একদিন ইউরোপে, আমেরিকায়, অন্যান্য প্রাচ্য দেশে এই জাতীয়তাবাদ নূতন জাতির ধর্ম ছিল—জাতীয়তাবাদের জন্য সব করতে প্রস্তুত ছিল সেদিনকার লোক—আজ তা একটা স্বপ্ন মাত্র—কোনো আত্মত্যাগের দাবি আজ তা করতে অক্ষম। কংগ্রেসের ভিতরকার গলদ আজ দিনকে দিন জাতীয়তাবাদকে পরাজিত করে দিচ্ছে। কংগ্রেস আজ দেশবাসীর কাছে কোনো ত্যাগই সাহস করে দাবি করতে পারে না। কংগ্রেসের ভিতর সুবিধাবাদী চোরাকারবারী, ব্যবসায়ী, কালাবাজারের লোক গিজ গিজ করছে। এই চেহারা নিয়ে কি দেশগঠনের কাজে বা দেশ রক্ষার কাজে কংগ্রেস আজ দেশবাসীর উপর নির্ভর করতে পারে?—ক্রমেই সরকারি শাসনযন্ত্র ও কনট্রাক্টরের উপর তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে—জনগণ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। যতটুকু রয়েছে তা কেবল বামপন্থীদের কৃপায়—তারা এখনো কংগ্রেস জাতীয়তাবাদকে কৃষক মজুরের সমাজতন্ত্রে পরিণত করবার স্বপ্ন দেখায়—এবং কংগ্রেসের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখবার কাজ করে। মুসলিম লীগের অসহ্য প্রতিক্রিয়ার চাপে ও দাঙ্গার ভয়ে হিন্দুরা আজ কংগ্রেসের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠনে পরিণত করে ফেলছে। অনন্যোপায় হয়ে কংগ্রেসকে আশ্রয় করা ছাড়া এক্ষুণি তাদের হাতে কোনো সংগঠন নেই বলেই কংগ্রেস আছে।

আজও ভারতবর্ষ এক হবে এই বাণী নিয়ে মহাত্মা তার প্রচার কার্য চালাতে পারেন। বামপন্থীরা সব কাজ ফেলে দিয়ে আবার ভারতকে এক করতে হবে এইমাত্র রাজনীতি চালাতে পারেন। তাঁরা হয়ত বলবেন ভারত ঐক্যবদ্ধ না হলে সাম্রাজ্যবাদের সাথে লড়াই করা চলবে না—সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকে তাদের শোষণের কৌশল চালাতে থাকবে—অতএব ইংরেজকে পাকিস্তান ও রাজস্থান থেকে তাড়ানোই একমাত্র কাজ—যেন সাম্রাজ্যবাদ হিন্দুস্থানেই থাকবে না বা হিন্দুস্থান সত্যি সত্যিই সাম্রাজ্যবাদ-মুক্ত হলো।

যাই হোক ঐক্য আন্দোলনের ফাঁকা কথাগুলির একটু বিচার করা দরকার। যে কারণের জন্য ভারত বিভক্ত হয়ে গেল—সেই সব কারণ বজায় রেখে ভারতকে আর একও করা যাবে না। ধনতান্ত্রিক দুর্বলতার জন্য ভারত আজ বিভক্ত, সেই মৌলিক দুর্বলতা— সেই ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদের ডাকে ভারতবর্ষকে এক করা সম্ভব নয়। নইলে ডি, ভ্যালেরা আজও আলস্টর প্রদেশটাকে আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে আনতে পারলেন না কেন? বলকান রাজ্যসমূহ আজও এক হলো না কেন? ইউরোপের খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি এক হতে পারছে না কেন? এক পৃথিবী, একদেশ, একজাতি—সে হলো মানুষ জাতি। এই এক পৃথিবীর প্রয়োজন মুখে সবাই স্বীকার করলেও এক পৃথিবী হচ্ছে না কেন? বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ পৃথিবীকে এক সাথে এক মতে আনতে পারছে না কেন? এই সব ঐক্য চেষ্টা দুষ্টোমির অপর নামমাত্র। ঐক্যের নামে চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র চলেছে নানা বিশ্ব সম্মেলনে। 'দেশগুলি এক হও'—'সবজাতি এক হও'—এতে হাজার বছরেও ঐক্য আসবে না। ঐক্য আনবার একটিমাত্র পথ আছে—সে হলো বিপ্লবের পথে—ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন বিপ্লবের পথে—পৃথিবীর যত নির্যাতিত মানুষ আছে তাদের সম্মিলিত অভিযানের পথে। দুনিয়ার যত মজুর ও কৃষক এক হও—এক হও প্রত্যেক দেশের জাতীয়তার বিরুদ্ধে—প্রত্যেক দেশের ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে—এই হলো আন্তর্জাতিকতার পথ। ভারতে হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও রাজস্থানের মধ্যে সত্যিকার ঐক্য আন্দোলন আসবে সমগ্রভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আন্দোলনে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আন্দোলনে—ধনতন্ত্রের সীমানায় তা সম্ভব নয়। যে মুহূর্তে ধনতন্ত্রকে স্বীকার করব সেই মুহূর্তে সমস্ত কায়েমী স্বার্থকে স্বীকার করতে হবে—বিদেশী ষড়যন্ত্রে পা ফেলতে হবে— বিভেদকারীদের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার মতো কুৎসিত শত্রুর কাছেও পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে হবে।

দুনিয়ার স্বাধীনতা ও বিশ্ব-বিপ্লব

আর একটু দূরের দিকে তাকালে আর একটা জিনিসও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। আজ পৃথিবীতে সকল দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন। সে দেশ শক্তিশালীই হোক আর দুর্বলই হোক—পূর্ণ স্বাধীনতাই হোক আর ঔপনিবেশিক স্বাধীনতাই হোক—ভৌগোলিক স্বাধীনতা অথবা পৃথিবীর মানচিত্রে রং বেরং দিয়ে আলাদা করা সীমানা দিয়ে ঘেরা স্বাধীনতা আজ সকলের জন্যই বিপন্ন, এমন কি রুশিয়ার স্বাধীনতাও বিপন্ন। জার্মান জাপানের মতো দেশ স্বাধীন রইল না—'অন্যে পরে কা কথা'। আগামী যুদ্ধে আবার কত দেশের স্বাধীনতা চূর্ণ হয়ে যাবে। ধনতন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে আজ যে ভৌগোলিক স্বাধীনতা তা মারাত্মক যুদ্ধ দিয়ে রক্ষা করতে হয়। এক দেশের স্বাধীনতা অন্য দেশের পরাধীনতার উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতা যুদ্ধ করে রক্ষা করতে হয়—আবার যুদ্ধ স্বাধীনতা হরণ করে। অথচ যুদ্ধটা আজকাল আর সীমান্তের যুদ্ধ নয়—উৎপাদন ধ্বংসের যুদ্ধ। সর্বগ্রাসী যুদ্ধ সমস্ত সমাজ, সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি মানুষকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যেতে হয় তবে

স্বাধীনতার কোনো মানেই থাকে না। মানুষের এই বাঁচবার জন্যই এই স্বাধীনতার দরকার কিন্তু বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক স্বাধীনতা সর্বপ্রকারে এক ধ্বংসের আয়োজন মাত্র—এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা হরণই তার ফল।

মোট কথা ধনতন্ত্রের জন্য—তার বিশ্বরূপ সাম্রাজ্যবাদের জন্য আজ মানুষের স্বাধীনতা—দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন। মানুষের স্বাধীনতা আজ আর দেশের ধনতান্ত্রিক ভৌগোলিক স্বাধীনতার স্ফূর্তি পেতে পারে না, পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ধনতন্ত্রের জন্যই আজ পৃথিবীতে ঘন ঘন ভয়ানক থেকে আরো ভয়ানক যুদ্ধ আসছে। মানুষকে যদি স্বাধীন থাকতে হয়—জনসাধারণের দেশগুলিকে যদি স্বাধীন রাখতে হয় তবে এই স্বাধীনতার শত্রু যুদ্ধকে অসম্ভব করতে হবে এবং যুদ্ধের যা কারণ অর্থাৎ ধনতন্ত্রকে সকল দেশ থেকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে। উচ্ছেদ করতে হবে একমাত্র বিপ্লবের সাহায্যে—যা ছাড়া তাকে উচ্ছেদ করা যায় না। এ সম্বন্ধে কোনো ছলনা, কোনো আপস, কোনো দুর্বলতা ও দ্বিধা রাখলে চলবে না।

অতএব ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অঙ্গ তেমনি ভারতের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিশ্বের সকল দেশের সমাজতন্ত্রের জন্য বিশ্ব-বিপ্লবের আন্দোলন।

এই বিশ্ব-বিপ্লবের অপেক্ষায় ভারতীয় বিপ্লব বসে থাকবে না, ভারতীয় বিপ্লব বিশ্ব-বিপ্লবকে ডেকে আনবে।

এই বিপ্লব আজ কোন দেশে প্রথম শুরু হবে এ নিয়ে অনেক তর্ক করা যায়। কিন্তু আসল কথাটা মনে রাখতে হবে যে আজ সমস্ত পৃথিবীর দেশগুলি একই অর্থনৈতিক সূত্রে গেঁথে গেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এক একটি দেশ। আজ স্থানীয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলে কোনো জিনিস নেই। যে দেশ আজ সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া, যারা এখনো হাতের কাজ করে খায়—তাদের তৈরি দ্রব্য সামগ্রীও আজ বিশ্বের বাজারের পণ্য—এবং সেদেশেও ধনতন্ত্রের মূলধন কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক জীবনটাকে কব্জা করে নিয়েছে। স্বতন্ত্র অর্থনীতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাজনীতি বা সামাজিক আদর্শ—আজ আর খাটবে না। তার অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়ায় এই—কোনো এক দেশে বিপ্লব শুরু হলে তা যেমন সমস্ত পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনকে জাগিয়ে দিতে চায় তেমনি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধতাকে জাগিয়ে দেয়। ফলে সমস্ত পৃথিবীর বুকে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তি দুটি এক ভয়ানক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যায়। এই শেষ লড়াই আজ পৃথিবীর পটভূমিকায় সর্বত্র ঘনিয়ে আসছে, কোথাও কম কোথাও বেশি। এশিয়ার নিপীড়িত দেশগুলির:বিশেষ করে ভারতবর্ষের এই বিশ্ব-বিপ্লবের সংগ্রামে সবার আগে এসে যেতে পারা কিছুই অসম্ভব নয় বরং এদেশের বিপ্লবীদল যদি কিছুমাত্র দক্ষতা দেখাতে পারে তাহলে এ সম্ভাবনা খুব স্বাভাবিক। এবং এই বিপ্লব ভারতবর্ষ বা পাকিস্তানের সীমানায় গিয়েই শেষ হবে না, সমস্ত পৃথিবীতে বিপ্লবের সম্পূর্ণ জয়ে এদেশের বিপ্লব সার্থক হবে। বিপ্লব হবার সম্ভাবনাটাই একমাত্র কথা নয়—বিপ্লব করার দল ও লোক চাই।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই চাই কেন?

ভুল ভাঙার যুগ

আর ভারতীয় বিপ্লব দ্বিতীয় স্তরে এসে পৌঁছেছে। প্রথম স্তরে স্বাধীন হব এবং সেই স্বাধীনতা কংগ্রেসই এনে দেবে এবং স্বাধীনতার সঙ্গে তার ন্যূনতম কর্মতালিকা অনুযায়ী কাজ

শুরু করে দেবে কংগ্রেস, এই বিশ্বাস ছিলো কংগ্রেসভক্তদের। আজ কংগ্রেসের স্বাধীনতা মিলেছে কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সুবিধাগুলি হাওয়ার মিলিয়ে যাচ্ছে, জনগণের কোনো স্বাধীনতা নেই—কোনো ক্ষমতা নেই। জনগণ আজ এত দুর্বল, এমন অসহায়, এত পরাধীন যা কোনো কালেই তারা অনুভব করেনি। এই অনুভব করার শক্তি তাদের আজ আছে—কেননা তারা আজ আর ঘুমিয়ে নেই, স্বাধীন হবে বলে বড্ড এগিয়ে এসেছিল, আজ ব্যাটন আর সঙ্গীনের জোরে তাদেরকে আবার তাদের চিরকালের গোলাম ঘরে অর্থাৎ কারখানা ও মাঠে মুখ বুজে কাজ করার ক্ষেত্রে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে— দেশের শাসনকর্তারা। একটা নির্মম হতাশা দেশের বুকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ব্যর্থতার অন্ধ আক্রোশে নিজেদের ক্ষতস্থানটা নিজেরাই আহত জন্তুর মত কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে। জনগণ হিন্দু ও মুসলমানে ভাগ হয়ে নিজেদের উপর নিষ্ঠুর আঘাত হেনে চলেছে– তার ইন্ধন যোগাচ্ছে দুষ্টমতি ধনীর দল, দেশী বিদেশী মালিকের দল, মুসলমান ধনীর দল। এই দাঙ্গায় জনগণের ক্ষতি হচ্ছে এ কথা জেনেও হিন্দু মুসলমান জনগণ এই হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছে কেন জানেনা, কিসের ইঙ্গিতে কোনো নিষ্ঠুর শয়তানের ইচ্ছামত তারা এই কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে—তাদের নিজের ইচ্ছা নিজেদের বিচার কোনো কাজেই লাগছে না-- শয়তানের অদৃশ্য ইঙ্গিতে ক্রমাগত ভুলের পরে ভুল করে যাচ্ছে।

পাকিস্তানে মুসলমানের মুক্তি মিলবে হিন্দুস্থানে মিলবে হিন্দুর বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ না করলে চলবে না, এসব আন্দোলন নিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি করে মরছে। আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে, ছেঁদো কথায় মেতে উঠেছে— অবান্তর সংগ্রাম করে আসল সংগ্রামে পরাজিত হয়ে পড়ছে। সাম্রাজ্যবাদের সাথে লড়াই করবার জন্য যুদ্ধে নেমে নিজেরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি শুরু করেছে, শত্রুর চক্রান্তে সব ভুল করে ফেলছে— কে যে শত্রু তাই বুঝতে পারছে না। আজও সেই একই শত্রু—সেই বিশ্বরূপী ধনতন্ত্র—বহুরূপী সাম্রাজ্যবাদ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই।

তার কারণ দেশের নেতারা এতকাল রং দেখিয়ে শত্রু চিনিয়ে দিত - সাদা যারা তারা শত্রু আর কালো যারা তারা মিত্র। এই সহজ কথাটা দিয়ে দেশের রাজনীতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আসল শত্রুর যে কোনো রং নেই সেই রং হীন শত্রু যে আজ ধনতন্ত্র, যার পরিণত বিশ্বরূপ হলো সাম্রাজ্যবাদ— যে কোনো একটি দেশের বিশেষ দস্যু নয়, কোনো একটি ধর্মের বিশেষ দস্যু নয়--সমস্ত পৃথিবীতে, সমস্ত গ্রামে, শহরে যার বাস— ঘরে ঘরে যার দৌরাত্ম্য, যার ইঙ্গিতে রাজা, বাদশা, নেতা, ধর্মযাজক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বৈজ্ঞানিক, সৈন্য, পুলিশ, খবরের কাগজ সম্পাদক ও রেডিও গোলামের মতো জনগণের ওপরে তার শোষণ কায়েম রাখবার জন্য লেগে রয়েছে—যে আজ চাষীর জমি কেড়ে নিচ্ছে- কুটির শিল্পীকে বৃত্তিহীন করেছে - যে মানুষকে বেকার করে ছেড়েছে--মজুরকে পিষে শোষণ করে নিচ্ছে - মধ্যবিত্তের সোনার স্বপ্ন চুরমার করে দিচ্ছে, যে দরকার হলে দাঙ্গা বাধিয়ে দিচ্ছে নয় তো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে পরগনার পর পরগনা উজাড় করে দিচ্ছে এবং যুদ্ধ লাগিয়ে দেশকে দেশ ছারখার করে দিচ্ছে— সে যে আজ বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পথে জনগণের বিপ্লবকে প্রতি বিপ্লব দিয়ে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে—এবং সেই ধনতন্ত্র যার বিশ্বরূপ, পরিণত রূপ হলো সাম্রাজ্যবাদ এ কথাটি যেন জনসাধারণের মনে বারে বারেই গুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আঘাতের প্রচণ্ডতায়, দুঃখের নির্মমতায় তাদের ভুল বেশিদিন থাকার নয়। ঠেকে ঠেকে তারা দ্রুত শিখে ফেলবে এবং আর ভুল করবে না। ভুল ভাঙবার পালা শুরু হবে এবার।

জীবনের ব্যর্থতা

জীবনের ব্যর্থতা আজ সব দিকে। জীবন আজ ভারবাহী একটা পশু মাত্র. সে পিঠে বয়ে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের বিস্ফোরণ। চলতে চলতে তার ক্ষীণদেহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—কখন যে পড়বে এবং পড়াব সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে এই ভেবে মানুষ আজ ভয়ানক ভীত। কি হবে, তাই তো আগামী যুদ্ধের শেষে মানুষ থাকবে তো? আণবিক বোমার হাত থেকে রক্ষা কোথায়? এই দাঙ্গাব শেষ কোথায়? দুর্ভিক্ষ এল বুঝি? বেকাব সমস্যা এল বুঝি? দেনার হাত থেকে কি বক্ষা নেই? যুদ্ধের জন্য আইন কবে বেঁধে নিয়ে যাবে না তো? কবে দেখব রেশন শপে বুঝি চাল নেই। খবরেব কাগজে নতুন ট্যাক্সের খবব উঠেছে বুঝি, এমনি ধবনের প্রশ্ন, অনিশ্চয়তা ও অসন্তোষ আজ মানুষকে অস্থির করে তুলেছে. ভাবতে তার কষ্ট হয় বলে ভাবতে চায় না—চিন্তা করলে ভয়াবহ পরিণাম ধবা পড়ে বলে চিন্তাশীলেরাও চিন্তা কবা ছেড়ে দিয়েছে।

এমনি অবস্থায় যদি বিপ্লবের ডাক না আসে, যদি সমস্ত চুরমার করে ভেঙে ফেলার ডাক না আসে—এই অমানুষিক মানুষের সমাজটাকে পালটে নতুন করে ঢেলে না সাজানো যায় যদি—তবে মানুষেব বংশও পৃথিবীতে থাকবে না যেমন অনেক জীবজন্তুব বংশ আজ পৃথিবীতে নেই।

মানুষেব মনেব চেহারাটা আজ কি বিশ্রী. কি কুৎসিত স্বার্থপরতা, কি জঘন্য প্রতিযোগিতা, কি ভয়ানক অবসাদ. কি কদর্য অবনতিব স্রোত সমাজের সকল স্তবে বয়ে চলেছে। পচন লেগেছে সমাজেব সমস্ত দেহে, মনে। রাজনৈতিক দলগুলিতেও পচন লেগেছে। সেখানে অন্ধ ক্ষমতাপ্রিয়তা, কদর্য প্রতিযোগিতা, উপদলীয় চক্রান্ত হাসাকব ক্ষীণ দৃষ্টিতে ভরে উঠেছে—জনগণেব শ্রদ্ধা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। জনগণকে ডাক দেবাব মতো নৈতিক জোর তাদের নেই—কাজেব প্রোগ্রাম নেই। দলবক্ষাব জন্যই দল করে চলেছে। কংগ্রেসেব মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভেব জন্য চোবাকাববারীদের দেশভক্তির প্রতিযোগিতা দেখে হাসি পায় অথচ কংগ্রেস কর্তাদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, লজ্জা নেই। আদর্শেব জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ আজ বোকামি বলে চায়েব আসরে হাসির ব্যাপার হয়েছে। আদর্শ আজ উপহাসেব বস্তু আর কাম্য হয়েছে কুৎসিত বিলাসিতা। কর্তব্যের পেছনে নিষ্ঠা নেই, একাগ্রতা নেই, প্রতিজ্ঞা নেই, চেষ্টাব পেছনে ধৈর্য নেই, সাধনা নেই—একটা গতানুগতিক দায়সারা গোছের দিন কাটানো আব খবরেব কাগজে বিবৃতি দানেই সব কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। পঞ্চাশটা লোকের মিটিংকে পাঁচ হাজার লোকের বিরাট জনসমাবেশ বলে কাগজে ছাপিয়ে দল রক্ষা হচ্ছে। তাই নিষ্ঠুর সত্য আজ সমস্ত দল ও উপদলগুলিকে গালে চড় দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তথাকথিত প্রতিবাদ কত বড় ফাঁকি—জনগণকে আজ তাবা ছুঁতেও পারছে না। প্রগতির কথা নিয়ে, একজাতি—একপ্রাণ—একতার কথা নিয়ে এই সব নেতাবা আজ বস্তিতে যেতে সাহস করে না. হিন্দুর কাছে গোঁড়া হিন্দু বলে যায়, মুসলমানেব কাছে যায় পাকিস্তানের সমর্থক হয়ে অথবা কারুর কাছেই যায় না। জনগণ শয়তানের ইঙ্গিতে, ব্যর্থ আক্রোশে বস্তিব আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে, আর এরা খবরের কাগজে এর বীভৎসতার কথা কাহিনী এঁকে এঁকে হয় তাদের পৈশাচিক মনোবৃত্তিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, মজা দেখছে, নয়তো সাধু বাণী ছড়াচ্ছে, নয়তো বলছে শুধু পাকিস্তানেই নয় আরো অনেক খণ্ডস্থানে মিলবে জনগণের মুক্তি।

এই সর্বাঙ্গীন মানুষের মনের দুর্গতির কারণও সহজে স্বাধীনতার জন্য। বিপ্লব ভিন্নই সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করেও যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা হয়েছে সেই তথাকথিত শান্তিপূর্ণতার মধ্যেই এই পচন রয়ে গেছে। বিপ্লব মানে কেবল রক্তারক্তি নয়। এই 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' ক্ষমতা হস্তান্তরেও কম রক্তপাত হয়নি। বিপ্লব মানুষের যা কিছু মহৎ তাকে জাগিয়ে দেয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ

ত্যাগ করতে শেখায়, আত্মত্যাগের জাদু সৃষ্টি করে বেশির ভাগ লোকের মনে। যত গ্লানি, যত ক্ষুদ্রতা, যত কুৎসিত লোভ বিপ্লবের বান সমাজের দেহ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, নতুন জলের পলিমাটি দিয়ে সমাজকে আবার বাঁচিয়ে দিয়ে যায়।

সমাজতন্ত্রবাদ কেন?

আমরা দেখেছি জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলন ধনতন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলে আজ সাম্রাজ্যবাদ থেকে প্রকৃত মুক্তি মিলল না, দেশটাকে এক রাখা গেল না, কৃষি-বিপ্লব সম্ভব হবে না, শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হবে না, গণতন্ত্র পেলুম না, মধ্যে থেকে ফ্যাসিবাদের মতো সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তাবাদকে গ্রাস করে ফেলল, জাতীয় সমস্ত জীবনে এক ভয়াবহ পচন ধরিয়ে দিল, এবং আমরা এ-ও ইঙ্গিত করেছি যে আজ সোজা সমাজতন্ত্র বা মজুর-চাষী পঞ্চায়েতরাজ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই ঐ সব উপরোক্ত প্রয়োজনগুলি মিটতে পারে এবং সমান অধিকার স্থাপন করে দেশের মৃতপ্রায় শরীরে আবার নতুন জীবন, নতুন উদ্যম আনতে পারে এবং এমন কি বিশ্ববিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও স্বাধীনতা চিরকালের জন্য কায়েম করতে পারে। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেবার মধ্যেই রয়েছে মুক্তি, রয়েছে নতুন সৃষ্টির আবেগ। কিন্তু কেন? সমাজতন্ত্রের এত বড় জাদুটা কিসে?

সমস্ত অসন্তোষ, মারামারি, কাটাকাটির মূল কারণ হলো জীবনের বদ্ধগতি। আর্থিক জগতে একদিকে অনটন—অন্যদিকে উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বিকাশ, এই দুই পরস্পর বিরোধী ধারাতে সভ্যতা আজ বিপন্ন। ধনতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে ও সংগঠনের কায়দায় মানুষের হাতে আজ এত প্রচুর তৈরি করবার ক্ষমতা এসেছে যে মাল তৈরি করবার ক্ষমতার উপর যদি কোনো বাধা না থাকত তবে তৈরি মালমশলা, খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদি এত তৈরি করা যেত যে অভাব বলে কোনো শব্দই থাকত না। বিদ্যুৎশক্তিরই পুরো ব্যবহার হচ্ছে না— আণবিক শক্তি বা গামারশ্মির ব্যবহার উৎপাদনের কাজে ধনতন্ত্র কখনোই লাগাবে না। মোট কথা মানুষের অভাব দূর করা চাই। এমন সমাজ চাই যে সমাজ এই বিপুল উৎপাদিকা শক্তির মুক্তি দেবে। ধনতন্ত্র বাজার ও তার দরের উপর নির্ভর করে—লাভ না হলে মালিকেরা মাল তৈরি করে না, বাজারে বিক্রি না হলে লাভ উসুল হয় না, এবং লোকের কেনবার ক্ষমতা কমে গেলে মাল বিক্রি হয় না এবং তাতেই ধনতান্ত্রিক শিল্পের সীমা শেষ হয়ে যায়।

লোকের অভাব আছে—দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে—কিন্তু ট্যাঁকে পয়সা নেই, দোকানী দোকান সাজিয়ে রাখলে কি হবে? ট্যাঁকে পয়সা ছিল না তাদের—সেই দুর্ভিক্ষ তাড়িত গ্রামবাসীদের—যারা শহরে রাস্তায় রাস্তায় এক মুঠি ভাতের জন্য ঘুরে ঘুরে ফুটপাতে মরেছে— কিন্তু দোকান খোলা ছিল—অনেক খাবারের দোকানও ছিল—হোটেলও ছিল - কিন্তু পয়সা ছিল না। পয়সার বিনিময়ে যে বণ্টনের ব্যবস্থা তার কারণ উৎপাদিকা শক্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার—এই সঙ্কীর্ণ বণ্টননীতির ব্যবস্থাই বর্তমান যুগের বিরাট যন্ত্রদানবকে আটকে রেখেছে। লাভের ছোট্ট কয়েদখানায় এই বিরাট উৎপাদিকা শক্তিকে বন্ধ করে রেখেছে। তাতেই এত শক্তি থাকতেও লোকের অভাব মেটাতে পারছে না।

মোট কথা প্রচুর খাদ্য, প্রচুর বস্ত্র, প্রচুর জিনিস তৈরি করতে হবে অথচ তা গুদামে পড়ে থাকবে না ব্যবসায়ীর লাভের অপেক্ষায়। লাভের হিসাব অনুযায়ী মাল তৈরি হবে না— তৈরি হবে লোকের সত্যিকার প্রয়োজনের অনুপাতে এই হলো সমাধান। আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে মানুষ প্রচুর তৈরি করবে এবং ভাগ করে নিয়ে মানুষ প্রচুর ভোগ করবে—এর মাঝখানে কোনো ধনীকে বসতে দেবে না এই হলো সমাজতন্ত্রবাদের নীতি। কোনো মালিক, কোনো ব্যাপারী, কোনো রাজা এসে দেশের উৎপাদনের শক্তির উপর

মালিকানা জারি করে উৎপাদনের উপর তার লাভক্ষতির হিসাব করার এখতিয়ারী পাবে না। সমাজের সকল মানুষের প্রয়োজন হিসাব করে সেই মতো মাল সবাই মিলে কাজ করে সমান ভাগ করে নেবে এই হলো সমাজতন্ত্রের কথা। গোটা সমাজটাই হবে দেশের ধনসম্পত্তির মালিক—কলকারখানা, খেতখামার, নদী, খনি, বনজঙ্গল, সবকিছুর মালিক এবং সেই সমাজে সকল মানুষের থাকবে সমান অধিকার।

সমান ভাগ করে নেওয়াটাই সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ নয়। যদি প্রচুর তৈরি না হয়, তবে সমান ভাগ করে নিলেও ভাগে মিলবে কোন ছাই। উৎপাদন বাড়াতে হবে—এমন বাড়াতে হবে যে সকলে সমান ভাগ করে নিলেও ভাগে যথেষ্ট মিলবে—যেমন যথেষ্ট মেলে জল, বায়ু। জল, বায়ু নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি হয় না—প্রাচুর্যের সমাজে খাদ্য বস্ত্র নিয়েও থাকবে না কোনো ঈর্ষার কারণ। কিন্তু মরুভূমিতে যেখানে জল নেই বা খুব কম আছে—সেখানে জল নিয়েই কাড়াকাড়ি মারামারি হয়ে থাকে।

একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে জিনিসটা পরিষ্কার করা যাক। আজ আমাদের দেশের শতকরা তিনটি লোকের বেশি জুতো পরে না—তাও বছরে এক জোড়া—গড়ে। সকল মানুষেরই জুতোর দরকার। আমরা দেখেছি বাকি ৯৭% লোকের পায়ে জুতো দিতে পারে না সমাজ—ধনতন্ত্রের জন্য। শতকরা তিনটি লোকের পায়ে জুতো জোগাতে দেশে মাত্র একটি বাটা কোম্পানি রয়েছে—বড় কোম্পানির মধ্যে। যদি সবাইকে জুতো পরাতে হয় তবে বাটা কোম্পানির মতো অন্তত আরো ত্রিশটা কোম্পানি করা দরকার। জুতো যদি বছরে ২/৩ জোড়া দিতে হয় তবে অন্তত পক্ষে ৫০টা বাটা কোম্পানির দরকার। কিন্তু ধনীরা আরো জুতোর কোম্পানি করে না কেন? কেননা আর যদি করে তবে জুতো বিকোবে না—জুতো কেনবার মতো পয়সা শতকরা তিনটার বেশি লোকের নেই। একটা বাটা কোম্পানি দাঁড়াতেই অনেক ছোট ছোট কারখানা উঠে গেছে—অনেক মুচির ভাত মারা গেছে, যদি আরো কয়েকটা বাটা কোম্পানি দাঁড়ায় তবে আর একটা মুচিও কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। অতএব ধনতন্ত্রের আমলে আর ২০/৩০টা বাটা কোম্পানি গড়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই, এবং ছোট ছোট কোম্পানিগুলি আজ বাটার প্রতিযোগিতায় উঠে যেতে চাচ্ছে—এবং মোট উৎপাদন তাতে কমে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনি করে, কাপড়, জামা, ওষুধ, তেল, বাড়িঘর সব কিছুরই প্রয়োজন এবং যদি শতকরা ১০০টা লোককেই যথেষ্ট পরিমাণে তা দিতে হয় তবে দেশে হাজার হাজার কলকারখানা গড়ে ফেলা দরকার। কিন্তু ধনীরা তা পারে না—কেননা মাল বিক্রি না হলে তারা তৈরি করার কাজ বন্ধ করে দেয়।

সমাজতন্ত্র এরূপ হাজার হাজার কলকারখানা বসাতে পারে—কেননা সেখানে কেনাবেচার ওপর উৎপাদন নির্ভর করে না—সেখানে মন্দা নেই, অর্থসঙ্কট নেই—মূলধনের অত্যাচার নেই। মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পয়সার দৌরাত্ম্য সেখানে নেই—সকলকেই খাটতে হবে একটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী, সমাজের দাবি থাকবে সকলের ওপর—আর সকলের সমান দাবি থাকবে সমাজের ওপর—যে সমাজ তৈরি মাল সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেবে। ভাগ করে দিতে সমাজের কোনো অসুবিধা নেই কেননা প্রচুর মাল তৈরি হবে। মানুষ সেদিন শুধু গায়ের জোরে কাজ করবে না—প্রকৃতির শক্তি অর্থাৎ কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ, আণবিক শক্তি ও গামারশ্মির শক্তিগুলিকে চাকরের মতো খাটিয়ে নেবে—শিক্ষিত চতুর স্বাস্থ্যবান লোকদের সাহায্যে।

উৎপাদিকাশক্তির এই মুক্তি—ব্যক্তিগত অধিকার থেকে মুক্তি মানুষের সৃজনী শক্তির অবাধ মুক্তি এনে দেবে। নব নব আবিষ্কার, জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্য নতুন গবেষণা, শিক্ষা ও আদর্শ মানুষের মনের চেহারা দেবে বদলে। রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে তখন, বিশ্বপ্রকৃতির অনেক না জানা রহস্যের আবিষ্কার অভিযান চলবে, তখন সে মানুষকে দেখে চেনবার জো থাকবে না

যে এরাই একদিন রাস্তায় রাস্তায় পরস্পরের গলা কেটে আনন্দ পেত—আকাশ থেকে বোমা ফেলে মানুষকে ধ্বংস করে হাততালি পেত।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পিছিয়ে পড়া রাশিয়ায় একদিন লেনিন এই বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন। সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সেদিন সমস্ত বিশ্বের শত্রুতাকে জব্দ করে দিয়েও রাশিয়াকে এমনভাবে গড়ে দিয়েছিল যে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্দান্ত যোদ্ধা হিটলারকে তার কাছে হার মেনে যেতে হয়। সেদিন রাশিয়াব সামনে অপর কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের দৃষ্টান্ত ছিল না যা দেখে তারা শিখতে পারে। আজ ত্রিশ বৎসর পরে রাশিয়ার ইতিহাস থেকে আমরা দৃষ্টান্ত পেয়েছি—তাদের ভুল ত্রুটিগুলিও দেখতে পেয়েছি—আমরা ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র আরো নিখুঁতভাবে গড়ে তুলতে পারি। তাছাড়া ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্ব-বিপ্লবের আর একটা জোয়ার এনে দিতে বাধ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যের চরম পতন তাতেই সম্ভব, তাতে সমগ্র এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য—এমন কি ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হু হু করে এগিয়ে যেতে বাধ্য। আজ ভারতের বিপ্লব ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না তা বিশ্ব-বিপ্লবে পরিণত হতে চাইবে। পিছিয়ে পড়া একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়বাব অসুবিধা ও অন্তরায়গুলি তাতে দূর হবে এবং ভারতে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ রাশিয়ার চেয়ে সব দিক দিয়েই সহজ হবে।

ভারতে শিল্প-বিপ্লব আনতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্র—যার উপরে কোনো বাজারের বাঁধন নেই—মূলধনের অত্যাচার নেই। এই শিল্প বিপ্লব প্রচুব ট্রাক্টর তৈরি করবে—যন্ত্রের চাষ চলবে—গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে—ছোট বড় নানা রকমের শিল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তুলবে—জমির উপর চাপ কমিয়ে দিয়ে অসংখ্য লোকের অন্যান্য কাজ ও জীবিকা জুগিয়ে দেবে। কোনো মানুষের আফশোষ থাকবে না এই বলে যে তার কাজের সুযোগ মেলেনি—কারো ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকবে না কোনো দুশ্চিন্তা।

প্রতিদিনের অভাব অভিযোগ অনটনে যে বিরক্তি জমে ওঠে, আজকের দিনে তারই ফলে দেখা দেয় নানা রকমের সামাজিক অশান্তি, মারামারি। সে অভাবের মূলে, সে বৈষম্যের মূলে চরম আঘাত হানবে সমাজতন্ত্র। সামাজিক অশান্তি চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাবে।

ধর্মান্ধতা নিয়ে আজ যে হানাহানি চলেছে তা শত প্রচার দিয়েও দূব করা যাবে না যতক্ষণ না ধর্মান্ধতার মূল কারণ দূর হয়। ভগবান হিন্দু না মুসলমান এই নিয়ে হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া নয়। সবাই জানে যে ভগবান যদি থেকে থাকেন তিনি একই। তবুও গান্ধিজীর রাম রহিমের বাণী কারো ধর্মান্ধতা দূর করতে পারছে না কেন? সামাজিক জীবনে অসহায়তা, অত্যাচার ও দুর্বলতা থেকেই আসে ধর্মের উপরে বিশ্বাস। এই দুর্বলতা ও অসহায়তা আসে সমাজের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা থেকে। মার খেয়ে, হার মেনে লোকে আশ্রয় খোঁজে কোনো এক শক্তির, সেই শক্তি সমাজে কোথাও দেখতে পায় না বলে—কোথাও আশ্রয় পায় না বলে খুঁজে বেড়ায় অপ্রাকৃত শক্তি। যদি মার না খায়, যদি দারিদ্র্য না থাকে, যদি জীবন নিয়ে সদাই বিপদগ্রস্ত হতে না হয়, যদি জীবনে নিশ্চয়তা মেলে, তবে এই সব দুর্বলতার কারণও দূর হয়ে যাবে। তখন দুষ্টমতি লোকেরা ধর্মের নামে লোক ক্ষেপাতে পারবে না আর সাধারণকে ক্ষেপিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করবারও থাকবে না কোনো উপায়। তখন সত্য যা তা যাচাই করে নিয়ে বিচার করে নিয়ে লোক গ্রহণ করবে, অন্ধবিশ্বাসের মূল উৎপাটন হয়ে যাবে। এই অত্যাচারে ভরা সমাজ ব্যবস্থা বজায় রেখে ধর্মান্ধতা শত শিক্ষা দিয়েও দূব করা সম্ভব নয়—নইলে জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত আধুনিক ভদ্রলোকদের এত ধর্মান্ধতা এল কোথা থেকে? অশিক্ষাই ধর্মান্ধতাব মূল কারণ নয়—মূল কারণ শ্রেণী-সংগ্রাম ও অত্যাচারমূলক সমাজ। তাই হিন্দু মুসলমানের একতা আজ ধর্মের নাম করে দাঁড় করাবার উপায় নেই—শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিপ্লবের ডাকে দরিদ্র হিন্দু মুসলমান জনসাধারণকে একত্র করা সম্ভব হবে।

বর্ণ হিন্দু ও হরিজন সমস্যা দূর হবে ওখান থেকেই—নইলে মন্দির হরিজনদেব জন্য খুলে দিলেও হরিজনদের দুঃখ ও রাগ দূর হবে না। সামাজিক অপমানের মূল কাবণ—শ্রেণী বৈষম্য—যতদিন ধনী দরিদ্রে সমাজ বিভক্ত থাকবে ততদিন সমাজ-জীবন থেকে অপমান দূর হবে না। অপমান ও অত্যাচার সমাজতন্ত্রের যুগে দেখতে পাওয়া যাবে না। পিছিয়ে পড়া বন-জঙ্গলের অধিবাসীদের, আদিবাসী, সাঁওতাল, কোল, কুকী, নাগা, মিকির—কাউকে শোষণ করবার, দাবিয়ে রাখবাব প্রয়োজন থাকবে না তখন, তাদেরকেও সমান অধিকার ও সুযোগ দিয়ে সভ্যতার মধ্যে টেনে আনা হবে।

এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন?

বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখলে একথা মানতেই হবে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পৃথিবী প্রস্তুত এবং ভাবতবর্ষও সমাজতন্ত্র ছাড়া এক পা এগুতে পারে না। যত দেরি হচ্ছে মানুষের দুঃখ তত বেড়েই চলেছে—দুর্গতি ও অবনতি ঘটছে সকল রকমের। দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে—সকল রকমের প্রতিবাদ ধুলোয় মিশে যাচ্ছে—সমস্ত রকমের দায়িত্ববোধ ও সমাজচেতনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমাজের এই পচন বন্ধ করার জন্য আব এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না—সমাজের রুদ্ধগতি মুক্ত কবে দিতে হবে। দেরি করতে গিয়ে, দ্বিধা করে দেশ ভয়ানক বকমের পিছিয়ে পড়তে চাচ্ছে। শিশুহত্যা, নারীহত্যা, বস্তি জ্বালানো, অসহায পথিকের উপর আক্রমণ—ঘুষ, জুলুম, গুণ্ডামি, চোবাবাজার, কালোবাজার ইত্যাদি যে সমস্ত ভয়াবহ লক্ষণ দেখা দিয়েছে এ থেকে সমাজের সমাজতন্ত্র ছাড়া আব কোনো মুক্তিব রাস্তা নেই, অতএব যত তাড়াতাড়ি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনা যায় ততই মঙ্গল।

বাস্তব অবস্থা যা তাতে ভাবতবর্ষে সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই চলতে পারে না। ভারতবর্ষ সমাজতন্ত্রের জন্য সব দেশের চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র, এখানকার দারিদ্র্যের বোঝাটা এত ভারি, এখানকার সমস্যাব জটিলতা এত কঠিন যে ধনতন্ত্রের কোনো সাধ্য নেই সেই ভার কিছুমাত্র কমায়, তার জটিলতা কেবল বাড়িয়েই দিতে পারে। অবস্থার দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রের কোনো বাধাই নেই—কেননা বিরাট কৃষক সমাজের সমস্যা বা কৃষি-বিপ্লব আজ আর ধনতন্ত্রে সমাধান হতে পারে না, সমাজতন্ত্রেই সমাধান হতে পারে। কৃষক সমাজতন্ত্র চাইবে না, বিরোধিতা করবে এই মামুলি যুক্তি টিকবে না। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঁচবার রাস্তাও নেই ধনতন্ত্রে—দিনকে দিন তাকে এই পথে গুঁড়িয়ে যেতে হবে। কোনো প্রকাব দ্বিধা বা অলস কল্পনা তাকে বাঁচাতে পারবে না।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য মানসিক প্রস্তুতি কোথায়?

বাস্তবতার দিক দিয়ে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি। কিন্তু যেদিক থেকে অভাব দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে সচেতন ইচ্ছার দিক থেকে। সমাজতন্ত্র যে এখনি চাই, এই চাওয়া বোধটা পরিষ্কার করতে হবে জনসাধারণের মনে। মানুষের সক্রিয় ইচ্ছার ভিতর দিয়েই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। প্রথমেই চাই আমাদেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে সমাজতন্ত্র এখনই আনব। ইচ্ছার অজ্ঞাতে, চেষ্টার অভাবে দেশটা আপনা থেকেই সমাজতান্ত্রিক হয়ে যাবে না। আপনা থেকে কোনো সমাজবিপ্লব ঘটে না—আপনা থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় মাত্র। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও সচেতন চেষ্টা সেই নতুন ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করে দেয়।

দেশে সংগঠন নেই—সমাজতান্ত্রিক চেতনা নেই—বিপ্লবের হাতিয়ার পঞ্চায়েত নেই ইত্যাদি নানা যুক্তি শোনা যাবে। নেই তো বটেই—কিন্তু না করলে হবে কোথা থেকে? যারা বিপ্লবী তারাই যদি সমাজতন্ত্রকে তাদের প্রোগ্রাম হিসাবে না নেয়—যারা সমাজতন্ত্রী বা

কমিউনিস্ট তারাই যদি সমাজতন্ত্রকে দূরের আদর্শ বলে একমাত্র বইয়ের পাতায় আর আলমারীতে তা আবদ্ধ করে রেখে দেয় সংগঠন হবে কোথা থেকে? এবং সংগঠন নেই বলে তখন দুঃখ করাও চলে না। বেশির ভাগ সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রকে একটা দূরের আদর্শ হিসাবে ধরে রেখেছে—তারা প্রায় সবাই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের জাতীয় সরকারগুলিকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—তারা লোকদের ভুল বোঝাতে শুরু করেছে যে স্বাধীনতার ন্যূনতম কর্মতালিকা এই সব জাতীয় সরকার সফল করতে পারে—সমাজতন্ত্রকে আজকের প্রোগ্রাম হিসাবে তারা গ্রহণ করেনি। তাদের সমাজতন্ত্র একটা কল্পনা বা স্বপ্ন মাত্র—বাস্তব প্রোগ্রাম নয়। তাই তাদের দলগুলিকে কখনো সমাজতন্ত্রের জন্য তৈরি করেনি—জনসাধারণকে কোনো সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে সংগঠিত হতে কিছুমাত্র সাহায্য করেনি। সমাজতন্ত্রের জন্য প্রকৃতপক্ষে এরা কোনোদিন কিছু করেনি—বরং ভুল বুঝিয়েছে—মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে জনসাধারণের শত্রুর সংগঠনকেই শক্ত করেছে—জনসাধারণকে রেখেছে দুর্বল করে।

স্ট্যালিনপন্থী কমিউনিস্টরা গত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে চালিয়ে তাকে সাহায্য করতে গিয়ে দেশে কমিউনিজমকে করল ঘৃণার বস্তু—সুযোগ বুঝে ধনীরা 'সব কমিউনিজমই এক'—এই মিথ্যা প্রচার চালু করে দিল। স্ট্যালিনপন্থীরা হিন্দু জনসাধারণকে কংগ্রেসে ও মুসলমান জনসাধারণকে মুসলিম লীগে যোগ দিতে সাহায্য করতে সর্বদা প্রচার করে এসেছে—অথচ সেগুলি যে ধনীদের দল এবং তাতে যে ধনীদেরই সংগঠন শক্ত করা হয় সেদিকে খেয়াল করল না। আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে লীগের সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলল। কংগ্রেস-লীগ একতার নামে ধনী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের এক করাই হলো তাদের প্রধান কাজ। জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, নিজস্ব শক্তি, নিজস্ব আদর্শ, নিজস্ব নেতৃত্ব, নিজস্ব লড়াইয়ের নীতি—এই কাজে কোনোকালে সত্যিকার কোনো সাহায্য করেনি—অথচ তারা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে তাদের মাথায় রেখে দিয়ে সাম্যবাদকেই কলঙ্কিত করে চলেছে। এরা যদি কমিউনিস্ট নামটা ছেড়ে দিত—তবে আর কোনো নালিশ থাকত না তাদের বিরুদ্ধে কেননা কমিউনিজম তারা কোনো দিনই প্রচার করেনি।

আজও তাদের কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের চিৎকার শেষ হয়নি। আজ তারা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান উভয় দেশের রাষ্ট্রকেই সাহায্য করবে। উভয় দেশের ধনিক নেতৃত্বের নিকট জনগণকে সঁপে দিয়ে—জনগণের যেন কোনো ক্ষতি না হয় তার জন্য আবেদন নিবেদন করে চলেছে। উভয় দেশের নেতারা অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার মাতব্বরেরা মিলে বিলেতী মূলধন বাজেয়াপ্ত করুক, দেশের গণতন্ত্র কায়েম করুক ইত্যাদি সদিচ্ছা প্রকাশ করছে। দেশীয় ধনতন্ত্র আজ পৃথিবীর ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে দিক—এই হলো তাদের আশা। সমাজতন্ত্র তারাই করে দিক—এমন কথাও তারা বলতে পারে। এরা সমাজতন্ত্রের বদলে "নয়া গণতন্ত্র" বলে এক জিনিস চালাতে চাচ্ছে—যার প্রকৃত ভিত্তি হলো ধনতন্ত্র—সমাজতন্ত্র নয়। তারা তেভাগা আন্দোলনের নামে জোতদারদের বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের একক সংগ্রাম চালাতে বলেছিল—কিন্তু সরকারের গায়ে, জমিদারের গায়ে, ধনীর গায়ে হাত দিতে নিষেধ করে দিল—সেখানে তারা লীগ মন্ত্রিত্বের অবসান করতে একটি কথাও বলল না। তারা চাষী ও মজুর রাজের জন্য লড়াই করে না—তারা লড়াই করে কংগ্রেস-লীগ রাজত্বের জন্য। তারা মজুর ধর্মঘটগুলিকে কখনোই রাজনৈতিক রূপ দিতে চায় না—মজুরকে সরকারবিরোধী করতে চায় না—মজুর ও চাষীর সমগ্র দাবি দিয়ে লড়াই করবার সম্মিলিত কায়দা নিতে প্রস্তুত নয়—কেননা সে কায়দায় বিপ্লব আসে। সামনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের উপর যে নিয়মতান্ত্রিক ভোটাভুটির রাজনীতি আসছে—তারই জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে—বিপ্লবের জন্য নয়।

পৃথিবীর কোনো দেশেই এই মেকি কমিউনিস্টরা সোজা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিতে

সাহস পায় না। ফরাসী দেশে, জার্মানীতে, ইয়োরোপের সর্বত্র তারা দলে ভারি, সর্বত্র যুদ্ধের পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, সেখানে তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে "নয়া গণতন্ত্রে" পরিণত করতে ব্যস্ত হলো যার কোনো অর্থ নেই—একটা আপস ও মিশ্র সমাজের কাল্পনিক প্রোগ্রাম মাত্র। সোজা সমাজতন্ত্র আনবার জন্য কোথাও ডাক দিল না। এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকার পরিণাম হবে প্রতিক্রিয়ার অভ্যুত্থান। এত ফাঁক সত্ত্বেও লোকে এদেরই বলে কমিউনিস্ট।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল বা ভারতের জাতীয় সমাজতন্ত্রীদল আজও কংগ্রেসকেই সমাজতন্ত্রী করবার চেষ্টায় ব্যস্ত। তারা কংগ্রেসকে যে শুধু গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একমাত্র সংগঠন হিসাবেই প্রচার করে তা নয়—তারা বিশ্বাস করাতে চায় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রও এনে দেবে। অতএব হিন্দুস্থানে কংগ্রেসরাজকে আরো শক্ত করাই হলো তাদের একমাত্র কাজ—ধর্মঘট ও চাষী-বিদ্রোহ করে এই কংগ্রেসরাজকে বিব্রত করতে তারা নারাজ। যা কিছু আন্দোলন আজ করার দরকার আছে সে কেবল দেশীয় রাজাদের হিন্দুস্থানের গণপরিষদে যোগ দেওয়াবার জন্য এবং পাকিস্তানকে জব্দ করার জন্য। আসলে হিন্দুস্থানের ধনীদের রাজত্বকে শক্ত করা, বড় করাই হলো তাদের কাজ। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের উপর যে ভোট যুদ্ধ হবে—সেই ভোট যুদ্ধের অপেক্ষায় তারা এখন মহড়া দিয়ে বেড়াবে এবং সেই ভোট যুদ্ধে যাতে কংগ্রেস পবাজিত না হয় তার জন্য কংগ্রেস যে একদিন সমাজতন্ত্রও এনে দেবে, মজুর-চাষী-প্রজা-রাজ করবে—তার প্রচার চালিয়ে যাবে।

অতএব তথাকথিত বামপন্থীদের বড় বড় দলগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে চলেছে। জনসাধাবণের কাছে আজ তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের সমগ্র রূপ—সমগ্র রাজনৈতিক রূপ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও রাজস্থান সর্বত্রই যে এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একসাথে শুরু করতে হবে এই দায়িত্ব বোঝাতে বেশি দল নেই। অথচ এই দায়িত্ব বোঝাবার উপরই সব নির্ভর করে। ভারতীয় জনগণের মনে রাষ্ট্র বিপ্লবের এই প্রয়োজনীয়তা আজ তীব্র করে স্পষ্ট করে বোঝাবার দায়িত্ব বিপ্লবী সাম্যবাদীদের—অন্যান্য যে কোনো দল যদি এই কর্মপন্থা গ্রহণ করে তবে অবিলম্বে তাদেব সাথে হাত মেলাতে হবে—কোনো দ্বিধা করা চলবে না। কিন্তু এই কর্মপন্থার সফলতা নির্ভর করে আজ জনগণেরই উপর—সোজা জনগণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব বোঝাতে হবে—ক্ষুদ্র দল ও উপদলের উপর নির্ভর করলে চলবে না। খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে—বিপ্লবের গতিকে প্রতি-বিপ্লবের গতির চেয়ে বেশি বেগবান করতে হবে।

সমাজতন্ত্রের জন্য কখনোই যে সংগ্রাম কববে না—সে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা চায় না, কৃষি বিপ্লব চায় না—গণতন্ত্র চায় না, দেশকে এক করতে চায় না, পৃথিবীতে শান্তি চায় না—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শেষ চায় না—সে সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল—বিপ্লব-বিরোধী। তার পক্ষে নৌ বিদ্রোহের অর্থ বোঝা সম্ভব নয়, তার জন্য পুলিশ ও সৈন্য বিদ্রোহের কোনো ইঙ্গিত নেই, তার কাছে বর্তমান মজুর আন্দোলনের কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক অর্থ নেই—চাষী বিদ্রোহে তার বাহবা দেওয়া চলে না। কেননা সব অসন্তোষ, বিদ্রোহ, ধর্মঘট ইত্যাদির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত হলো আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যদি বিপ্লব আনতে রাজি না থাকি—তবে এই সব আন্দোলনের কোনোই অর্থ থাকে না। দেশের জনগণ একটা বিরাট পরিবর্তন চায় কিন্তু তাদের চাওয়ার অর্থ তাদের কাছে স্পষ্ট নয়—তারা বুঝতে পারে না তাদের বিদ্রোহ কোথায় গিয়ে সার্থকতা পেতে পারে—না বুঝলেও যা অবস্থা তাতে বিদ্রোহ না করে, থাকতে পারে না। তাদের অবস্থা চরমে পৌচেছে—তাদের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে—কিন্তু দেশের দলগুলি তাদের বুঝিয়ে দেয় না যে তাদের দাবি ন্যায্য—তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব বিরাট এবং এই দায়িত্ব একমাত্র মজুর-কৃষক রাজ বা সমাজতন্ত্রেই পালন করা হবে—অন্য কোনো উপায়ে নয়।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

রাষ্ট্র বা শাসনযন্ত্র সম্বন্ধে একটা বিরাট অজ্ঞতা রয়েছে আজ দেশে এবং এই অজ্ঞতাকে দূর করা কোনো 'বিপ্লবী' আজও দরকার বলে মনে করেনি—বরং নানা কাজ ও কথার মধ্য দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণের ধারণা এই রাষ্ট্রটা একটা প্রয়োজনীয় যন্ত্র মাত্র—এর কোনো বিশেষ রাজনীতি নেই—যার হাতে পড়বে তার নীতি অনুযায়ীই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে। যেমন লাঠি দিয়ে সাপও মারা যায় আবার লোকের মাথাও ফাটানো যায়—লাঠির কোনো দোষগুণ নেই—লাঠিধারীর হাতে তার দোষগুণ নির্ভর করে। তেমনি আজ দেশের বুকে আইন আদালত, সৈন্য, চৌকিদারী, দফাদার, থানা, কাছারি, জেল, হাজত, দুর্গ প্রভৃতি নিয়ে যে সরকারি যন্ত্রটা রয়েছে, তাব মাথায় যদি কোনো ইংরেজ থাকে তবে হবে তা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র—যদি কোনো কংগ্রেস নেতা থাকেন তবে জাতীয় সরকার—যদি জয়প্রকাশ নারায়ণ থাকেন তবে তা হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—আব যদি পি সি যোশী থাকেন তবে হবে তা খাস কমিউনিস্ট সরকার। কিন্তু এত মোটাবুদ্ধি ও বালসুলভ সহজ বিচারে চলবে না। রাষ্ট্র যন্ত্রটি অত সহজ নয় যে আইন সভায় দলে ভারি হলেই সব করা সম্ভব। এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণাব উপরেই সকল প্রকার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির জন্ম হয়ে থাকে—কূটনীতির পাকে পাকে ঘুরে বেড়াতে হয়।

যখন যে শ্রেণী সমাজের উৎপাদিকাশক্তির মালিক থাকে, তারই স্বার্থের প্রয়োজনে, বাষ্ট্রটি হয় তার নিজস্ব রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রয়োজনই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য। রাষ্ট্র মালিক শ্রেণীর একটি দুর্দান্ত আইনসঙ্গত দস্যুতা মাত্র। এই যন্ত্রটি এত সুনিপুণ ভাবে তৈরি করা হয় যে অন্য কোনো শ্রেণী তাতে হাত দিতে পারে না—অন্য শ্রেণীর নেতারা যদি তাতে ঢোকে তবে তাদের নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলতে হয় এবং কালে কালে মালিক শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করে চলে।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এ দেশের লোকদের অবাধ শোষণের জন্য যে দস্যু-সরকার তৈবি করেছে, সেই রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়েই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার ন্যূনতম কর্মতালিকা কাজে চালু করতে পারা যায় এত বড় মিথ্যা আর হয় না। ইংরেজের হাত থেকে কংগ্রেস ও লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল ভারি কাঠামোতে কোনো আঘাত পড়ল না, উত্তরাধিকারী হিসাবে ইংরেজের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটি নিঃশব্দে দেশনেতারা হস্তগত করে স্বাধীন দেশ গঠনেব অনেক স্বপ্ন দেখছেন। বর্তমান গণ-পরিষদগুলি সাধারণ আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে গোটা কয়েক আইন তৈরি করবে মাত্র—কিন্তু শাসন, শৃঙ্খলা, প্রতিদিনের নিয়মকানুন, জেল, পুলিস, সৈন্য নিয়ে যে বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্রটি আছে তাকে অটুট বেখেই কাজ চালাবে। এমনকি সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় খুশি এবং এখানে সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রে যে ফাটল ও শিথিলতা দেখা দিয়েছে—তার সংস্কার করে পুনরায় শক্ত ও জবরদস্ত কাজে তারা সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটের অধিকার কায়েম হলে—যা এই সব গণপরিষদ করতে চাচ্ছে—বামপন্থীদের আনন্দের আর সীমা নেই। তা হলেই নাকি গণতন্ত্র কায়েম হবে এবং বামপন্থীরা বেশি সংখ্যায় আইন পরিষদে ঢুকে সমাজতান্ত্রিক আইন পাস করে দেশে সমাজতন্ত্র এনে দেবে—বিপ্লবের দরকার হবে না।

পৃথিবীতে অন্যান্য দেশে এই সব নিয়মতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অনেকবার পরীক্ষা হয়ে গেছে—আবার এবারে দেখা দিয়েছে নিয়মতান্ত্রিক কমিউনিজম। একই নীতি—অর্থাৎ ভোটের জোরে আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার চেষ্টা এবং সেখানে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক আইন পাস কবা। এই পথে স্পেনে কিছু হয়নি—ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদ শেষ পর্যন্ত কায়েম হয়েছে—এ পথে

ফ্রান্সে কিছু হয়নি, এপথে জার্মানীতে কিছু হয়নি, এ পথে ইংলণ্ডে কিছু হয়নি। সর্বত্র এই পথ বিপথ বলে পরীক্ষিত হয়ে গেছে, প্রমাণ হয়ে গেছে। ইংলণ্ডের বর্তমান সোশ্যালিস্ট সরকার একের পর এক বিফল হতে চলেছে—কেননা তারা ধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার নামকে দিয়েছে সমাজতন্ত্র—নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে না পারছে ধনতন্ত্রকে শেষ করতে, না পারছে ধনতন্ত্রকে চালু রাখতে—ফলে নিষ্ফল চেষ্টার জন্য জনসাধারণের কোনো দুঃখই দূর করতে পারছে না। সাম্রাজ্যের ব্যাপারে—বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে লেবার সরকার সেই পুরানো সাম্রাজ্যবাদী নীতিই চালিয়ে চলেছে—এই জন্য সেখানকার ধনপতিদের সহযোগিতা তারা পাচ্ছে—এবং ধনপতিরাও বর্তমান দুরবস্থার জন্য সাক্ষাৎ ভাবে দায়িত্ব এড়াবার জন্য এই সব শিশুসুলভ সমাজতান্ত্রিকতার হাস্যকর চেষ্টা সহ্য করে যাচ্ছে। চার্চিল মৃদু মৃদু হাসছেন—তিনি জানেন তাদের দল আবার সগৌরবে ফিরে আসবে।

পৃথিবীর যত ধনতন্ত্রীরা তাদের আশু বিপদ এড়াবার জন্য—জনসাধারণের বিপ্লব ও বিদ্রোহ এড়াবার জন্য—তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটি অনেকবার তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের কাছে ভাড়া খাটিয়েছে—এবং কিছুদিন পরেই সগৌরবে নিজ মূর্তিতে এসে নিজেদের যন্ত্র নিজেদের হাতে নিয়েছে।

ধনতান্ত্রিক অসাম্যের উপর গণতন্ত্রের ভোটাভুটি একটা বিরাট ধাপ্পা, একটা প্রকাণ্ড চালাকি। অর্থনৈতিক সাম্য না থাকলে, ভোটের সমান অধিকারের কোনো মানে থাকে না। অর্থের জোরে, প্রতিপত্তির জোরে, সংগঠনের জোরে, প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে, ভাড়াটিয়া ভলান্টিয়ারের সাহায্যে টাকা ছড়িয়ে ধনপতিরা সব সময়ে তাদের লোকদেরই আইন সভায় পাঠাতে পারে। যদি বা এই সব অতিক্রম করেও প্রকৃত বামপন্থীরা আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে—আইন সভাকে দরকার হলে বানচাল করে দেবার মতো ক্ষমতাও এদের আছে—কেননা রাজকর্মচারী, সেনাপতি, পুলিশ সাহেব, আদালতের জজ থেকে আরম্ভ করে যে এক বিরাট দুর্ভেদ্য আমলাতান্ত্রিক দুর্গ তারা রচনা করেছে, তাকে ভেদ করার সাধ্য আইন সভার নেই। এই নিষ্ঠুর সত্য আজকের যুগে সব বিপ্লবী সব সমাজতন্ত্রীকেই স্বীকার করতে হবে।

বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ভোটের অধিকার যতই বাড়ুক—সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রটি দিনে দিনে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে—তার শাসন করবার নির্মমতা বেড়ে চলেছে—তার শাসন করবার শক্তি অমোঘ হয়ে উঠেছে—তার কলেবর বিরাট ভার নিয়ে জনগণের উপর চেপে বসছে। বিভিন্ন কমিটি, বিভিন্ন শাসনতন্ত্র বিশারদেরা ও বিশেষজ্ঞ নিত্যদিন শাসন যন্ত্রকে শক্ত করবার কৌশল আঁটছে। বিদ্রোহ, ধর্মঘট, বিপ্লব দমন করবার কৌশল ও যন্ত্রপাতির অশেষ উন্নতি করেছে—এবং প্রচারের ক্ষমতা অসম্ভব বাড়িয়ে ফেলেছে—খবরের কাগজ, রেডিও ও অন্যান্য প্রচার যন্ত্র দিয়ে যে কোনো জিনিসকে চালু করতে পারছে। এই বিরাট যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে মন্ত্রীরা থৈ পায় না, বিশেষজ্ঞ আমলাতন্ত্রীরা যা লিখে দেয় তাই সই করে দিয়ে আসে।

তারপরে এই রাষ্ট্রযন্ত্র—যে রাষ্ট্রযন্ত্র আজ ইংরেজরা আমাদের রেখে গেল তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ভরা। ঘুষ ছাড়া কোনো বিভাগের কাজ চলে না। সমাজের যত চোর, ডাকাত, খুনী, কালাবাজারী ও চোরাবাজারী সব এই রাষ্ট্র থেকেই রক্ষার ব্যবস্থা পায়। বর্তমান শাসক সম্প্রদায় যেহেতু ধনতন্ত্রী, সামন্ততন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে উচ্ছেদ করতে নারাজ—যেহেতু এই সব প্রধান শোষণ ও দুর্নীতির কারণগুলি মেনে নিয়ে গেল—সেহেতু আজ আর কোনো দুর্নীতিকে দূর করার সাধ্য তাদের নেই। সমস্তটাই যেখানে দুনীতি সেখানে দুর্নীতির সংশোধন করা যায় না—সমস্তটাকে ভেঙে ফেলে দিতে হয় এবং নতুন করে জনসাধারণের হাতে গড়া রাজ—পঞ্চায়েত রাজ কায়েম করতে হয়।

এই শাসনযন্ত্রকে শোধন করবে যে হাতিয়ার—অর্থাৎ কংগ্রেস ও লীগ—সেই দুই

হাতিয়ারের ভিতরকার দুর্নীতিই বা কে দূর করে? আজ সমস্ত কংগ্রেস ও লীগ দলটাই দুষ্ট লোকের মোড়লিতে ভরে গেল। চোরাবাজারের ব্যবসায়ীরাই তাদের মাতব্বর। কংগ্রেস ও লীগের টিকিট পেতে না পেলে কারো আইন সভায় যাবার উপায় নেই—নইলে তাদের দেশদ্রোহী করে ছেড়ে দেওয়া হবে। কংগ্রেস লীগের টিকিট পেতে হলে হাজার হাজার টাকা খরচ করবার ক্ষমতা থাকা চাই—তারপরে ভোটাযুদ্ধেও কয়েক হাজার টাকা চাই—বিরাট একদল ভলাণ্টিয়ার পোষণ করা চাই—১০/২০টা মোটর লরি চালাবার মতো পয়সা থাকা চাই ইত্যাদি। এত সব অতিক্রম করেও যদি আইন সভায় পৌঁছানো গেল সেখানে চিরস্থায়ী আমলাতন্ত্রের হাতে অপদস্থ হয়ে মাথা নুয়ে তাদের কথামত সায় দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ থাকবে না।

ঘুষে ভরা, জরাগ্রস্ত, নিষ্প্রাণ, নিষ্ঠুর এই আমলাতন্ত্র বা রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশের কোনো ভাল কাজই করা সম্ভব নয় বরং দিনকে দিন যত অশান্তি ও অবনতির কারণ হবে এই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যত সব শোষণকারীরা তাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দুর্গ সৃষ্টি করে রেখেছে—এই রাষ্ট্রকে ভেঙে চুরমার না করে দিলে কোনো প্রকার পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়। এই রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো প্রকার মোহ থাকা মারাত্মক ভুল এবং এই ভুল যারা করে তারা বামপন্থী নয়—প্রতিক্রিয়ার দালাল।

যখন বিপ্লবীরা বলে রাষ্ট্রটাকে ভেঙে ফেলতে হবে তখন তারা কি বোঝাতে চায়? রাষ্ট্রের দর-দালান, অফিস, কাছারি, দুর্গ সব চূর্ণ করে দাও এবং বর্তমানে যারা সরকারি কাজ করছে তাদের মেরে ফেল—একথার অর্থ এই নয়। রাষ্ট্র একটি সংগঠন মাত্র—একটা সশস্ত্র ও শক্তিমান দল। এই সরকারি দলটা বিস্তর লোককে নিয়ে তৈরি কিন্তু এর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ধনিক শ্রেণীর। এই সমস্ত দলটাকে দিতে হবে ভেঙে। এই সংগঠনটাকে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে—যাতে তার ভেতরকার লোকগুলি দলবদ্ধ না থাকতে পারে—ছিন্ন ভিন্ন হয়ে দলচ্যুত হয়ে সাধারণের মধ্যে মিশে যেতে পারে। এই ভাঙার কাজটা কোনো কালেই নির্বিবাদে হয় না, বিপ্লব করতে হয় এবং অনিবার্য যতটুকু ততটুকুই ধ্বংস করতে হয়।

যারা ধনতন্ত্রকে ক্রমে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করে নিতে চায়—তারাই বর্তমান রাষ্ট্রটি পেয়ে মহাখুশি—যেন এই রাষ্ট্র দিয়েই এই রূপান্তরের কাজটি করা সম্ভব। ধনতন্ত্র কোনোকালেই সমাজতন্ত্রে পরিণত হয় না—ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে অহি-নকুল সম্পর্ক, একটা অপরটার পরম শত্রু। ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করেই সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো যায়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীরে ধীরে এই রাষ্ট্রের সাহায্যে ধনতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তিত করার চেষ্টা এত হাস্যকর যে বলার নয়। অথচ এই দিয়েই আজ নানা দল নানা ধোঁকা দিতে ব্যস্ত।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এইসব জঞ্জাল আর দুর্নীতির উৎস ও দুর্গগুলি চূর্ণ হয়ে যাবে—জনগণ সত্যিই মুক্তি পাবে। ক্ষুদ্র চেতনার অবসান হবে। সমাজ গঠনের কাজে নতুন উদ্দীপনা মিলবে—দুর্দান্ত সাহস দেখা দেবে জনগণের বুকে—বিপ্লবের অসীম শক্তি দিয়ে দেশের ভিতরের ও বাইরের প্রতিবিপ্লবকে সাত সমুদ্রের পারে ঠেলে দিয়ে আসবে—বিশ্ববিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। পাল্লা দিয়ে আত্মত্যাগের জন্য তৈরি হবে লোক—কঠিন পারিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হবে না তাদের দেশকে গড়বার কাজে। সেই গড়বার কাজ নেবে পঞ্চায়েত রাজ—চাষী মজুরের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমলাতন্ত্র সেখানে নেই—একমাত্র পরীক্ষিত দেশসেবক দিয়ে তৈরি হবে দেশের শাসনতন্ত্র। অনাবিল গণতন্ত্র সেখানে কায়েম হয়ে, জনসাধারণের রাজ জনসাধারণের হাতে তৈরি হবে—তার প্রত্যেকটি অঙ্গ জনসাধারণের নিজের হাতে তৈরি। সচেতন বিপ্লবী জনগণ সজ্ঞানে দেশগঠনের কাজে মনোযোগ দেবে। ইতিহাসের কোনো জঞ্জালই তারা বাঁচিয়ে রাখবে না—সব ধুয়ে মুছে নতুন করে মানুষের সভ্যতা গঠন করবে।

ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা

ভূমিকা

কম্যুনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে নীতিগত ও কৌশলগত পার্থক্য কোথায়—কেন এই দুই দল সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামেও এক হতে পারে না—এই সব প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। ব্যক্তিগত কারণে দলাদলি মনে করে অনেকে বিষয়টার গুরুত্ব বিচার করতে ইচ্ছুক নন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে এই দুই দলের যে ভিন্ন ভিন্ন নীতি দেখা দিয়েছে সাধারণ লোক সব সময় তা হয়ত লক্ষ্য করেনি এবং লক্ষ্য করে থাকলেও আজ তা একত্র করে সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যেও মতানৈক্যের কারণগুলি সাজিয়ে দেখবার মতো স্মৃতিশক্তি বজায় রাখেনি।

আমরা নিজেরা অবশ্য জানি কেন এবং কোথা থেকে এই পার্থক্য এবং আজকে এই পার্থক্যের রূপ কি? তাতে কি আসে যায়—সমগ্র জনসাধারণকে এই পার্থক্য বুঝতে হবে—বোঝাতে হবে—কেননা সাম্যবাদের শিক্ষা, নীতি, কৌশল ও তাৎপর্যের তথ্য এই পার্থক্যের বিচারের মধ্যে নিহিত আছে এবং এই পার্থক্য না বুঝবার চেষ্টার মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের অজ্ঞতাপ্রিয়তা। কিছু না বুঝেই নিজেদেব ভাগ্য কোনো উপায়ে ভাল করে ফেলবার এই সহজসাধ্য উপায়ের সন্ধান শেষ পর্যন্ত হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে মত ও পথ নিয়ে আমাদের যে ঝগড়া সেটা ব্যক্তিগত ঝগড়া নয়—ক্রমবিকশিত ইতিহাসের পথ বেছে নেবার আগ্রহ ও আবেগ এবং এই মত ও পথ বেছে নেবার ঝগড়ায় দেশ বিদেশের যাবতীয় জনতা অংশ গ্রহণ করুক এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়ে আমাদের বিচার করে নিক—এইটাই হবে আমাদের এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

এই দুই ধারার মধ্যে যে পার্থক্য তা আজকের কথা নয়—পনের বছরের উপর এই পার্থক্যের রেখা দেখা যায় এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতের ও বিশ্ব-রাজনীতির প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে সাম্যবাদী বিপ্লবের ধারা সম্পর্কে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এই সব পার্থক্যের উপকরণগুলি ধৈর্য ধরে পড়লে ভারতীয় ইতিহাসের বর্তমানকাল ও ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক বিচার হয়ে যাবে—যাবতীয় সমস্যার সমালোচনা হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক পাঠক নিজেকে শেষ পর্যন্ত উপকৃত মনে করবেন। অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ভক্তির উপর গোঁজামিল দিয়ে ও অজ্ঞতার বড়াই করে যে রাজনীতির কংগ্রেসী-রাজপথ এদেশে চালু ছিল—তাকে অনুসরণ করে আজ দেশের লোকের যে দুর্গতি হয়েছে তা থেকে আজ অন্তত এইটুকু শিক্ষা নেওয়া উচিত যে না বুঝেসুঝে কিছু করতে নেই—এবং কোনো কিছু বুঝতে চেষ্টা করাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই—আর কোনো কিছু না বুঝে অজ্ঞতার দুর্গে আশ্রয় নেওয়া শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বাস্তুহারা দশাপ্রাপ্তির কারণ মাত্র। এক রকমের লোক আছেন যাঁরা না বুঝেই পণ্ডিত এবং হরেদরে সব দলকেই এক মনে করে গভীর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা দেখান। আর এক রকমের লোক আছেন যাঁরা কিছু না বুঝতে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন এবং সাংসারিক চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে মাথা দেওয়া নেহাৎ সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। এই উভয় জাতীয় লোকই

এই দুর্দশার গৌণ কারণ—কেননা এদের অকাল পক্বতা ও অজ্ঞতাই দেশের বুকে হামবড়া নেতাদের অস্তিত্বে সাহায্য কবেছে এবং তাদের দেশের মঙ্গল করাব নামে দেশকে আজ জাহান্নমে ফেলে দিতে সাহায্য করেছে।

কম্যুনিস্ট ও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির পার্থক্য বুঝতে গিয়ে পাঠককে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক ইতিহাসই পড়তে হবে। এই পার্থক্যের যেমন একটা অতীত আছে, তেমনি আছে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীতের কথাগুলি যদি উল্লেখ না করে পারা যেত তবে পাঠককে এখনই বর্তমান ও ভবিষ্যতের তাজা ঘটনার উপর নিয়ে এসে জোর আলোচনা শুরু করা যেত। কিন্তু এই বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকে অবজ্ঞা করলে চলবে না কারণ বর্তমানের বীজ অতীতেই উপ্ত হয়ে থাকে যেমন ভবিষ্যতের বীজ উপ্ত হচ্ছে বর্তমানে। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই পার্থক্যকে বুঝতে চাইলে তাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবটাই বুঝতে হবে।

তাছাড়া আজকের পৃথিবীর ও ভারতের যে ভবিষ্যৎ সে হলো সাম্যবাদেরই ভবিষ্যৎ। আজকেব জন্য পৃথিবীতে যে ইতিহাস অপেক্ষা কবছে সে সাম্যবাদী বিপ্লবের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এই সাম্যবাদী বিপ্লবের বিভিন্ন ধারাব বিকাশ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি বুঝতে চেষ্টা না করি তবে কি আকাশের নক্ষত্রেব সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করব? এই সাম্যবাদী চিন্তাধাবা ও কর্মপন্থার বিচাব ছাড়া প্রয়োজনীয় বস্তু আজ আমাদের কিছুই থাকতে পাবে না—কেননা এরই উপর মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে।

সাম্যবাদী সংগ্রামেব উপর নজব রাখলুম—কিন্তু সাম্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বটাকে বুঝবার শ্রম নেব কেন? নিতে হবে ; কেননা এই দ্বন্দ্ব—ভালই হোক আর মন্দই হোক—এটার অস্তিত্ব রয়েছে—শুধু ভাবতেই নয় অন্যান্য দেশেও। যেমন এক বর্মাযই দুই বকমের কম্যুনিস্ট রয়েছে অথচ সকলেই তারা স্ট্যালিনপন্থী । স্ট্যালিনপন্থী টিটো আজ স্ট্যালিন বিবোধী। অনেক দেশে এমন অনেক সব দল ও কর্মী আজ সংগ্রামে রত যাদেব সাম্যবাদী চিন্তাধাবা ও কর্ম প্রণালী এক রকমের নয়। পৃথিবী থেকে ধনতন্ত্র তো উঠে যাবে—কোনো কিছুই তাকে রক্ষা করতে পাববে না, পাবছেও না—কিন্তু তার স্থান বিশ্বসাম্যবাদ গ্রহণ করবে একথা জানলেও—বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট দলগুলি কেমন করে একদিন সত্যি সত্যি এক হবে, দেশের পার্থক্য, শ্রেণীর পার্থক্য, জাতের পার্থক্য, রংয়ের পার্থক্য সব মুছে ফেলে দিয়ে এক পৃথিবীতে রাষ্ট্রহীন, শ্রেণীহীন, শোবণহীন মনুষ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে—সেই সমস্যাটাও অত জলেব মতো সহজ মনে করা হাস্যকর মাত্র। বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দল বিভিন্ন দেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে আবার দেশে-দেশে লড়াই বাধাবে কিনা, ক্ষমতার লোভ, অজ্ঞতার অভিশাপ এবং অতীতের নেশা আমাদেব আরো ভোলাবে কিনা! অন্তত আর যাতে না ভোলাতে পারে এবং আমবা যাতে সেই এক পৃথিবীব এক সাম্য ও সভ্যতার সৌধ অবথা বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচিয়ে সহজে গড়ে তুলতে পারি তার উপায় হলো সচেতনতা—সজাগ চেতনতা—প্রত্যেক জিনিসটাকে খুঁটিয়ে দেখার স্বভাব বৃদ্ধি করা এবং অন্ধ ভক্তি বা বিশ্বাসের মূল উৎপাটন করা।

*　　*　　*　　*

ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা

শ্রেণীসংগ্রামই হলো ইতিহাসেব ইতিহাস এবং শ্রেণীসংগ্রামেব পথেই একদিন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে-- সমস্ত মানুষ, সব জাতি, সব দেশ নিযে একটি সাম্যবাদী সমাজ— এইটাই হলো মার্কসিজম লেনিনিজমেব প্রধান কথা।

সব শ্রেণী, সব জাতি মিলিযে দিযে বা সংঘর্ষটা বন্ধ কবে দিযে এই সমাজ-সাম্য আসছেনা—আসছে সংঘর্ষেব চূড়ান্ত ফলাফলে—সব শ্রেণীকে এক শ্রেণীতে পবিণত কবে দিযে—এক মহান বিপ্লবেব মধ্য দিযে।

অতএব ইতিহাসেব বর্তমান স্তবে যে বিবদমান শ্রেণীগুলি দেখতে পাই—সেই বিবাদগুলিব ঐতিহাসিক পবিণতিব উপব লক্ষ্য বেখেই কম্যুনিস্টকে বিবাদটাকে ঈপ্সিত ইতিহাস নির্দিষ্ট পথে এগিযে নিযে যেতে হবে বিপ্লবেব দিকে এবং শেষ পর্যন্ত এক শ্রেণী বা শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন কবতে হবে।

এই যে শ্রমজীবী জনসাধাবণেব সমষ্টিভূত সাম্য সমাজ আনবাব পবিকল্পনা তাতে স্বভাবতই এটা ধবে নিতে হবে যে শ্রমিক শ্রেণীই উক্ত সমাজ আনতে সব চেযে বেশি অগ্রণী নেতা ও উদ্যোক্তা হবে, অতএব বলা হয— সাম্যবাদী আন্দোলনেব নেতা শ্রমিক শ্রেণী। যদিও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগুলিতে সংখ্যায লোক থাকে অনেক বেশি, তথাপি ইতিহাসেব গতিপথে আজ শ্রমিক শ্রেণীই নেতৃত্বেব দাযিত্ব পালন কবতে পাবে—কেবল নিজেদেব উপব নিজেদেব নেতৃত্বই নয —সমস্ত শোষিত শ্রেণীব উপব নেতৃত্ব। এই নেতৃত্বেব অধিকাব শ্রমিক শ্রেণীব আপনা থেকে পাওযা নয—এটা হচ্ছে ইতিহাসেব দাযিত্ব। এই দাযিত্ব পালন কবাব মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীব নেতৃত্ব নির্ভব কবে। মোট কথা এই যে মানুষেব জন্য সাম্যবাদী সমাজেব বিবাট সম্ভাবনা ও তাকে কার্যকবী কববাব প্রধান গৌবব আজ শ্রমিকেব এবং যা কিছু দুর্ভোগ, দুঃখ অত্যাচাব অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগুলি—যেমন কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত আজ ভোগ কবছে—তাব সুবাহা আজ শ্রমিক শ্রেণীব আর্দশ পালনেব মধ্যেই সম্ভব—এমন কি পিছিযে পড়া ঔপনিবেশিক অত্যাচাবে জর্জবিত ও সাম্রাবাজ্যবাদী বজ্রমুষ্টিব মধ্যে আবদ্ধ পবাধীন দেশেব সত্যিকাব স্বাধীনতা আন্দোলনও আজ সাম্যবাদী আন্দোলনেব অংশ বিশেষ মাত্র—অতএব শ্রমিক শ্রেণীব দাযিত্ব ও নেতৃত্ব সাপেক্ষ। যাব ফলে আজ দেখতে পাই মালয, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশেব স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিও আজ আব জাতীযতাবাদীদেব নেতৃত্বে নেই—সে সব আজ কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে চলে গেছে—এবং জাতীযতাবাদীবা প্রকৃতপক্ষে তাদেব দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদীদেব আওতায বাখতে ব্যস্ত। মোট কথা আজকেব পৃথিবীতে জন সাধাবণেব প্রত্যেকটি দাবি সাম্যবাদীকেই ওঠাতে হবে—অপব পক্ষে জাতীযতাবাদ সাম্রাজ্যবাদেব সাথে একীভুত হযে গিযে প্রত্যেক দাবিকে দাবাবাব চেষ্টা কববে। এই যে সাম্রাজ্যবাদেব সাথে জাতীযতাবাদেব মিলন তাব মাধ্যম হলো কি? সেই শ্রেণীস্বার্থ—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদেব ও জাতীযতাবাদেব শ্রেণীস্বার্থ এক—কেননা ধনিক-বণিক শ্রেণীই হলো এই উভযবাদেব ভিত্তি —যাব ফলে বিশ্বব্যাপী গণ-বিপ্লবেব মুখে সর্বদেশে সর্ব জাতীয ধনিক শ্রেণী আজ এক হযে উঠেছে—তাতে স্বাধীনতা যাক—গণতন্ত্র যাক—সভ্যতা যাক—মানুষ বাঁচুক আব না বাঁচুক—পৃথিবীব্যাপী ধনিক স্বার্থ আজ যে কোনো উপায়ে বক্ষা কবতেই হবে—এইটাই হলো ধনিক

শ্রেণীর স্বার্থ। অপর পক্ষে—স্বাধীনতা, শান্তি, গণতন্ত্র, অন্নবস্ত্র, উন্নতি ইত্যাদি যাবতীয় দাবির উপর যে এক বিরাট আত্মরক্ষামূলক প্রেরণা উঠেছে আজ দেশে দেশে—কোটি কোটি জনতার ত্রাসগ্রস্ত বুকে—সে দাবিগুলিকে সমন্বিত করে একটি মাত্র আদর্শই আজ পৃথিবীর বুকে বর্তমান—সে হলো সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম—ফলে আজ কেবলমাত্র মজুর শ্রেণী থেকেই সাম্যবাদী আসছে না—বহু ভেঙে পড়া ধ্বংসশীল শোষিত শ্রেণীর মানুষ সাম্যবাদকে নিজেদের স্বপ্ন ও আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু ইতিহাসেব এই গতি ১৫/২০ বছর পূর্বে ভারতীয় সাম্যবাদীর চোখেও পরিষ্কার ছিল না। একজন কম্যুনিস্টও বুঝতে বেগ পেত—কেমন করে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশ মাত্র—আবার এও বুঝতে পারত না শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইয়ে স্বাধীনতার স্থান কোথায়। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উপর নির্ভর করে এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপরই আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশি—এই সব কথাও কম্যুনিস্টদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। যেমন ধরুন ১৯৩০/৩২ সালে ভারতে যে স্বাধীনতার আন্দোলন হয় তখন এদেশে যাঁরা কম্যুনিস্ট ছিলেন—যদিও তাঁরা মুষ্টিমেয় ছিলেন—তাঁরা সেই আন্দোলনে অংশ নিতে বা সহানুভূতি দেখাতে পারলেন না—কারণ তখন তাঁদের মতে সেই আন্দোলন বুর্জোয়া-স্বার্থ সাপেক্ষ—অতএব সাম্যবাদী তাতে অংশ নিতে পারে না—যেন স্বাধীনতা তার কাছে বড় কথা নয়—স্বাধীনতা আন্দোলনের বাইরে শ্রেণী-সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনটাই তার একমাত্র কাজ! আবার ১৯৪২ সালে যে স্বাধীনতা আন্দোলন এল তাতেও ভারতীয় স্বাধীনতাব কথা এদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় জিনিস বলে মনে হলো না—বরং এরা সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করতে সাহায্য করল। এর ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতীয় জনগণের প্রতি একটা সত্যিকার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করল না—যার জন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো দান নেই—এই অপরাধে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতীয় জনগণের কাছে কোন শ্রদ্ধা পেলনা—এবং কম্যুনিজমকে ভারতীয় জনগণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে ছাড়ল। এর ধাক্কা আজও কম্যুনিস্ট পার্টি সামলাতে পারেনি। আজ যে ভারতে কম্যুনিজমের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে আসছে—তার কারণ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি নয়—তার কারণ এশিয়ার পূর্ব দেশে কম্যুনিস্টদের একই সাথে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্যবাদী শ্রেণীসংগ্রামের যুক্ত কৌশলের স্বার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

*　　　*　　　*　　　*

মার্কস লেনিনপন্থীদের রাজনীতির কৌশল হলো শ্রেণী সংগ্রামের কৌশল—এই কথাটা শুনতে যত সহজ, বুঝতে তত সহজ নয় এবং কার্যত তা বোঝা ঢের বেশি কঠিন ও বুঝতে হলে প্রচুর বুদ্ধি বিবেচনার দরকার হয়।

মজুরকে নিয়ে অথবা চাষীকে নিয়ে অথবা খেতমজুরকে নিয়ে যখন তাদের দাবিদাওয়ার উপর শ্রেণীসংগ্রাম চালাই—তাদের দৈনন্দিন দাবিদাওয়া নিয়ে—সেটা হলো শ্রেণীসংগ্রামের প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক সংগ্রাম। যদি কোনো কম্যুনিস্ট মনে করে যে তার হাতে যে শোষিত শ্রেণীর অংশটুকু রয়েছে তাদের আপসহীন অর্থনৈতিক সংগ্রামটা চালিয়ে গেলেই হলো—অন্য কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে—তবে সে কম্যুনিস্ট হতে পারল না—অন্তত লেনিনপন্থী কম্যুনিস্ট হতে পারল না। আশু দাবিদাওয়ার উপর তার নিষ্ঠা যত প্রবলই থাকুক—সমগ্র রাজনৈতিক দায়িত্ব অবহেলা করার দরুন তার সংগ্রামটা হবে অন্ধ।

আবার এই মজুর চাষীর যে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া রয়েছে সেখানেও রয়েছে শ্রেণী-সংগ্রাম—কিন্তু তার সংঘর্ষ রাষ্ট্রের সাথে অর্থাৎ সম্মিলিত ধনিক-বণিক-জমিদার শ্রেণীর সর্ববিধ স্বার্থরক্ষার সংগঠিত সংস্থার বিরুদ্ধে। এই সম্মিলিত শত্রুর রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত শোষিত শ্রেণীর লড়াইটা হলো কম্যুনিস্টের পক্ষে প্রধান দায়িত্ব! এটা হলো শোষিত মজুর, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম। প্রত্যেক অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করতে হবে, কেননা রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লব ভিন্ন কম্যুনিস্ট যা চায় তা কায়েম করতে পারে না এবং শোষিত জনসাধারণেরও মুক্তি সম্ভব হয় না। যারা কম্যুনিস্ট নয় তারাই কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামকে রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত করতে প্রস্তুত নয়—তারা জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যা কিছু মেলা সম্ভব তা পাইয়ে দিতে ব্যস্ত। এইখানেই কম্যুনিস্ট পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রাম ও অকম্যুনিস্ট পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রামের পার্থক্য। যদি কখনও দেখেন যে কোনো কম্যুনিস্ট তার শ্রমিক ও চাষীদের রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে দূরে ঠেলে রাখতে চাইছে তখনই বুঝতে হবে সে কম্যুনিস্ট নয়। কাজে কাজেই কম্যুনিস্টকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে আন্দোলন করতে হয়—অর্থনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রটা খুব ভালভাবে বুঝে নিতে হয়—এমন কি শোষিত শ্রেণীর অর্থনৈতিক কোনো দাবি যদি তার সমগ্র রাজনৈতিক দাবির বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকে অর্থনৈতিক দাবিটা দাবিয়ে রেখে রাজনৈতিক দাবিটাকে প্রথম স্থান দিতে হবে। এরই নাম জনগণকে রাষ্ট্রচেতন বা সমাজচেতন করে তোলা। স্বার্থচেতন করলেই সাম্যবাদীর কাজ হয় না—অকম্যুনিস্টরাই শ্রমিক ও চাষীকে একান্তভাবে স্বার্থচেতন করতে ব্যস্ত। শ্রেণীচেতনা বলতে কেবল এই সমাজচেতনা বা রাষ্ট্রচেতনাই বোঝায়।

যেমন ধরুন শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধি, মাগ্‌গি ভাতা, সস্তা রেশন, বাসস্থান ইত্যাদি নিয়ে আপনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে লড়াই করতে পারেন—ইউনিয়ন বানাতে পারেন—কিন্তু তাই নিয়ে মগ্ন থাকলেই আপনি কম্যুনিস্ট হলেন না। কম্যুনিস্ট হতে হলে দেখতে হবে এই শ্রমিকদের এই দেশ সম্বন্ধে, এই সমাজ সম্বন্ধে—অন্যান্য শোষিত চাষী, গরিব জনসাধারণ সম্বন্ধে যে নেতৃত্বের দায়িত্ব তা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জাগাতে পারছেন কিনা। শ্রেণীচেতনা কেবল নিজের শ্রেণীর স্বার্থটা দেখাই নয়—স্বার্থবাদ বিপ্লব নয়—একটা লোকের স্বার্থও নয় এবং কেবলমাত্র একটা শ্রেণীর আশু স্বার্থও নয়। আপনাকে বুঝতে হবে—এই শ্রমিক শ্রেণীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হতে হবে ; দরিদ্র জনসাধারণের নেতা হতে হবে, কাজ দিয়ে, বৈপ্লবিক সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে—তবেই তো দরিদ্র জনসাধারণ শ্রমিককে নেতা বলে মেনে নেবে এবং সাম্যবাদী আদর্শের উপর শ্রদ্ধাশীল হবে—তবেই তো জনসাধারণ শ্রমিক শ্রেণী তথা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে নেবে এবং ধনীদের পথ ও নেতৃত্ব ত্যাগ করবে। অতএব নিজের শ্রেণীর স্বার্থটাই সব নয়—অন্যান্য সমস্ত শোষিত শ্রেণীকে সঙ্গে টেনে নেবার উপর সাম্যবাদী বিপ্লবের সার্থকতা নির্ভর করছে।

আবার শুধু জাতীয় আন্দোলনের উপর যে দায়িত্ব সেখানেই কম্যুনিস্টদের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না—বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে যে বিপ্লবী শক্তি রয়েছে তাদের জোরদার ও সাহায্য করার মধ্যেও সাম্যবাদীর দায়িত্ব রয়েছে।

মোট কথা—কম্যুনিস্ট আন্দোলন এক বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন—এই রাজনৈতিক আন্দোলন বিপ্লববাদী এবং তার যাবতীয় কাজকর্ম এই একটি মাত্র মাপকাঠি দিয়েই বিচার্য—

জনগণের সেবা জাতীয় কাজকর্মটাই কম্যুনিস্ট আন্দোলন নয়। সেবাধর্মে কম্যুনিস্টদের চেয়েও বড় সেবকদল থাকতে পারে।

অতএব যে কোনো একটি সত্যিকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে প্রথমত খুবই সচেতন পার্টি হওয়া দরকার। এখানে অজ্ঞতার কোনো স্থান থাকতে পারে না। কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব খুব সোজা জিনিস নয়। এই যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের যুক্ত কৌশল, এই যে বিভিন্ন আশু স্বার্থ ও প্রধান স্বার্থের উপরে সার্থকতম সংগ্রামেব ব্যবহার, এই যে বিভিন্ন শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কৌশল—এতে যথেষ্ট বুদ্ধি ও সজাগ দৃষ্টি দরকার—কারণ সর্বকালে ও সর্বদেশে এই সব কৌশল ঠিক একই রকম হতে পারে না। কার সঙ্গে কখন হাত মেলাতে হবে এবং কখন ছেড়ে দিতে হবে এর মধ্যে কৌশলগত (tactical) পার্থক্য স্থান ও কাল বিশেষে ঘটতে পারে—কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের বৈপ্লবিক মূলনীতি (Strategy) কখনও এতটুকু ক্ষুণ্ণ করলে চলবে না।

এই বিরাট কৌশলগত ও নীতিগত দায়িত্ব পালন করবার ক্ষমতা কম্যুনিস্ট পার্টি কি করে অর্জন করতে পারে। তার প্রথম দরকার হবে স্বাধীন চিন্তা কববার ক্ষমতা ও স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটি কৌশল অবলম্বন করববা ক্ষমতা। যদি কম্যুনিস্ট পার্টি অন্য কোনো পার্টির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, অথবা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে সেই পার্টির পক্ষে দৃঢ় ও স্পষ্ট নেতৃত্ব দেখানো সম্ভব নয়। কি কারণে অন্য পার্টিব মুখাপেক্ষী হযে পড়তে পারে? যদি এই পার্টি শোষিত শ্রেণীকে অপব শ্রেণী থেকে আলাদা করে সংগঠিত করার চেষ্টা না করে—তবে তার পরনির্ভরশীল প্রতিবিম্বটি নিজ পার্টি নেতৃত্বেব মধ্যে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। যেমন ভারতের মজুব ও চাষীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে যদি ধনিক-বণিক-জামিদার শ্রেণীর বাইরে সংগঠিত না করা হয়—যদি কম্যুনিস্টরা ধনিক-বণিক প্রভাবিত কংগ্রেসের বা লীগ পার্টির মধ্যে জনসাধারণকে সংগঠিত করে তবে শ্রমিক শ্রেণীর বা চাষীরও যেমন স্বাধীন সত্তা থাকতে পাবে না, তেমনি সেই কম্যুনিস্টদেরও কোনো সত্তা থাকতে পারে না। তারা সর্বপ্রকারে ধনিকদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে বাধ্য হয় এবং নিজেদের এমন দুর্বল অবস্থায় এনে ফেলে যে স্বাধীনভাবে কোনো আঘাত, কোনো কৌশল, কোনো আন্দোলন তৈবি করতে পারে না—যার ফলে কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব ক্রমাগত ভুলেব পর ভুল করতে বাধ্য হয়। নিজেদের সত্তাকে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল করতে পারলেই দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে বাধ্য, শক্তি আয়ত্তশীল হতে বাধ্য এবং কখন কোন কোন শ্রেণীর সাথে যোগ দিতে হবে বা শর্তে দিতে হবে তার পরিষ্কার রূপ দিতে সমর্থ হতে পারে।

এই ভাবে স্বাধীন সাম্যবাদী দল তৈরি করতে চেষ্টা ন' করলে কম্যুনিস্ট পার্টি কখনো সাবালক হতে পারে না—এবং আন্দোলনে জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পারে না। এভাবে নিজেদের সংগঠিত স্বাধীন সত্তা তৈবি করতে না পারলে আন্তর্জাতিক সংকট ও যুদ্ধকালেও কম্যুনিস্ট পার্টি কোনো সুচিন্তিত ও স্বাধীন পন্থা বেছে নিতে পারে না এবং বিশ্ব-বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত দায়িত্ব ও দান দেখাতে পারে না। প্রকৃত কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব গঠনেব পথে এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ থাকতে পারে না—কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও নেতৃত্ব এই সাহসেব উপরই নির্ভর করে। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী, নিজ শ্রেণীতে অবিশ্বাসী, দুর্বল পরনির্ভরশীল চিন্তাধারা দিয়ে কখনো কোনো সত্যিকার কম্যুনিস্ট দল গঠন করা সম্ভব নয়।

*　　*　　*　　*

মার্কস-লেনিন নির্দিষ্ট রণ-কৌশলের ভিত্তিতে যে কয়েকটি মূল সূত্রের আলোচনা করা হয়েছে তারই উপর যদি আমরা অতীত ১৫ বছরের ভারতীয় ঘটনাগুলি আলোচনা করে দেখি তাহলেই আমরা বুঝতে পারব কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে আলাদা বিপ্লবী কম্যুনিস্ট বলে আর একটি ধারা কি ভাবে ও কেন বেরিয়ে এল।

১৯৩০-৩২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির বয়কটে যে একপেশে বা Sectarian অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছিল—তারই সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৩৫ সালে তাদের নীতি সম্পূর্ণ পাল্টে দিল। বুর্জোয়ার কোনো প্রকার আন্দোলনে যোগ না দেবার নীতি থেকে—একেবারে বুর্জোয়ার সাথে সহযোগিতার পথ নেওয়া হলো—কখন? যখন বুর্জোয়া লড়াই করেছে ইংরেজের সাথে তখন নয়—যখন লড়াই বন্ধ করে দিয়েছে তখন। ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মিলিত স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্নে তখন ভারতীয় পার্টি বিভোর—আর এই মিলিত স্বাধীনতা আন্দোলনের মিলন ক্ষেত্র হলো কংগ্রেস—কংগ্রেসই স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে দেশের মজুর চাষী সবাইকে সমবেত করতে হবে—যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বলা বাহুল্য মজুরদের জন্য আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থাকবে—চাষীদের জন্য থাকবে নিখিল ভারত কৃষক সভা—কিন্তু এই দুই শ্রেণী প্রতিষ্ঠান, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে কংগ্রেস তার নেতৃত্বকে মেনে নেবে, শক্তিশালী করবে ইত্যাদি। অর্থাৎ কংগ্রেস হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—আর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কৃষক-সভা হলো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মজুর ও চাষীদের অর্থনৈতিক যা কিছু দাবি দাওয়া তা নিয়ে তাদের নিজস্ব শ্রেণীসংস্থাগুলি লড়বে—কিন্তু দেশের রাজনীতিতে যা কিছু অংশ কৃষক ও মজুরেরা নেবে তা নেবে কংগ্রেসের মারফৎ। কংগ্রেসের বড় বড় নেতরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক —কেউ বা সভাপতি, কংগ্রেস হলো 'এ' টিম—তার 'বি' টিম হলো টি, ইউ, সি আর কৃষক সভা হলো 'সি' টিম। কংগ্রেসের স্বরূপকে তারা বুর্জেয়া শ্রেণীর পার্টি হিসাবে স্বীকার করতে রাজি হলো না—কংগ্রেসকে একটা সর্বসাধারণের বৈঠকখানা হিসাবে সবাইকে বোঝাতে লাগল। কংগ্রেসের ধনীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে অথবা মজুর বস্তিতে গিয়ে—কংগ্রেসের মহিমা কীর্তন করবার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেলেন, দলে দলে এই সব কংগ্রেসী কম্যুনিস্টরা রোদে বৃষ্টিতে জলে কাদায় ঘরে ঘরে গিয়ে কংগ্রেসের সভ্য তৈরি করতে লাগল—কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে লাগল—এবং মজুর ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতিগুলিকে কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী পরনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ফেলল।

বিপ্লবী কম্যুনিস্ট দলের জন্ম হলো কম্যুনিস্টদের এই শ্রেণী সহযোগিতার বিরুদ্ধতা থেকে। শ্রেণীসংগ্রামের নীতি বর্জন করে কম্যুনিজম বাঁচতে পারে না, এবং যুক্ত জাতীয় ফ্রন্টের মেকী স্বাধীনতার পরিকল্পনা ভারতে সত্যিকার স্বাধীনতা দিতে পারে না—এই লেনিনিস্ট নীতির উপর ভিত্তি করেই বিপ্লবী সাম্যবাদের রাস্তা অপর কম্যুনিস্টদের থেকে আলাদা করে নিতে হলো।

কম্যুনিস্টরা বলল যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট করতে হবে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে—স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য।

বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা (তখন তাদের নাম ছিল কম্যুনিস্ট লীগ অব ইণ্ডিয়া) বলল—শোষিত শ্রেণী সমূহের যুক্তফ্রন্ট করতে হবে—ধনিক বণিক শ্রেণীদের বাদ দিয়ে—যার নাম হবে রেড ফ্রন্ট (Red Front)—কেন না আজ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজের সাথে আপসহীন সংগ্রাম করতে পারে না—তারা সর্বদাই আপসের জন্য লালায়িত এবং যে কোনো মুহূর্তে ভারতের জনসাধারণকে প্রতারিত করতে পারে—যার ফলে সত্যিকার স্বাধীনতা মিলবে না।

কম্যুনিস্ট পার্টি বলল—ভারতীয় জনসাধারণকে কংগ্রেসে ঢুকতে এবং কংগ্রেসকে একমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে।

বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা বলল—ভারতীয় জনসাধারণকে বুর্জোয়াদের তৈরি রাজনৈতিক খোঁয়াড়ে অর্থাৎ কংগ্রেসে নিয়ে যাওয়া অন্যায়—তাতে ভারতের মজুর ও চাষীদের নিজস্ব নেতৃত্ব, সংস্থা ও রাজনীতি দাঁড়াবে না—বুর্জোয়া নেতৃত্ব কায়েম হবে এবং শেষ পর্যন্ত অশেষ দুঃখ পেতে হবে।

কম্যুনিস্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কৃষক সভাকে ভারতীয় কংগ্রেসের সহচর ও অনুচর হিসাবে দাঁড় করাতে প্রস্তুত হলো।

বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা তাতে বাধা দিতে লাগল, কেন না মজুরকে যদি সমগ্র শোষিত জনতার নেতৃত্ব নিতে হয় এবং সত্যিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব নিতে হয়—তবে মজুর শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া নেতৃত্ব থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং কৃষককে বুর্জোয়া নেতৃত্বের বাইরে টেনে আনতে হবে—আর এই কাজ, কম্যুনিস্ট পার্টি যদি নিজেকে কংগ্রেস থেকে মুক্ত না করে নেয়, তবে তার দ্বারা করা সম্ভব নয়। মজুব, কৃষক, ছাত্র আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ধনিক নেতৃত্ব থেকে আলাদা করে গড়ে তুলতে হবে, তবেই কম্যুনিস্ট আন্দোলন আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে ভারতের রাজনীতিতে আঘাত হানতে পারবে—বুর্জোয়াকে খোসমুদি করে চলতে হবে না অথবা স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করে বেড়াতে হবে না। জনগণের এই স্বাধীন সত্তা, সংস্থা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেই দরকার হলে প্রয়োজনমত অপর শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা কবতে পারে—কিন্তু তা না থাকলে তার কোনো শক্তিই থাকা সম্ভব নয়—অপরের হুকুম তামিল করা ছাড়া।

কম্যুনিস্ট পার্টি আমাদের কোনো কথায় কান দিল না—শ্রেণী সহযোগিতার পথে কংগ্রসী সংস্কারবাদী-রাজনীতিতে নিজেদের নিমজ্জিত করে ফেলল এবং ধীরে ধীরে বিপ্লববাদ ভুলে গিয়ে ধনিক শ্রেণীর তাঁবেদার হিসাবে সংস্কারবাদী রাজনীতিতে মগ্ন হয়ে গেল। যা সম্ভব নয়—যা ইতিহাস বিরুদ্ধ সেই কংগ্রেসী নেতৃত্বের মধ্যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

এই ধারা কতদূর যায় তা দেখবার একটা কৌতূহল চরিতার্থ করবার ইচ্ছা আমরা পোষণ করছিলাম—কিন্তু হঠাৎ একদিন এক বিশেষ ব্যাপার ঘটে গেল—যার ফলে কম্যুনিস্টদের এই কংগ্রেস সাধনা সহসা পরিত্যাগ করতে হলো। সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্টের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের যে পরিকল্পনা কম্যুনিস্টরা করেছিল তা নিজেরাই একদিন ছেড়ে দিয়ে দৌড়! কি হল? যুদ্ধ লেগে গেছে—ইংরেজ ও ফরাসীর বিরুদ্ধে জার্মানীর। কম্যুনিস্ট ভায়ারা কংগ্রেসকে এই সুযোগে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করার জন্য খুব চেঁচামেচি করছে—কিন্তু কংগ্রেস নাচার—নড়ে না, গরম গরম বুলি বন্ধ করার জন্য সরকার কম্যুনিস্টদের ধরতে শুরু করল। ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে। এখন কি করা যায় ভেবে আকুল, বিলেতের কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির নিকট খবর এল এখন এটা আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়—জনযুদ্ধ। অতএব এই যুদ্ধে ইংরেজ, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার পক্ষ হয়ে সর্বদেশের কম্যুনিস্টদের লড়তে হবে। রাশিয়া যোগ দেওয়া মাত্র সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টটাও কি করে গণফ্রন্ট হয়ে গেল তা বুঝতে কম্যুনিস্ট ভায়াদের কিছু সময় লাগল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে খবর পাওয়া মাত্র এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করল।

সবকাব এদেবকে সব ছেড়ে দিলে—যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য কববাব জন্য এদেব প্রচুব স্বাধীনতা দিলে, যুদ্ধবিবোধী আন্দোলনেব বিরুদ্ধে বিবাট প্রচাব কবে চলল—এবং শেষ পর্যন্ত যখন ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভাবতব্যাপী একটা অভ্যুত্থান দেখা দিল তখন সেই আন্দোলনকে প্রতিহত কবাব জন্য এবা ইংবেজ সবকাবেব সাহায্যে যাবতীয় কুকাজ কবে বেড়াতে লাগল। ধর্মঘট না কবতে দেওয়া হলো এদেব প্রধান নীতি—মজুব শ্রেণীকে মাগগী ভাতাব ব্যবস্থা কবিয়ে দিয়ে এবং সস্তা বেশনেব ব্যবস্থা কবিয়ে দিয়ে মজুব শ্রেণীব মধ্যে সুবিধাবাদ ও স্বার্থবোধ জাগিয়ে তুলল—স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো অংশ নিতে দিল না—চাষীদেব মধ্যে দুর্ভিক্ষেব জন্য যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল তাব প্রতিবাদে মজুবদেব দিয়ে একটি সামান্য প্রতিবাদও ওঠাল না—মোট কথা আশু মাগগীভাতা ও সস্তা বেশনেব লোভ দেখিয়ে সব বাজনৈতিক দাযিত্ব থেকে দূবে ঠেলে দিল এবং শোষিত শ্রেণীসমূহেব নেতৃত্ব নেবাব যে দাযিত্ব সে কথা তাদেব ঘুণাক্ষবেও বুঝতে দিল না। ফলে কোথায় শ্রমিকশ্রেণী সর্বপ্রকাব স্বাধীনতা ও বিপ্লবী আন্দোলনেব নেতা হিসাবে নিজেকে দাঁড় কবাবে—না নিজ স্বার্থপবতাব নীচ মনোবৃত্তি নিয়ে সমগ্র জাতীয় আন্দোলন থেকে নিজেকে সবিয়ে নিয়ে গোপনে বিশ্বাসঘাতকতাব কটি চিবোতে লাগল। আমবা অর্থাৎ বিপ্লবী কম্যুনিস্টবা লাল নিশান হাতে কবেই এই '৪২-এব আন্দোলনে নেমে যাই—কম্যুনিজমকে কম্যুনিস্ট পার্টিব কুকার্য থেকে বক্ষা কবাব জন্য যতটুকু সাধ্য চেষ্টা কবি—লাল নিশান—যে স্বাধীনতা আনোলনেব কখনো বিবোধিতা কবতে পাবে না সেজন্য আমাদেব যতটুকু শক্তি ছিল ব্যবহাব কবি। ফলে আমাদেব কর্মীবা জেলে আবদ্ধ হয়ে যায়। একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি তখন নিবাপদে শ্রমিক ও কৃষকদেব মধ্যে ঘুবে বেড়াতে অনুমতি পাচ্ছে—তাবা তখন খুব ইউনিয়ন গড়তে লাগল—সবকাবি অনুমোদন পেতে লাগল—গ্রামে গ্রামে জাপানী দমনেব নামে স্বাধীনতা দমনেব আন্দোলন কবতে লাগল—কিন্তু বুভুক্ষু চাষীবা কম্যুনিস্টদেব এই নীতি কিছু বুঝলে না—কেবোসিন, কাপড়, তেল, নুনেব সাপ্লাইযাব হিসাবে কম্যুনিস্টদেব সবকাবি সহকাবি হিসাবে দেখতে লাগল—বুঝল এদের চটালে আব কেবোসিনটা হয়ত পাওয়া যাবে না। সংগ্রাম যখন দবকাব তখন তাদেব ভোলাচ্ছে জনযুদ্ধেব শেষে জনযুগেব গল্প দিয়ে—বেশনসপেব কিউ সংগঠনেব কাজে।

সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে ভাবতীয় জনগণেব বিক্ষোভ এত ব্যাপক ও এত যথার্থ যে সেই বিদ্রোহকে দমন কববাব জন্য কম্যুনিস্টদেব প্রকাশ্য সভা কবে স্বাধীনতা আন্দোলন বিবোধী কার্য কবা সম্ভব হয়নি—মাব ও ধিক্কাবেব চোটে পালাতে হয়েছে। এমনকি পুলিশ ভ্যানে কবে নিজেদেব প্রচাব কাজ কবতে দেখা গিয়েছে। শুধু তাই নয় ভাবতেব জনগণকে হিন্দু ও মুসলমানে বিভক্ত কবাব জন্য যে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল মুসলিম লীগেব মধ্য দিয়ে চালু ছিল তাকে এই কম্যুনিস্টবাই লেনিন স্ট্যালিনেব নামে কার্যকবী কবাব চেষ্টা কবল। লীগেব নেহাৎ সাম্প্রদাযিক ও প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিজাতি তত্ত্বকে এবা উস্কানি দিতে লাগল এবং পাকিস্তানেব দাবিকে ন্যায্য বলে ঘোষণা কবল ও মুসলমান জনতাকে মুসলিম লীগেব মধ্যে সংগঠিত কবতে সাহায্য কবল—পাঞ্জাবে লীগ নেতা ও কম্যুনিস্ট নেতাদেব যুক্ত সভা সমিতি ও মিছিল চলতে লাগল। শুধু দ্বিজাতি তত্ত্ব নয—ওবা বহুজাতি তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হলো। একদিন লেনিন পিছিয়ে পড়া জাতিদেব জাব শাসিত বাশিয়াব অধীনতা থেকে মুক্ত আত্মনিযন্ত্রণেব অধিকাব দাবি কবেছিলেন—জাব সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে বিপ্লবকে আবও জোবদাব ও ব্যাপক কববাব জন্য। বিপ্লবী আন্দোলনেব সহায়ক হিসাবেই তিনি এই আত্মনিযন্ত্রণেব অধিকাব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু যাব যাব পাঁঠা লেজে কাটবাব অধিকাব দিয়ে লেনিন ক্ষান্ত হন নি—

বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায সর্বত্র বৈপ্লবিক আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—যে আগুনে বিভিন্ন 'জাতিতত্ত্ব' পুড়ে সোনা হয়ে এক মহান সোভিয়েট সংহতি গড়ে উঠেছিল—যার একটুকবো জমি আজ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার সাধ্য কারো নেই বা কোনো প্রেরণাও নেই কোনো জাতির।

এই আত্মনিয়ন্ত্রণেব ধূয়াটা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বৈপ্লবিক আন্দোলন ও জনগণের বৈপ্লবিক সংহতির কাজে ব্যবহার করল না—করল ঠিক উল্টো কাজে —স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখতে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে জব্দ করার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলকে সাহয্যে করার জন্য। আজ যখন এই তথাকথিত দুই জাতিতত্ত্ব ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে দুর্বল করে দিয়েছে—জনগণের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শোষিত শ্রেণীব মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে অসংখ্য পরিবারকে একদম ধ্বংস করে দিয়েছে—জনগণকে হিংসা ও প্রতিহিংসার সীমাহীন লড়াইয়ে ব্যস্ত রেখেছে—তখন এই কম্যুনিস্ট ভায়ারা স্বীকার করেছেন তাঁদের পাকিস্তানকে মানতে যাওয়া ভুল হয়েছিল! কিন্তু এই একটি মাত্র ভুলের জন্যেও ইতিহাস এদের সহজে ভুলবে না। আজ এরা হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র এবং নেহেরু-লিয়াকৎ ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছে—কিন্তু তাতে নিজেদের দানটা ভুলে গেছে বোধ হয়।

এরা একদিন কংগ্রেসের মধ্যে ডুবে গিয়ে কংগ্রেসী চেলা বনে গিয়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। আপসহীন সংগ্রামের জন্য এরা চিৎকার করত—কিন্তু যেদিন সুভাষ বসু রামগড়ে আপসহীন সংগ্রামের জন্য বিরোধী পাল্টা সংগঠন গড়তে চাইল, সেদিন এরা সুভাষ বসুকে প্রথমে উস্কানি দিয়ে পরে পিছনে সরে পড়ল! কেননা সমগ্র কংগ্রেসকেই এদের চাই—গান্ধীকে না হলে ওদের চলবে না। আবার এরাই মুসলিম লীগের দাবি নিয়ে চেঁচাতে লাগল—এব হিন্দুকে কংগ্রেসে ঢোকাতে ও মুসলমানদের লীগে ঢোকাতে প্রচুর সভা করে বেড়াল—আব গান্ধীকে জাতির পিতা ও জিন্নাহকে জাতির চাচা বলে অশ্রু বর্ষণ ও গলাবাজী কবে বেড়াল। একদিন এরাই কংগ্রেস ও লীগকে এত বড় করেছে—আর আজ এরা কংগ্রেস ও লীগের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হয়ত বুঝতে পারছে তাদের সেদিনকার কাজগুলি বোধহয় ভাল হয়নি—শত্রুকে এতটা শক্তিশালী করা নিজেদেরই দুঃখের কারণ হয়েছে। নিজেদের ছড়ানো কাঁটা দিয়ে নিজেদের পথকেই করে ফেলেছে কণ্টকিত ও অবরুদ্ধ—আজ সে সব কাঁটা তুলতেই ওরা হয়রান হচ্ছে।

কিন্তু কেন এই দুর্মতি? কেন এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা? শুধু একটি মাত্র কারণের জন্য—রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে, কেননা রাশিয়া ফ্যাসিস্টদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত। কিন্তু ওরা এদেশে যা করেছে তাতে রাশিয়ার কি সাহায্য হয়েছে তা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে—যার সত্যিকার সাহায্য হয়েছে সে রাশিয়া নয়—সে হলো অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় ধনবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতার। সর্বদেশে একই জাতীয় নীতির হুবহু ব্যবহার থেকে যে দুর্গতি ঘটে সে সম্বন্ধে লেনিন অনেকবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। কম্যুনিজমকে ভারতের জনগণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করিয়ে রাশিয়ার কোনো লাভ হয়নি বরং যুদ্ধের মধ্যে অথবা যুদ্ধের শেষে ভারতে যদি সত্যিকার বিপ্লব কম্যুনিস্টরা ঘটাতে পারত তবে আজ আবার রাশিয়াকে অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সামনে বিপদগ্রস্ত হতে হতো না। চীনদেশের মতো ভারতেও যদি বিপ্লব চালু হতো তবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা থাকত না এবং রাশিয়ার পক্ষে সেইটাই হতো আখেরের লাভ।

আমরা বিপ্লবী কম্যুনিস্টরাও রাশিয়ার আত্মরক্ষাকে খুব বড় একটা প্রয়োজনীয় নীতি বলে মনে করি। কিন্তু রাশিয়াকে আমরা বৈপ্লবিক সাহায্যের দ্বারাই সমর্থন করতে চাই—অর্থাৎ বিশ্ব-বিপ্লবই হলো রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষা ব্যবস্থা এবং তার অংশ হিসাবে ভারতে বিপ্লব সাধন করাই রাশিয়াকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা বলে মনে করি। আজ যদি অ্যাংলো-আমেরিকান শক্তি সমূহের কোনো ঘাঁটি ভারতে না দাঁড়াতে পারত তবে তার চেয়ে বেশি সাহায্য রাশিয়া বা চীন বা যে কোনো বিপ্লবী দেশের জন্য আর কি হতে পারত? ভারতের স্বাধীনতা যদি এতই গৌণবস্তু হয়ে থাকে তবে আজ কমিনফর্মের মুখপত্রে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের কেন হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয় যে ভারত ও পাকিস্তান আজও ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে মুক্ত হয়নি—আজও তাদের অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত হবার কাজ বাকি রয়েছে এবং ভারতীয় বিপ্লব আজও প্রধানত স্বাধীনতা আন্দোলন মাত্র ও ভারতীয় কম্যুনিস্টদের এই আন্দোলনটাকেই শান্তি আন্দোলনের অন্তর্গত করে নিয়ে অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধোদ্যমকে ব্যর্থ করতে হবে ইত্যাদি?

সেদিনের কথা মনে পড়ে। জনযুদ্ধ আপনা থেকে জনযুগে রূপান্তরিত হয়ে যাবে—বিপ্লব অনিবার্য জিনিস নয়—সমাজতন্ত্রের চেয়ে নয়া গণতন্ত্র অনেক কার্যকরী কথা—চার্চিল জনগণের বন্দী - আরও কত কি! যেন একটা প্রকাণ্ড প্রহসনের মধ্যে ডুবেছিল এরা। শ্রমিক একনায়কত্বের দরকার নেই বিপ্লব অনিবার্য নয় এমনি ধরনের কল্পনা—কত শিশুসুলভ স্বপ্ন দেখত এরা;—সংগ্রামের জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি রাখল না, যত রাজ্যের ভীরু মেরুদণ্ডহীন ছেলেমেয়েদের নাচের গানের আসরে এনে এরা এক অভাব কম্যুনিজম সৃষ্টি করল। এদের বাহ্যিক কলেবরটা যে নেহাৎ ফাঁকা একদিন তার প্রমাণ মিলল—কিন্তু সে অনেক পরে।

দৈনিক কাগজ, মাসিক কাগজ, সাপ্তাহিক কাগজ, হরেক ভাষায় হরেক রকমের কাগজ, গানের কাগজ, নাচের কাগজ—তা ছাড়া পোস্টার, লিফলেট, বইপত্র, পুস্তিকায় সারা ভারতে এরা তখন তাজ্জব কাণ্ড করে চলেছে—সরকার কোনো বাধা দিচ্ছে না। সৈন্যদের গণনাট্য শুনিয়ে ভারতের স্বার্থ এই জনযুদ্ধের মহিমা কীর্তন করে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। ধনিক-বণিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে পার্টির নানা অনুষ্ঠানে, কারখানায় কারখানায় ইউনিয়ন গড়ে তুলছে—কিন্তু তাতে ধর্মঘট করানো নিষেধ, চাষীদের মধ্যে সংগঠন চলেছে, সভা চলেছে—কিন্তু কোনো প্রকার কৃষক আন্দোলন নিষেধ,—কেননা তাতে ফসল বাড়াবার কাজে অর্থাৎ যুদ্ধোদ্যমে ক্ষতি হবে। কালোবাজার ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে কথায় বিষোদগার হয়েছে—কিন্তু যারা কালোবাজার করে ও খাদ্যদ্রব্যাদি লুকিয়ে রাখে সেই সব জ্ঞাত কনট্রাকটার ও সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম করেনি কেননা তাতে সরকার বিরোধী আন্দোলন এসে যেতে পারত—ফলে মিথ্যা বিক্রম দেখিয়ে আকাশে লাথি মারার মতো বাঁকা লড়াইয়ের ফাঁকা আওয়াজ ওঠাত—যেন এরা সত্যি সত্যি কত লড়াইএ লোক! দুর্ভিক্ষ এসে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে উজার করে দিল—কিন্তু সরকারের তৈরি দুর্ভিক্ষের জন্য এরা সরকারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদমূলক ধর্মঘট বা মিছিল পর্যন্ত করালে না,—ক্ষুধার্ত ও মুমূর্ষু লোকদের মুখে সরকারি খিচুড়ি তুলে দিয়ে জোরদার সেবাকাজ চালাতে লাগল এবং নিজেদের আত্মবঞ্চনা করতে লাগল এই বলে যে ওরা খিচুড়ির জন্য যদি জোরদার আন্দোলন না করত তবে আরও ৫০ লক্ষ লোক মারা যেত।

নিজেদের ওরা এই বলে ভোলাত যে স্বাধীনতা আন্দোলনটা মস্ত জিনিস নয় এবং তাদের নীতি অভ্রান্ত—কেননা দলটা তাদের রাতারাতি ফুলে কেশ থেকে কলাগাছে পরিণত হয়ে

গেছে! কত লোক, কত ছেলে, কত মেয়ে, কত কাগজ, কত ইউনিয়ন—লাল ঝাণ্ডার নীচে এসেছে—স্বাধীনতা আন্দোলনকারী "ফ্যাসিস্টপন্থীদের" সংগ্রামকে কেমন ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছে! জনগণের ভীরুতা, দুর্বলতা, ও স্বার্থবোধকে জাগিয়ে এই যে দলবৃদ্ধি—এটা যে কত ফাঁকা সেটা হাতেনাতে প্রমাণ পেল সেদিন যেদিন ওরা ওদের কলকাতা কংগ্রেসের জঙ্গী প্রস্তাব কাজে চালু করতে গেল। যখন এই জাতীয় সরকারকে উচ্ছেদ করবার জন্য ওরা দ্বিতীয় কংগ্রেসে মনস্থির করল তখন দেখা গেল ওদের দল থেকে ক্রমে ক্রমে সবাই ভেগে পড়ছে—এবং যারা রইল তারাও সেই জঙ্গী প্রস্তাবকে আস্তে আস্তে সাবোতাজ করে দিয়ে প্রায় বিকল করে দিল। সরকারি অত্যাচারের একটা সামান্যতম ধাক্কাও ওদের কোনো একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানও সহ্য করতে পারল না—ট্রামওয়ে ইউনিয়ন, চটকল ইউনিয়ন, রেলওয়ে ইউনিয়ন ইত্যাদি চোখের পলকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—সারা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কোনো সত্যিকার শক্তি দেখা গেল না।

কেন এমন হলো? সংগ্রাম বিমুখতার পথে যাদের সংগ্রহ করা হয়েছে, সংগ্রাম তাদের চোখে বিভীষিকা মাত্র। সুবিধাবাদ দিয়ে যাদের মুগ্ধ করা হয়েছে আদর্শের জন্য সংগ্রাম তাদের কাছে পাগলামি—নাচের আসরে যাদের সংগ্রহ করা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা একমাত্র পলাতকের ভূমিকায় নামতে পারে। তা ছাড়া যে টন টন কাগজ ওরা ছাপাত তাতে বিন্দুমাত্র বৈপ্লবিক চিন্তা বা শিক্ষা থাকত না—লেনিনের একটা কথাও তাতে প্রচারিত হতো না; ওরা মার্কস, এঙ্গেলস্, স্ট্যালিন এই ধারার মধ্য থেকে লেনিনের নামটা পর্যন্ত উহ্য রাখতে চেষ্টা করেছে—স্বয়ং ডিমিট্রভ পর্যন্তও একাজ করেছে;—কেননা ওদের কাছে তখন জনযুগ আসতে দেরি নেই, তাতে বিপ্লবের দরকার নেই, শ্রেণীসংগ্রামের সেই লেনিনিস্ট তাৎপর্য আর নেই, শ্রমজীবী শ্রেণীর একনায়কত্বের আর কোনো আবশ্যকতা নেই—এবং এগুলি ওরা জোর গলায় বলতে সাহস করত! এই বিস্ময়কর বিস্মৃতির কথা আজ ওরা যদি স্বীকার না করে, তবে ওদেরই লেখা কাগজপত্র থেকে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে—এবং দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে ওরা প্রাকাশ্যেই স্বীকার করেছে যে যুদ্ধকালীন সমস্ত রাজনীতিটাই ওদের ভুলে ভরা ছিল ও ওরা নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। দলের নীতিটা ভুল চলবে, ক্রমাগত ভুল ও সুবিধাবাদের উপর দলটা চলতে থাকবে অথচ দলের লোকগুলি খাঁটি ও শক্ত থাকবে—এমন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে পারে না। খোল ও নলচে দুই পাল্টে নতুন একটি হুঁকোর মতো, কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি ও সংস্থা দুটোই কলুষিত হয়ে যে একটা নতুন দল বনে গিয়েছিল—যা ওদের শেখাল কেবল সুবিধাবাদ ও গোলামিপনা—সৈন্যদের মধ্যে ঢুকল না, তাদের বৈপ্লবিক মনোভাব গঠন করবার জন্য সৈন্যদের বোঝাল না যে একদিন তাদের বিদ্রোহ করতে হবে;—বরং সৈন্য বিদ্রোহের মধ্যে সুভাষী ফ্যাসিজমের গন্ধ আছে যেহেতু সুভাষবাবু বিদ্রোহী সৈন্যদের কাজে লাগিয়েছিল—এই আতঙ্কে সৈন্যদের সরকারি আনুগত্যের মধ্যে যে কি মহান গণসম্ভাবনা রয়েছে তাই বোঝাতে লাগল—তাও বাইরে থেকে, ভেতরে গিয়ে নয়। পুলিশের মধ্যেও কোনো গোপন সংগঠন গড়া হলো না, যদিও পুলিশভ্যানে করে ওদের মজুর-বস্তিতে যাবার সুবিধা মিলত। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একদা মাও-সে-তুং তাঁর সমগ্র লালফৌজকে চিয়াং-কাই-সেকের সৈন্যবাহিনীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল—চিয়াং এর নেতৃত্বে লড়াইয়েও নেমেছিল—কিন্তু মাও একদিনের জন্যও তার আসল মতলবটা ভোলেননি যে যুদ্ধ শেষে মুহূর্ত বিলম্ব না করে চিয়াংকেও শেষ করতে হবে—এবং সেই অর্থে, চিয়াংয়ের সৈন্যগণের মধ্যে লালফৌজের সৈন্যদের ঢুকিয়ে দিয়ে সমগ্র কুওমিনটাং বাহিনীটাকে লাল মতাবলম্বী করার জন্য ভিতরে

ভিতরে দুর্দান্ত চেষ্টা করে চলেছিল। বর্মার কম্যুনিস্টরা জাপানের সাথে সহযোগিতা করে ইংরেজকে হটিয়েছে---আবার ইংরেজের সাথে হাত মিলিয়ে জাপানীকে হটিয়েছে—আবার শেষ পর্যন্ত এ, এফ, পি, এল, এ (A. F. P. L. A)-এর সহযোগিতায় সারা দেশটাকেই শত্রু মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। মালায়, ইন্দোচীন, বর্মা প্রভৃতি দেশে কম্যুনিস্টরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে নিজেদের অস্ত্রাগার পূর্ণ করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেনি; কিন্তু এখানকার কম্যুনিস্ট ভায়াদের ওকথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তোবা তোবা করে শিউরে উঠত—কেননা ওতে নাকি রোমাঞ্চকর অতিবামপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ আছে! বিপ্লব যাদের নিজেদের জীবনে করবার বা দেখবার কথা নয়—যাদের নাতি নাতনীদের করবার কথা;—তারা অবিশ্যি সম্মুখে সশস্ত্র সংগ্রামের কল্পনা করতে পারে না। তাদের কাছে জনযুদ্ধের বাণীই সর্বস্ব। ওরা মূর্খের স্বর্গে বিভোরে ঘুমুচ্ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লবীরা যখন অস্ত্র সংগ্রহে ব্যস্ত ও মুক্তিফৌজ গঠনে লিপ্ত, তখন ওরা এদেশে গণনাট্যের আবিষ্কারেব নামে ট্রাইব্যাল নৃত্য দেখতে ব্যস্ত।

আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে এই জাতীয় মনোভাবের আলোচনা করে দেখি—যুদ্ধ শেষে, যখন জার্মানী ও জাপানের পরাজয় ঘটে গিয়েছে—যখন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার চলেছে—সেই সন্ধিক্ষণে ভারতে নানা জাতীয় বিক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইছে। ছাত্র আন্দোলন, সুভাষ বাবুর আই,এন, এ বন্দিদেব মুক্তি আন্দোলন,—শ্রমিক, চাষী, সৈন্য, পুলিশ সকলের মধ্যেই একটা নবজাগরণের হৈ চৈ উঠেছে—সেই সময়ে বোম্বাই ও করাচী বন্দরে ভারতীয় নৌবহরের নাবিকেরা বিদ্রোহ করে বসল। বিদেশী অফিসারদেব আভিজাত্য, অহঙ্কার ও দুর্ব্যবহার এবং জীবন যাত্রাব অসহনীয় অবস্থাব বিরুদ্ধে বহুকালের ধূমায়িত রোষ একদিন ফেটে পডল। সেদিন বোম্বাইয়ে বিদ্রোহী নাবিকেরা একে একে কংগ্রেস, কংগ্রেস-সোসালিস্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টিব দ্বারে দ্বাবে নেতৃত্ব ভিক্ষা করে ফিবেছে। কংগ্রেস তখন অন্তর্বর্তী সরকারের গদিতে বসার তোড়জোড়ে ব্যস্ত—অতএব বিদ্রোহীদের সোজা আত্মসমর্পণেব হুকুম দিল। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি তখনো আত্মগোপনকারী নেতৃত্বের মধ্যে আস্থাবান অর্থাৎ আগস্ট আন্দোলনের জের টেনে চলেছে এবং কংগ্রেসের এই আপসকে মেনে নিতে পারছে না—পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করতে নারাজ। কিন্তু তাদের নেতা অরুণা আসফ আলির কাছে যখন বিদ্রোহী নাবিকেরা নেতৃত্ব করবার জন্য আহবান জানাল, তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন---মুখে সহানুভূতি জানালেও বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট দরবার করতে উপদেশ দিলেন এবং কাগজে ও পত্রে কংগ্রেসকে এ সম্বন্ধে সচেতন ও বিবেচক হতে বলে দায়িত্ব পালন করলেন। হতাশাগ্রস্ত নাবিকেরা তখন কম্যুনিস্ট পার্টি ও তাদের নেতা ডাঙ্গেব নিকট উপস্থিত। ডাঙ্গে নাটকীয় কায়দায় বিদ্রোহী নাবিকদের উদ্দেশে লাল সেলাম জানালেন এবং নাবিকদেব দাবি যে অত্যন্ত ন্যায্য এই নিয়ে জোর বিবৃতি দিলেন তাঁদের কাগজেব মারফৎ। আর যতদিন পর্যন্ত না তাদের দাবি মানা হয় ততদিন পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বললেন এবং শ্রমিকদের একদিনের জন্য নৌ-বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিতে ধর্মঘট করতে ডাক দিলেন। শ্রমিকরা অবশ্য এই ধর্মঘটের ডাক শোনার অপেক্ষা রাখেনি—ততক্ষণে বোম্বাইয়ের ফ্রি প্রেস জার্নাল সাধারণ ধর্মঘট করার জন্য এক আহবান দিয়ে বসেছে। বোম্বাইয়ের আকাশ বাতাস বিপ্লবের সূচনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে—রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকেরা সাহেব ধরে ঠেঙাচ্ছে—ব্যারিকেড করে পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে—প্রাণ দিচ্ছে। ক্যাসেল ব্যারাকে নাবিকদের বিদ্রোহ তখন সম্পূর্ণ—অস্ত্রাগার তাদের হাতে—সবগুলি জাহাজ তাদের হাতে—সমস্ত বোম্বাই শহরটি যুদ্ধ জাহাজগুলির অর্লিকান গান ও এন্টি-এয়ারক্রাফট গানের আওতার মধ্যে,

শহর থেকে যে কোনো প্রকারের বাধাকে তারা মুহূর্তে ক্ষান্ত করে দিতে পারে—গোরাদের শিবিরগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারে। মারাঠি সৈন্যবাহিনী জনতার বিদ্রোহকে দমন করতে অস্বীকার করেছে ও বিদ্রোহীদের দমন করতে এগিয়ে আসতে নারাজ—সমস্ত শহর জয়হিন্দ রবে, বিপ্লবের ধ্বনিতে থর থর করছে—সাহেবরা ও ধনীরা ভয়ে অস্থির—রাস্তায় বের হচ্ছে না। সারা ভারতে তখন বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর যেখানে যত জাহাজ আছে—কি করাচীতে, কি আন্দামানে—সর্বত্র তারা বেতারে যুক্ত কর্মপন্থা নিয়েছে ও যুক্তভাবে চলেছে।

এমন দিনে কম্যুনিস্ট পার্টি যা করেছিল তা কি যথেষ্ট, না বৈপ্লবিক? বিদ্রোহীরা যখন সমস্ত আইনানুগ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসেছে—সমস্ত জাহাজ ও ক্যাসেল ব্যারাক হস্তাগত করে বসে আছে,—তখন তাদের ব্যবহারগত দাবিদাওয়ার কথাই ওঠে না। তাদের রেশন ও খাদ্য অর্জনের ছোট ছোট অর্থনৈতিক দাবির গণ্ডী তারা পেরিয়ে এসেছে—তারা বিদ্রোহ সম্পূর্ণ করতে চাইছে—বিপ্লব সংঘটিত করতে তারা নেতা চাইছে, নেতৃত্ব করবার মতো দল চাইছে—তারা ভারতকে স্বাধীন করতে চাইছে। বোম্বাইয়ের মজুরেরা সে ডাকের অর্থ বুঝেছে, তাই রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড করে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। সৈন্যবাহিনী দ্বিধাগ্রস্ত তারাও বিদ্রোহ প্রবণ। সারা ভারতে এযাবৎকালের মধ্যে চলেছে ধর্মঘট। কলকাতায় বারে বারে বিদ্রোহ ফেটে পড়তে চাইছে—যুক্তপ্রদেশে গুর্খারা পর্যন্ত বিদ্রোহ করছে—বিহারে পুলিশেরা বিদ্রোহ করছে। এমন দিনে কম্যুনিস্ট পার্টি এই বিপ্লবের সম্ভাবনাটাকে বুঝতেই পারলনা—তারা মনে করল নাবিকদের দাবিদাওয়া ন্যায়সঙ্গত, অতএব তার জন্য তারা ধর্মঘট চালাক এবং শহরের মজুরেরা সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করুক। ব্যাস। এই পর্যন্ত।

তখনকার অবস্থা বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি কি চোখে দেখেছে সেটা আলোচনা করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে কম্যুনিস্ট চিন্তাধারা ও বিপবী কম্যুনিস্ট চিন্তাধারায় পার্থক্য কোথায়। তখন আমাদের মতে বিদ্রোহী নাবিকদের উপর ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার হুকুম হাস্যকর—বিদ্রোহীরা ধর্মঘটের স্তর বহুদূরে ফেলে এসেছে—তখন তারা একদম মরিয়া—একদম বিদ্রোহী। তখন তাদের জাহাজের উপর বসে থাকা ভুল—একদম ভুল—কেননা খাদ্য পানীয় কোথায় পাবে যদি শহরের উপর কর্তৃত্ব কায়েম না হয়? না খেয়ে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে জলে বসে থাকা মানে পরাজয় ডেকে আনা। তা ছাড়া দূর ভারত মহাসাগর থেকে রয়াল নেভির বড় বড় জাহাজ যদি এসে উপস্থিত হয় তবে দূরপাল্লার কামানের কাছে ভারতীয় নৌবহরের ছোট ছোট কামান দাঁড়াতে পারে না—যেমন করাচীতে 'মহারাজ' জাহাজ কোস্টাল ব্যাটারির কামানের আঘাত শেষ পর্যন্ত রুখতে পারল না—বহু নাবিক হতাহত হয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো (দমদম বসিরহাট মামলায় অভিযুক্ত বিন্দা সিং এই 'মহারাজ' জাহাজের বিদ্রোহী আহত নাবিকদের মধ্যে অন্যতম)।

তখনকার বৈপ্লবিক Order of the Day কি হওয়া উচিত ছিল—কি কি হুকুম উপযুক্ত বৈপ্লবিক নেতৃত্ব থেকে আসা উচিত ছিল? (১) তৎক্ষণাৎ বোম্বাই দখল করতে নেমে এস, (২) জলে এক মিনিট থাকবার দরকার নেই—ভারতীয় বিপ্লব কয়েকখানা জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে আবদ্ধ থাকতে এবং টিকতে পারে না, (৩) ওর্লির (Worli) গোরাদের ব্যারাকগুলির উপর হামলা করো, জাহাজ থেকেই উড়িয়ে দাও, (৪) সদলে সশস্ত্রে রাস্তায় নেমে এস—মজুরদের সঙ্গে একসাথে দাঁড়াও—মজুরদের সশস্ত্র করো—থানাগুলি দখল করো—মারাঠী সৈন্যদের ডেকে নাও—শহর দখল করে বসো—অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার স্থাপন করো এবং

সারা ভারতে বিপ্লবের জোয়ার তুলে দাও। এইটাই হলো বিপ্লবী কম্যুনিস্ট লাইন এবং এই লাইন অনুসৃত হতে পারলে—ভারতে বিপ্লব সার্থক হতে পারতো- -এর চেয়ে ভাল করে বিপ্লব সূচনা করবার মতো যোগাড় বা যোগাযোগ আসা করা যায় না—কল্পনাও করা যায় না। সেদিনকার ভারতে এইরূপ কিছু ঘটলে সমস্ত ভারত একদম ফেটে পড়ত—সাম্রাজ্যবাদ চূর্ণ হয়ে যেত এবং সে বিপ্লব চীন বিপ্লবের চেয়ে শতগুণ সহজ হতো। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ভাগ করার সুযোগ হতো না—কেননা সেদিন I. N. A. এবং নৌবিদ্রোহের কল্যাণে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ছিল—যা গত বিশ বছরের মধ্যেও দেখা যায়নি।

বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি এই নীতি অনুসরণ করেও কেন নৌবিদ্রোহকে স্বমতে চালাতে পারল না? কেবল তার পরিচয় হীনতার পাপে। বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা তখন বিদ্রোহীদের কাছে পরিচিত নয়—এত বড় একটা হুকুম বোম্বাইএর ক্ষুদ্র একটি কোণঠাসা দলের কাছ থেকে নিতে বিদ্রোহীরা সাহস পায়নি। পরে অবশ্য অনেক বিদ্রোহী নাবিক স্বীকার করেছে যে এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথই সেদিন ছিল না—একমাত্র আত্মসমর্পণ ব্যতীত।

কম্যুনিস্ট পার্টির সেই পরিচিতি ছিল—নাম ছিল—পরিচিত নেতা ছিল—তাই বিদ্রোহীরা তাদের কাছে ধরনা দিয়েছিল। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি তখন কংগ্রেসকে গদিতে বসাতে চেষ্টিত। জহরলালকে রাজনৈতিক আনুগত্য জানিয়েছে। মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানকে সমর্থন করেছে। সুতরাং বিদ্রোহীদের বিপ্লব করতে বলতে পারেনা। ফলে তাদের লাল সেলাম ও বক্ষবিদারী অশ্রুবর্ষণ বিদ্রোহীদের বিপথগামী করে দিল—তাদেরকে খাদ্য ও জল পাঠিয়ে সহানুভূতি ছাড়া বৈপ্লবিক কোন আদেশ দিতে পারল না। তিন দিন পরে সব ভেঙে গেল—নাবিকদের অর্থহীন ধর্মঘট শুধু কাল হরণ করে চলল—ভারত মহাসাগর থেকে বৃটিশ নৌবাহিনীকে আসবার সময় দিল—বিদ্রোহীদের কিংকর্তব্য-বিমূঢ় করে দিল এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল।

কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো দোষ নেই—ওরা বিপ্লব কল্পনায়ও রাখেনি—বিপ্লবের দরকার হতে পারে এমন ধারণাও পোষণ করত না। ওরা কংগ্রেস ও লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনায় আনন্দে বিভোর—দেশ খণ্ডনের যৌক্তিকতা প্রমাণে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। নৌ-বিদ্রোহটা হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়ে ওদের বিব্রত করে দিয়েছিল মাত্র—একটা অবাঞ্ছিত হাঙ্গামা হিসাবে—জনযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে জনযুগের আগমনে একটা বেসুরো বিশ্রী ঘটনা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল—ওদের চোখে।

উপরোক্ত উদাহরণটি থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। চিন্তার জড়তা, অবৈপ্লবিক কূপমণ্ডুকতা, অর্থহীন বাক্য বিলাসিতা ও অভাবনীয় অজ্ঞতার এমন চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর কোনোও কম্যুনিস্ট পার্টিতে কোনো কালে দেখা যায় নি!

১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে নানা জাতীয় বিদ্রোহাত্মক লক্ষণ ক্রমাগত ফুটে বেরুতে লাগল—ভারতের অচলায়তন অস্তিত্ব যেন গভীর তলদেশ থেকে নানা ভাবে নানা ছুতোয় কেঁপে কেঁপে উঠছে—শত শত বৎসরের অপমানিত, লাঞ্ছিত ও প্রতারিত ভারত অসহ্য অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেদিনকার কলকাতার চিত্র কারো ভোলবার নয়—নানা উপলক্ষে মিলিত হিন্দু-মুসলমান জনতার বিদ্রোহ করবার ইচ্ছে থেকে থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সেদিনের সেই "দিল্লী চলো"র ডাকে কোনো ফ্যাসিবাদ আত্মপ্রকাশ করেনি—বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আবেগ প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র—যাতে জনযুদ্ধওয়ালা কম্যুনিস্টরাও যোগ না দিয়ে মুখ দেখাতে পারছিল না।

আমবা ১৯৪২ সাল থেকে যে আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিই—সেই বাজনৈতিক আক্রমণাত্মক নীতিকে এই দীর্ঘ কয বছবেব মধ্যে একদিনও ক্ষান্ত হতে দিইনি—কোনো মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান বা অন্তর্বর্তী-সবকাবেব বাজনৈতিক ঘটনা আমাদেব সংগ্রামেব নীতিকে ক্ষান্ত কবতে বা যুদ্ধবিবতি ঘোষণা কবতে উৎসাহ দেযনি—আমবা সামাজ্যবাদেব সাথে দেশীয ধনবাদেব এই আপসবফাকে, যে কোনো উপাযে হোক, কাযেম হতে দিতে পাবিনা। কিন্তু কম্যুনিস্টবা এই অন্তর্বর্তী সবকাব ও মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যানকে সমর্থন কবে, কাজেই তাদেব পক্ষে এই সব জনবিক্ষোভে আন্তবিকতাব বৈপ্লবিক সহযোগিতা কবা সম্ভব হযনি—তাবা এই সব ছাত্র বিক্ষোভ ও শ্রমিক বিক্ষোভে যোগ দিত কেবল একটা মীমাংসাব জন্য এবং গবম বুলিব ও গবম কর্মপন্থাব একটা ফাঁকা আওযাজ ও আলগা আলগা আন্দোলন দিযে আবাব নিজেদেব বাজনৈতিক আসবে ফিবে আসাব জন্য। তাই এই সব নৌ বিদ্রোহ, ছাত্র বিক্ষোভ, স্ট্রিট ফাইট ইত্যাদিকে এবা বৈপ্লবিক স্তবে পৌঁছে দিতে আপত্তি কবত।

আমবা প্রত্যেকটি বিক্ষোভ, প্রত্যেকটি বিদ্রোহকে বৈপ্লবিক পথে এগিযে নিযে যেতে বলতাম, আমবা বলতাম পাড়ায পাড়ায পঞ্চাযেত গঠন কবো—সোভিযেটেব আদর্শে, পাল্টা সবকাবেব প্রযোজনে, বিপ্লবেব অপবিহার্য স্তব ও কর্মপন্থা হিসেবে। আমবা বলতাম—শহবে, গ্রামে, বস্তিতে এই পাল্টা পঞ্চাযেত সবকাবেব বনিযাদ গঠন কবো —কেননা এটা বৈপ্লবিক যুগ—সামনে আমাদেব বিপ্লব ছাড়া আব কিছুই নেই—এবং এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব রূপ নিতে বাধ্য। আমবা বলেছি গণবাহিনী গড়ো—পঞ্চাযেত বাজ কাযেম কবাব উদ্দেশ্যে। আমবা পুলিশ, সৈন্যদেব মধ্যে সোজা বিদ্রোহেব আহবান দিযে চলেছি—সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয কংগ্রেসেব ষডযন্ত্রকে বানচাল কবে দেবাব জন্য বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে জাগবিত কববাব আহবান দিযেছি। আমাদেব এই সমযকাব পুস্তিকাগুলি দ্রষ্টব্য (যথা—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয কেন, বিপ্লবী সাম্যবাদীদল ও পঞ্চাযেত ইত্যাদি)। আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৯৪২সালে যে বিদ্রোহেব সূত্রপাত হযেছে তাব কোনো বৈপ্লবিক ছেদ থাকতে পাবেনা— সেই বিদ্রোহকেই দীর্ঘাযিত কবতে হবে, গভীবতব কবতে হবে, বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রামেব পথে রূপায়িত কবে আনতে হবে এবং ভাবতেব জাতীয স্বাধীনতাব আন্দোলনকে ক্রমেই সংঘর্ষেব মধ্যে দিযে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সম্পূর্ণ কবতে হবে। অতএব মার্কসিস্ট হিসেবে ১৯৪২ সালেব আন্দোলনে আমাদেব যোগ দেওযা মানে কংগ্রেসেব সাথে যোগ দেওযা নয—ভাবতেব বুকে অন্তর্নিহিত বিপ্লবেব সাথে যোগ দেওযা। কাজে কাজেই কংগ্রেসেব অথবা কংগ্রেস-সোসালিস্টদেব অথবা ফবওযার্ড ব্লকেব সংগ্রাম বিবতিব সাথে সাথে আমাদেব সংগ্রাম বিবত হতে পাবেনা—ববং বাজনৈতিক সংকট ও বিশ্ববিপ্লবেব ঘনাযমান পবিস্থিতিতে আমাদেব সংগ্রামেব আপসহীন স্বরূপটাকে আবও স্পষ্ট, আবও দৃঢ ও আবও বেগবান কবতে হবে। ঔপনিবেশিক দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনেব এই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিব কথা আমবা পূর্বেই বলেছি—যখন বলেছি পবাধীন দেশেব স্বাধীনতা আন্দোলন আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেবই অঙ্গ বিশেষ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কায়েম না হওযা পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ থেকে সত্যিকাব ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মেলা অসম্ভব। অতএব পেথিক লবেন্সেব আগমন, অন্তর্বর্তী সবকাব স্থাপন, দেশীয ধনীদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ, মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান ইত্যাদিব কোনোটাব উপবই আমাদেব বাজনীতি যুদ্ধবিবতি ঘোষণা কবতে পাবে না—যেহেতু এইসব কোনো ঘটনাই ভাবতেব অগ্রগতিব পথে বিশ্রাম নেবাব মতো কোনো সোপান নয ,—ববং বিপ্লব বিরোধী ষড়যন্ত্র মাত্র—যাকে বানচাল কববাব প্রয়োজন ও দাযিত্ব বামপন্থীদের শতগুণ বেড়ে যায়।

অতএব আমবা একাই বিপ্লবের কথা বলতে লাগলাম। অন্যান্য বামপন্থীবা আমাদেব ঠাট্টা কবতে লাগল। কম্যুনিস্ট পার্টি আমাদের দায়িত্বহীন অতিবামপন্থী বলে উডিযে দিতে চাইল—কেননা আমবা সব কিছুতেই বিপ্লব দেখি।

এদেশে ট্রট্স্কীপন্থী একটা দলও ছিল—যাদেব নাম ছিল বলশেভিক লেনিনিস্ট পার্টি। তাবাও আমাদেব পাতিবুর্জোযা সুলভ বোমাঞ্চকাবী অতিবিপ্লবী বলে ঠাট্টা কবত। তাবা পঞ্চাযেত ও বিপ্লবেব ডাকটাকে হঠকাবিতা বলে চালাতে লাগল। ট্রটস্কীপন্থীবা তখনও বাজাবে খুব কডা বিপ্লবী নামে পরিচিত ছিল—অতএব তাদেব কাছেও আমাদের অতিবাম নীতিব জন্য গাল খেতে হচ্ছে দেখে এই ট্রট্স্কীবাদ সম্বন্ধে আমাদেব নজব দিতে হলো এবং তন্ন তন্ন কবে ওদেব সঙ্গে আলোচনা কবে ভাবতীয ট্রট্স্কীবাদেব মর্মোদ্ধাব কবা হলো।

বাজাবে আমাদেব সম্বন্ধে তখন একটা অস্পষ্ট ধাবণা চালু ছিল যে বিপ্লবী কম্যুনিস্টবাও টট্স্কীপন্থী। এই ধাবণা কম্যুনিস্ট পার্টি চালু করতে সাহায্য কবে। কেননা ওবা জানত যে ওদেব সম্বন্ধে আমাদেব সমালোচনা অকাট্য—ওদেব নীতিতে যে গলদ বাব বাব প্রকাশ পেযেছে তা আমবা ধবিযে দিই—এবং সাম্যবাদেব পাল্টা এবং প্রকৃত রাস্তা তৈবী কবতে ও সে পথে অগ্রসব হতে আমাদেব একটা তীব্র আগ্রহ আছে। তাই নিজেদেব লজ্জিত বিবেককে সন্তুষ্ট কববাব জন্য দেশে ও বিদেশে আমাদেব ট্রটস্কীবাদী বলে চালাতে চেষ্টা কবেছে এবং আজও কবে যাচ্ছে—কেননা এতে ওদেব পক্ষে আমাদেব অগ্রাহ্য কবা সহজ হয এবং ওদেব দলবলকে একটা খাবাপ ইঙ্গিত দিযে আমাদেব সম্বন্ধে বিমুখ কবে বাখতে সুবিধা হয। অতএব ট্রট্স্কীপন্থা সম্বন্ধে আমাদেব বিচাবেব ও ধাবণাব একটু বিশদ আলোচনা কবা দবকাব।

ট্রটস্কীব সঙ্গে স্টালিনেব দ্বন্দ্ব ও তাব পবিণতি নিযে আজ এই পুস্তকে কোনো আলোচনা কবা হবে না কেননা কোনো এক দেশেব বৈপ্লবিক নীতি, কৌশল ও কর্মপন্থা নির্বাচনে অতসব মহাভাবতীয আখ্যান টেনে আনাব দবকাব কবে না। আমবা এখানে বৈপ্লবিক কৌশল ও নীতি সম্পর্কিত আলোচনায ব্যস্ত। যে সমস্ত নীতিগত বিবোধ ইতিহাস সাপেক্ষ, যাতে কোনো দলাদলিগত বিকৃতিব অবকাশ বা সন্দেহেব স্থান নেই এবং যে কথা নিঃসন্দেহভাবে ঐতিহাসিক সত্য বলে জ্ঞাত সেইসব মূলনীতিগত বিষযই আলোচনা কবব। এই কৌশল ও নীতিব দ্বন্দ্বটাই আসল, নইলে পববর্তী কালে কে কী ষডযন্ত্র কবেছে—পবস্পব পবস্পবেব বিরুদ্ধে—এ নিযে বৈজ্ঞানিক বিচাব কববাব মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদেব নেই এবং অবসবও নেই।

ট্রট্স্কীবাদেব মাত্র দুটি ইতহাস বিখ্যাত নীতি সম্পর্কে আলোচনা কবলেই পববর্তী কালে ট্রট্স্কীপন্থাব পতনেব কাবণ বুঝতে সহজ হবে। Theory of Permanent Revolution ও Dictatorship of the Proletariat-এব ট্রট্স্কী ভাষ্য—এই দুটি বস্তু এখন আমাদেব আলোচ্য বিষয।

Permanent Revolution বা চিবন্তন বিপ্লবেব নীতি নিযে ট্রটস্কীব সঙ্গে লেনিনেব মতানৈক্য ইতিহাস বিখ্যাত। ১৯০৩/৪ সালেই এই মতানৈক্য দেখা দেয। জাব শাসিত বাশিযাব বিপ্লব কি ধবনেব হবে এবং যে কোনো বিপ্লবেব উত্থানে শ্রমিকশ্রেণী ও তাব সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি কি ভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে বিপ্লবকে পবিচালিত কববে এই নিযে মস্ত একটা তর্ক ওঠে। লেনিনেব মতামত Two Tactics of Social Democracy নামক বিখ্যাত বইতে লিপিবদ্ধ, যাব পাল্টা মত ট্রট্স্কীব Permanent Revolution-এ পাওযা যায।

লেনিনেব মতে তখনকাব বাশিযাব সমাজগর্ভে দুটি বিপ্লব সম্ভাবনা বযেছে—একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অপবটি শ্রমিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ;—এবং এই দুই বিপ্লবেবই নেতা শ্রমিক

শ্রেণী। বণিক শ্রেণী তখন বৈপ্লবিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তাই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ও নেতৃত্ব সে করবে না বরং জারের সঙ্গে আপস করে একটা সহযোগিতা করে নেবে—বিপ্লবের বিরুদ্ধেই। ফলে শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে বিপ্লবের পথে টেনে আনবে এবং প্রথমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করবে—যদিও সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব তখনও তার বুর্জোয়া সীমানা অতিক্রম করেনি। এই বিপ্লবের শ্রেণী যোজনা হবে এই রকম অর্থাৎ Democratic Dictatorship of the Proletariat and the Peasantry বা শ্রমিক কৃষকের একনায়কত্ব বা শ্রমিক-কৃষকরাজ। অথচ তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা স্তর মাত্র এবং কতটা সময় পর্যন্ত এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্ব ও একনায়কত্ব বর্তমান থাকবে ও কখন তা চরম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে চলে যাবে তা নির্ভর করবে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। এই যুক্ত শ্রমিক-কৃষক রাজ যদিও তখনো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমান্ত অতিক্রম করছে না, তথাপি এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শেষ ও চরমতম স্তর—যার একটি পদক্ষেপ পরেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আরম্ভ। এই মজুর কৃষক একনায়কত্বে কাজ কি? জারতন্ত্রকে ধ্বংস করা, সামন্ততন্ত্রের অবসান, জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অবসান ও গণতন্ত্রের ব্যবস্থা চালুকরণ—কিন্তু ধনতন্ত্রে তখনও আঘাত করা হচ্ছে না। জারতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের অবসানে—পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অধিকার কায়েম হবার পরে—জনগণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—তখন অনিবার্য ঐতিহাসিক গতিতে শ্রমিকশ্রেণী ধনতন্ত্রকেও চ্যালেঞ্জ করে বসবে এবং দরিদ্র চাষীদের সহযোগিতায় শ্রমিক একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) স্থাপন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কায়েম করবে। প্রথম বিপ্লবে মজুর সমস্ত চাষীকে নিয়ে যুক্ত একনায়কত্ব স্থাপন করছে, কিন্তু দ্বিতীয় বিপ্লবে ধনীচাষীদের বাদ দিয়ে গরিবচাষী ও খেতমজুরদের সহযোগিতায়—শ্রমিক একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করছে। কিন্তু এই দুই বিপ্লবের মধ্যে কোনো লৌহ-সীমানা দিয়ে সীমান্ত নির্দেশ করা নেই—বরং ইতিহাসের বেগে ও ঘটনার চাপে—অবস্থানুযায়ী—প্রথম বিপ্লব দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে (One growing into the other)।

ট্রটস্কী বলে রাশিয়ার সমাজগর্ভে একটি মাত্রই বিপ্লব সম্ভাবনা রয়েছে—সে হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—যার প্রথম থেকে শ্রেণী সংযোজনা হলো শ্রমিক একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat)। রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব আসছে তাতে গণতান্ত্রিক কোনো স্তর নেই—যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লব বিরোধী এবং চাষীরাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি মজুরেরা একনায়ক সরকার শহরে কায়েম করতে পারে তবেই গ্রামদেশে দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানো সম্ভব হবে এবং তাদের সহযোগিতাও পেতে পারবে, তথাপি রাষ্ট্রক্ষমতা মজুর শ্রেণীকে নিজেরই হাতে রাখতে হবে—চাষী বা অপর কোনো সম্প্রদায়ের সাথে তা ভাগ করে ভোগ করা উচিত হবে না, সম্ভবও হবে না। শ্রমিক শ্রেণীকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই নেতৃত্ব, দায়িত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণ করবার কর্মকুশলতা অর্জন করতে হবে। বিপ্লবে চাষীদের যে কোনো দানই নেই তা নয় তবে গরিব চাষীদের দান গৌণ এবং তা শ্রমিক একনায়কত্ব ও নেতৃত্ব সাপেক্ষ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজ গঠনে চাষীদের কূপমণ্ডুকতা আগ্রহ্য করবার নয় বলেই চাষীদের সাথে বিপ্লবী শ্রমিকদের ক্ষমতা বণ্টন সম্ভব নয়—এবং তা সমাজতান্ত্রিক স্বার্থেরও প্রতিকূল।

উপরোক্ত তর্কের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অযথা আলোচনা না করে দেখা যাক এই তর্ক রাশিয়ার ইতিহাসে কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল—১৯১৭ সালের বিপ্লবে লেনিনের নীতি না

ট্রটস্কীর নীতি ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সূচনার পর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক যে সাময়িক সরকার কায়েম হয় তা ক্ষণস্থায়ী এবং সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রমিক বিপ্লবে বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ইতিহাসের বাস্তব বিচারে দেখা যায় যে লেনিন বা ট্রটস্কী কারোরই মতামত ঠিক হুবহু কাঁটায় কাঁটায় প্রতিপন্ন হয়নি অথচ দুইয়ের পার্থক্যও আকাশ-পাতাল নয়। কেরেনেস্কিকে নিয়ে যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র কায়েম হয়েছিল জারের পতনের পর—তাকে চাষী মজুরের যুক্ত একনায়কত্ব বলা যায় না—সেই সরকার সামন্ততন্ত্র বিরোধী তো নয়ই বরং ভিতরে ভিতরে জারের অনুচরদের সাথেও তাদের সহযোগিতা ছিল। দ্বিতীয়ত অক্টোবর মাসের বিপ্লবোত্তর যে রাষ্ট্র কায়েম হল তাকে কেবলমাত্র শ্রমিকের রাজ একথা বললেও অত্যুক্তি হয়। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় রূপ যা হয়েছিল তা হল সোভিয়েট গণতন্ত্র। মজুরেরা মজুর সোভিয়েটে, চাষীরা চাষী সোভিয়েটে, সৈন্য ও নাবিকেরা নিজ নিজ সোভিয়েটে সংগঠিত হয়েছিল—বিপ্লবের মধ্য দিয়েই—প্রায় নিজ থেকেই—১৯০৫ সালের বিপ্লবের অনুকরণে। এই সোভিয়েট সংগঠনের মধ্যে সকল বামপন্থী দলগুলিই ছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাতে বলশেভিক প্রাধান্য প্রকাশিত হতে লাগল—কেননা বলশেভিক নীতি ক্রমশই জনতার নিকট সঠিক বলে মনে হতে লাগল—বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তখন লেনিনের পক্ষে "All Power to the Soviet" এই শ্লোগান দিতে কোনো অসুবিধা হল না—এবং কার্যত ক্ষমতা সমস্ত সোভিয়েটের হাতে চলে গেল ও বলশেভিক পার্টি নেতৃত্ব করতে সমর্থ হলো। এই যে নতুন শাসনতন্ত্র এতে কেবল মজুরই থাকল না- কৃষক, সৈনিক, নাবিক, শিক্ষক, দরিদ্র বুদ্ধিজীবী—সকলেই রইল —এবং সম্মিলিত নিপীড়িত শ্রেণীগুলি মজুর শ্রেণীর পার্টি বলশেভিক নেতৃত্বে এক গণতান্ত্রিক একনায়ক দুর্ধর্ষ শাসন কায়েম করল—যা নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র কিন্তু শত্রু পক্ষের কাছে একদম নির্মম ও একনায়কত্ববোধক।

অতএব কি ঘটল? (১) বিপ্লব বুর্জোয়া গণতন্ত্রে তিষ্ঠতে পারল না—সমাজতন্ত্রে এগিয়ে গেল ; (২) মজুর, চাষী, নিম্নমধ্যবিত্ত এদের রাজত্ব বা একনায়কত্ব কায়েম হল , —(৩) এই সম্মিলিত একনায়কত্বের নেতা শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি বলশেভিক পার্টি কেন না যাবতীয় সামাজিক আদর্শ ও কর্মপন্থা যা এই সোভিয়েট কায়েম করতে বাধ্য হলো বা বেছে নিল—তা হলো বলশেভিক কর্মপন্থা যা এই শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক আদর্শ। এই বলশেভিকি কর্মপন্থার এতটুকু আপস অন্য আদর্শের সাথে করতে হয়নি এবং সম্পূর্ণ নির্জলা কম্যুনিস্ট নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে লাগল। চাষী, বুদ্ধিজীবী, সৈনিক এরা সকলেই ক্ষমতার অংশ পেলেও—তা কায়েম বা চালু করতে হচ্ছে পাতিবুর্জোয়া ধারায় নয়—শ্রমিক ধারায় —এরই জন্য বলা যায় রুশ-বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সামাজিক তাৎপর্য মজুর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) । এখানে মজুরের সংখ্যা দিয়ে বা তাদেরই শ্রেণী থেকে সকল অফিসার বা কর্মকর্তা দিয়ে শাসনযন্ত্র গঠনের কথা উঠছে না—উঠছে শ্রমিকতন্ত্র বা শ্রমিকের আদর্শ কায়েম করার তাৎপর্য থেকে। Dictatorshipএর শ্রেণীগত মূল্য ও স্থান, কাল, পাত্র, এইরূপেই বুঝতে হবে—অন্য কোনো উপায় নেই।

অতএব লেনিন ও ট্রটস্কীর মধ্যে কে বেশি সঠিক? লেনিন! কেননা লেনিন বিপ্লবের একটা ক্রমবিকাশমান ছবি (Growing Picture) দেখেছিলেন। বিপ্লব কতকটা অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু হয় বিদ্রোহের পথে—এবং পথে যেতে যেতে অবস্থা ও নেতৃত্বের আঘাতে তা ক্রমশ শ্রেণীচেতন ও উদ্দেশ্য-মুখর হতে থাকে এবং কালে তার শেষ পরিণতি অর্থাৎ সার্থক বিপ্লবের সম্পূর্ণ পরিণতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছায়—যার সামাজিক শ্রেণী বিশ্লেষণ মজুর

নায়কত্ব—শোষিত শ্রেণী সমূহের সম্মিলিত এক রাষ্ট্রশক্তির আধারে ও একনায়কত্বে। ট্রটস্কী এই হিসাবে ঠিক যে আজকের যুগে প্রত্যেক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্গত , কিন্তু তাঁর Dictatorship of the Proletariat এবং Permanent Revolution এর ব্যাখ্যার মধ্যে এমন একটা ধারণা বর্তমান যে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই বিপ্লবী এবং কোনো বিপ্লবে যদি শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কত্ব গ্রাহ্য না হয় ও মজুর একনায়কত্ব মেনে না নেওয়া হয় তবে তা বিপ্লবই হবে না। এতে গাড়ির আগে ঘোড়া না জুড়ে ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়বার মতো একটা অবস্থা বুঝায়। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব অন্যান্য শ্রেণী প্রথমেই মেনে নেবে কেন এর যুক্তি বোধগম্য নয়। অপর পক্ষে অন্যান্য শোষিত দরিদ্র শ্রেণীগুলি যাদের লোকসংখ্যা বেশি—রাশিয়ার মতো কৃষি-প্রধান দেশে—তারা যদি শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধিতা করে অথবা নিষ্ক্রিয়তা দেখায় তবে মজুর শ্রেণীর রাজ কোনো কালেই কায়েম হতে পারে না —যেমন পারেনি প্যারিস কম্যুনে, প্যারিসের শ্রমিকেরা তাদের কম্যুনকে বাঁচাতে—সমস্ত ফ্রান্সের কৃষকের অসহযোগিতা এবং বিরোধিতার জন্য। মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব ও একনায়কত্ব মজুরের জন্মগত অধিকার নয়—ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার মধ্যে তা অধিকারে পরিণত হচ্ছে। অপরাপর শোষিত শ্রেণীর দাবি ও আকাঙ্ক্ষাকে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই আজ তার নেতৃত্বে ও আদর্শে সফল করতে পারে—এই কথা শ্রমিককে কার্যত দেখাতে হবে , তবেই তারা মজুর নেতৃত্ব ও আদর্শ মেনে নেবে। অতএব Permanent Revolution এর মধ্যে একটা মাথা থেকে (Top থেকে) নামবার ইঙ্গিত রয়েছে—কিন্তু লেনিনের পথ—গোড়া থেকে উঠবার পথ এবং ক্রমবর্ধমান পথ—অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের সুকৌশল প্রয়োগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। লেনিনের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের (Growing Revolution) শেষ পরিণতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (Socialist Revolution)—কিন্তু ট্রটস্কীর সমাজতন্ত্রী বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্ব (Proletarian Dictatorship) দিয়ে আরম্ভ করবার স্বপ্ন অবাস্তব —এবং পৃথিবীর কোথায়ও তা বাস্তবে পরিণত হয় না—না চীনে, না ইন্দোচীনে, না মালয়ে, না পূর্ব ইউরোপে। পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় যেখানে শ্রমিক শ্রেণীই দলে ভারি ও সংখ্যায় বেশি—সেখানে তাদের বিপ্লব আজো শুরুই হয়নি।

পরবর্তীকালে, বিশেষ করে এই যুগে ট্রটস্কীপন্থীরা এমন একটা অদ্ভুত পলিসি নিল যে যদি কোনো আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের আদর্শে শুরু না হয় তবে তা বৈপ্লবিক আন্দোলনই নয়। ফলে—ভারতবর্ষে, বর্মায়, মালয়ে, ইন্দোচীনে, ম্যানিলায় যে সমস্ত আন্দোলন উঠেছে তাকে তারা স্বীকার করেনা—ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে,—যার জন্য ট্রটস্কীপন্থীদের স্থান আজ আর কোথায়ও নেই, একমাত্র সুবিধাবাদের শিবির ছাড়া—যার জন্য ভারতীয় ট্রটস্কীপন্থীদল শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সোসালিস্ট দলে ভিড়ে গিয়ে ট্রটস্কীবাদের চরম দুর্গতি করে ছেড়েছে। আর এরাই আমাদের বৈপ্লবিক আহ্বানগুলিকে রোমাঞ্চকর পাতি বুর্জোয়া স্বপ্ন বলে ঠাট্টা করত।

* * * *

এইভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলতে লাগল—বছর কেটে যেতে লাগল। দেশে অশান্তি ও বিক্ষোভ রয়েছে এবং তার ওপর চলেছে ক্ষমতা হস্তান্তরের রাজকীয় চালবাজী—কংগ্রেস, লীগ ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে টানাটানি চলেছে—দর কষাকষি চলেছে। ওদিকে বৃটেনে রক্ষণশীলদের পরাজয় ঘটেছে—লেবার ক্ষমতায় আসীন হয়েছে—ভারতীয় ধনীদের হাতে সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে ভারতে বৃটিশ অর্থনৈতিক ও বৃহত্তর যুদ্ধস্বার্থ রক্ষার্থে

ইংরেজ সরকার ভারতীয় ধনীদের হাত করতে ব্যস্ত। লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধটাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে চলেছে এবং যাতে ভারতীয় রাষ্ট্র একটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে শক্তিমান হয়ে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য ইংরেজ সরকার মুখে সাধুবাণী ছড়ালেও ভিতরে ভিতরে মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উস্কানি দিতে লাগল। কংগ্রেস গণ আন্দোলনের বিরাট বৈপ্লবিক অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা লক্ষ্য করে ক্রমেই ভীত হয়ে উঠতে লাগল এবং গণ আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে কাবু করবার সাহস যা এতকাল তারা করে এসেছিল তা আর তারা দেখাতে পারল না এবং সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ সরকারের সদিচ্ছায় বিশ্বাসবান হতে লাগল এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে সত্যিকার একজন ভারতবন্ধু আবিষ্কার করে ফেলল।

কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি এই ক্ষমতার হস্তান্তর ব্যাপারে সমর্থন জানাল না এবং ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্যকে তখনো চালু রাখবার মতো মৌখিক রাজনীতি করতে লাগল---অথচ যে সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তির মধ্যে—বিদ্রোহী নাবিক, সৈন্য, পুলিশ, রাজকর্মচারী, ছাত্র, মজুর ও চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাদের দায়িত্ব নিতে সাহস করল না —ফলে তারা একটা নির্বীর্য বাকসর্বস্ব নীতিতে আটকে পড়ল —না পারছে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে, না পারছে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে কিংবা দেশের নেতৃত্বকে নিজ হাতে নিতে। পরমুখাপেক্ষী দল হিসাবে কংগ্রেস সোসালিস্ট দল চিরকালই কংগ্রেসের অনুগত-বিরোধিতাবাদী---যে প্রত্যেক সঙ্কট মুহূর্তে, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মুখে কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য জানাতে ভুল করে না। আজও তারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেও—সেই পরনির্ভরতা থেকে রক্ষা পায়নি এবং দেশে কোনোপ্রকার বৈপ্লবিক অবস্থা চালু হলে যদি তাতে বর্তমান রাষ্ট্র ও কংগ্রেসী সরকারের উচ্ছেদ সম্ভাবনা থাকে, তবে তারা রাষ্ট্রের তথা কংগ্রেসের রক্ষণাবেক্ষণে অচিরাৎ আত্মনিয়োগ করবে একথা বার বার বলেছে। অতএব আগস্ট বিপ্লবীরা এই সময়টায় সময় কাটানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারেনি। দেশে তখন আরো একটা অসংবদ্ধ শক্তি খুব জোরাল ছিল---সে হলো আজাদ হিন্দ বাহিনী ও সুভাষচন্দ্রের প্রভাব। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে জয়হিন্দ ও নেতাজী একটা জীবন্ত শক্তি হিসেবে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছিল—যাকে ভাঙিয়ে পরবর্তীকালে কংগ্রেস ভোট যুদ্ধ জয় করে নিল এবং সেই ঐতিহ্যকে নিজেদের পতাকায় লাগিয়ে নিজেদের শক্তিকে আরো বাড়িয়ে নিল। কম্যুনিস্ট পার্টি পর্যন্ত এই আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন থেকে একদম বাইরে থাকতে সাহস পায়নি—তারা এই আন্দোলনের ভেতরে ঢুকে নিজেদের অস্তমিত রাজনৈতিক ইজ্জৎ ফেরাবার চেষ্টা করেছে অথচ যাতে এই আন্দোলন জয়ী না হয় অথবা বিপ্লবমুখী না হয়ে ওঠে, তাতে ওদের চেষ্টার অন্ত ছিল না—যার জন্য তারা জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছে, গুণ্ডামি বন্ধ করতে হবে, বিশৃঙ্খলা দূর করতে হবে এবং জহরলালকে (অন্তর্বর্তী সরকারে আসীন জহরলালকে) পূর্ণ সমর্থন জানিয়েই যা কিছু করার করতে হবে।

অথচ এদেশে যারা সুভাষবাবুর বন্ধু, সেই সব ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা এই বিরাট দিল্লী চলার ও জয়-হিন্দ আওয়াজের তাৎপর্য বুঝতে পারল না বা দায়িত্ব গ্রহণ করতে সাহস পেল না বলেই পারল না। নিজেদের অপেক্ষাকৃত ম্রিয়মাণ অস্তিত্বকে সুভাষবাবুর নামে পুনরুজ্জীবিত করেই আনন্দিত---কিন্তু দেশের বুকে যে ঐতিহাসিক পুঞ্জিভূত ব্যথা ও বাসনা এই সব বাণীর মধ্য দিয়ে ফেটে বেরুতে চাইছিল তাকে কোনো প্রকার বিদ্রোহাত্মক পথে এক পা এগিয়ে নিতে সাহস করল না---কেবল একদিন নেতাজী ফিরে আসবেন ও তিনি মরেননি এই সব ভবিষ্যৎ স্বপ্নেই বিভোর রইল।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্ত সেনাপতিরা তখন ভারতের গৌরব, কোটি কোটি লোকের অতি আদরের তারা। কিন্তু শাহনওয়াজ, ধীলন প্রমুখ সেনাপতির জনতার নেতৃত্ব গ্রহণ করবার সাহস পেলনা, তারা জনতার শ্রদ্ধা নিয়েই সন্তুষ্ট রইল এবং কংগ্রেসের পিঠ চাপড়ানিতে আশ্বস্ত হয়ে অনেকে যার যার ঘরে ফেরবার পথ ধরল। রাজনৈতিক জ্ঞান তাদের অতি অল্পই ছিল— স্বাধীনতার আন্দোলন বা আপসবিহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-সংগ্রামের ডাক দেবার মতো মানসিক প্রস্তুতি বা সাহস তাদের কারুরই ছিলনা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর অগণিত সাধারণ সৈনিকেরা তখন ভাতা ও পুনর্বসতির আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে কংগ্রেসের অনুগামী হতে লাগল এবং ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থী নেতাদের অক্ষমতা ও দায়িত্বহীনতা তাদের ধীরে ধীরে সরে পড়তে সাহায্য করল। এই বিরাট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্ভাবনা ও শক্তিকে কেন বিরাট এক সংঘাতে পরিণত করা গেল না—তার রাজনৈতিক কারণ হলো এই যে বিদায়মান ভঙ্গিতে ইংরেজরা যখন সমস্ত ক্ষমতা দেশীয় নেতাদের হাতে সমর্পণ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন নিছক স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম ওঠাবার প্রয়োজনীয়তা যেন বামপন্থীরা খুঁজে পাচ্ছিল না। যখন কংগ্রেস দেখাতে লাগল যে দিল্লী তো আমাদের হাতে, লালকেল্লার তো আমরাই মালিক, তখন কংগ্রেস সোসালিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লকিস্ট, আজাদ হিন্দওয়ালা আরও কত কি বামপন্থী নেতা ও এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টি পর্যন্ত বুঝতে পারল না, সত্যি এই গণবিক্ষোভ কার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে, যেন শত্রুই নেই—ইংরেজ তল্পি তল্পা বাঁধছে যাবার জন্য অতএব শত্রু কোথায়? কেউ কেউ ভেবেছে ইংরেজ যাচ্ছে না – যেতে পারে না ওদের মেরে না তাড়ালে যাবে না—কিন্তু কংগ্রেস বারে বারে দেখাতে লাগল তারা তো সত্যিই ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বিদায় নিচ্ছে— প্রত্যেকটি সামরিক অফিসারকে পর্যন্ত নিয়ে যেতে প্রস্তুত কিন্তু ভারতের স্বার্থেই তাদের এত তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রজিতের মতো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে যাবার মতো, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ দেশীয় ধনপতি ও রাজারাজড়াদের আড়ালে লুকিয়ে যখন অন্তর্ধান হতে লাগল তখন সেই অন্তর্হিত শত্রুকে ধরবার ও আঘাত করবার উপায় হলো এই আড়ালযন্ত্র, এই ভারতীয় ধনিকস্বার্থকেই আঘাত করে চূর্ণ করে দেওয়া যাতে সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের কদাকার চেহারাটাও ভারতীয় বিপ্লবী জনগণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাকে আঘাত করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় শিখণ্ডিশক্তিকে আঘাত করতে না পারলে সাম্রাজ্যবাদের গায়ে আঁচড়ও পড়ে না—এমনি তখন ভারতীয় রাজনীতির পরিস্থিতি অবস্থা, কিন্তু দেশীয় কায়েমী স্বার্থকে আঘাত করা মামুলী স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়ে আরও একস্তর অগ্রগামী রাজনীতি এবং সে রাজনীতি সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্তর্গত। যেহেতু এইসব বামপন্থীদলগুলি (কম্যুনিস্ট পার্টিসহ) ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আজকের প্রোগ্রাম হিসেবে নিতে চায় না। যেহেতু তারা দেশের সত্যিকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্গত একটা পর্যায় হিসাবে কোনোদিন দেখেনি—সেহেতু তদানীন্তন গণবিক্ষোভগুলিকে নিয়ে কি করা যায় বুঝে উঠতে পারেনি বলেই অর্থহীন বাদানুবাদে কালযাপন করা ছাড়া আর কোনো কাজই করতে পারেনি। লেনিনের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক গতি (Growing Revolution) বোঝবার ক্ষমতা কম্যুনিস্টরা অর্জন করেনি এবং তাঁর লিখিত সাম্রাজ্যবাদ বইখানার তাৎপর্যও বুঝতে পারেনি বলেই ভারতীয় ধনতন্ত্রকে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ থেকে কোনো আলাদা বস্তু বলে মনে করে। সেই জন্যই এরা সেকেলে জাতীয়তাবাদের ভাবভঙ্গি থেকে নিজেদের ব্যবহারকে এতটুকুও উন্নত করতে পারেনি। তাই ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে বিরাট গণবিক্ষোভ চলেছিল

ভারতের বুকে তার কোনো ফলই হলো না— আপন উদ্দেশ্যহীনতা আপনার কাছেই ধরা পড়তে লাগল।

কিন্তু এভাবে হয়ত আর বেশিদিন চলত না- বিপ্লবী সাম্যবাদের রাস্তা জনতার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠত। কিন্তু বিপ্লবী সাম্যবাদ তখনো নিজের কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি বিপ্লবী সাম্যবাদী দল সবার কণ্ঠ ও কলরোল বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের বৈপ্লবিক ডাক সবার কানে পৌঁছে দিতে পারেনি তার প্রথম কারণ, এই দলের শক্তিহীনতা, দ্বিতীয় কারণ জনগণের অভিজ্ঞতার অভাব ও তৃতীয় কারণ দেশে চিন্তাশীলতার অভাব। ওদিকে বিপ্লব বিরোধী শক্তিগুলি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহচরেরা চুপ করে বসে নেই, তারা বৈপ্লবিক গণশক্তির ঐক্যকে ভেঙে দেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং খোলাখুলিভাবে ও গোপনে দেশের বুকে সাম্প্রদায়িক লড়াই লাগিয়ে দেশকে বিভক্ত ও জনগণকে বিভক্ত, বিভ্রান্ত ও পরস্পর সংঘর্ষশীল করতে ব্যস্ত ২৯শে জুলাই কলকাতার ময়দানে যে অভূতপূর্ব শ্রমিক সমাবেশ হয়েছিল এক বিরাট সাধারণ ধর্মঘটের উপর, সেই মহান বোবা শক্তির বৈপ্লবিক ইংগিত ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও তার নেতারা এমনকি কম্যুনিস্টরা পর্যন্ত বুঝতে পারল না। শ্রমিক শক্তির সেই বিরাট সমাবেশ— ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর আইনসংগত আন্দোলনের চরম বিকাশ এবং ওরকম ঐক্য ও সমাবেশ ভারতে আর কোনো দিনই আশা করা যায় না। কেননা ইতিহাস কখনো পুনরাবৃত্তি করে না। যে পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর ক্রমপর্যায়ে মিলিত শ্রমিক শ্রেণীর সেদিনের সমাবেশ ঘটেছিল সেই সেই পরিস্থিতি ও ঘটনার বিন্যাস আর কখনও ফিরে আসতে পারে না। সেই সমাবেশকে ওখানেই শেষ না করে, সেই সাধারণ ধর্মঘটকে ধর্মঘটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে সেই শক্তিকে আপনা থেকে অবহেলায় যেতে না রেখে সে শক্তিকে দিয়ে সেদিন যদি কম্যুনিস্ট পার্টি অথবা অন্যান্য বামপন্থীরা এক বিরাট রাজনৈতিক আক্রমণের কর্মপন্থা চালাত তবে জনগণের ওপর বিপ্লবী শ্রমিক নেতৃত্ব কায়েম হতে পারত। কংগ্রেসের বদলে শ্রমিকস্বই ভারতের কোটি কোটি জনতার নেতা বলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত কৃষক নিম্নমধ্যবিত্ত, ছাত্র পুলিশ, সৈন্য সবার আন্দোলন ও বিক্ষোভকে একত্র গ্রথিত করে ভারতে সত্যিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করতে পারত। বিপ্লবী কম্যুনিস্ট এভাবেই সেদিনের ধর্মঘটকে দেখেছে এবং ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের নেতাদের কাছে এই কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বার বার অনুরোধ করেছে। কিন্তু বিপ্লবী সাম্যবাদীদল তাদের এ কথা বোঝাতে পারেনি। তারই কিছু পরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ধর্মঘট নিয়ে যে বিরাট বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল তাকে উপলক্ষ করেই বিপ্লবী সাম্যবাদী দল তাদের নিজস্ব একক শক্তির ওপরেই সাধারণ ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আশা করে যদি তা আংশিকরূপেও সার্থক হয় তবে এই আংশিক শক্তিকে দৃঢ়তর নেতৃত্ব ও কর্মপন্থা দিয়ে বৈপ্লবিক পথে টেনে নেবার চেষ্টা করবে এবং দেশের বুকে এই অন্ধ বিক্ষোভকে একটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার রাস্তায় চালনা করবে ও অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন রাজনীতির হৈ চৈ ও আবর্ত থেকে জনতাকে মুক্ত করে সোজা বৈপ্লবিক সংগ্রাম, চাষী মজুররাজ কায়েম করার সংগ্রাম চালু করবে।

কিন্তু প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি কেবল দাঁড়িয়ে বিপ্লবী শক্তির অভ্যুত্থান দেখতে থাকবে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে এ হতে পারে না। বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তি দুটি মল্লযুদ্ধে লিপ্ত— এক পক্ষের প্রত্যেকটি দুর্বলতার সুযোগ অপর পক্ষের পূর্ণ ব্যবহার করে নেবার কথা— একটা জীবন-মরণ সংগ্রামে এই যুধ্যমান শক্তি দুটি লিপ্ত হয়ে পড়েছে— শুধুমাত্র একটি দেশের পটভূমিকায় নয়, সমগ্র পৃথিবীর পটভূমিকায় এই রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভারতে বিপ্লবী

শক্তিগুলি ছিল অন্ধ—তারা আপন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অর্ধচেতন ও অবচেতন—তারা জানে না যে সত্যি সত্যি তারা লড়াইয়ের ময়দানে এসে পড়েছে। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী শক্তিটা সম্পূর্ণ সচেতন—সে বোঝে কার সঙ্গে তার লড়াই চলেছে—অতি চতুর দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রতিবিপ্লবকে চালিত করছে—অন্ধ বিপ্লবী শক্তির প্রত্যেকটি দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নিচ্ছে—অসতর্ক বিপ্লবী শক্তিকে অতর্কিতে ও দৃঢ়তার সাথে আক্রমণ করতে ব্যস্ত, অচেতন বিপ্লবী শক্তির ভেতরে ঢুকে বিপ্লবী আন্দোলনকে সাবোতাজ করছে এবং জনতার প্রত্যেকটি অজ্ঞতাকে ভুল পথে চালু করবার জন্য অহরহ ষড়যন্ত্র করে চলেছে। নিষ্ঠুর শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য এই ঘাত প্রতিঘাতের কথা—যাদের স্মরণে থাকে না তারা বিপ্লবী মার্কসবাদকে বোঝেনি—তারাই কেবল একটা মাত্র সাধারণ ধর্মঘট বা একটা মাত্র বিরাট সমাবেশ করে দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকতে পারে এবং মনে করে তাদের এই জয় বা অগ্রগতি চিরস্থায়ী এবং কালের স্রোতে দিগ্বিজয়ের স্থায়ী সোপান হিসেবে অলঙ্ঘ তার সীমানা। চঞ্চল সমাজের অভ্যন্তরে দ্রুতগতিশীল পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলির আবর্ত আক্রমণ প্রতি আক্রমণের নিষ্ঠুর ঘাত প্রতিঘাত তাদের স্থবির মননশীলতার ওপর কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি করে না—পরম আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে মূর্খের স্বর্গে স্বপ্ন দেখতে থাকে। প্রত্যেকটি জয়কে সুদৃঢ় করার তাগিদ প্রত্যেকটি অগ্রগতির সোপানকে পরবর্তী পদক্ষেপের সোপান করার তাগিদ, একটি ঘাঁটিকে অধিকার করার পর পরবর্তী ঘাঁটিকে দখল করার অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও আয়োজন যাদের নেই—তারা আজকের পৃথিবীতে লড়াইয়ের অর্থই বোঝেনি—তারা লড়াইয়ের ময়দানকে বিশ্রামাগার মনে করতেও কসুর করে না। শত্রুপক্ষের কৌশল অতি সুস্পষ্ট—তারা এই লড়াই-এর ময়দানটাকে রণক্ষেত্র বলেই মনে করে এবং তদনুযায়ী ছলাকলা কৌশল সব কিছু প্রয়োগ করে অবিশ্রান্তভাবে আমাদের নির্মূল করবার জন্য ব্যস্ত—অস্ত্র, অর্থ, সৈন্য, সংগতি, প্রচার প্রতি মুহূর্তে রাত্রিদিন তারা বাড়িয়ে চলেছে, অহর্নিশি গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছে—জনতার মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্য। মেকী নেতা সৃষ্টি করে, মেকী দল সৃষ্টি করে জনতার ঐক্যে ফাটল ধরাচ্ছে এবং সর্বোপরি এই রণক্ষেত্রটাকে বুঝতে দিচ্ছে না—আমাদের চোখে এটা সত্যি রণক্ষেত্র—বিশ্রামাগার নয়—যাতে আমরা আত্মবঞ্চনায়, মিথ্যাজয়ে সন্তুষ্ট থাকি। যদি বিপ্লবীদের মনে একটা সত্যিকারের ক্ষমাহীন লড়াই-এর প্রতিজ্ঞা না থাকে—যদি তাদের যাবতীয় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মোহে সর্বশিকড় কেটে না যায়—যদি তাদের মনে একটা ইস্পাতের মতো দৃঢ় বেপরোয়া মনোবৃত্তির সৃষ্টি না হয়, তবে এই শ্রেণীযুদ্ধে তারা পরাজিত হতে বাধ্য। যদি তারা মনে করে দেশে বিপ্লব ঘটানো বর্তমানে কর্মসূচী নয়, একমাত্র বিপ্লব ঘাড়ের ওপরে এসে উপস্থিত হলেই বিপ্লব করবার বাসনা জাগবে, তার পূর্বে নয় , যেখানে তাদের মনে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আশু সুবিধা আদায়ের সীমাবদ্ধ লক্ষ্য বর্তমান, যেখানে বৈপ্লবিক অবস্থার উদ্ভবও তাদের সেই বেপরোয়া মনোবৃত্তি জাগাতে পারে না, সেখানে অবস্থা কতকটা প্রতিবিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়লে হয়ত তাদের মনে একটা আফশোস জাগতে পারে যে একটা সুযোগ বুঝি তারা হারিয়ে ফেলল। বৈপ্লবিক নেতৃত্বের সচেতনতা, উদ্দেশ্যশীলতা, সক্রিয়তা, দূরদৃষ্টি, সদাসর্তকতা যদি না থাকে—তাহলে গণ আন্দোলনকে পরিকল্পিত ও ঈপ্সিত পথে চালিত করার ক্ষমতা অসম্ভব, তবে ঘটনার মালিক না হয়ে তাকে ঘটনার দাস হয়েই চলতে হবে- -ঘটনা ঘটাবার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আসবে না—ইতিহাসকে নিজের হাতে গড়বার ক্ষমতা তার হবে না—আঘাত হানবার চেয়ে ক্রমাগত প্রত্যাঘাত সহ্য করে যাওয়াই তার দুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়াবে—এবং ক্রমশই জনতার কাছেও অক্ষমতা ও ক্লীবত্বের

অপবাধে অবজ্ঞাব বস্তু হযে দাঁডাবে। নেতৃত্ব এমনি একটা বিবাট বস্তু—একে অবহেলা কবা—একে তৈবি না কবাব মতো অপবাধ আব দ্বিতীয় নেই এবং নেতৃত্বেব এই বলিষ্ঠ ভূমিকাকে অতিবঞ্জিত কববাব উপায নেই। এই নেতৃত্ব ভাবতীয কম্যুনিস্ট পার্টি কোথাযও এতটুকু দেখাতে পাবেনি। অন্যান্য দেশেব কম্যুনিস্ট নেতৃত্বেব তুলনায বিশেষ কবে চীন, বর্মা, মালয, ইন্দোচীন ইত্যাদিব তুলনায —ভাবতীয কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব যে কত দুর্বল, কত অজ্ঞ, কত ভীরু, কত তুচ্ছ তা বোধহয আজকেব কম্যুনিস্টবাও স্বীকাব কববে।

বণক্ষেত্রে ট্রেঞ্চেব মধ্যে অবস্থিত এক পক্ষেব সৈন্যদেব অবহেলা, গাফিলতি ও অসতর্কতাকে যেমন বিবোধী পক্ষেব ট্রেঞ্চবাসী সৈন্যবা অচিবাৎ ব্যবহাব কবে নেয, এক পক্ষ অপব পক্ষেব দুর্বলতাব সন্ধান কববাব জন্য যেমন বাত্রিদিন ওৎ পেতে থাকে এবং তাবই ওপব যুদ্ধেব ভাগ্য নির্ভব কবে তেমনি আজকেব এই শ্রেণীসংগ্রামেব চূডান্ত বণক্ষেত্রেও পবস্পব-বিবোধী শক্তিগুলিকে ওৎ পেতে থাকতে হবে—সক্রিয কর্মপন্থা গ্রহণ কবতে হবে, ক্রমাগত এগুবাব চেষ্টা কবতে হবে, ক্রমাগত শত্রুব নিকটবর্তী হবাব চেষ্টা কবতে হবে। একে অস্বীকাব কবা মানেই আজকেব কর্তব্যে ফাঁকি দেওযা, লডাই এডিযে যাবাব চেষ্টা কবা। শত্রু থেকে দূবে থাকবাব হাস্যকব চেষ্টা —যা পলাযনেবই নামান্তব মাত্র। দ্বিধা, জডতা, উদ্দেশ্যহীনতা,, লক্ষ্যহীনতাব সম্পূর্ণ সুযোগ অপব পক্ষ নেবেই নেবে।

তাবা তা নিলও। ভাবতেব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিব চবম প্রতিমূর্তি এই মুসলিম লীগেব বাংলা সবকাব ১৬ই আগস্ট তাবিখে “প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব” জন্য মুসলিম সমাবেশ কবল, সেই একই মনুমেণ্টেব তলায যেখানে তাব পূর্বে ২৯শে জুলাই লক্ষ লক্ষ মজুব ও কর্মচাবী ভেঙ্গে পডেছিল। এই বিবাট পবিহাস থেকে কেউ কি কিছু উপদেশ সংগ্রহ কবেছে? ২৯শে জুলাই-এব গণ-সমাবেশ ছিল উদ্দেশ্যহীন—মানে বাজনৈতিক উদ্দেশ্যহীন—একটা বিদ্রোহী আবেগেব অন্ধ অভিব্যক্তি মাত্র। ২৯শে জুলাই-এব সমাবেশ কোনো কিছু কবাব ভবিষ্যৎ প্রতিজ্ঞা নিলনা। কিন্তু ১৬ই আগস্টেব সাম্প্রদাযিক মুসলিম সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য চালিত —একটা দাঙ্গা ঘটাবাব জন্য দৃঢ প্রতিজ্ঞ —সমবেত জনতাব কোনো সামগ্রিক উদ্দেশ্য না থাকলেও—তাব কর্মকর্তাবা গুণ্ডা নিযুক্ত কবে সমগ্র জনতাব ভাগ্য নির্দিষ্ট পথে চালিত কবে দিল—উত্তেজিত কবে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুদেব ওপব আক্রমণ ঘটিযে দিল। তাবপব জনতা আঘাত ও প্রত্যাঘাতেব অনিবার্য ঘটনাচক্রে এমন ভাবে লিপ্ত হযে পডল যে সমস্ত কলকাতা হিন্দু ও মুসলমানে বিভক্ত হযে গেল। নেহাৎ প্রাণবক্ষাব খাতিবেই নিতে হলো যাব যাব সম্প্রদাযেব আশ্রয। বিপ্লবীবা, বামপন্থীবা, কম্যুনিস্টবা দেখতে লাগল তাদেব চোখেব সামনে তাদেব এতদিনেব বাসনা ও সাধনা কেমন কবে চুবমাব হযে ভেঙে গেল—কোনো শান্তিব ললিত বাণী কাউকে হুঁশিযাব কবতে পাবলে না—দাঙ্গাব নিজস্ব শক্তি তখন আপন গতিপথে এগিযেই চলতে লাগল। কী তীব্র আঘাত সেদিনকাব গণআন্দোলন ভোগ কবেছে তাব কোনো সীমা নেই, ভাবতেব ইতিহাসেব মোড ফিবে গেল —এবই পবিণাম নোযাখালি, বিহাব ও পাঞ্জাবকে পব পব কি বীভৎসতা ও কি অমানুষিকতাব বক্ত পথে চালিত কবল—যাব পবিণতি আজও শেষ হযনি। এই কদর্য উপাখ্যানটা ভাবতীয জীবনে একটা সাময়িক ঘটনামাত্র নয—এই ঘটনা অগ্রগামী ভাবতীয জনতাকে আজ এশিযাব সমগ্র জনতাব বহু পেছনে ফেলে দিযেছে—যাব জন্য আজ ভাবতীয গণশক্তি এত দুর্বল, এত আস্থাহীন, এত হতচেতন এবং যাব জন্য এই পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদী-আন্দোলন আজ একটা স্বপ্ন ছাডা ভাবতে তেমন কোনো প্রভাব স্থাপন কবতে পাবছে না—যদিও শাসক শ্রেণীব ক্ষমতা কোনোরূপেই সত্যিকাবেব শক্তিমান নয।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে, যাবতীয় অফিস কর্মচারীদের সহযোগিতার উপর আস্থা রেখে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে ও সর্বসাধারণের অসন্তুষ্টির ওপর লক্ষ্য রেখে আমরা যে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিই- -তা একদিনের জন্য স্থায়ী করবার ইচ্ছায় নয়— যতদিন পর্যন্ত সম্ভব ও যতদূর বৈপ্লবিক উত্তেজনা ও কার্যাবলী তা থেকে ঘটানো যায়- -এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। কিন্তু আজ তার দুটি প্রধান দুর্বলতা আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। প্রথম যেদিন থেকে এই ধর্মঘট শুরু হবার কথা সেদিনটি ১৭ই আগস্ট— অথচ ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" দিন ধার্য হয়ে গেছে। অতএব বুঝতে হবে ১৬ই আগস্টকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিইনি ; আমরাও প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিনি, আমরাও কতকটা মূর্খের স্বর্গে বাস করেছি বলে আমাদের আক্রমণের দিন ওদের আক্রমণের দিনের পর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। অথচ প্রকৃত রাজনৈতিক জ্ঞান যদি আমাদের থাকত তবে তা হওয়া উচিত ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে, যাতে ওদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বানচাল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো, যদিও আমরা সাধারণ ধর্মঘটকে একটি দিনের ধর্মঘটেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইনি---যদিও আমরা তা রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করতে চেয়েছিলাম, তথাপি একথা আমাদের বলতেই হবে যে আমাদের চিন্তাধারাও বিরাট গোঁজামিল ছিল। ঠিক কি ধরনের সংগ্রাম সাধারণ ধর্মঘটের পরে ওঠানো যায় সে জাতীয় কোনো স্পষ্ট ধারণা আমাদের ছিল না, একথা স্বীকার করা আজ আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। যে ধরনের সংঘর্ষ উঠে যায় আপনা থেকে, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে গাড়ি পোড়ানো ইত্যাদি আমরা যা আগে দেখে এসেছি তার পুনরাবৃত্তিই যথেষ্ট নয়। যদিও এর পূর্ব থেকে আমরা পাড়ায় পাড়ায় বস্তিতে বস্তিতে পঞ্চায়েত ও গণবাহিনী গঠনের ডাক দিয়েছি, কিন্তু সেই পাল্টা সরকারের (পঞ্চায়েতিরাজ) বাস্তব জন্ম ও লাল ফৌজের (গণবাহিনীর) সাক্ষাৎ সংগ্রাম কিভাবে কি কায়দায় চলবে সে সম্বন্ধে আমাদের খুব অস্পষ্ট ধারণা ছিল বলতে হবে --কেননা সে সব ধারণা স্পষ্ট করার ভেতরে ভারতীয় বিপ্লবের ধারা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ধারণার ভিত্তি রয়েছে। বিপ্লব চাই কিন্তু ভারতীয় রণক্ষেত্রে সে বিপ্লব কি কায়দায়, কি ভঙ্গিতে হবে তার concret বাস্তবরূপ ও তার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা তখনও আমাদের পার্টিতে [illegible] হয়নি। তোতা পাখির মতো অনেক কথা বলে চলেছি -- অথচ বুঝতে পারিনি কেন [illegible] কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না বিরাট জনমণ্ডলীর কাছে---কেন আমরা আমাদের বিশিষ্ট [illegible] বাস্তবে রূপ দিতে পারছি না। বিচ্ছিন্নভাবে অনেক কার্যকরী ও বৈজ্ঞানিক নির্দেশের সন্ধান আমরা যে না পেয়েছিলাম তা নয়—প্রত্যেকটি গণ অভ্যুত্থানে আমাদের আক্রমণধারা [illegible] সবার থেকে আলাদা ও স্পষ্ট থাকলেও প্রত্যেকটি আঘাতের তাৎপর্যকে আমরা (যেমন R. I. N. বিদ্রোহে আমাদের চিন্তাধারা) বিচ্ছিন্নভাবে বুঝতে পারলেও—তদানীন্তন [illegible] সামগ্রিক বিপ্লবের বাস্তব আঘাতের প্রোগ্রামটা কি হবে সে সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত ধারণা আমাদের নেতৃত্বেও বর্তমান ছিল না। যেমন ভারতীয় বিপ্লবে মূলগত ও কৌশলগত [illegible] কোথায় এসব বিষয়ে কোনো জীবন্ত চিন্তাধারা তখনো পার্টি-নেতৃত্বে উদিত হয়নি [illegible] স্বীকার করতেই হবে যে পার্টি-নেতৃত্ব তখনও বিপ্লবকে বাস্তব প্রোগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করেনি—ঘটনা প্রবাহের টানে আক্রমণাত্মক বাক্যবান চালিয়ে যাচ্ছে মাত্র।

এই ১৯৪৬-এর শেষ দিকেই আমাদের পার্টির চতুর্থ অধিবেশন হয় উদয়রামপুরে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের পর মুক্ত নেতা ও কর্মীদের নিয়ে ভালভাবে অধিবেশন বসাবার সুযোগ

হয়েছিল অনেককাল পরে। সেই অধিবেশনের থিসিস হিসেবে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব নেওয়া হয় তাতে মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান ও এই ভুয়া স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়—কংগ্রেস ও লীগরাজকে অস্বীকার করার পণ গ্রহণ করা হয় এবং তাদের বৈপ্লবিক উচ্ছেদ সাধন করে মজুর-চাষীরাজ কায়েম করার জন্য বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সম্পূর্ণ চালু রাখতে বলা হয় এবং আগামী বিপ্লবের হাতিয়ার ও পাল্টা সরকারের সংস্থা হিসাবে সোভিয়েটের আদর্শে সর্বত্র পঞ্চায়েত গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। তাছাড়া স্ট্যালিন নেতৃত্বের সমালোচনা ও দেশীয় কম্যুনিস্টদের অপকীর্তির ব্যাখ্যা করা হয়। (Post War World and India—Thesis of the Fourth Party Conference of R. C. P. I.)

কিন্তু তৎকালীন দ্বিখণ্ডিত ভারতের রক্তাক্ত কলেবরের ওপর, দাঙ্গাবিধ্বস্ত শ্রমিক শ্রেণীর ওপর নির্ভর করে, কি ধরনের ক্ষমতা দখলের লড়াই, কি পরিবেশের উপর, কোন কোন শক্তির আশ্রয়ে সত্যি সত্যি চালু করা যায় সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আলোচনা হয় নি। লড়িয়ে প্রস্তাব রেখেও লড়াইয়ের কায়দা পরিষ্কার না করার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গলদ রয়েছে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক প্রস্তাবকে কার্যকরী করার ক্ষমতা তার নির্দিষ্ট কৌশল বিচারের মধ্যে অনিবার্যরূপে দিতে হবে—নইলে সে প্রস্তাব কেবল কাগজে প্রস্তাব হয়েই থাকবে—তার কোনো মূল্য থাকবে না। আমাদের প্রস্তাব আমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই তৈরি করতে হবে, অন্য দশটা পার্টির প্রস্তাব, ব্যবহার ও অবস্থার দয়ার ওপর তা নির্ভর করবে না—এমনি হলেই বুঝতে হবে দল সত্যি সত্যিই স্বাবলম্বী হয়েছে—কারো মুখাপেক্ষী হয়ে নেই ও স্বাধীনভাবে চলবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। তা না হলে অপর দশটা পার্টির ওপর দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার মতো সুবিধাবাদ ঢুকে যেতে বাধ্য—কি আর করব সব বেটা বিশ্বাসঘাতক—(এমন কি কংগ্রেস পর্যন্ত।) এমনি ধরনের এক আত্মবঞ্চনা দলের মেরুদণ্ড ও কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দেবে। অন্যের দোষ দেখিয়ে যে সমস্ত বামপন্থী দল আপন গৌরব ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যস্ত থাকে তারা জানে না কখন অলক্ষ্যে তারা নিজেরাই প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করে চলেছে ; তাছাড়া এই নেতিবাচক নীতি জনতার শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না, তারা আমাদের কাছে সত্যিকারের কাজ ও নেতৃত্ব দেখতে চায়—যে কাজ ও নেতৃত্ব অপরের মুখাপেক্ষী নয়।

প্রায় দেড় বৎসর লেগেছে আমাদের দলের এই দুর্বলতাকে আবিষ্কার করতে ও সর্বপ্রথম নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াবার পণ গ্রহণ করতে। ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে আমাদের দলের পঞ্চম অধিবেশন বীরভূমে হয় এবং সেখানে যে রাজনৈতিক থিসিস গ্রহণ করা হয় তাতে কি ধরনের বিপ্লব বাস্তবিক পক্ষে কিভাবে শুরু করতে হবে তার সাক্ষাৎ বিশ্লেষণ ও দায়িত্ব নেওয়া হয়। আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেই অধিবেশন পার্টির পক্ষে এক নবজীবন—সত্যিকার লড়াই করবার পণ হিসেবে এবং লড়াই-এর নমুনা, কায়দা, নেতৃত্ব ও দায়িত্ব নেবার গভীর প্রতিজ্ঞা হিসেবে তা পার্টির ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শুধু রাজনৈতিক প্রস্তাব ও কর্মপন্থা হিসেবেই নয়—দলের নেতৃত্বে ও সর্বত্র যেখানে যত পশ্চাৎশীলতা ও গতানুগতিকতার লক্ষণ ছিল তাকে সমূলে উৎপাটন করা হয় ও বাজে মাল বাদ দেওয়া হয়। বিপ্লবী সাম্যবাদী দলে ঐ সময়টায় একটা বিপ্লব ঘটে যায় একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। দলের মধ্যে এই বিপ্লব পার্টিকে চেতনার দিক দিয়ে, দৃঢ়তার দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে একটা নতুন প্রাণ দিয়ে যায়।

কিন্তু এই পার্টি-বিপ্লব সহজে ঘটেনি—অনেক রকম কর্মসংকট, সংগঠন সংকট, অর্থ সংকট ও নেতৃত্ব সংকট পার্টিকে বহুদিন থেকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে ফেলছিল এবং

গণসংযোগ থেকে ও বাস্তব কাজকর্ম থেকে দূবে হটিযে বৈঠকখানাব আলোচনাব মধ্যে সীমাবদ্ধ কবে ফেলছিল। কিন্তু ১৯৪২-এব আগস্ট বিদ্রোহে যোগদান কবাব জন্য জাতীয আন্দোলনেব প্রাণেব জোযাব পার্টিকে আবাব পুনরুজ্জীবিত কবে দিযে যায। কংগ্রেসবিবোধী দল হিসাবে চিবকাল পবিচিত ও পবিচালিত হওযা সত্ত্বেও কংগ্রেসী কম্যুনিস্টদেব ক্রমবর্ধমান গড্ডালিকা শক্তিব বিরুদ্ধে একক শক্তি হিসেবে মাথা তুলতে এই পার্টি কখনো ভয পাযনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিব ও দৃঢ় গণ সংযোগকাবী কমপন্থাব অভাবে দলেব positive কর্মপন্থা ক্রমেই ক্ষীণ হতে থাকে—তখন একমাত্র negative criticism বা অপব দল সমূহেব ভুলেব বিস্তাবিত বিববণ দিতেই দল তাব যথাশক্তি নিযুক্ত বেখেছিল কিন্তু তাব ফলে ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতব হতে লাগল। ১৯৪২-এব আন্দোলন আমাদেব শক্তি যোগায এবং বিভিন্ন প্রদেশে আমবা সেই সংগ্রামেব মধ্যেই ছড়িযে পডতে সমর্থ হই। তথাপি একথা মনে বাখতে হবে যে যদিও আমবা বক্ত পতাকাব আদর্শ নিযেই এই আন্দোলনে যোগ দিই, যদিও আমবা কংগ্রেসী পাতাকা নিযে অগ্রসব হইনি, তাহলেও একথা সর্বজনবিদিত যে ১৯৪২ সালেব আন্দোলন কংগ্রেস প্রণোদিত, অতএব আমাদেব যথেষ্ট শক্তি না থাকাব দরুন এই আন্দোলনে আমবা কোনো বিশিষ্ট দাগ কাটতে পাবিনি যাতে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিস্টদেব চেযে আমাদেব দলকে জনতা সংগ্রামেব মধ্যে স্পষ্ট করে আলাদাভাবে লক্ষ্য কবতে পাবে। অতএব যখন কংগ্রেস আন্দোলন উঠিযে নিল এবং কংগ্রেস সোসালিস্টবা স্তব্ধ হযে বসে ঘটনাব স্রোত পর্যবেক্ষণ কবাব নামে সময নষ্ট কবতে লাগল—তখন আমবা আমাদেব ক্ষুদ্র শক্তি নিযে স্বাধীনভাবে সেই আগস্ট আন্দোলনেব ধাবাকে অব্যাহত বাখতে পাবলুম না বা কোনো জাযগাযও বাজনৈতিক সংগ্রাম চালু কবতে পাবলাম না। যদিও এই সমযেব মধ্যে আমবা বোম্বাই-এব মজুব-শ্রেণীব মধ্যে বেশ কিছুটা ঢুকতে পেবেছি এব দু-একটা ধর্মঘট নিজ শক্তিতে চালাতে সমর্থ হযেছি ঝবিযা ও বানীগঞ্জেব কযলা খাদে বেশ বিস্তৃতভাবেই ছডিযে পডতে পেবেছি, বার্নপুব, ও কুলটিব লৌহ শিল্পে সংগঠন কবতে অনেকটা এগিযেছি এবং টাটা শ্রমিকদেব মধ্যে কিছুটা প্রভাব স্থাপন কবা সম্ভব হযেছে—তাছাডা আসাম ও বাংলাব পল্লী অঞ্চলে, শিল্পাঞ্চলে বিস্তৃত গণ সংযোগ কববাব ক্ষেত্র কবেছি—তথাপি সেই নবলব্ধ শক্তি এত প্রচুব ছিল না যে আগস্ট আন্দোলনেব ধাবা আবও বাঁচিযে বাখতে পাবি ঐ শক্তি দিযে। অতএব আমাদেব ইচ্ছা অনিচ্ছাব বিরুদ্ধেও আমাদেব ধবে নিতে হলো এই যে, নবলব্ধ শ্রমিক ও কৃষকশক্তি যা আমবা বোম্বাই, বিহাব, বাংলা ও আসামে সংগঠিত কবতে সমর্থ হযেছি এবং যাব প্রচুব সম্ভাবনা বযেছে অদূব ভবিষ্যতে তা দিযে যা আন্দোলন কবব তা আব আগস্ট আন্দোলনেব জেব হিসেবে না টেনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব ভূমিকা হিসেবে নতুন আঘাত দেবাব সংযোজনা কবতে হবে—ভাবতীয বিপ্লবেব দ্বিতীয স্তব হিসেবে। সেই হিসেবেই আমাদেব কাগজে, পুস্তিকায, প্রস্তাবে ক্রমাগত আক্রমণাত্মক নীতিব বিস্তাব কবতে লাগলাম। এদিকে যখন বিভিন্ন প্রদেশে আমাদেব গণশক্তি সুন্দবভাবে বিস্তাবিত হতে চলেছিল ও আমাদেব মুখপত্র, কাগজ, পুস্তিকা ইত্যাদি দেশেব বাজনীতিব পূর্ণ বিচাবে কৃতিত্ব দেখাতে শুরু কবেছিল—তখন দলেব নেতৃত্ব সেই সম্ভাবনাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দাযিত্ব বলিষ্ঠ হাতে নিতে পাবে কিনা তাব একটা পবীক্ষা অগোচবেই চলতে লাগল। নেতৃত্বেব দূবদৃষ্টি, দৃঢতা ও বলিষ্ঠতা আমাদেব সেই উদীযমান শক্তিকে আবো দশগুণ বাডিযে দিতে পাবত, কিন্তু দেখা গেল ব্যাপাবটা যেন তেমনি ভাবে ঘটছে না এবং দলেব গণক্ষেত্রে যে সংগ্রাম উঠতে চায় তাকে বিস্তৃত বর্ধিত ও উন্নত কববাব ক্ষমতা যেন নেতৃত্বের নেই।

নেতৃত্বের মধ্যে গলদ একদিন অতি বিস্ময়কর ভাবে ফুটে বেরুল। বাংলা সরকার একদিন পার্টির নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও কতিপয় নেতা ও কর্মীকে ধরে ফেলল। বোম্বাই সরকার সাথে সাথে আমাদের ইংরাজী কাগজের সম্পাদকমণ্ডলী ও আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ধরে নিল --নবপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী সরকারের এই প্রথম দমননীতি। এই ধরপাকড়ের উদ্দেশ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাংলা পরিষদে এক বিবৃতি দিলেন। রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আন্দোলন সেদিন খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল-- এসেম্বলির দুয়ারে বিরাট বিক্ষোভ- এমন কি গুলি লাঠি প্রয়োগ ঘটেছিল। সরকার ঘোষণা করলেন যে তারা জানতে পেরেছে যে বিপ্লবী সাম্যবাদীরা দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করছে এবং তাদের বাইরে মুক্ত রাখা নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। সৌম্য ঠাকুর দার্জিলিং জেল থেকে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের বিবৃতি চ্যালেঞ্জ করে এক পত্র দেন এবং তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে তিনি ও তার দল সশস্ত্র বিপ্লব করবার জন্য আয়োজন করেননি—করে থাকলে তার প্রমাণ সরকার দেখাক এবং যদি কোনো কোনো ব্যক্তি দলের নাম করে কিছু চেষ্টা চরিত্র করেছে বলে মনে হয় তার সঙ্গে দলের বা নেতৃত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। সাধারণ কর্মীদের কাছে এবং সেন্ট্রাল কমিটির এই ধরনের প্রতিবাদ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। সরকার কি প্রমাণ করতে পারে না পারে তার ওপর কোনোকালেই রাজবন্দী বানানোর নীতি নির্ভর করেনি, সরকারের ভয়টাই তার কাজের জন্য দায়ী। সেক্ষেত্রে আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিনি বা এ জাতীয় কোনো চিন্তা আমাদের নেই—একথা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যারা দেশে বিপ্লব চাই বলে ক্রমাগত চেঁচিয়ে এসেছে, যারা প্রত্যেকটি বিক্ষোভ ও বিদ্রোহকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করবার জন্য বার বার জনতার কাছে আবেদন করেছে তাদের মুখে এ জাতীয় ভালমানুষী ভাব এবং কথা শুনলে জনতা বুঝবে -ও, তাহলে এরাও যা বলে তা বিশ্বাস করে না। তাছাড়া যে নেতা আমাদের ইংরাজী কাগজে (Toilers Front) The Hour has Struck & We shall Settle Accounts নামক দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ সংগ্রামমূলক প্রবন্ধ দিয়েছিলেন, তার কাছ থেকে এ জাতীয় প্রতিবাদ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তাই কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের সন্ত্রাস ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের উপর দোষ দিয়ে দলকে এবং নিজেকে সর্বপ্রকার বিপ্লব আন্দোলন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা অত্যন্ত নোংরা বলে মনে হলো।

তাছাড়া তিনি জেল থেকে গোপনে দলের সেক্রেটারির কাছে সংবাদ পাঠালেন যে সমস্ত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ জাতীয় কার্যকলাপ ও আক্রমণাত্মক রাজনীতি স্থগিত রেখে চুপচাপ থাকবার জন্য কেননা সরকার নাকি আমাদের সম্বন্ধে খুব কঠিন মনোভাব পোষণ করছে যে আমরা নাকি যা তা করবার জন্য সমরায়োজন করছি। সেন্ট্রাল কমিটি ও তার সেক্রেটারির নিকট এই নির্দেশ অদ্ভুত বলে মনে হলো।

যা হোক সৌম্য ঠাকুরের আত্মীয়স্বজনেরা গান্ধীজি ও জহরলালের সঙ্গে বার বার দেখা করে সৌম্যবাবুর মুক্তি ঘটালেন এবং কি জাতীয় আশ্বাসের উপর বিপ্লবী নেতাকে মুক্ত করলেন তা অপ্রকাশিত রইল। তবে এটা যে তিনি কোনো লিখিত প্রতিশ্রুতি বা understanding না দিলেও সরকারকে এতটুকু আশ্বাসময় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি বিপ্লবাত্মক কোনো কাজে লিপ্ত নন বা অদূর ভবিষ্যতেও তা তাঁর কার্যক্রম নয় এবং হয় তিনি দলকে বিপ্লবাত্মক extremist পথ থেকে ভিন্ন পথে টেনে আনবেন, নয়ত নিজে দলত্যাগ করবেন।

যখন জেল থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন দেখা গেল তিনি এতটুকু এক ব্যক্তি মাত্র হয়ে গেছেন, স্নায়বিক আঘাতপ্রাপ্ত ভেঙে পড়া একটি নেতার ভগ্নাবশেষ মাত্র, যাঁকে দেখলে চেনা

যায় না। দলের মধ্যে উপদলীয় যড়যন্ত্র হচ্ছে—অতিবামপন্থামূলক নীতির জন্য অযথা সরকারি অত্যাচার ডেকে আনা হচ্ছে—জহরলাল সরকারের ওপর জনতার আস্থা এখনো বর্তমান রয়েছে—জহরলাল সরকারকে নিপাত করবার আওয়াজ অসাময়িক হচ্ছে ইত্যাদি নানা কথা তাঁর বাড়ি বসে বসে বলতে লাগলেন এবং দল থেকে পদত্যাগ করবার ইচ্ছা জানালেন। তাঁকে তাঁর বক্তব্য লিখিতভাবে উত্থাপন করতে বলা হয়, তিনি তাতে নারাজ। তিনি সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিং-এ উপস্থিত হতে নারাজ, তিনি পার্টির সেক্রেটারির সংগে আলাপ করতে নারাজ, তিনি দলের সাধারণ সভ্যদের কাছে তাঁর বক্তব্য কোনো সাধারণ বৈঠকে উত্থাপন করতেও নারাজ। মোট কথা তখন তিনি একটা nervous wreckও বলা যায়। তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করেও বসলেন, পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি এই পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে এবং তিনি তা না করাতে পার্টির সাধারণ সভা বা Conference ডাকার সিদ্ধান্ত হয় এবং তাঁর বক্তব্য ও পদত্যাগপত্র উক্ত কনফারেন্সে উপস্থিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলের মধ্যে একটা বিরাট আলোড়ন ঘটে এবং এর প্রকৃত অর্থ কি তা ধরবার জন্য আমাদের রাজনৈতিক থিসিসটা সত্যই কি তা ভালভাবে বুঝবার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স ডাকা হয় বীরভূমে—যা পার্টির পঞ্চম অধিবেশন বলে খ্যাত এবং যার কথা পূর্বেই বলেছি। বস্তুত সৌম্য ঠাকুরের ব্যবহারের ভিতরে যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভেদ আছে এবং সৌম্য ঠাকুর যে এখন পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত ও ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন তা বোঝবার ক্ষমতা তদানীন্তন সেণ্ট্রাল কমিটির হয়েছিল—তাই দলের সংগঠন ও অন্যান্য খুঁটিনাটি অভিযোগের কোনো উল্লেখ না করেই তারা সোজা রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও আমাদের আপসহীন বৈপ্লবিক কর্মপন্থার নির্ভীক অনুসরণ করার যে আক্রমণাত্মক নীতি তাই নতুন থিসিসে পরিষ্কার করে উপস্থিত করে। সৌম্য ঠাকুরের সমস্ত ছলনা ও দলীয় চক্রান্তমূলক অভিযোগ মুহূর্তে ধরা পড়ে যায় এবং তাঁর নরমপন্থী নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির স্বরূপ তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে যায়। তিনি তাঁর একজন অনুগত কমরেডের সাহায্যে একটা পাল্টা থিসিস দেন। এ সব থিসিসের দীর্ঘ পাঁচদিন পাঁচরাত্রি ব্যাপী আলোচনা হয়, কোনো ব্যক্তিগত কথা ওঠে না—এবং সৌম্য ঠাকুরের থিসিস একদম বর্জিত হয়ে যায়—একশো জন প্রতিনিধির মধ্যে তিনি মাত্র ছয়টি ভোট পান এবং অপর থিসিস বিপুল উদ্যমে ও ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়ে যায়।

এই সংবাদ শোনামাত্র সৌম্য ঠাকুর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক সভা ডাকেন। সভায় ঘোষণা করে দেন যে বিপ্লবী সাম্যবাদীদলের অতিবামপন্থার জন্য তিনি ঐ দল ত্যাগ করেছেন এবং জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেন যে এই দল কয়েকটি ভাঙা বন্দুক পিস্তলের সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে যে সংগ্রামাত্মক কাজ করতে চলেছে তাতে ভয়ানক ক্ষতি হবে এবং সবাইকেই তিনি হুঁশিয়ার করে দিলেন, পুলিশও এই সুযোগে হুঁশিয়ারীটা পেয়ে গেল। আসামের প্রতিনিধিরা আসামে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে ধরা পড়ে গেলেন এবং দলের সর্বত্র সব নেতৃস্থানীয় কর্মীদের আত্মগোপন করতে হলো। সরকারি দমননীতি দলের ওপর পুরোমাত্রায় চলতে লাগল। জনতাকে হুঁশিয়ার করার চেয়ে সরকারকে হুঁশিয়ার করাই বোধহয় তাঁর বেশি উদ্দেশ্য ছিল।

দলের পক্ষে এটা একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্য যে দলের একটিমাত্র নেতা— লোকপরিচিত নেতা—সৌম্য ঠাকুরই ছিলেন, যার ফলে এই দলকে বিপ্লবী সাম্যবাদীদল না বলে অনেকে সৌম্য ঠাকুরের দল বলত। সেই একটি মাত্র নেতা যখন ভাঙলেন তখন দলের ওপর একটা বিশেষ অবজ্ঞার সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয় এবং জনতা অত গভীর করে রাজনীতি বোঝবার

চেষ্টা করে না বলেই হাল্কা ধরনের গালগল্পে খুশি থাকে। কিন্তু ততক্ষণে জলের তলায় পায়ে মাটি লেগে গেছে—আশু বৈপ্লবিক কর্মপন্থা তখন দলকে এতটা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান করে দিয়েছে যে এই নেতা পলায়নের ব্যাপারে সাধারণ কোন কর্মী এতটুকু দমেনি এবং খুব দীর্ঘকালের একটা ব্যথার মতো যা দলের আত্মশক্তিতে, কর্মশক্তিতে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নির্ধারণে একটা Slow poison এর মতো দলকে নির্জীব করেছিল ও বেপরোয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধার কারণ হয়েছিল—সেই ক্ষয়িষ্ণু নেতৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে দলের ভিতরকার উদ্যম, সাহস ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বলবান ও শক্তিমান হয়ে উঠল (পরবর্তীকালে আবার সৌম্য ঠাকুর সাহসে ভর করে কতক লোক নিয়ে বিপ্লবী সাম্যবাদী দল বলে এক দল চালাতে থাকেন এবং দমদম-বসিরহাট সংগ্রামের পর যখন দলের ওপর সরকারের নির্মম অত্যাচার চলেছে, যখন দলের কোন মুক্ত Platform নেই তখন সেই সুযোগে সাইনবোর্ড লাগিয়ে সৌম্য ঠাকুরের বিপ্লবী সাম্যবাদী দল প্রকাশ্যে উপস্থিত হয়েছে। এই দলের বিপ্লবী কর্মপন্থা যত কমছে তত তার প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক রূপ খুলে যাচ্ছে। মোট কথা জনগণকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া ও আমাদের পথকে কণ্টকিত করার চেষ্টা ছাড়া ওদের অস্তিত্বের আর কোনো অর্থ আজ আর নেই—জনতার কাছেও কোনো গুরুত্ব নেই)।

কিন্তু সহসা বাদানুবাদ ও সংঘর্ষের ফলে পার্টিকে আরও বেশি আত্মগোপন করতে হলো। থিসিসের পরিপূর্ণ আলোচনা এই পুস্তকে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভবপর নয়। যারা ইচ্ছুক তারা নিশ্চয়ই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ও বিশ্লেষণটি আলাদা করে পড়ে নেবেন। তাহলেও তার ব্যাখ্যা পরবর্তী ঘটনা ও কার্যকলাপের মধ্যে প্রকাশিত হবে। থিসিসে সমগ্রভাবে পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে—আজকের যুগে বৈপ্লবিক আঘাতের পটভূমিকা ও স্তরবিন্যাস সোজাসুজি ভাবে বলা হয়েছে। বিশ্ব-বিপ্লবের অঙ্গ হিসাবে আমাদের দায়িত্বের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। তাছাড়া পিছিয়ে পড়া গ্রামপ্রধান চাষীপ্রধান দেশে চাষীদের মধ্যে যে বিপ্লবের চালিকা শক্তি বর্তমান তা দিয়েও যে বিপ্লব ঘটানো যায় তা নীতিগত আলোচনা এবং চীন, বর্মা প্রভৃতি দেশের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। শহরের মজুর সম্প্রদায়ই যে একমাত্র বিপ্লবী শক্তি এবং শহর নেতৃত্ব না করলে যে চাষীরা বিদ্রোহ করতে পারে না এই ধারণার মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে এবং আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল ও মুক্তিফৌজের সাহায্যে বিপ্লবকে প্রসারিত করার নির্দেশও রয়েছে। Theoretical আলোচনা অত্যন্ত আধুনিক সমস্যার ওপর টেনে আনা হয়েছে যার ফলে রাশিয়ার ধরনের বিপ্লবই যে একমাত্র পন্থা নয় সেই কথা দেখানো হয়েছে। চীন বিপ্লবের নীতিকে স্বীকার করার মধ্যে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের নতুন ইশারা দেখানো হয়েছে ; এমন কি মালয় বা ফিলিপাইনের বৈপ্লবিক চেষ্টাগুলিও যে আজকের যুগে অবৈজ্ঞানিক নয় সে কথা সাহসের সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে। বৈপ্লবিক আঘাত যে বৈপ্লবিক চেতনার জন্য কত আবশ্যকীয় তা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিপ্লব যে কেবলমাত্র একটি সার্থক সশস্ত্র অভ্যুত্থান নয় বরং বার বার আঘাতের ফল তাও দেখানো হয়েছে। আংশিক সংগ্রামের বদলে স্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য প্রণোদিত মজুর-চাষী-রাজের জন্য সংগ্রামই যে আজকের দিনে একমাত্র কর্মপন্থা সে কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, উদ্দেশ্যহীন কার্যাবলীর নিন্দা করা হয়েছে। পার্টির নেতৃত্বে পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি, সচেতনতা ও বলিষ্ঠতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এত সংক্ষেপে থিসিসটাকে বোঝানো সম্ভব নয় তাই আমরা প্রত্যেক মননশীল পাঠককে আমাদের থিসিস পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিস ও আমাদের থিসিস পাশাপাশি রেখে পড়তে হবে যেহেতু উক্ত পার্টির তৎ-পরবর্তী কালের কার্যকলাপ ও আমাদের কার্যকলাপের তুলনামূলক সমালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা এখন সেই দিকে নজর দেব। আমাদের নিজেদের পার্টির মধ্যে যে নীতিগত সংকট ও বিপ্লব ঘটে গেল তাতে আমাদের কাজ পরিষ্কার হলো এবং আমরা আবার কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যাবলীর পূর্ণ বিচার করবার সামর্থ ও শক্তি অর্জন করতে পারলাম। কম্যুনিস্ট পার্টিও তখন এক দলীয় সংকটের মধ্যে দিয়ে পূর্ববর্তী যোশী নেতৃত্বকে হটিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে সংগ্রামাত্মক থিসিস গ্রহণ করেছে এবং লড়াইয়ের পথে পা বাড়িয়েছে— অতএব তখন মনে হলো কম্যুনিস্ট পার্টি বুঝি সত্যই আমাদের খুব নিকটে এসে গেছে এবং আমরা আগামী সাক্ষাৎ সংগ্রামেই যুক্তভাবে আঘাত হানতে পারব। যার ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একটা নতুন Interest তৈরি হলো এবং তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের ইচ্ছা আমাদের দলের সর্বত্রই দেখা দিল। কম্যুনিস্ট পার্টি অবশ্য নিজেরা কোনোদিন আমাদের ডাক দেবার মতো উদারতা দেখাতে পারেনি। তাদের আত্মগরিমা বোধেই হোক অথবা চিরকাল ভুল পথ অনুসরণ করার লজ্জাবোধেই হোক তারা আমাদের কাছে রাজনৈতিক সাথী হিসেবে কখনো কোনো কথা বলতে পারেনি। তাদের এই অদ্ভুত মনোভাবকে একদিন তাদের নিজেদেরই ব্যাখ্যা করতে হবে বলে আশা করি।

১৯৪৮ সালের মার্চে কম্যুনিস্ট পার্টির কলিকাতা কংগ্রেস তাদের পার্টির পক্ষে একটা যুগান্তকারী অধিবেশন। এই অধিবেশনেই তারা তাদের অতীত ইতিহাসের যাবতীয় সুবিধাবাদী, সংস্কারমূলক ও বিপ্লববিরোধী কার্যকলাপের সন্ধান পায়। ক্রমাগত সংস্কারবাদী ও শ্রেণীসহযোগিতামূলক রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করার জন্য তারা যে এক ভয়াবহ অধঃপতনের মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই প্রথম তারা তা ধরতে পারল এবং অতীতের যাবতীয় ভুলপথের জন্য যোশীর নেতৃত্বে যে সেণ্ট্রাল কমিটি কাজ করে যাচ্ছিল তার নিন্দা করা হয় এবং যোশীর নেতৃত্ব খতম হয়। এই কংগ্রেসে রণদিভেকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন সেণ্ট্রাল কমিটি গঠন করা হয়। পি, সি, যোশী সমস্ত ভুল স্বীকার করে এবং কংগ্রেস অধিবেশনে অনুশোচনায় কেঁদে ফেলে বলেও শোনা যায়।

এই অধিবেশনে তারা স্বীকার করে যে ঃ—

(১) অতীতে কংগ্রেসের প্রভাবকে শক্তিশালী করার জন্য জনতাকে কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেস নেতৃত্বে আস্থাবান করে তোলা তাদের ভুল হয়েছে।

(২) শ্রমিক শ্রেণী ও চাষীদের সংগঠনগুলিকে স্বাধীনপথে চালু না করার জন্য এবং তাদের কংগ্রেসানুবর্তী করে রাখার জন্য যে শ্রমিক নেতৃত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে গড়ে ওঠেনি তার জন্য তাদের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও দুর্বলতাকে আক্রমণ করা হয়। শ্রেণী সংগ্রামের বদলে তারা যে ধীরে ধীরে শ্রেণীসহযোগিতার সুবিধামূলক রাজনীতি জনতাকে শিখিয়েছিল তা স্বীকার করে এবং দেশে শ্রমিক নেতৃত্বের বদলে বুর্জোয়া নেতৃত্ব কায়েম হতে সাহায্য করেছে বলে স্বীকার করে।

(৩) গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে তারা তাদের মতে জনযুদ্ধ বলে ঠিকভাবে আরোপিত করলেও, এই যুদ্ধকে তারা ঠিকমতো ব্যবহার করেনি—ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সঙ্গে সাময়িক সাহযোগিতাকে তারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণে পরিণত করে ছেড়েছিল—যার ফলে তারা পার্টির নিজস্ব সংগ্রামী শক্তিকে বৃদ্ধি করেনি ববং শ্রেণী-সহযোগিতার পথে সংগ্রামশক্তিকে মত, পথ ও সংগঠন হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলেছিল।

শ্রমিক ও চাষীদের যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য তারা তাদের শক্তির যতটা নিয়োগ করেছিল ততটা শ্রমিক ও চাষীদের নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি ও চেতনা বর্ধনের কাজে অবহেলা করেছে—যে জন্য পার্টির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে একটা সংস্কারমূলক ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

(৪) এই নীতির ফলে তাদের পার্টি এতটা অচেতন ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে যুদ্ধ শেষে যখন ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়েছে এবং দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তখনো তারা ঘুমে অচেতন ছিল এবং গতানুগতিক ধারায় মত্ত ছিল বলে সহসা লড়াইয়ের মোরচা পরিবর্তন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের পার্টিকে সংগ্রামে নামাতে পারেনি ও দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির তাৎপর্য না বুঝে কংগ্রেস ও লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল চলেছিল তাকে ব্যর্থ করে জনগণের উপর আশ্রয় করে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ডাক দিতে পারে নি।

(৫) যার ফলে এরা মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান, যাতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে তথাকথিত স্বাধীনতা দেবার কথা আছে—তাকে সমর্থন করে বসেছিল এবং সর্বপ্রকারে জওহরলাল সরকার ও পাকিস্থানে লীগ সরকারকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয় আর মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানকে একটা প্রগতিমূলক ব্যবস্থা বলে আশীর্বাদ করে। এই মারাত্মক ভুলের জন্য তারা অনুতপ্ত হয়। আর একথাও তারা স্বীকার করে যে, ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা এই দেশে বর্তমান রাখার যে একমাত্র অপকৌশল একথা সেদিন তারা বুঝতে পারেনি।

(৬) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে মুসলিম লীগের পাকিস্থানের দাবিকে স্বীকার করে ওরা যে বিরাট এক ভুল করেছিল তাও স্বীকার করে এবং ভারতে বহুজাতিতত্ত্বের উপর স্থাপিত সংস্কারমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির পায়ে শ্রেণীসংগ্রামের বৈপ্লবিক রাজনীতিকে বলি দিয়েছিল তারও উল্লেখ করে।

(৭) বড় বড় ধনী ও মাঝারি ধনীদের মধ্যে পার্থক্য—জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেলের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি কাল্পনিক সীমারেখা টেনে তাদের রাজনীতিতে যে অসম্ভব রকমের গোঁজামিল চলেছিল—প্রকৃত সংগ্রামকে এড়াবার জন্য—সে কথাও স্বীকার করে।

(৮) তাছাড়া উপরোক্ত রাজনীতির ফলে তাদের দলীয় সংগঠনের উপর যে দুর্বল নেতৃত্ব ও দুর্বল শিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল তারও ইঙ্গিত করা হয়।

বলা বাহুল্য এই উপলক্ষে এও স্বীকার করে যে একমাত্র পি, সি, যোশীই এই নীতির জন্য দায়ী ছিল না—তদানীন্তন সেণ্ট্রাল কমিটির সকল সদস্যেরই এই নীতি ছিল—এমনকি রণদিভেও সেই দোষ থেকে রেহাই পান না—যেহেতু তিনি উক্ত সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্য বহুকাল ধরেই ছিলেন এবং কোনো অন্যমত কখনো দেন নি। এতদ্দ্বারা একটা সরলতা ও উদারতার ছেলেভোলানো আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয় এবং গত ভুল যা হয়েছে হয়েছে এবারে যে যার ঠিকঠাক কাজ করে যাওয়া যাক এমনি একটা সহজ মনোভাব নেওয়া হলো—অর্থাৎ অতীতের ভুলগুলি স্বীকার করলেও তার গভীরতা ও সুদূরপ্রসারী ক্ষতির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। মোটকথা সকলেই সকলকে ক্ষমা করার নামে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। এই ভুল রাজনীতির জন্য ভারতের মজুর কৃষক আন্দোলনে যে কত বড় ক্ষতি হয়েছিল তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত রইল এবং সর্বসাধারণের কাছে, জনতার কাছে—তাদের ভুলটাকে তেমন করে তুলে ধরল না, তাদের ভুল যে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং জনতার শিক্ষার জন্য যে সে সব ভুলগুলি অকপটে জনতার কাছে উপস্থিত করা দরকার—

জনতার বৈপ্লবিক শিক্ষাব প্রয়োজনে—সে সত্যকে তারা চাপা দিয়ে গেল—এক রকমের "চুপ চুপ যা হয়েছে হয়েছে ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না।"—ধরনেব ভাব দেখিয়ে। কিন্তু অত সহজে ও চুপচাপেই সংস্কারবাদের মৃত্যু হয় না। সংস্কারবাদের শিকড় যে কত গভীব এবং তাব বিরুদ্ধে যে ক্ষমাহীন সংগ্রামেব প্রযোজন ও একটা সংস্কারবাদী শ্রেণীসহযোগিতামূলক পার্টি যে রাতারাতি বিপ্লবী দলে পরিণত হতে পারে না—তা তাদেব কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েক মাসের মধ্যেই প্রতিভাত হয়ে উঠল। দেখা গেল সংস্কারবাদ পার্টির আনাচে-কানাচে, নেতৃত্বে সর্বত্রই বিদ্যমান রয়েছে, যার ফলে তাদের বৈপ্লবিক প্রস্তাব কার্যকবী হতে পদে পদে বাধা পাচ্ছে, কোথা থেকে যেন তাদের অতীত তাদের দলের বর্তমান নীতিকে সাবোতাজ করে যাচ্ছে এবং সংস্কারবাদ প্রচ্ছন্নভাবে দলেব পরাজয় ঘটিয়ে দলের নীতিকে ভুল প্রতিপন্ন করার তালে কাজ কবে চলেছে। আমরা এই অদ্ভুত পরিণতিটা পরিবর্তী বাস্তব ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে দেখতে পাব। এখন এদের প্রধান বাজনৈতিক থিসিস বা প্রস্তাবের আলোচনায় অগ্রসব হই। এই উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড সত্যকে স্মরণ করে যাওযা চাই—শ্রেণীসংগ্রামের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে গোঁজামিল বা ভুলের জন্য ক্ষমাশীলতার স্থান নেই। এই নির্মম শ্রেণীযুদ্ধে সর্বাঙ্গীন নির্মমতা একান্ত দবকার—বিশেষ কবে চিন্তাজগতে ক্ষমাহীন সত্যনিষ্ঠা ও সংগ্রামী মনোভাবেব প্রয়োজন। ভুল করলে ক্ষমা করার স্থান এখানে নেই—ভুলেব মূল নির্মমভাবে উৎপাটন কবে ফেলতে হয তা না হলে ক্ষমার আড়ালে ভুল গোপন আশ্রয় করে নেবেই নেবে এবং সুযোগ মতো তা আবাব দেখা দেবে। বাজনীতিতে দীর্ঘকালব্যাপী ভুল একটা আকস্মিক ঘটনা নয—ভুল পথ সুবিধাবাদী শ্রেণী সমূহেব স্বার্থচেতনামূলক আত্মপ্রকাশ মাত্র—কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অতএব সুবিধাবাদ যতদিন আছে এবং সুবিধাবাদী শ্রেণীগুলি যতদিন আছে—পথেব "ভুলও" ততদিন থাকবে—যা অসুবিধায় পড়ে ভুল হযেছে বলে ক্ষমা চাইবে অথচ ভবিষ্যতেব সুযোগ খুঁজতে থাকবে। এবই জন্য লেনিনেব লেখায়, নীতিতে ও কাজে এমন একটা ক্ষুবধার সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল যা বিন্দুমাত্র ভুল ও অন্যায়কে কখনো ক্ষমার চোখে দেখতে পাবেনি এবং সামান্য একটা ভুল কথাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং দলের ভিতবকার কর্মীদেবও রেহাই দিতেন না, কেননা তিনি জানতেন সুবিধাবাদ একটা ভযানক শত্রু—যাব আপাতসবল চেহারার অন্তরালে একটা কদর্য শক্তি লুকোচুরি করে বেড়ায়—যার মৃত্যু অতি সহজে ঘটে না—ক্ষমাশীলতাব মধ্যে ত নয়ই—ক্ষমাহীন সতর্ক সংগ্রামেই তার মৃত্যু হয় এবং বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এমন কি চূড়ান্ত জযের মুখেও এই কুৎসিত শক্তি বারে বারে উঁকি মারে। এই কুৎসিত সুবিধাবাদ প্রকৃত পক্ষে শত্রু শিবিরের অচেতন ও চেতন চব হিসাবে বিপ্লবী শিবিরকে দুর্বল করবার চেষ্টায় লুকোচুরি খেলতে থাকে। এই মতবাদিক লুকোচুরি কার্যক্ষেত্রে যে কত রকমেব ছলনা ও আত্মবঞ্চনা কবে বেড়ায—তা একমাত্র গভীব সঙ্কটেব মধ্যেই ধবা পড়ে, যখন আর কোনো উপায থাকে না।

যাহোক, ওদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রকাণ্ড একটা রাজনৈতিক প্রস্তাব পাস করা হয। কিন্তু এই থিসিসে তাদের অতীত ভুলেব বিন্দুমাত্র উল্লেখ করা হয় না—যেন ওদের অতীত নেই এবং তার প্রভাবও তাদের ভবিষ্যতে নেই। যেন নতুন করে ওরা বাজনীতি শেখাচ্ছে ও শিখছে এমনি মনে করে অতি সাধারণ কথাগুলি ফেনিয়ে ফেনিয়ে বড় কবেছে যা অনেকেই জানে কিন্তু ওরা জানত না, কেননা গত কয়েক বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার মোহে আচ্ছন্ন থাকায় দেশবাসীর যুদ্ধজনিত অভিজ্ঞতা ও তিক্ততার সাথে তাদের পরিচযই ছিল না। তারা দেশ যা ভাবত, প্রাণ দিয়ে অনুভব করত তার উল্টোটা বলে বেড়াচ্ছিল এবং এই যুদ্ধ যে

জনসাধারণের কত ক্ষতি করেছে তাকে অস্বীকার করে জনযুদ্ধ ও নিজেদের যুদ্ধ বলে সাফাই গাইতে গিয়ে জনসাধারণেব দুর্ভোগ ও সত্যিকার অভিজ্ঞতার সাথে তাদের পরিচয় গেছিল ছিন্ন হয়ে। ওরা এই দেশে বাস করেও যেন এক ভিন্ন জগতে বাস করত—জনতার মধ্যে থেকেও জনতার কথা, ব্যথা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধরতে পারেনি। ফলে নতুন করে ওদের রাজনৈতিক প্রস্তাবনা করতে হয়েছে, যে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বোঝানোর চেয়েও নিজেদের বোঝানোই বেশি। কেননা জনসাধাবণ তাদের শ্রেণী-শত্রুকে—দেশীয় ও বিদেশীয় শত্রুকে অনেকদিনই চিনেছে—কম্যুনিস্ট পার্টিকে এই সবেমাত্র চিনবাব প্রয়োজন ও তাগিদ এসেছে। ফলে অতি সাধারণ কথা নিয়ে অনেক আলোচনা করতে হয়েছে কিন্তু কাজেব কথার সময় আর কোনো কথা থাকেনি---অর্থাৎ কার্যকরী করার পন্থা হিসাবে কোনো পথের ইঙ্গিত পর্যন্ত করা হয়নি বা আলোচনার দরকার মনে করেনি। কেননা প্রস্তাবটা বোঝাই যেন দায়, শত্রুকে চেনা এবং স্বীকার করাই যেন অনেক ; তাকে নিপাত করার জন্য, প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য উপায় ও পথ আবিষ্কার করাটা অনেক দূরের ব্যাপার এবং বোধ হয় আসল ব্যাপারই নয়। বিপভ্যানউইন্‌কল্-এর মতো বিশ বছরের ঘুম থেকে হঠাৎ উঠেছে যারা এর বেশি তাদের কাছে আশা কবাও অন্যায়। যাব ফলে ওদের রাজনৈতিক প্রস্তাবটাকে প্রস্তাব না বলে প্রস্তাবনাও বলা চলে। মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট পার্টির কাছে প্রস্তাবের কোনো অর্থই হয় না যদি তাতে সংঘাতের কার্যক্রমই না থাকে। বিশ্লেষণ করাটা বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ হতে পারে না—কার্যক্রমের নির্দেশ তৈরি কবার মধ্যেই রয়েছে বিশ্লেষণের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য। সংঘাত বা actionটাই মার্কসবাদের মূল লক্ষ্য কেননা Marxism is a guide to action and not theory for its own sake. নিজেদের চেষ্টায় পরিকল্পিত সংঘাত (action) ওঠানো তো দূরের কথা, সে সমস্ত সংঘাত (action) জনতাব মধ্য থেকে আপনা থেকেই ফেটে পড়ছে তাদেরকে কি রাস্তায় কোন কৌশলে কোন দিকে নিয়ে যেতে হবে তারও কোনো আলোচনা হলো না--যেমন হলো না তেলেঙ্গনাকে কোন পথে নিযে যেতে হবে। "তেলেঙ্গনাই আমাদের পথ" এই বলে তাদের পার্টির কোনো কোনো মহলে একটা গুঞ্জন উঠলেও তলিয়ে দেখবার চেষ্টা কবল না তেলেঙ্গনার পথটা কি এবং কতদূর তাব দৌড়। এটা লক্ষ্য করল না যে তাদের মতের সার্থকতা তাদের পথের উপবই নির্ভর করে, তাদের প্রস্তাবে না--এটা কার্যক্ষেত্রেই প্রমাণিত হবে এবং একথাও খেয়াল হলো না যে সংগ্রামের কায়দাটাই সংগ্রাম (form of struggle is the struggle itself) অর্থাৎ সংগ্রামের রূপটা পরিষ্কার না করতে পারলে সংগ্রামটাই সম্ভব নয়—নইলে সংগ্রাম একটা কথাব কথা বা abstract conception হয়ে দাঁড়ায় মাত্র। এই অদ্ভুত চিন্তাহীনতার ফলেই তারা তাদের এক বিরাট প্রস্তাবনার শেষ পাতায় একটি কথা বলেই দায়িত্ব শেষ করল—সে হলো "জনতার নেতৃত্ব করো"। এদিকে নেতাদেরই জানা নেই নেতৃত্ব কাকে বলে এবং কোন পথে রয়েছে সে নেতৃত্ব। ওদের প্রস্তাবে শব্দ যতটা রয়েছে তার শত-ভাগের এক ভাগও হয়নি কাজের কথা, যেন শব্দ দিয়েই বিপ্লব ঘটানো যায়, উত্তেজনা দিয়েই বিপ্লব ঘটানো যায়। তাই অতবড় একটা মারমুখী প্রস্তাব নেতৃত্ব করার এক মৃদু আহ্বানেই সহসা শেষ হয়ে গেল। যেন পথে পথে ঠিক হবে পথ কি, দলের সভায় তা স্থির হবে না, যেন সংগ্রামের কৌশল আবিষ্কার করবে জনতাই, কেবল সংগ্রামটাই যে দরকার এই কথাটা পার্টি বলে দিলেই হলো। রূপহীন সংগ্রাম আকারহীন বস্তুরই সামিল। সংগ্রামের রূপ সম্বন্ধ এই অস্পষ্টতা ও তাচ্ছিল্য এদেরকে একদিন নাকের জলে চোখের জলে এক করে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের যে শ্রেণী-বিন্যাস সেই বিশ্লষণটাকেই ভুল প্রতিপন্ন করে দিয়েছিল অর্থাৎ তাদের

পথজ্ঞানের অভাব তাদের মতটাকেই নিজেদের কাছে ভুল প্রমাণিত করেছিল। একথা আমরা পরবর্তী ঘটনার বিশ্লেষণ থেকে দেখাব। এখন আমরা এদের মতটা কি তাই একবার তাকিয়ে দেখি।

রাজনৈতিক প্রস্তাবে বা থিসিসে প্রথমত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পৃথিবীতে দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ও বিপ্লবী চীন অপর দিকে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবিরোধী ধনিক রাষ্ট্রগুলি। এই দুই শক্তি অপরিহার্য বেগে এক সংগ্রামের জন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি যোজনায় সাম্রাজ্যবাদী শিবির দিনকেদিন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং গণতন্ত্রী সোভিয়েট ফ্রণ্ট শক্তিমান হতে চলেছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট ধনতন্ত্রকে ক্রমশ দুর্বল করছে কিন্তু সোভিয়েট ফ্রণ্টে কোনো অর্থনৈতিক সঙ্কট নেই, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, নতুন নতুন পরিকল্পনা কার্যকরী হতে চলেছে। পৃথিবীর বুর্জোয়ারা তাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট হ্রাস করবার জন্য শ্রমজীবী জনসাধারণের উপর শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে নিতে চায়, ফলে শ্রমজীবীদের উপর অত্যাচার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাই দেশে দেশে শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে উঠছে ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিপ্লবের আতঙ্ক আজ বুর্জোয়ার একমাত্র ভয় বলেই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপরেও বিশ্ববিপ্লব রোখার কাজটাই তাদের প্রধান। অর্থনৈতিক সঙ্কটে ও যুদ্ধে চূর্ণ বিচূর্ণ ইউরোপের ওপর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা টলমল করে উঠেছে এবং আমেরিকা সেই টলটলায়মান ব্যবস্থাকে "মার্শাল সাহায্য" এর দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত এবং তারই সঙ্গে আমেরিকা অর্থনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসুক। মূলত আজ দুটি প্রধান বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশ একই সূত্র থেকে উদ্ভূত, সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, বুর্জোয়া বনাম শ্রমজীবীদের শ্রেণীসংগ্রাম—এই দুই শক্তিই আজ বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের একমাত্র স্পষ্ট পটভূমিকা। এই পটভূমিকায়ই পিছিয়ে পড়া দেশের, উপনিবেশের ও পরাধীন দেশের জনগণের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথ বেছে নিতে হবে। তৃতীয় কোনো শক্তি আজ আর বর্তমান নেই—শক্তি যোজনায় এই পরস্পরবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তি দুইটির মধ্যে প্রত্যেক দেশের জনতার পথ বেছে নিতে হবে। বলা বাহুল্য—জনতার পথ সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পথ ছাড়া অপর কোনো পথ হতেই পারে না। আজ পৃথিবীতে গণশক্তিটাই শক্তিমান, অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র পতনশীল। অতএব পৃথিবীর চারিদিকেই আজ বিপ্লবের অগ্রগতি অপরিহার্য অর্থাৎ পৃথিবী আজ সমগ্রভাবে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণ।

উপনিবেশ সমূহে ও অর্ধ ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আজ বর্তমান। ভারতে গণবিক্ষোভের মুখে অর্থনৈতিক সঙ্কটে আচ্ছন্ন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভীত হয়ে পড়ে, ফলে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে হাত করবার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস ও লীগের হাতে সাক্ষাৎ শাসনাধিকার ছেড়ে দেয়—মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ অনুযায়ী দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভাগ করে দিয়ে। ভারতীয় ধনীদের পার্টি কংগ্রেস গণবিপ্লবের ভয়ে এই সাম্রাজ্যবিভাগ নীতি মেনে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে—যে ভয়ে তারা নিজেরাও ভীত—সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে বেশ কিছু সুবিধা ও ক্ষমতা আদায় করে নেয়। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে সাম্রাজ্যবাদ ভারত মহাদেশ থেকে বিদায় নেয় না, তার অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় এবং যাতে সেই প্রতিশ্রুতি

কোনোদিন ভঙ্গ করবার সাহস ও শক্তি ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর না হয়, তারই জন্য ভারত বিভাগ সংগঠিত করে দিয়ে ভারতীয় ও পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের দুর্বল করে রাখার পাকা ব্যবস্থা করে নেয়। অতএব ভারতে যে তথাকথিত স্বাধীনতা এল তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় বুর্জোয়া ও সামন্ততন্ত্রের এক মিলিত জোট দেখতে পাওয়া যায় এবং এই ব্যবস্থায় ভারতীয় বুর্জোয়া শুধুমাত্র একজন অংশীদার নয়—অংশীদারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় অধিকার সাব্যস্ত করে নেয়। অতএব সমগ্রভাবে ভারতীয় বুর্জোয়া আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোনো প্রকার মনোভাব ও কার্যক্রম তাদের আর নেই। তাই ভারতীয় জনতার গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়ার কোনো স্থান নেই—এই বিপ্লবের শ্রেণী মোরচা আজ পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে গরিব কৃষক-সাধারণের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে আজ শহরের খুদে বুর্জোয়া ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ছাড়া আর কোনো বুর্জোয়াকে পাওয়া সম্ভব নয় এবং এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব আজ কেবলমাত্র গণতন্ত্রেই সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য নয় তা ধনতন্ত্র বিরোধী হতে বাধ্য ও তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য। তার মানে আজ ভারতীয় গণবিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অন্তর্গত, যদিও সামাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূর্ণ রূপ কতকগুলি স্তর সাপেক্ষ। সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণবিপ্লব অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক কারণ অনুযায়ীই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অপ্রতিহত গতিতে ও অনিবার্যরূপে অগ্রসর হতে বাধ্য। এই বিপ্লবের নেতা হবে মজুরশ্রেণী এবং তার সাক্ষাৎ দোসর বা সহযোগী হবে গ্রামের গরিব কৃষক, খেতমজুর, ভাগচাষী ও শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী। ধনী কৃষক আজ ভারতের গ্রাম্যজীবনে ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি এবং ধনতন্ত্র আজ গ্রাম্য জীবনে নানা উপায়ে ঢুকে গেছে ও ধনতান্ত্রিক শোষণপ্রথা কায়েম করতে চলেছে। অতএব গ্রামদেশে কৃষকের সংগ্রাম শুধুমাত্র জমিদারদের বিরুদ্ধেই নয় —তার বর্তমান বক্ষক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও— অতএব কৃষকবিপ্লবে আজ আর ধনী কৃষকদের পাওয়া সম্ভব নয়—তারাও প্রতিক্রিয়াশীল। জনতার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই যুগে সমগ্র কৃষকশ্রেণীকে পাওয়া সম্ভব নয় বরং ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে খেতমজুর ও গরিব কৃষকদের সংগ্রাম চালু করবার দরকার হয়েছে। এই হলো কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিসের সারমর্ম।

এইখানে একটা কথা বলে যাওয়া দরকার যে ওদের এই থিসিস ওদেরকে আমাদের কাছে এই প্রথম টেনে আনে। কংগ্রেস ও বুর্জোয়াতন্ত্র বা ধনতন্ত্রকে এই প্রথম ওরা একবস্তু বলে স্বীকার করে এবং এই প্রথম ধনতন্ত্র ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজন বোধ করে। এই প্রথম ওরা আজকের বিপ্লবকে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ত্রিসীমানায় আবদ্ধ হতে দিতে প্রস্তুত নয় যদিও তাকে এরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গীভূত এক অধ্যায় হিসাবে দেখে না তবুও তা যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে আগুয়ান এক বিশেষ ধাপ তা স্বীকার করে অর্থাৎ ভারতীয় বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি যে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র বা নয়াগণতন্ত্র নয় এও কতকটা স্বীকার করে ফেলে। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা ওদের থিসিসে অত পরিষ্কার করে লেখা নেই—তবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে সমাজতন্ত্রেরই জন্য সংগ্রাম একথা অস্বীকার করার কোনো মানেই হয় না। সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সম্মিলিত ফ্রন্টকে একই সঙ্গে আঘাত করে শেষ করার পর যা দাঁড়াতে বাধ্য তা কোনো নয়াগণতন্ত্র নয়— সমাজতন্ত্রই—এই কথা ওরা মুখ ফুটে না বলতে পারলেও শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছে। ওদের Notes on Strategy & Tactics-এ একথা আরো স্পষ্ট হয়েছিল। এর সমালোচনা যথা সময়ে পরে আবার করতে হবে। তাছাড়া

বৈপ্লবিক সংগ্রামের দ্বারাই এই সরকারের উচ্ছেদ সাধন করার ইচ্ছাই এই থিসিসে বর্তমান। অতএব বলা যায় এই সময়েই C P I বা কমুনিস্ট পার্টি R C P I-এর খুব নিকটে এসে যায়। আমরা ওদের নিকটবর্তী হইনি—ওদেরই ঘটনার চাপে আমাদের পথে আসতে হয়েছিল।

তথাপি একথাও বলে রাখা দরকার যে কার্যক্ষেত্রে ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ওদের বিচার তখনো আমাদের চেয়ে পৃথক ছিল। বিশ্ব-বিপ্লবের পটভূমিকা ওরা যে ভাবে দিয়ে থাকে, আমাদের নিকট পটভূমিকা সে ভাবে প্রতিভাত নয়। বিশ্ব-বিপ্লব আজও ওদের কাছে কতকগুলি দেশের বিপ্লবের সমষ্টিমাত্র কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশ্বসত্তাটা আজকে দেশাতীত—অর্থাৎ দেশের সমষ্টির চাইতেও আলাদা করে তার যে একটা নিজস্ব সমগ্র সত্তার সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিশ্বচেতনা (International Outlook) আজও ওদের তৈরি হয়নি। বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র একটি দেশেও কায়েম হতে পারে এই যে স্ট্যালিনিস্ট নীতি তা আজও ওরা পরবর্তী দেশ সমূহের বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠন ব্যাপারে সেই "দেশীয়" চিন্তাধারা অতিক্রম করতে পারেনি। ফলে কোনো একটি দেশের বিপ্লবের পটভূমিকা বিচার করতে গিয়ে ওরা বারে বারেই সেই বিশেষ দেশের অন্তর্গত উৎপাদিকাশক্তি ও তার শ্রেণী যোজনাতেই মগ্ন থাকে—যার ফলে পিছিয়ে পড়া ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবের পটভূমিকায় সমগ্র বিপ্লবী শিবিরের উৎপাদিকা শক্তির সংযোজনা ও সাহায্যকে চোখের সামনে দেখতে না পেয়ে বিপ্লবের গণতান্ত্রিক সীমানা টানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গঠনমূলক দুর্বলতার উপর নজর রেখে যেমন বিপ্লবকে এরা খর্ব করতে চায় গণতান্ত্রিক সীমানার মধ্যেই —তেমনি বৈপ্লবিক শক্তির বিচারেও একটি দেশের অসম্পূর্ণ শক্তি যোজনায় ভয় পেয়ে পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক পথ ধরতে দ্বিধা করে এবং বুঝতে পারে না বিশ্ব-বিপ্লবের কোনো শক্তি জাতীয় বিপ্লবে সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য করতে পারে কিনা। এই ভয়, দ্বিধা ও আড়ষ্ট-চিন্তা স্টালিনিস্ট নেতৃত্বের আড়ষ্টতা, জাতীয়তা ও দ্বিধা থেকেই জন্ম নেয়।

তাছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করেছি—ভারতীয় বিপ্লবের কায়দা ও পথ সম্বন্ধে ওদের থিসিসে ও চিন্তাধারায় যে কোনো উল্লেখ নেই, তার জন্যও ওদের আড়ষ্ট ও দ্বিধাসঙ্কুল চিন্তাধারা দায়ী। এই কর্মপন্থার ব্যাপারেও আমাদের সঙ্গে ওদের গুরুতর পার্থক্য থেকে যায়। ভারতীয় বিপ্লব গণতান্ত্রিকই হোক আর সমাজতান্ত্রিকই হোক—বিপ্লবের কার্যক্রম ও আঘাত কি ভাবে সংগঠিত করতে হবে তারই উপর নির্ভর করবে বিপ্লবের ভাগ্য। এই বিষয়ে ওদের অবহেলা বা চিন্তাহীনতা যে কত গুরুতর ছিল তা পরবর্তী আলোচনা থেকেই বুঝতে পারা যাবে।

যাহোক, ওদের এই সংগ্রামী প্রস্তাবের জন্য, ওদের সাথে একই সঙ্গে সংগ্রামে নামবার জন্য আমাদের একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে। এই উদ্দেশ্যে ওদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা জানবার জন্য আমরা দলগত ভাবে ওদের সঙ্গে নিজেদের গরজে সংযোগ করি এবং কয়েকবার ওদের সাথে আলোচনাও চালাই। কেননা মত ও পথের পার্থক্য নিয়ে চুলচেরা তর্কের চেয়ে উভয় সংগঠনের সংগ্রামী কার্যক্রমটাকে চালু করাই প্রধান কাজ এবং সংগ্রামের পথেই সকলের মতামত পরীক্ষিত হবে ও হতে পারে—এই বিবেচনায় আমরা ওদের বার বার যুক্ত সংগ্রামের জন্য ডেকে থাকি। এখন কথোপকথনের ভঙ্গিতে ওদের সঙ্গে আমাদের আলোচনাটাকে বিবৃত করব—যাতে সকলের বুঝতে খুব সহজ হয় যে ওদের দেখবার ভঙ্গির সাথে আমাদের দেখার ভঙ্গির পার্থক্য কোথায় এবং ওদের কার্যক্রমের ও আমাদের কার্যক্রমের পার্থক্য আসে কোথা থেকে। বিভিন্ন সময়ে বারে বারে ওদের সঙ্গে আমাদের যে আলোচনা হয়—তা আর বারে

বারে উল্লেখ না করে আমরা এক সাথেই তার সংযোজনা করে দিচ্ছি। এখানে একটুমাত্র বলে রাখা দরকার যে ওরা নিজেরা কখনোই আমাদের সাথে একত্র কাজ করবার জন্য কোনো সদিচ্ছা বা উৎসাহ দেখায় নি- -যদিও ওরা ওদের থিসিসে বার বার সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্ট গঠন করবার কথা বলেছে- -ওটা কেবল ওদের একটা পোশাকী কথা যার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা নেই —কিন্তু ওরা কোনো কালেই অপর কোনো বামপন্থীদের সাথে আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যবহার করেনি —অপরের অসুবিধার সুযোগ নিয়েছে—যার ফলে প্রয়োজনবোধ থাকলেও কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে একত্র যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে আজ অনেকেরই মনে একটা দ্বিধার ভাবের উদয় হয়। ওদের মানসিক গঠনে এমন একটা সঙ্কীর্ণতা ও অতিবিৎ পার্টিবাজী আছে যে অপর কোনো দল সসম্মানে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না। এবং পিছন থেকে আঘাতের ভয়ে মিশতেও চায় না। এজাতীয় সঙ্কীর্ণতা ওদের নীতিগত দুর্বলতা থেকে আসে এবং ক্রমাগত ভুলের পর ভুল পথে ও সুবিধাবাদী পথে চলার জন্য ওরা মনে করে অন্যান্য বামপন্থী দলসমূহকে একমাত্র চাতুরী ও অসৎ উপায়ে করায়ত্ত করার উপরেই বুঝি জনতার উপর আধিপত্য স্থাপন করার কৌশল বর্তমান। যদি ওরা ঠিক পথে চলত—তবে ওদের আত্মপ্রত্যয় জাগত ও দৃষ্টিভঙ্গি আরো সুদূর প্রসারী হতো এবং ওদের সঙ্গে অন্যান্য মার্কস্‌পন্থী ও বামপন্থী দলসমূহের সহযোগিতার আকর্ষণ বেশি হতো . সঙ্কীর্ণতা, সংশয় ও অসাধু প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হতো না ওদের দল আজ ভারতের বুকে নেতা বলে প্রতিষ্ঠিত হতো। দলের ও নিজেদের মধ্যেও ওদের সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা চালু থাকে ঠিক এই একই কারণে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কৃষক সভায় নিজ দলের একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য ওরা যে সমস্ত অন্যায় সাংগঠনিক নীতি গ্রহণ করত এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের সুযোগ এমন ভাবে নিত যে অন্যান্য দল ওদের সাথে সত্যিকার সহযোগিতা করার মতো মনোভাব পোষণ করতে পারত না। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিও বিভিন্ন দলগুলির সহযোগিতার ক্ষেত্র না হয়ে প্রতিযোগিতা, দলাদলি ও হানাহানির প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াত। আশা করি এই নিষ্ঠুর সত্যটা আজ তাদের স্মরণ হবে এবং বুঝতে পারবে কেন মাও-সে-তুং অন্যান্য বামপন্থীদের সহযোগিতা অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং কেন ওরা অন্যান্য বামপন্থীদের চটিয়ে দিয়েছে। ওরা অন্যান্য বামপন্থীদের নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই সহযোগিতা করতে চাইত—তাদের সংশোধন ও শক্তিমান করে নিজেদের সত্যিকার সহায় হিসাবে, স্থায়ী বন্ধু হিসাবে, বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে টেনে আনবার উদার ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করত না—যার ফলে অন্যান্য সকলে ওদের বামপন্থী ঐক্য কথাটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র বলেই মনে করত এবং নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে কেউই বড় একটা ওদের কথায় সাড়া দিত না। মতবাদের দুর্বলতার জন্য অথবা সুবিধাবাদের জন্য যে ওরা অন্যান্য বামপন্থীদের এই বিষ নজরে দেখত তা নয়,—কেননা ওরা নিজ মতবাদের দুর্বলতা ও সুবিধাবাদের জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য যে ওরা অন্যান্য বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করত তা একেবারেই নয় ববং নিজেদের সুবিধাবাদ অবাধে চালু রাখার অন্তরায় সৃষ্টি করত বলেই ওদের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ সংশয়াকীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ হতে বাধ্য হতো। তাছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে ওদের বিরূপভাব কেবল মাত্র এই জন্য যে আমরা ওদের সুবিধাবাদ ও সংস্কারবাদ পদে পদে দেখিয়ে দিতাম—বৈপ্লবিক দিক থেকে– যার জন্য ওরা খুব বিরক্ত হতো এবং দোষী ভাবটা কাটাবার জন্য আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করা, অবজ্ঞা করা এবং ট্রট্‌স্কীপন্থী বলে কুৎসা রটানো একটা পলিসি হিসাবে ধরে নিয়েছিল। ভিতরে যাদের সারবস্তু নেই—বাইরে তাদের এই ছলনা ও চাতুরী ছাড়া অন্য কোনো

উপায় থাকতে পারে না। আমাদের সম্বন্ধে ওদের এই মনোভাব কতকটা তবু বোঝা যায়—কেননা আমরা ওদের দুর্বলতা ও সুবিধাবাদকে রাজনৈতিক আক্রমণ করেছি—কিন্তু বামপন্থী হিসাবে যারা অন্যান্য শোষিত শ্রেণী ও নিম্নমধ্যবিত্তদের উপর দল গঠন করে তাদের সম্বন্ধে ওদের ব্যবহার আশ্চর্যজনক। রাজনৈতিক নীতি হিসাবে, শ্রমিক শ্রেণীর সহায় হিসাবে যাদের সংযোজিত করা ওদের উদ্দেশ্য তারা কি করে যে বামপন্থী দলগুলিকে চটিয়ে দিত এবং শত্রুদের কবলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করত তা বোঝা কঠিন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ছাত্রপ্রতিষ্ঠান, নিখিল ভারত কৃষকসভা প্রভৃতি প্রত্যেক সংগঠনেই ওরা অন্যান্য বামপন্থীদের মৌখিকভাবে আহ্বান করত—অথচ কার্যত তাদের এইসব প্রতিষ্ঠানে কোণঠাসা করে রাখার জন্য একটা ভয়ানক চেষ্টা চালাত—এবং তাদের নিষ্পেষিত করে (Squeeze out) দুর্বল করে দেবার চেষ্টায় থাকত। পাতিবুর্জোয়া বা নিম্নমধ্যবিত্তসুলভ মতবাদ নিয়ে যে সমস্ত দল দাঁড়ায় এবং যেগুলি সত্যি করে সংগ্রামের ফ্রন্টে আসতে চায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেবার উদ্দেশ্য কম্যুনিস্ট পার্টির থাকতে পারে না—বরং তাদের শক্ত করা—সংগ্রামে নিযুক্ত করবার একটা উপায় হিসাবে কম্যুনিস্ট ও শ্রমিক নেতৃত্বের আওতায় তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা দূর করাই হলো তাদেরকে যুক্ত বামপন্থী সংগঠনে টেনে আনার সার্থকতা। কিন্তু কার্যত ওরা উল্টোটাই বরাবর করে এসেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিসর্জন দিয়ে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ দলীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করাই হলো পার্টির কাজ। বামপন্থীদের সংশোধন করা বা রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার কোনো উপায় ওরা নিত না বরং তাদের হেয় করা, ছোট করা ও আলিঙ্গনের নামে ধ্বংস করাটাই মস্ত কায়দা বলে মনে করত। ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে মজুর ইউনিয়নে, চাষী সংগঠনে, ছাত্র-প্রতিষ্ঠানে এমনকি একটা সাধারণ সভায় ও সংবাদ পরিবেশন ব্যাপারেও ওরা এই প্রকার রাজনীতিহীন দলীয় প্রাধান্য রাখবার জন্য ব্যস্ত থাকত। সদস্য তালিকায় কারচুপি করা, কার্যকরী সমিতিগুলি ছলে বলে—যে কোনো উপায়ে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখার জন্য এমন সব অসাধু উপায় অবলম্বন করত যার ফলে অন্যান্য দলগুলিও ওদের অনুকরণে ওদেরই প্রতিক্রিয়ায় এই সব সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটা অরাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের ক্ষেত্র করে তুলত। প্রত্যেক দল তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই অভিযোগ স্বীকার করবে। যার ফলে বামপন্থী ঐক্য কথাটা অনেকের একটা প্রধান ছলনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না বলে তাদের দেশবাসীকে এবং বামপন্থী দলের অন্তর্গত লোকজনদের শিক্ষা দেবার মতো কিছু সম্পদও ছিল না। কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে সব ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা আজ তাদের সত্যি সত্যি একক (Isolated) করে ছেড়েছে—কোনো সংগ্রামে বা কোনো আন্দোলনে একমাত্র নিজেদের চেলা চামুণ্ডা ছাড়া আর কোনো লোককে এরা লাগাতে পারে না। রাজনৈতিক দুর্বলতা সাংগঠনিক সংকীর্ণতা দিয়ে পূরণ করতে যাওয়ার এই হাস্যকর নীতি আজ অতিশয় স্পষ্ট। বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সবলতা যদি ওদের অক্ষুন্ন থাকত তবে এই অসাধুতার ও সংকীর্ণতার আশ্রয় নিতে হতো না—কেবলমাত্র আদর্শগত নিষ্ঠা ও কর্মপন্থার বৈপ্লবিক নীতি তাদের দলকে সত্যিকার শক্তি যোগাতে পারত এবং অন্যান্য ছোট ছোট দল ও উপদলগুলিকে সত্যিকার নিজেদের ফ্রন্টে স্থায়ী সহযোগী হিসাবে ধরে রাখতে পারত ও ক্রমে সকলের নেতৃত্ব করার স্বাভাবিক অধিকার পেত—যেমন পেয়েছে আজ চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি। কিন্তু ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি নানাভাবে বামপন্থী রাজনীতিতে একটা অস্বাস্থ্যকর নোংরা আবহাওয়ার সৃষ্টি করে ছেড়েছে। অপরপক্ষে এও বুঝতে হবে অবৈপ্লবিক সংস্কারমূলক রাজনীতি বামপন্থীদের এই দুর্দশা এনে দিতে বাধ্য।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, বাস্তব বৈপ্লবিক আঘাত সংগঠন যেখানে কর্মপন্থা—সেখানে সংগ্রামকারীদের সহযোগী পাবার জন্য একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে কিন্তু বিপ্লব যেখানে কর্মপন্থা নয় –প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা দখল করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে প্রতিযোগিতার কথাটাই এসে পড়তে বাধ্য। শত্রুর ভয়ানক প্রত্যাঘাত থেকে আত্মরক্ষার সেখানে প্রয়োজন নেই। দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাজানো পাতা আসরে জমিয়ে বসবার জন্যই অপর দলসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক চাল ও ছলনা দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখাই যেখানে একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়—সেখানে এজাতীয় অসাধুতা ও সংকীর্ণতা ফেঁপে উঠতে বাধ্য। বামপন্থীদের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির মৌখিক ঐক্যনীতি ও বাস্তবক্ষেত্রে দুর্নীতিপূর্ণ বা নীতিহীন ব্যবহার একটা বরাবরের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সম্বন্ধে ওদের তাচ্ছিল্য ও শত্রুতামূলক ব্যবহার সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের পরে যেচে দেখা করি। কেননা এক প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে জনতার একটা মাত্র অংশকে সংগ্রামে টেনে আনার একটা বিরাট বিপদ আছে। জনতাকে সংগ্রামে জয়ী করাই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য সেখানে জনতার শক্তিকে যে সব স্থানে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড় করানো সম্ভব তাকে অগ্রাহ্য করে একমাত্র নিজেদের শক্তিতে অগ্রসর হওয়া অনিষ্টকর। এই জন্যেই ওদের সঙ্গে আমরা মিলিত কর্মপন্থা অন্ততপক্ষে সম্মিলিত এককালীন আঘাত বা আক্রমণের সংযোজনা করা একটা বৈপ্লবিক কর্তব্য বলে মনে করি অতীতের ঝগড়ার ইতিহাস বা দলগত সঙ্কীর্ণতা কোনো কিছুই এই প্রয়োজনীয়তার উপরে স্থান পেতে পারে না এবং যদি আমরা তা না করতে পারি তবে আমাদের সংগ্রাম আরও দুর্বল হবে এবং জয় অনিশ্চিত হয়ে উঠবে। কম্যুনিস্ট পার্টির কিন্তু এজাতীয় গরজ এতটুকু দেখা যায়নি। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে কি বিবেচনার উপর ওদের এই কার্পণ্যবোধ ও সঙ্কীর্ণতা বর্তমান ছিল। কোন অহংকারে ওরা নিজেদের এতবড় শক্তিমান মনে করত যে একমাত্র নিজেদেরই শক্তিতে ওরা জনতাকে জয়ী করবে। আজ জনতার কম্যুনিস্ট পার্টিকে এই প্রশ্ন করা উচিত যে কেন সম্মিলিত আঘাত হানবার আয়োজনে কম্যুনিস্ট পার্টির এত উৎসাহহীনতা দেখা দিত- কেন জনতাকে এরা ভুল বুঝিয়েছে এবং নিজেদের শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়ে জনগণকে মার খাইয়েছে ও পরাজিত করে ছেড়েছে।

এই জাতীয় মনোভাবই যে বর্মায় বিপ্লব আন্দোলনে কম্যুনিস্ট দলগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এও সন্দেহ করা যায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের প্রতিনিধি থাকিন্ নুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগ্রামী দল কোনো সম্মিলিত কর্মপন্থা ও সহযোগিতা করতে পারেনি—লালঝাণ্ডা কম্যুনিস্ট ও শ্বেতপতাকাধারী কম্যুনিস্টদের মধ্যে অনবরত সশস্ত্র সংগ্রাম রয়েছে—যদিও উভয় দলই স্টালিনপন্থী এবং কেউই নিজেদের ট্রটস্কীপন্থী বা টিটোপন্থী বলে স্বীকার করে না –সোভিয়েট ও স্টালিনের নেতৃত্ব মুখে সকলেই মেনে নেয়। তাছাড়া বিদ্রোহী পি ভি ও দল, বিদ্রোহী সৈনিকরা, বিদ্রোহী কারেনদেরকে ওরা নিজেদের সম্মিলিত সংগ্রামে সংযুক্ত করতে পারেনি। এই আত্মক্ষয়ী ও আত্মহত্যাকারী সংকীর্ণতার পরিণাম যে কত ভয়াবহ এবং কত অনিষ্টকর তা বর্মার ইতিহাস থেকে প্রত্যেক বিপ্লবীর শিখে নেওয়া উচিত। যদি বিদ্রোহীরা ও বিপ্লবীরা একত্রে আঘাত হানতে পারত এবং একত্রে সংগ্রাম চালাবার একটা যুক্ত কর্মপন্থা তৈরি করতে পারত তা হলে থাকিন নুর রাজত্ব অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে যেত। রাজনৈতিক সংকীর্ণতা বৈপ্লবিক উদারতা ও দূরদৃষ্টিকে নষ্ট করে ফেলেছে বলেই আজ বর্মার জনসাধারণ এই দীর্ঘস্থায়ী অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতবর্ষে

এজাতীয় দুর্ঘটনা ও প্রতিকূল অবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিপ্লবীদের একটা প্রধান কর্তব্য। আশ্চর্যের বিষয় বর্মার এই অদ্ভুত পরিস্থিতি সম্বন্ধে কমিনফর্ম নেতৃত্ব আজও নীরব—হয়ত সবটা ব্যর্থ হবার পর তাদের রায় বা নির্দেশ বের হবে। এই সংকীর্ণতা সুদূর বিশ্ব নেতৃত্ব পর্যন্ত প্রসারিত বলে সন্দেহ করাও অন্যায় হবে না—সেখানে বিপ্লবের চেয়ে স্টালিন প্রশস্তিটাই বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বলে স্থায়ী নীতি হিসাবে ধার্য হয়েছে। তা না হলে কি করে বোঝা যায় যে কেন আজও কমিনফর্ম নেতৃত্ব বর্মার ব্যাপারে হাত দেয় না এবং কেন তাদের মুখপত্রে এবিষয়ে একটি কথা পর্যন্তও উল্লেখ করে না? মনে হয় তার কতকগুলি শক্তিকে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে চায় এবং বর্মার কম্যুনিস্ট দলগুলির মধ্যে যারা বেশি স্টালিনপন্থী এই সংবাদের অপেক্ষায় আছে—আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কোনো নির্দেশ দিতে প্রস্তুত নয়।

বিপ্লবী কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি—"আপনাদের সঙ্গে সম্মিলিত সংগ্রামের জন্য আমরা কোনো সম্মিলিত কার্যক্রম গঠন করতে পারি কিনা, এই উদ্দেশ্যে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। এ বিষয়ে আপনাদের কোনো পলিসি আছে কি?'

কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি—"আছে। আমাদের থিসিসে যুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন করবার নীতি গৃহীত হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ রণক্ষেত্রে যারা সংগ্রামে প্রস্তুত আমরা তাদের সবাইকেই এক করবার প্রোগ্রাম নিয়েছি।"

বিঃ কঃ প্রঃ—"বেশ কথা, কিসের ভিত্তিতে, অর্থাৎ কোন জাতীয় সম্মিলিত সংগ্রাম আপনারা ওঠাতে চান এবং বৈপ্লবিক কর্মপন্থা আপনাদের কি? কিসের ওপর আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি?"

কঃ প্রঃ —"ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশনের ভিতরেই আমাদের সঙ্গে আপনাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র রয়েছে।"

বিঃ কঃ প্রঃ—' ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেতো আমরা আছিই এবং বরাবরই আছি। সেখানে সম্মিলিত কর্মপন্থা যা নেবার যোগ্য, তা নেওয়া হয়েছে, হয়ে থাকে এবং থাকবেও। ছাত্র ফেডারেশন বা কৃষক সভায় আমরা আপনাদের মধ্যে নেই—কেননা অতীতের দলগত নীতিতে আজ প্রায় প্রত্যেক পার্টিরই একটা নিজস্ব ছাত্র সংগঠন ও কৃষক সংগঠন তৈরি হয়ে গেছে। আপনাদের ছাত্র ফেডারেশন বা কৃষক সভা আজ আর সমগ্র ছাত্র ও কৃষকদের সাধারণ প্ল্যাটফর্ম নয়— ওদুটি আপনাদেরই পার্টির নিজস্ব একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। ওখানে এখন ঢোকা মানে নিজেদের প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া। কিন্তু এতবড় একটা ভাঙাগড়ার মধ্যে যাবার আগে আমাদের জানা দরকার—মজুর, কৃষক ও ছাত্রদের এই সমস্ত আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে আজ আপনারা কি করতে চান? বিপ্লবের কোনো প্রয়োজনে কি এগুলোর ব্যবহার করতে চান? এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঢোকা বা বেরিয়ে আসার কোনো নিজস্ব তাৎপর্য থাকতে পারে না—সবটাই বিচার করতে হবে এই বিবেচনার ওপর যে এগুলি দিয়ে আমরা বিপ্লব সংগঠিত করতে চাই কিনা এবং কেমন করে চাই। সাধারণ সময়ে এই সব আইনী প্রতিষ্ঠানের কাজ ও ব্যবহার—বৈপ্লবিক সময়ে তার ব্যবহার ও তাৎপর্য এক থাকতে পারে না। অতএব বলুন আপনাদের সাধারণ বৈপ্লবিক পরিকল্পনার ছবিটা কি, এবং তার ভিতর ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা বা ছাত্র ফেডারেশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি ? তা নাহলে সেই পুরোনো নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির খাতিরে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আমাদের যোগ দেবার কোনো আগ্রহ নেই।"

কঃ প্রঃ—"বৃহত্তব কোনো সংগ্রামী পথ নেবাব আগে শ্রমিকদেব একতা ও নেতৃত্ব সৃষ্টিব প্রয়োজনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকেই একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় মজুব প্রতিষ্ঠানে পবিণত কবা দবকাব। এইজাতীয় বিবেচনাব খাতিবেই ছাত্র সমাজ ও কৃষক শ্রেণীব জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিনিধি স্থানীয় কবা দবকাব, যাতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে বেশিব ভাগ জনতাকে একত্র কবা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনেব পথে যে সমস্ত শ্রেণীসংগ্রাম উঠবে তাদেবকে একই প্রতিষ্ঠানেব পতাকাতলে চালু কবা দবকাব। আপাতত সংগ্রামেব পথে যাবাব এইটাই নিম্নতম কার্যসূচী।"

বিঃ কঃ প্রঃ—"ভাল কথা—কিন্তু এই নিম্নতম কর্মসূচী চিবকালেবই কর্মসূচী—অর্থাৎ অবৈপ্লবিক যুগেব কর্মসূচীব লক্ষ্যও এছাড়া অন্য কিছু হতে পাবে না। কিন্তু বিপ্লবেব যুগে উর্ধ্বতন ও উর্ধ্বতম কর্মসূচীব ছবি যদি বিপ্লববাদীব চোখে স্পষ্ট না থাকে তবে প্রাথমিক কর্মসূচীতে ভুল থাকবে এবং কোনোকালেই হয়ত প্রাথমিক কর্মসূচী থেকে তাব উর্ধ্বতন কর্মসূচীতে পৌঁছবাব গবজ থাকবে না। অতএব জানা দবকাব আপনাদেব বৈপ্লবিক কর্মসূচীব পূর্ণ ছবিটা কি এবং কি ভাবেই বা সেই পথে অগ্রসব হচ্ছেন।"

কঃ প্রঃ 'বিপ্লব আমাদেব পবিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত নাও হতে পাবে—অতএব এজাতীয় পবিকল্পনা না কবে আমাদেব আশু কর্তব্যেই মনোযোগ দেওয়া উচিত—না হলে আমবা ভুল পবিকল্পনা কবে বসতে পাবি।"

বিঃ কঃ প্রঃ- "তাব মানে আপনাবা বর্তমানে এই প্রাথমিক কর্মসূচী ছাডা আব কিছুই কবতে বাজি নন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ছাত্র ফেডাবেশন ও কৃষক সভাকে ভাবতেব একমাত্র শ্রেণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড কবাবাব কাজ ও প্রাথমিক অর্থনৈতিক লডাইযেব নিম্নতম কর্মসূচী ছাডা বিপ্লবেব জন্য আব কোনো আযোজন বা প্রস্তুতিব, পবিকল্পনাব বা বিবেচনাব বস্তু কি কিছু পান না ?"

কঃ প্রঃ (ইতস্তত ভাব) "ঠিক তা নয, তবে আমবা আগে থেকে কোনো পবিকল্পনায বন্দী হযে থাকতে বাজি নই। অবস্থাব ওপব বিবেচনা কবে, আন্দোলনেব স্তবেব বিবেচনা কবে যথাসময়ে যথাযোগ্য পদক্ষেপ কবব।"

বিঃ কঃ প্রঃ—"আমবা তা মনে কবি না। নিচে থেকে প্রাথমিক কাজগুলি কখনোই বৈজ্ঞানিক হতে পাবে না—যদি সমগ্রভাবে বিপ্লবেব চিত্রটা বিচাব ও গবেষণা কবাব ওপব পার্টিব নজব না থাকে। তাছাডা পার্টিব কাজই এই—জনতাকে নেতৃত্ব দেবাব ক্ষমতা তাব দূবপ্রসাবী চিন্তা ও গবেষণা ও তদনুযাযী নির্দেশ দেবাব ক্ষমতা পার্টিকে অর্জন কবতে হবে—আন্দোলনকে নিজেব পথে ভেসে যেতে দেবাব মতো মতি মার্কস লেনিনপন্থী পার্টিব থাকতে পাবে না—তাকে বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট ধাবায বইযে নিযে যেতে হবে—নেতৃত্বেব জোবে, কৌশলে ও দূবদৃষ্টিতে। অতএব প্রাথমিক সমস্ত কাজগুলিকে আমবা সমগ্র কর্মোদ্যমেব ছবিব মধ্যে যথাস্থানে দেখতে চাই। বিপ্লবেব ধাবা ঠিক ঠিক আমাদেব চিন্তাধাবাব বেখা ধবেই অগ্রসব হবে, এমন কোনো স্থিবতা নেই , কিন্তু তাই বলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা থাকবে না বা তাব ওপব প্রস্তুতি থাকবে না, এহেন স্বতঃস্ফূর্ততা (spontaneity) বা pragmatism লেনিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিব বিবোধী।"

কঃ প্রঃ—(ইতস্তত ভাব, কোনো উত্তব নেই)।

বিঃ কঃ প্রঃ—"আমবা আবো খোলাখুলি কবে দু-একটা প্রশ্ন কবতে চাই। আপনাবা আপনাদেব থিসিসে সংগ্রাম ঘোষণা কবেছেন। কোন কোন শ্রেণী এই লডাইযে যোগ দেবে ও দিতে পাবে এবং কোনো কোনো শ্রেণীব বিরুদ্ধে এই লডাই ওঠাতে হবে—তাব বিচাব বা

শ্রেণী বিন্যাস ও শিবির নির্ণয় করেছেন , কিন্তু সংগ্রামী শ্রেণীগুলি কেমন করে লড়াই করবে তার কোনো উল্লেখ করেননি। আমাদের দুশ্চিন্তা এখানেই যে সংগ্রামের রূপটা পরিষ্কার না করলে সংগ্রামটাই ফাঁকা কথায় পরিণত হতে পারে, অথবা যে কোনো লোক যে কোনো অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব সংগ্রাম বলতে আপনারা ঠিক কি ধরনের সংগ্রাম বোঝেন তা পরিষ্কার করুন।"

কঃ প্রঃ—"যেমন অবস্থায় যেরকম সংগ্রাম ওঠে সেগুলির নেতৃত্ব করা এবং আপনা থেকে যে সব সংগ্রাম আজ জনতা ওঠাচ্ছে, তাদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সেই সব সংগ্রাম পরিচালিত করার বেশি কিছু আমরা ভাবতে প্রস্তুত নই।"

বিঃ কঃ প্রঃ—"অর্থাৎ জনতা নিজেদের প্রেরণায়, বিবেচনায় ও অভিজ্ঞতায় যতটুকু করতে রাজি ও করছে, তার ওপর নেতৃত্ব করা ছাড়া সংগ্রাম সম্বন্ধে আপনাদের কি কোনো নীতি, নির্দেশ বা সংগ্রাম বিজ্ঞান নেই? Tactics বা রণকৌশল সম্বন্ধে আপনাদের কি বক্তব্য রয়েছে জনতার কাছে—জনতার কাছে পরিপূর্ণ বিপ্লবের ছবিটাকে কেন আপনারা এখন থেকেই পরিচিত করাবেন না?"

কঃ প্রঃ—(ইতস্তত ভাব)

বিঃ কঃ প্রঃ—"আমরা আরো স্পষ্ট করে একটি কথার উত্তর চাই। আপনাদের সংগ্রাম কি কেবল আন্দোলনেই আবদ্ধ থাকবে কংগ্রেসী আন্দোলনের মতো– যা সিভিল কোড ভাঙতে চায় কিন্তু পেনালকোড ভাঙতে চায় না—এমনি ধরনের কিছু? না আপনাদের সংগ্রাম বিপ্লব—অর্থাৎ পৃথিবীতে যে অর্থে বিপ্লব ঘটেছে সেই অর্থে? ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লব বলতে আমরা যে সশস্ত্র সংগ্রাম ও বেপরোয়া গণঅভ্যুত্থানের চিত্র দেখি— সেরকম কোনো চিত্র আপনারা ভাবতে দেখতে পান কি - অদূর ভবিষ্যতে? অদূর ভবিষ্যতে যদি তা না দেখেন তবে আপনাদের থিসিসে বর্তমান কালটিকে বৈপ্লবিক অবস্থা বলে প্রচার করছেন কেন? যদি বৈপ্লবিক অবস্থা মনে করেন তবে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি করছেন না কেন এবং কেন জনতার সামনে বিপ্লবের কায়দা ও বিজ্ঞানের কথা তুলছেন না?"

কঃ প্রঃ—"আমরা এত আগে থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য জনতাকে প্রস্তুত হতে বলতে পারি না। এখন আমাদের প্রাথমিক সংগ্রাম কৌশলগুলিই যথেষ্ট।"

বিঃ কঃ প্রঃ—"অর্থাৎ এখন কেবল মাত্র উত্তেজনামূলক প্রচার, আন্দোলন ও আংশিক সংগ্রামগুলিই চালু করতে চান। এখন তবে আপনাদের মতে বিপ্লবের আন্দোলনমূলক এবং যখন বিপ্লবের বৈপ্লবিক অবস্থা এসেছে বলে মনে করবেন একমাত্র তখনই বিপ্লবের রূপকে আপনারা জনতার নিকট উপস্থিত করবেন? কিন্তু আন্দোলন যে সব সময়েই আপনা থেকে বিপ্লবে রূপান্তরিত হয় না –সে কথা কি আপনারা গত কংগ্রেসী আন্দোলনগুলির ইতিহাস থেকে পাননি? বিপ্লবে আন্দোলন আছে মানি, কিন্তু আন্দোলনে বিপ্লব নেই, তা থাকলে ১৯২০ সাল, ১৯৩০ সাল ও '৪২ সালের আন্দোলন বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে যেত। এমন কি ভুল ও অর্থহীন আন্দোলন বিপ্লবের ক্ষতিও করতে পারে এবং বিপ্লবের পথকে নির্বীর্য ও পরাজিত করার জন্যও "আন্দোলনের" ব্যবহার হয়ে থাকে। জনতার রোষের নিবৃত্তি (Safety Valve) হিসাবে একটা আচমকা বিকাশেই আন্দোলন ক্ষান্ত হয়ে যায়। অতএব আপনাদের রণনীতিতে কেবল আন্দোলন ও উত্তেজনামূলক প্রচার থাকাটাই বিপ্লবের পক্ষে নিশ্চিত আশার কথা নয়।"

কঃ প্রঃ—"আপনারা কি তবে এখুনি সশস্ত্র সংঘাতের কথা উত্থাপন করতে চান? জনতাকে সশস্ত্র সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যা... কথা কি আজকের আলোচ্য বিষয় হতে পারে?"

বিঃ কঃ প্রঃ—"কেন নয় ? আলোচ্য বিষয় থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের কথাটা কেন উহ্য থাকবে বলতে পারেন?"

কঃ প্রঃ—"জনসাধারণ এই ধরনের প্রস্তুতির জন্য এখনো প্রস্তুত নয়। জনসাধারণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে যখন তারা নিজেরাই অস্ত্রধারণ করার কথা ভাবতে পারবে তখনই আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা উত্থাপন করব—তার আগে এ জাতীয় চিন্তা বা প্রস্তুতির কথা ভাবা হঠকারিতা বা অতিবামপন্থী ভুল মাত্র। এখন জনতাকে প্রস্তুত করার কাজটাই আসল - জনতার প্রস্তুতির সাথে তাল মিলিয়ে এগোতে হবে। নিজেদের প্রস্তুতিটাকে জনতার প্রস্তুতি বলে চালালে চলবে না এবং জনতা এখনো সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে অনেক দূরে পিছিয়ে আছে।"

বিঃ কঃ প্রঃ—"জনতাকে প্রস্তুত করতে হবে একথা ঠিক। কিন্তু জনতাকে প্রস্তুত করবার দায়িত্ব যারা নিয়েছে বা নেবে তাদেরকে নিজেদেরই প্রস্তুত করাটা সর্বপ্রথম কর্তব্য। নিজেরা আগে ভাল করে ভেবে বুঝে নিতে হবে যে আমরা সত্যিই সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি কিনা অথবা আমরা সত্য সত্যই সশস্ত্র বিপ্লব চাই কিনা। যদি চাই তবে এখন থেকেই নিজেদের দল ও জনতাকে প্রস্তুত করবার যথাযোগ্য আয়োজন ও চেষ্টা করতে হবে—না হলে সশস্ত্র সংগ্রামের মুখে হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও তার কায়দাকানুন নিয়ে সবদেশের বিপ্লবীদলই হঠাৎ প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে না। অতএব আপনারা বলুন জনতার সশস্ত্র বিপ্লব করতে চাওয়া না চাওয়াটা তাদের মতামতের জন্য ফেলে রাখলে চলবে কি, না, নিজেদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত চেষ্টার সাহায্যে শিক্ষার দৌলতে জনতার সেইরূপ প্রতিজ্ঞা জাগাতে হবে? যদি জনতাকে এখন সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা অত্যন্ত অসময়োচিত কাজ বলে মনে করেন তবে নিশ্চয়ই এই বিবেচনা থেকে করেন যে জনতা এখনো প্রাণ দেওয়া নেওয়া ব্যাপারে আগুয়ান নয় এবং তারা এখনো এতটা বেপরোয়া সংগ্রাম এর ঝুঁকি নিতে পারে না। তাহলে আপনারা কেন জনতাকে রক্তাক্ত সংঘাতের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন—কেন পুলিশের গুলির মুখে উত্তেজিত করছেন—কেন জনতাকে একতরফা মার খাওয়াচ্ছেন—কেন এখন গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর ও ভাগচাষীদের আন্দোলনে পুলিশের তরফ থেকে একতরফা গুলি চলেছে—শহরে, কারখানায়, রাস্তায় জনতার ওপর গুলি, লাঠি ও গ্যাস হামেশাই চালানো হচ্ছে এবং আপনারাই উত্তেজিত করে তা ঘটাচ্ছেন কেন- -যদি এখনো জনতাকে সংঘর্ষের মধ্যে না নিয়ে যেতে চান?"

কঃ প্রঃ— এই একতরফা মারের মুখেই জনতা বুঝতে পারবে যে তাদেরও মার দেবার পলিসি নিতে হবে এবং তখনই তারা অস্ত্রধারণ করার কথা গ্রাহ্য করবে। এই ভাবেই তাদের প্রস্তুতি করতে হবে—নিজেদের অভিজ্ঞতার তালে তাল রেখে।"

বিঃ কঃ প্রঃ— "এই ভাবে জনতার মনোবল ও চেতনা সৃষ্টি হচ্ছে না - অযথা মার খাইয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া হচ্ছে মাত্র। জনতার সংগঠন এতে শক্তিমান হচ্ছে না তা আরও চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছে। একতরফা মার খেয়ে জনতা ভয় পেয়ে যাচ্ছে ও জনতার দোদুল্যমান অংশ এই মারের চোটে আরো বেশি পলায়নপর হচ্ছে ও তারা এগিয়ে আসবার কোনো সাহস বা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না।"

কঃ প্রঃ—"অত্যাচারের মুখে যদি দাঁড়াতেই না পারে তবেই তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে জনতা এখনো চূড়ান্ত সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়।"

বিঃ কঃ প্রঃ—"এটা অর্ধসত্য মাত্র—যা মিথ্যার চেয়ে হানিকর। জনতাকে অত্যাচারের মুখে ফেলে দিয়ে তার মনোবল সৃষ্টি করার কায়দা হাস্যকর ও কতকটা সত্যাগ্রহীপনা মাত্র। জনতা কেবলমাত্র অত্যাচারের মুখে নিজেকে তৈরি করতে পারে না—একটানা অত্যাচার তাকে নষ্ট

করে দেয় মাত্র। কেবল আত্মরক্ষা দিয়ে যুদ্ধ জয় যেমন হয় না তেমনি কেবল অত্যাচার সইয়ে জনতার মনোবল ও চেতনা তৈরি করা যায় না। অত্যাচারের বদলে আক্রমণের পথে জনতাকে টানতে হবে, জয়ের পর জয় দেখাতে হবে, বিজয়ী সংগ্রামের বলিষ্ঠ চিত্র একদম না থাকলে কখনো পরাজয় না মেনে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের সঙ্কল্প আসতে পারে না। তাছাড়া জনতা দেখবে, তাদের নেতারা তাদের কেবলই মার খাওয়াচ্ছে না—জয়যাত্রার পথে—বুদ্ধিমানের মতো নিয়ে চলেছে। তাছাড়া যেখানে যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতার চাপে জনতার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করবার জন্য আগ্রহ জন্মেছে, সেখানে আপনারা কতটুকু সশস্ত্র সংগ্রাম সজ্ঞানে গঠিত করেছেন? কোথায় আপনাদের প্রস্তুতি স্তরের পর স্তর উন্নত হচ্ছে? নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিত্বের আমলে যে তেভাগা সংগ্রাম আপনারা করেছেন এবং তাতে যে সব রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটেছে, তার চেয়ে আজকের দিনে যেদিন আপনারা বিপ্লব সংগঠিত করতে চলেছেন আপনাদের সেই চাষী সংগ্রামের চেয়ে কোন বিষয়ে আপনারা technical বা political উন্নতি দেখাচ্ছেন? আপনারা কি একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন না? একটা জনতার সৃষ্টি, তারপর কতকটা উত্তেজনার সৃষ্টি, তারপর পুলিশের আগমন ও তাদের সাথে সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত কতকগুলি লোকের মৃত্যু ও জনতার পলায়ন —এই চিত্রটাই কি আপনাদের একমাত্র চিত্র নয়? তাছাড়া আপনারা কি করে বুঝছেন যে বিপ্লব বেশ স্তরের পর স্তর নিয়মানুবর্তিতায় বিকশিত হবে — কে বলেছে বিপ্লব ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয় —কে বলেছে বিপ্লব আপনাদের কাটিন মাফিক অগ্রসর হবে? তাছাড়া ভারতের বিরাট রণক্ষেত্রে আন্দোলন কোথাও কোথাও অতি প্রাথমিক স্তরে রয়েছে—আবার কোথাও তা অত্যন্ত অগ্রবর্তী অবস্থায় এসে পৌঁছেছে— আবার কোথাও অতি প্রাথমিক অবস্থা থেকে অতি অগ্রবর্তী অবস্থায় হঠাৎ ঝাঁপিয়ে চলে আসছে। বিপ্লবের এই অসমগতিকে, এই বৈপ্লবিক গতিকে অগ্রাহ্য করা মানে সংস্কারবাদের ছায়া থেকে নিজেদের সর্বতোভাবে মুক্ত না করা। এই জটিল ও দুর্দান্ত সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থায় ও অসমগতিসম্পন্ন বৈপ্লবিক সংঘাতের যুগে অস্ত্রশস্ত্রের কথা ভাবটা আজ অপ্রাসঙ্গিক তো নয়ই —বরং আমরা ও আপনারা এ বিষয়ে যথেষ্ট বিলম্বে সচেতন হতে চলেছি —যার পরিণাম ভাল নয়। ইতিহাস আমাদের গাফিলতির জন্য অনেক কঠিন দুঃখ দেবে। আপনারা জনতাকে একতরফা মার খাইয়ে প্রস্তুত করছেন না—বস্তুত উল্টোটি করে চলেছেন —তাদের ভয় খাইয়ে দিচ্ছেন ও হতাশ করে ছাড়ছেন। যদি সশস্ত্র সংগ্রাম আজ এমনই অসময়োচিত হয়ে থাকে তবে তেলেঙ্গানায় আপনারা চাষীদের সশস্ত্র সংগ্রাম নিয়ে এত গৌরব অনুভব করেন কিসে ? সেখানে কি সেটা অতি বামপন্থা হয়নি?"

কঃ প্রঃ—"না, কেননা সেখানকার পরিস্থিতি ভিন্ন। সংগ্রামের স্তর সেখানে উঁচুতে চলে যায়, কাজেই সশস্ত্র সংগ্রাম সেখানে স্থায়ী রূপ নিচ্ছে।"

বিঃ কঃ প্রঃ —"জনতা অস্ত্রধারণ করবার সাহস সংগ্রহ করতে পেরেছিল বলেই সংগ্রাম অত উঁচু স্তরে যেতে পেরেছে এবং জনতার মনোবল সেখানে দিনকেদিন বেড়েই চলেছে। যদি তারা যথাসময়ে অস্ত্রধারণ না করত তবে তারা আজ গুঁড়িয়ে যেত—ইতিহাসের বুকে কোনো দাগ না কেটেই। তাছাড়া ওখানেও জনতার অস্ত্রগ্রহণ বাস্তবে ঘটবার পর আপনারা তা সমর্থন করেছেন —সেখানেও আপনাদের দূরদর্শিতা বা নেতৃত্বের কোনো পরিচয় নেই। আপনারা বাস্তব অবস্থাটা অর্থাৎ চাষীদের সশস্ত্র সংগ্রামটা মেনে নিয়েছেন মাত্র— অথচ দলের সর্বভারতীয় নীতি হিসাবে আজও তা গ্রহণ করেননি— যেন যে কথা তেলেঙ্গানায় সত্য—যে কথা বার্মায় সত্য—যে কথা মালয়ে, ইন্দোচীনে সত্য—সে কথা বাংলায়, আসামে, বিহারে সত্য হতেই

পারে না। কোনো একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর তার সাফাই করা ছাড়া আপনাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কি কোনোকালে আগে থেকে কোনো নির্দেশ দিতে পারবে না? যদি তেলেঙ্গানাই আপনাদের পথ তবে তেলেঙ্গানাকে প্রসারিত করা, ভারতের যেখানে সম্ভব সেখানেই আরো তেলেঙ্গানার সৃষ্টি করা, তেলেঙ্গানা-ফ্রণ্টের সাহায্যকল্পে শত্রুর বিরুদ্ধে আরো অনেক সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করা কি আজ আপনাদের কাজ নয় —এ বিষয়ে এখনো বিলম্ব করা কি বিপ্লবীদলের শোভা পায়? আপনাদের সমস্ত দল ও সংগঠন শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হবার পর কি আপনারা সত্যিকার প্রস্তুতির কথা ভাববেন?"

কঃ প্রঃ- "কিন্তু আমরা এখন আর কি করতে পারি? আমাদের এত অস্ত্রবল কোথায় যে সর্বত্র তেলেঙ্গানার জন্য জনতাকে প্রস্তুত হতে বলব। বার্মায় কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এসে গিয়েছিল- এবং জনতার হাতেও তাই এসে গিয়েছিল —অতএব তারা ঐ প্রকার সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগুতে পেরেছে কিন্তু ভারতের বুকে তো ঐ জাতীয় যুদ্ধ ঘটেনি এবং অস্ত্রও তারা পায়নি--অতএব অস্ত্রের কথাটা এখনই বলা সম্ভব নয়।"

বিঃ কঃ প্রঃ- তবে কোন বলে তেলেঙ্গানার চাষীরা চরম সংঘর্ষে নেমে যেতে পেরেছে? কখন অস্ত্র নিয়ে তারা সংগ্রাম শুরু করেছে? অস্ত্রের সংখ্যাটা তাদের কর্মপন্থাকে নির্দিষ্ট করেনি —বরং তাদের কর্মপন্থাই তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করিয়েছে। যা তেলেঙ্গানায় সম্ভব —অর্থাৎ যে অস্ত্র চাষীরা তেলেঙ্গানায় সংগ্রহ করছে- ততটা পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সব অঞ্চলেই সংগ্রহ করা সম্ভব এবং তার চেয়ে ঢের বেশি সংগ্রহ করাও সম্ভব—অবশ্য যদি সংগ্রহ করবার ইচ্ছা থাকে এবং জনতাকে অস্ত্র ধরাবার বাসনা থাকে। তাছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টির অস্ত্র নেই একথা বলা শোভা পায় না। যার পক্ষে আন্তর্জাতিক শক্তি রয়েছে, যার পক্ষে নাকি ব্রহ্মের বিপ্লবীরা রয়েছে—রয়েছে বিপ্লবী চীন রাশিয়া, তার অস্ত্র মেলে না—একথার মানে কি? মেলে না একথা ঠিক নয়- আসলে আপনারা তা চাননি- আপনারা বিপ্লব ও সশস্ত্র বিপ্লব কল্পনার বাইরে রেখে দিয়েছিলেন —যার ফলে আজকের বিদ্রোহী জনতার ব্যবহার ও আপনা থেকে ফেটেপড়া সংগ্রামগুলিও আপনাদের অপদস্থ করে ছাড়ছে, অপ্রস্তুত করে ছাড়ছে।"

ক, প্রঃ "তা কতকটা সত্যি।-- তার কারণ তো আজ সর্বজনবিদিত। একথা সবাই জানে যে আমাদের পূর্ববর্তী নেতৃত্ব বহুকাল ধরে আমাদের সংস্কারপন্থায় ডুবিয়ে রেখেছিল এবং আমরা পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দল থেকে এই জন্যই পিছিয়ে পড়েছি। বুর্জোয়াদের তাঁবেদারি করে করে আমাদের দল যে নিজেদের বৈপ্লবিক শক্তি ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল তা থেকে আমরা সবে মাত্র মুক্ত হয়েছি কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের পরে। অতএব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা ও দলীয় প্রস্তুতির মন্দগতিটাকে অস্বীকার করতে চাই না।"

বিঃ কঃ প্রঃ – "আপনাদের এই স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ। এই আত্মসমালোচনা আশাপ্রদ। কিন্তু চেতনার দিক দিয়ে দলের চৈতন্য আজও পিছিয়ে পড়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আর ইতিহাস আপনাদের ও আমাদের অপ্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করবে না এবং আমাদের আঘাত দিয়ে কঠিন শাস্তি দেবে – আদর করে ঠাঁই দেবে না। অতএব বিলম্ব না করে, অতীতের সমস্ত গাফিলতি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আজো কি আমাদের উঠেপড়ে লাগতে হবে না? একটা অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থার কি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হবে না? যদিও আমাদের গাফিলতি ও অন্ধতাবশত আমরা আজ এশিয়ার মধ্যে সবার অগ্রবর্তী শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে পারিনি—তথাপি যাতে আমরা একদম পরাজিত না হয়ে পড়ি, যাতে সংগ্রামটাকে দীর্ঘায়ত করেও নিজেদের বাকি প্রস্তুতিটাকে সামলে নিতে পারি তার কি কোনো চেষ্টা করবার নেই?"

কঃ প্রঃ—"কি ভাবে তা করা সম্ভব? কি আপনাদের বক্তব্য?"

বিঃ কঃ প্রঃ—"আমাদের মতে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আগামী সংগ্রামের একটা যথাসম্ভব শুদ্ধ চিত্র মনে মনে এঁকে নেওয়া যাতে আমাদের প্রস্তুতি ও দৈনন্দিন কাজের লক্ষ্য সেই দিকে এগুতে আমাদের সাহায্য করে, যাতে অন্ধ সংগ্রাম ঘটে না যায়– যাতে যথাসম্ভব সচেতন পদক্ষেপে এগুতে পারি—যাতে সংগ্রামটা আমাদের অপ্রস্তুত করে না ফেলতে পারে এবং সংগ্রামটার ওপর আমাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও হাত রাখতে পারি ও যথাসম্ভব ইঙ্গিত পথে চালিত করতে পারি।

এই উদ্দেশ্যে ইতিহাসের ধারা থেকে নিজেদের পথকে তুলনামূলক বিচার দিয়ে বেছে নিতে হবে এবং তার বর্তমান শক্তি যোজনা দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। অন্ধ গতানুগতিকতার বশবর্তী হয়ে থাকলে চলবে না যে, রুশদেশে বিপ্লব যে ভাবে সংঘটিত হয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রেও বিপ্লব হুবহু তার পুনরাবৃত্তি করবে তা সম্ভব নয়, কেননা রুশ দেশ ভারত নয়, সেদিনকার পৃথিবী আজও একই স্থানে দাঁড়িয়ে নেই এবং ১৯৫০ সাল ১৯১৭ সাল নয়। তাছাড়া বিশ্ববিপ্লবের পটভূমিকা ও সাংগ্রামিক তাৎপর্যও এক নয়।

অর্থাৎ কেবল মাত্র রুশবিপ্লবের অভিজ্ঞতাই শেষ কথা নয়। আজ চীনদেশে ব্রহ্মে, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এমনকি মালয়ে যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চলেছে তার তাৎপর্য ও অভিজ্ঞতা অবহেলা করবার কথা নয়। আজ ভারতীয় কম্যুনিস্টদের স্পষ্ট করে বলতে হবে এই প্রাচ্যদেশীয় বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে তাদের মতামত কি- -কেবল সহানুভূতিসূচক সমর্থন নয়—নীতিগত সমর্থন ও কৌশলগত সমর্থন আছে কিনা তা জানাতে হবে। বিপ্লবের চীনা কায়দাটাকেও স্বীকার করতে হবে এবং তারপর এইসব সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বিপ্লবের ধারা অবস্থানুযায়ী বেছে নিতে হবে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে দৈনন্দিন সংগঠন ও সংগ্রামের কাজ আগুয়ান করতে হবে। অন্ধ ও উদ্দেশ্যহীন সংগ্রাম আজ সম্পূর্ণ অপাঙক্তেয় বলে ত্যাগ করতে হবে।"

কঃ প্রঃ—"কি কি কারণে আপনারা চীনা বিপ্লবের কায়দাকে রুশবিপ্লবের কায়দা থেকে ভিন্ন বলে দেখেন?"

বিঃ কঃ প্রঃ—'অত্যন্ত সহজ ও সরল তার পার্থক্য। প্রথমত— চীনবিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি হলো চাষীরা এবং রুশ বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি হলো শহরের মজুররা।

দ্বিতীয়ত—চীন বিপ্লবের প্রধান সংগ্রাম সংযোজনা উঠেছে গ্রাম থেকে, রুশবিপ্লবে শহর থেকে।

তৃতীয়ত—রুশবিপ্লবের একটি অবদান হলো তার লালফৌজ, কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে মুক্তিফৌজ বিপ্লবকে প্রসারিত করবার প্রধান শক্তি।

চতুর্থত—চীন বিপ্লবে মজুরশ্রেণীর নেতৃত্ব—কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যেই প্রকাশিত, কিন্তু মজুরশ্রেণী সংখ্যা ও শ্রেণীহিসাবে বা সংগঠিত শক্তি হিসাবে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেনি— বড়জোর সাহায্য করেছে মাত্র, কিন্তু রুশ-বিপ্লবে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব শ্রেণী, সংখ্যা ও সংগঠন হিসাবে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সেখানে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব ও বলশেভিক নেতৃত্ব সর্বতোভাবে একই জিনিস।"

কঃ প্রঃ—"কিন্তু অতীতে সাংহাই ক্যান্টন প্রভৃতি মজুর-বহুল শহরে যদি একটা বেপরোয়া বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাস না থাকত তবে কি চীনের গ্রামদেশে এইজাতীয় কম্যুনিস্ট প্রভাব চালু হত অথবা মুক্তিফৌজ গঠিত হওয়া সম্ভব হতো?"

বিঃ কঃ প্রঃ--'কিন্তু ১৯২৭ সালের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টা ১৯৪৫ সালে চীন বিপ্লবের শক্তি যুগিয়ে দিতে পারে না—সে হিসেবে ধরতে গেলে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেকটি সংগ্রামই পরবর্তী সকল যুগের উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য হতে পারে। কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব চাষীদের ওপর প্রতিষ্ঠা হবার কারণ সাংহাই-এর সংগ্রামে অনুসন্ধান না করে আজকের যুগের গণমুক্তির পরিস্থিতির মধ্যেই খুঁজতে হবে এবং বর্তমান যুগের ক্ষীয়মান সাম্রাজ্যবাদী প্রথার পতনশীল অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যেই তার ঐতিহাসিক সুযোগ অন্বেষণ করতে হবে। তাছাড়া ইন্দোচীন বর্মা প্রভৃতি গ্রামপ্রধান দেশে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে বিপ্লবী অভিযানের পক্ষে কোনো অতীত মজুর সংগ্রাম জড়িত আছে কি?"

কঃ প্রঃ 'মালয়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রূপটাকেও আপনারা বৈপ্লবিক-কৌশলের একটা নতুন অবদান হিসাবে গ্রহণ করেন?"

বিঃ কঃ প্রঃ – 'কেন নয়? প্রত্যেক দেশের পরিস্থিতির বেপরোয়া প্রয়োজনের তাগিদে আজ পৃথিবীতে হরেক রকমের সংগ্রাম অনিবার্য। মালয়ের সন্ত্রাসবাদ জনকয়েক লোকের কাজ নয় - একটা ব্যাপক গণসমর্থন না থাকলে এই জাতীয় সংগ্রাম দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব নয়—ব্যাপক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সেখানকার বিপ্লবীরা কেন ধনীদের মেরে মেরে উচ্ছেদ করবার পথ নেয় তা তাদের সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত—কেবল বাঁধা একটি ফরমুলায় ফেলে সব আন্দোলনের বিচার করা চলবে না।"

কঃ প্রঃ 'আপনারা ভারতায় বিপ্লব কি ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে মনে করেন? রুশ, চীন, ইন্দোচীন, বর্মা, মালয়, - এর কোন পথে ভারতের গতি বলে মনে করেন?'

বিঃ কঃ প্রঃ - আমরা এর কোনো একটি দেশের বিপ্লবের সাথে আমাদের দেশের হুবহু মিল হবে বলে আশা করি না। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বিখণ্ডিত ভারতের পটভূমিকায় জনতার মধ্যে যে একটা ভাঙন এসেছে ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রথম আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছে –এই আত্রাংত পরিস্থিতিতে ও গণতান্ত্রিক সুবিধার অবর্তমানে মোটামুটিভাবে আমাদের এখন চীন-বিপ্লবের পথেই অগ্রসর হতে হবে—যদিও এই বিপ্লব অভিযানের শেষ অধ্যায়গুলি কি ভাবে অতিক্রান্ত হবে সে কথা এখন বলা যায় না। চীন বিপ্লবের মতো গ্রামাঞ্চল অথবা ছোট শহর নিয়ে জেলা অঞ্চলগুলি দখল করে –আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সংগ্রামী শক্তিগুলিকে সংহত ও শিক্ষিত করে ফেলা দরকার এবং মুক্তিফৌজ সংগঠন করে মুক্তি সংগ্রাম চালু করা দরকার। এই আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করার ভূমিকায় শহরের মজুর শ্রেণীর কোনো অংশ নেই বা থাকতে পারে না, এমন ভুল করলে চলবে না—যদি আমরা বুদ্ধিমান হই এবং কোনো পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নেবার ক্ষমতা রাখি তবে চীনাদের চেয়ে আমরা মজুর শ্রেণীর কার্যকরী সহায়তা আরো বেশি লাভ করতে সমর্থ হতে পারি এবং তা নির্ভর করবে কি জাতীয় পরিকল্পনায় আমরা হাত দিচ্ছি তার ওপর। মজুর শ্রেণীর সাহায্য ও সহযোগিতা তো বটেই- অন্যান্য শহরবাসী শোষিত জনতার সাহায্য ও সাক্ষাৎ সহযোগিতা লাভ করা ও কার্যত তা আদায় করা সম্ভব। তাছাড়া যে সমস্ত অঞ্চল আমরা দখল করব তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সর্বদেশব্যাপী গণবিক্ষোভকারী আন্দোলন ও সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক আন্দোলন হয়ত সৃষ্টি করা সম্ভব। তারই সাথে গেরিলা বাহিনীর সাহায্যে মুক্তিফৌজের অগ্রগতিকে সাহায্য করার পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মালয়ের সন্ত্রাসবাদী নমুনা মিশ্রিত করলেও ভাল বই মন্দ হতে পারে না।"

কঃ প্রঃ —"যদিও আমাদের মতামত এখনো এ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্ধারিত হয়নি— তথাপি আমরা একথা বলতে পারি যে আপনাদের চিন্তাধারা আমরা মানতে পারি না এবং পোষণ করতে পারি না। চীন বা ব্রহ্মের মতো অবস্থা আমাদের তো নয়ই বরং বলা যায় আমাদের দেশের অবস্থা কতকটা প্রাক্‌বিপ্লবী রাশিয়ার মতো। অতএব রাশিয়ার পথ অনুসরণ করা ছাড়া আমরা অন্য কোনো নীতি গ্রহণ করতে রাজি নই। রাশিয়ার পথ বলতে আমরা এখানেও শহরের মজুর আন্দোলনের উপরই বেশি জোর দিতে চাই এবং সমগ্রভাবে জনতার এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। এই মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব কেবল জনতার ওপর পার্টির নেতৃত্ব মনে করলে যথেষ্ট হবে না— সমগ্র মজুর শ্রেণীকে বিপ্লবী আন্দোলনে প্রধান অংশ নিতে ও সংগ্রাম পরিচালনায় নেতৃত্ব করতে দেখতে চাই তা নাহলে ভারতীয় বিপ্লব অগ্রগামী হতে পারে না। গ্রামদেশে এবং তেলেঙ্গানায় যেখানে যতই সংঘর্ষ উঠুক তার রাজনৈতিক বৈপ্লবিক চরিত্র জোরদার ও স্থায়ী বিপ্লবী পথে অগ্রসর করাতে হলে শহরে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে দুর্দান্ত বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টি করাতেই হবে। তেলেঙ্গানার পথই আমাদের পথ এ কথার অর্থ এই নয় যে আমরা তেলেঙ্গানাকে দ্বিতীয় চীনের ভূমিকায় দেখি অথবা সেখানকার মুক্তিফৌজের অনরূপ ভারতের মুক্তিফৌজরূপে বিকশিত হবার সম্ভাবনা দেখি। তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম শহরের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম সাপেক্ষ অতএব আমরা বিপ্লবে রাশিয়ার শিক্ষাই বেশি করে গ্রাহ্য করি এবং চীনের মতো পরিস্থিতি কোথাও দেখতে পাই না।'

বিং কঃ প্রঃ—"কিন্তু একথাও ঠিক নয় যে আপনারা রাশিয়ার পথের অনুগামী। তা যদি হতেন তবে সেই পথে মজুর শ্রেণীকে চালিত করবার জন্য আপনাদের সামগ্রিক নীতি থাকত যা আপনাদের এখনো নেই। এখনও আপনারা সমগ্র মজুর শ্রেণীকে নিয়ে কোনো সামগ্রিক আন্দোলন, এমন কি একটা সাধারণ ধর্মঘট পর্যন্ত ডাকতে সাহস করেন না। এখনো আপনারা মজুর শ্রেণীকে খণ্ড খণ্ড ভাবে লড়াই করাতে ব্যস্ত এবং যখন দেখছেন এই খণ্ড সংগ্রামগুলি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এবং শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও জোটগুলি ভেঙে যাচ্ছে তখনো আপনারা সমগ্র মজুর শ্রেণীকে একত্রে সংগ্রামে নামবার জন্য কোনো সামগ্রিক প্রোগ্রাম ও সাধারণ শ্লোগান দিচ্ছেন না—প্রস্তুতির দোহাই দিয়ে আসলে মজুর শ্রেণীকে অপ্রস্তুত করে ছাড়ছেন এবং এ পথে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা বরং এতে মজুরদের মনোবল ও সংঘশক্তি অচিরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই আপনাদের দল বাংলায় বেআইনী ঘোষিত হয়ে গেছে - আপনারা অতিকষ্টে আত্মগোপন করে থাকছেন - বহু ইউনিয়নের অফিস আজ প্রায় তালা বন্ধ হয়ে পড়ছে—শোভাযাত্রা, মিছিল ইত্যাদি বেআইনী হয়েছে—১৪৪ ধারা ও নিরাপত্তা আইন আপনাদের কি কোণঠাসা করে ছাড়ছে না— অথচ আপনারা অদূর ভবিষ্যতে সংগ্রামে মজুর নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখছেন। যদি তাই করতে হতো তবে আপনাদের যাবতীয় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও যুবক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রে এক সংগ্রামে অগ্রবর্তী হবার জন্য যুক্ত আহ্বান ও সংগ্রামী সাধারণ সংঘাত ঘটাতে হতো। তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিপত্তি যখন একচেটিয়া ছিল—যখন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন মাথা তুলতে সাহস পায়নি—তখন এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সর্বভারতীয় যুক্ত রাজনৈতিক মজুর আন্দোলন সৃষ্টি করেননি কেন? কবে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কাজে লাগাতে অগ্রসর হয়েছেন? কোনোদিন নয় এবং তাকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আওতা থেকে মুক্ত করেননি— প্রত্যেক ইউনিয়নকে দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে সংগ্রাম করিয়েছেন ও আজও তাই করতেই ব্যস্ত। কখনো অন্য কোনো শ্রেণীর

স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে দাঁড় করাননি, যেমন বাংলার চাষীরা যখন দুর্ভিক্ষে লক্ষে লক্ষে প্রাণ দিয়েছে— আপনারা একমাত্র আপনাদের হাতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থাকা সত্ত্বেও এই মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষনীতির বিরুদ্ধে এবং চাষীদের সমর্থনে একদিনের জন্যও একটা সাধারণ ধর্মঘট করাননি। এমনি যার ইতিহাস সে প্রতিষ্ঠান কি সহজে গ্রামদেশের শোষিত জনতার ও কৃষকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে? মজুর শ্রেণী তাদের সংঘ বা সংখ্যাশক্তির জোরে আজ নেতৃত্ব কায়েম করবে এই প্রতিকূল অগণতান্ত্রিক অবস্থায় তা তো এখন আশা করা যায় না। মজুর শ্রেণীকে দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে অথবা চাষী আন্দোলনের সাহায্যে আপনারা কতটুকু কি করিয়েছেন যে আজ সহজে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব সংগ্রামী চাষী ও নিম্নমধ্যবিত্তরা মেনে নেবে? তাছাড়া মজুর শ্রেণীর মধ্যেই বা কোথায় সেই ব্যাপক রাজনৈতিক দায়িত্বের চেতনা বর্তমান। কোথায় বা আপনারা মজুর শ্রেণীকে সত্যিকার বিপ্লবী রাজনীতি শিখিয়েছেন? অতএব আজ মজুর শ্রেণীর অপ্রস্তুতির দোহাই দিয়ে চাষীদের বিপ্লবী আন্দোলন বা সংগ্রাম স্পৃহাকে স্তিমিত করে দেওয়া বা তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করা— আজকের বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকেই অগ্রাহ্য করা মাত্র।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে দেশে আজ যে পরিস্থিতি দেশ আজ দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে কর্তিত হয়েছে, তাতে শ্রমজীবী মজুরশ্রেণীর মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব কতকটা জেগে গিয়েছে অর্থাৎ মজুর শ্রেণীর একতা অনেকটা নষ্ট হয়েছে এবং তারই সুযোগ নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর আক্রমণ করা সরকারের পক্ষে সহজ হয়েছে। যুদ্ধের পরেই এবং ভারত বিভাগের আগে যে সময়টায় ভারতের সর্বত্র মজুর, চাষী, সৈন্য, নাবিক ও রাজকর্মচারী ইত্যাদির ব্যাপক ও তুমুল আন্দোলন চলেছিল সেই সময়টাই ছিল কম্যুনিস্ট ও শ্রমিক নেতৃত্বের এক অপূর্ব সুযোগ এবং তখন যদি কম্যুনিস্ট পার্টি তার বৈপ্লবিক কর্তব্য সমাধানে এগিয়ে আসত মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম করবার জন্য মজুর শ্রেণীকে সংগ্রামে সত্যিকার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গ্রহণে সাহায্য করত তবে রাশিয়ার মতো বিপ্লব ঘটানো হয়ত সম্ভব ছিল— অন্তত সেই জাতীয় চেষ্টার পক্ষে প্রচুর যুক্তি ছিল। কিন্তু তখন আপনারা মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ সমর্থন করছেন— কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা যাওয়াটাকে একটা অগ্রবর্তী অবস্থা বলে শ্রমিক ও চাষীদেরকে অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন করতে বলছেন এবং আপনাদের দল, নেতৃত্ব ও কর্মপন্থা যে তখন সংস্কারমূলক রাজনীতিতে একদম আচ্ছন্ন ছিল একথা আপনারাও স্বীকার করেন।

দেশ বিভাগের পূর্বে এবং পরে বৈপ্লবিক অবস্থা একই আছে এবং জনতার সামগ্রিক একতা ও শক্তি বেড়েছে বা একই আছে এজাতীয় কল্পনা মায়াত্মক। দেশবিভাগের অজুহাতে সম্মিলিত গণফ্রণ্টের ওপর প্রচুর আঘাত শত্রু হেনে দিয়েছে, এইটাই ছিল দেশবিভাগের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যের তাৎপর্য। দেশবিভাগের পরে স্থানে স্থানে জনতার সংগ্রামের তীব্রতা বেড়েছে বটে কিন্তু সমগ্রভাবে ভারতের জনতার শক্তি আহত হয়েছে এবং দমিত হয়েছে এই সত্যটা মেনে নিতে হবে। অতএব যে যে স্থলে স্থানীয় সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে তারই ওপর ভিত্তি করে সেই অঞ্চলে আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করা এবং তথাকার জনতার সংগ্রামশক্তিকে বাড়িয়ে তোলা ও মুক্তিসংগ্রাম চালু করা ছাড়া আজ আর কোনো পথ নেই। সমগ্রভাবে দেশের বুকে দমননীতির যে আক্রমণ চলেছে ও শহরে যে দারুণ দমননীতি চলেছে তাতে বিন্দুমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ নেই। অতএব আজ যদি বিপ্লবী শক্তিগুলিকে বাঁচতে হয় তবে তাদের আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করতেই হবে— যেখানে সম্ভব সেখানেই যাতে সেই অঞ্চলে পুলিসের

গুপ্ত ও প্রকাশ্য চর বিপ্লবীদের চেষ্টা পণ্ড করতে না পারে, যাতে জনগণের গণবাহিনী প্রকাশ্যে ও সংগ্রামের মধ্যে গড়ে তোলা যায়, যাতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির উচ্ছেদ করে, জমির স্বত্ব সমবেত ভাবে চাষীদের হাতে ন্যস্ত করা যায়, যাতে জনতা মুক্তির স্বাদ বুঝতে পারে। যাতে দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভয় ও সন্দেহ দূর করা যায় এবং তাদের ওপর শত্রুপক্ষের প্রভাব দূর করে গরিব চাষী ও মজুরদের স্থায়ী ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে দাঁড় করানো যায়। এছাড়া আজ কম্যুনিস্ট আন্দোলন বাচতে পারে না এবং এপথ অনুসরণ করতে হলে সশস্ত্র সংগ্রামের কথাটা পরের বিবেচ্য বলে ঠেলে না রেখে, এখনকার বিবেচ্য বিষয় করতে বাধ্য। আজকের পরিস্থিতিতে অস্ত্রের কথাটা না ভাবা বিপ্লবের কথা না ভাবারই সামিল।

তাছাড়া যদি আপনারা আপনাদের বর্তমান বক্তব্য চাষী সংঘর্ষের দাবিগুলিকে ভাল করে বুঝতেন তবে এই অত্যাচারের মুখে চাষীদের অস্ত্রের দাবিটাও লক্ষ্য করতেন এবং একমুখী মার খাওয়ার পরিবর্তে প্রত্যাঘাত করার বাসনাটাও লক্ষ্য করতেন ও বুঝতে পারতেন, জনতার কাছে অস্ত্রশস্ত্র আজ ভয়ের কারণ নয়—তারা তা চায়। এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে জনতা পুলিসের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়েছে কিন্তু আপনারা তা আবার পুলিসের হাতে ফিরিয়ে দিতে জনতাকে বাধ্য করেছেন।' (কাকদ্বীপে ও ২৪ পরগনায়)

কঃ প্রঃ—"আমাদের অতীতের সংস্কারবাদী দুর্নীতির জন্য যে ক্ষতি হয়েছে সেকথা আমরা মানি এবং আমরা সামরিক ভাবে যে অবস্থায় আছি ও আমাদের প্রস্তুতির অনেক বিষয় যে আজও বাকি আছে সে কথাও আমরা মানি। কিন্তু এই প্রস্তুতির অসম্পূর্ণতা আজ মজুর শ্রেণীর উপর নির্ভর করলেই বেশি তাড়াতাড়ি দূর হওয়া সম্ভব। আমরা আপনাদের নীতিকে সমর্থন করিনা, বরং ক্ষতিকর বলে মনে করি—কেননা আজকের পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র দাড়ায়নি ,. সুতরাং এখুনি অস্ত্রের কথা ভাবা হঠকারিতা মাত্র। আমরা রুশবিপ্লবের শিক্ষাকে আজও ভারতে প্রয়োগ করবার মতো যথেষ্ট কারণ দেখি এবং চীন বিপ্লবের কায়দা অনুসরণ করার কোনো যুক্তি পাই না।

বিঃ কঃ প্রঃ—"বেশ ভাল কথা, আপনারা আমাদের পথকে বিপথ বলে মেনে নিলেও নিজেদের পথটাকেই বা প্রশস্ত ও দ্রুতগতিশীল করছেন না কেন? আপনারা শ্রমিক শ্রেণীকে দিয়েই বা রাজনৈতিক সংগ্রাম ঘোষণা করাচ্ছেন না কেন? যে সাধারণ ধর্মঘটের উপর আপনাদের আস্থা তা সংগঠন করতে এত দেরি করছেন কেন?"

কঃ প্রঃ— 'আমরা চেষ্টা করছি। সাধারণ ধর্মঘটের পূর্বে অসংখ্য ধর্মঘটের দরকার—আমরা তাই করছি এবং একদিন যখন শ্রমিকেরা বিক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ধর্মঘটের সীমা ও সংকীর্ণতা নিজেরাই বুঝতে পারবে তখন তারা সাধারণ ধর্মঘটের জন্য সাড়া দিতে পারবে—কিন্তু এক্ষুনি তা পারবে না।"

বিঃ কঃ প্রঃ—"ভুল কথা। বিক্ষিপ্ত ধর্মঘটগুলি পরাজিত হবার ফলে -এবং পরাজিত হতে বাধ্য বলে -শ্রমিকদের মনোবল ও চেতনা বাড়বে না—ভেঙে যাবে মাত্র। বরং শ্রমিকদের স্থানীয় শক্তিগুলি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি ও ক্ষমতা বর্তমান থাকতে থাকতেই সাধারণ ধর্মঘটের মতো সাধারণ ডাক দেওয়া সম্ভব , অপরপক্ষে যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্গত ইউনিয়নগুলি ব্যর্থ সংগ্রামে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে তখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় শক্তিও শূন্যগর্ভ হতে বাধ্য এবং তখন আপনারা আর কিছুই করতে পারবেন না (বলা বাহুল্য এই সব আলোচনার প্রায় একবছর পরে ৯ই মার্চ রেল ধর্মঘটের সাথে সাধারণ ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত কম্যুনিস্ট পার্টি নিয়েছিল—কিন্তু তখন সেই এক বছর পরে

এদের সাংগঠনিক শক্তি প্রায় ছিল না বললেই চলে। যখন বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা ছাড়া সংঘশক্তি কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই তখন সেই ডাক যে একদম ব্যর্থ হয়ে যায় সে কথা এখানে স্মরণ করা দরকার)।

অতএব দেখা যাচ্ছে আপনারা প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার কায়দায় বিপ্লব করতেও রাজি নন অথবা রাশিয়ার বিপ্লবের সত্যিকার শিক্ষাও নেন নি। আবার আপনারা চীন বিপ্লবকেও কুণ্ঠিত মনে নিয়ে থাকেন ও সেই পথ ভারতের পথ নয় বলে ঘোষণা করেন, অর্থাৎ তেলেঙ্গানা'র প্রকৃত তাৎপর্যটাও আপনারা নিতে প্রস্তুত নন। তেলেঙ্গানার সংগ্রামটাকে একটা বিচ্ছিন্ন কৃষক সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো তাৎপর্য বা সর্বভারতীয় তাৎপর্য দিতে আপনারা প্রস্তুত নন—এবং তেলেঙ্গানার পথে বিপ্লবকে প্রসারিত করার যে একটা বাস্তব ইঙ্গিত, ঘটনার সংঘাতেই আজ যা সকলের চোখে ধরিয়ে দিয়েছে, সেই সত্যকে অস্বীকার করার জন্য আপনারা চোখ ফিরিয়ে আছেন। আসলে আপনারা রুশ-বিপ্লবকেও মানেন না এবং চীন বিপ্লবকেও মানেন না—অর্থাৎ বিপ্লব এখনও আপনাদের সচেতন কর্মপন্থা নয়—কংগ্রেসী ঢংয়ের আন্দোলন এবং উত্তেজনামূলক প্রচারই আপনাদের বর্তমান কর্মপন্থা। এই বিক্ষিপ্ত অন্ধ আন্দোলন পরাজিত হতে বাধ্য এবং তা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্ষমতাও বাড়িয়ে দিতে পারে। গণআন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চালিত করার কোনো দায়িত্ব আপনারা নিচ্ছেন না—এইটাই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের শেষ অভিযোগ।"

ক. প্রঃ —'আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে—আপনারা বড় ধৈর্যহীন পাতিবুর্জোয়াসুলভ অধীরতা দিয়ে বিপ্লব সম্ভব নয়—জনতার অভিজ্ঞতার সাথে সাথে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে—বাড়াবাড়ি অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার করে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মতো বিপ্লবকে পাকানো সম্ভব নয়'

বিঃ ক. প্রঃ —"আমরা অধৈর্য এরেবারেই নই—কিন্তু আমরা একথা মানি যে লোহাটা যখন গরমে লাল হয় তখনই তাতে ঘা দিতে হানতে হয়—ঠাণ্ডা হয়ে গেলে নয়। আজকের যুগে বিপ্লবের পরিস্থিতি হয়ত দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে কিন্তু সেই পরিস্থিতির মধ্যে যে গণচেতনার ওঠানামা চলবে তার উপযুক্ত ব্যবহার যদি আমরা না করি তবে ভারতবাসীর দুঃখ ও দুর্ভোগ দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। বিপ্লবী দলের চিন্তাধারায় কোনো জটিলতা আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত নই এবং বৈপ্লবিক আঘাত হানার তৎপরতা ও পরিস্থিতির যথাযোগ্য ব্যবহার করার ক্ষমতা যদি কম্যুনিস্টদের না থাকে তবে তাদের নেতৃত্ব করবার দাবি অন্যায় ও ক্ষতিকর বলে মনে করি। আর প্রতিবিপ্লবের চেয়ে বিপ্লবের গতি বেশি বেগমান করবার প্রয়োজনীয়তাকে যদি আপনারা অধীরতা বলে উড়িয়ে দিতে চান, তবে আমরা বলব আপনারা এখনও রণক্ষেত্রের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারেননি অর্থাৎ রণক্ষেত্রে নেমেও সতর্ক নন এবং যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নন। সর্বোপরি আমাদের অভিযোগ এই যে আপনারা জনসাধারণের অপ্রস্তুতির দোহাই দিয়ে নিজেদের অপ্রস্তুতির সাফাই গাইতে চান। প্রস্তুতি করবার পূর্বে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার প্রস্তুতি করা কাকে বলে—You must define the task before you take up the task চিন্তাজগতেও আপনাদের শিথিলতা ও আলস্য বর্তমান। আপনারা চিন্তা করতেও সাহস পান না—তাই অবস্থার দয়ার উপর নির্ভর করে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে স্রোতের গতি অবলোকন করার অভ্যাস তৈরি করেছেন এবং সেইজন্যই যারা ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চায়—যারা বর্তমানকে ভবিষ্যতের সোপান হিসাবে সজ্ঞানে সচেতন পদক্ষেপে চলতে চায়—তাদেরকে আপনারা কল্পনা-বিলাসী বলে ঠাট্টা করতে চান। আসলে বাস্তবতার নামে আপনাদের

অতীতের প্রতি অর্থাৎ সুবিধাবাদী দুর্নীতির প্রতি আপনাদের প্রচ্ছন্ন আকর্ষণকে আজও আপনারা জিইয়ে রাখতে চান। আপনারা প্রত্যেকটি ঘটনার পূর্ণ দায়িত্ব নেন না। ঘটনাগুলিকে ও জনতার সংগ্রামগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে থাকেন এবং সেগুলিকে সংযুক্ত করে সর্বাঙ্গীন সংগ্রামের পথে এগুতে প্রচুর দ্বিধা করে থাকেন, আর আমরা তা করতে চাই না বলে আমাদের একটা অতি প্রচলিত গাল—অতিবামপন্থী—এই প্রচার দিয়ে নিজেদের জড়তার সাফাই গান।”

কঃ প্রঃ – ‘যাক, এই আলোচনা আর চালিয়ে কোনো লাভ নেই—কেননা আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সংযুক্ত কর্মপন্থা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আর একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই—আন্তর্জাতিক শক্তি যোজনা সম্বন্ধে আপনাদের মতামতটা কি ? সোভিয়েট ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সম্বন্ধে আপনাদের মত ও সহানুভূতি কোনদিকে?”

বিঃ কঃ প্রঃ—“যাক, এতক্ষণে আপনারা আমাদের সম্বন্ধে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন তাঁর একটা প্রধান কারণের উল্লেখ করেছেন। পৃথিবী যে আজ বিপ্লবী শিবির ও প্রতি-বিপ্লবী শিবির—এই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, অর্থাৎ, একদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী-ধনতন্ত্রী-সামন্ততন্ত্রী ফ্যাসিবাদ এর সম্মিলিত শিবির গড়ে উঠেছে এবং অপরদিকে সোভিয়েটরাষ্ট্র, পূর্বইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, চীন দেশ ও পূর্ব এশিয়ার বিপ্লবী সংগ্রাম এবং প্রত্যেক দেশের গণআন্দোলন নিয়ে অপর এক বিপ্লবী শিবির তৈরি হয়েছে এই দুই শিবিরের মধ্যে আমাদের স্থান কোথায় এই কথাই জিজ্ঞাসা করছেন তো? অতি স্পষ্ট ভাষায়, কথায়, লেখায় ও কাজে আমরা বারে বারে জানিয়েছি যে আমরা বিপ্লবী শিবিরে একটি সংগ্রামশীল দল মাত্র। অপর শিবিরের সাথে আমাদের আপসহীন শত্রুতা ছাড়া কোনো সম্পর্ক নেই এবং কোনোকালে ভুলেও ছিল না। আমরা প্রতিক্রিয়ার শিবিরের বিরুদ্ধে আজই প্রথম সংগ্রামে নামছি না—যেমন আপনারা এই প্রথম নামছেন--আমরা বরাবর অ্যাংলো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দেশীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে এসেছি শ্রেণীশত্রু হিসারে, জাতীয়শত্রু হিসাবে, আন্তর্জাতিকশত্রু হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দেশীয় অনুচরদের চিনতে আমরা কখনো ভুল করিনি। আপনারা বরং বারে বারে এই ভুল করেছেন এবং শত্রু মিত্র চিনতে পারেননি। আমরা আপনাদের বহু পূর্বেই চীনা বিপ্লবকে সমর্থন করেছি এবং তাদের সংগ্রাম যে আমাদেরই সংগ্রাম ও তাদের পথ যে আমাদেরও পথ—তাদের জয় অথবা পরাজয় যে আমাদেরও জয় অথবা পরাজয়—একথা আপনাদের থেকেও আমরা বেশি স্পষ্ট করে স্বীকার করেছি। দয়া করে আমাদের কাগজপত্রগুলি যদি দেখেন তবেই বুঝতে পারবেন। আমরা যে ট্রটস্কীপন্থী নই একথাও আপনারা স্বীকার করবেন যদি আপনাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যনিষ্ঠা থাকে এবং ট্রটস্কীবাদ যে আজ কার্যত প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সাহায্য করে চলেছে সে কথাও আমরা এদেশীয় উদাহরণ থেকে জনতাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া আজ যে আপনারা একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের উপরই ভারতীয় বিপ্লবের ভাগ্য ন্যস্ত করতে চান, তাতেই যে ট্রটস্কীবাদের গন্ধ আছে সেটাও দেখিয়ে দিতে চাই—মুখে আপনারা যতই না কেন ট্রটস্কীবাদ উড়িয়ে দিতে চান। আপনারা নিজেদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হোন--এবং লক্ষ্য রাখুন ভুল পথ ও ভুল স্বপ্ন অনুসরণ করার জন্য ভারতীয় জনগণকে পরাস্ত করে না ফেলেন।

কিন্তু একথাও আমরা সাহসের সঙ্গে স্বীকার করি যে যদিও আমরা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সৈনিক, তথাপি এই শিবিরের মধ্যে মত ও পথ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে এবং তা স্বাভাবিক। এই সম্মিলিত শিবিরের বাস্তব নেতৃত্ব আজ স্টালিনপন্থী--কিন্তু স্টালিনপন্থা সর্বদা স্পষ্ট নয় এবং এক রকমও নয় একথা ইতিহাস থেকে প্রমাণ করা খুব

সহজ। আমরা মনে করি না বিশ্ববিপ্লবের নেতৃত্ব আভ্যন্তরিক সঙ্কট থেকে চিরকালের মতো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ববং মনে করি বিশ্ববিপ্লবেব প্রসাবের সাথে সাথে বিশ্বনেতৃত্বেরও বিস্তর প্রসাব বাঞ্ছনীয়। বিশ্বনেতৃত্বে আজও সঙ্কীর্ণতা ও অস্পষ্টতা আছে বলেই বিশ্ববিপ্লব দ্রুত অগ্রগামী হতে এতটা বাধা পাচ্ছে—যাকে আভ্যন্তরিক বাধা বলা যায়—যাকে অতীতের প্রতি অকারণ মোহ বলা যায়—যাকে মার্কসিজমকে একটা Dogmaয় পরিণত করার চেষ্টা বলা যায়। যদি বিশ্ববিপ্লবের নীতি মার্কস-এঙ্গেল্স্-লেনিন-স্টালিনেব অভিজ্ঞতাতেই শেষ হয়ে যেত, তবে মাও-সে-তুং-এর অভিজ্ঞতা ও চীন বিপ্লবের তাৎপর্যের কোনো প্রকাশ হতো না। অতএব সর্বক্ষেত্রে রুশ-বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র সারবস্তু বলে শেষ করার ইচ্ছা আমাদের নেই। যদিও রুশবিপ্লব ইতিহাসের পাতায সবচেয়ে প্রকাণ্ড ঘটনা, তাই বলে চীনবিপ্লবের অভিজ্ঞতাও তুচ্ছ ঘটনা নয়, এবং হযত আবও নতুন অভিজ্ঞতা, আরও অনেক নতুন পথ, বিশ্ববিপ্লবের শেষ স্তরে দেখবার জন্য আমাদেব প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। মার্কসিজমের বইগুলি আমরা সমাপ্ত পুস্তক হিসাবে দেখিনা—কাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক হিসাবেই একটা অস্ত্র বলে জানি এবং তার প্রসারের পথ শেষ হয়ে যায়নি। আমরা অনেক বিষয়ে স্টালিন নেতৃত্বের সাথে একমত হতে পারি না—যেমন পারি না আপনাদের মধ্যে সেই নেতৃত্বের বাস্তব প্রকাশের সঙ্গে একমত হতে। এইটাই বোধ হয় আপনাদেব চোখে আমাদের ভয়ানক অপরাধ ! কিন্তু এই অপরাধ থেকে আমরা এক্ষুনি মুক্ত হবার কোনো কারণ দেখিনা—বিশেষ কবে যখন আপনাদেব কার্যকলাপ লক্ষ্য করি। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শিবিরে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক এবং হয়ত তা আবও স্পষ্ট ও তীব্র হতে পাবে। শত্রু শিবিবেব বিরুদ্ধে আরও সার্থকভাবে লড়াই করবার কায়দা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠিত কববার উদ্দেশ্যেই আমরা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি—কিন্তু আমরা এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে কোনো ক্রমেই নিজেদের শিবিরকে দুর্বল করবার কাজে ব্যবহাব কবতে দিতে পারিনা। নিজেদের ভিতরের গলদ উচ্ছেদ করে যেমন প্রত্যেক দল শক্তিমান হয—যেমন আপনারা নিজেদেব দলের ভিতরকার দুর্বলতা অন্তর্দ্বন্দ্বের সাহায্যে দূর করে দিতে চেষ্টিত—যেমন আমরা নিজেদের দল থেকে সুবিধাবাদী লক্ষণগুলি নির্মম হস্তে ছেঁটে দূর কবতে সর্বদা সজাগ— তেমনি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শিবিরের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সুবিধাবাদকে দূব করবাব জন্য প্রত্যেক দেশের বিপ্লবীদের সজাগ থাকা দবকার। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিব নাম সোভিয়েট বিবোধিতা নয় অথবা স্টালিনকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রও নয়—বা আপনাদের ক্ষতি করাব উদ্দেশ্যও নয , বরং আপনাদের শক্তিমান ও ঠিক পথে চালিত করার মধ্যেই আমাদের সর্বোত্তম স্বার্থ নিহিত আছে। আপনাদেব ধ্বংস অথবা দুর্বল করার মধ্যে নয়।

অতএব আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শিবিব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার। আন্তর্জাতিক শিবিরের নেতাদেরই এখন উচিত আমাদের সম্বন্ধে তাঁদেব ধারণাটা কি তা স্পষ্ট করা—পরিষ্কার করা। দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন কবার ভিতর অথবা ধ্বংস হতে দেবাব ভিতর আপনাদের এবং আপনাদের মারফত বর্তমান স্টালিন নেতৃত্বের—কোনো স্বার্থ থাকতে পাবে না —বরং একটি পরম বিশ্বাসযোগ্য সৈন্যদলকে শত্রু বলে মনে করার ভিতর অত্যন্ত হাস্যকর ও লজ্জাকর মনোভাব প্রকাশ পায় মাত্র।"

কঃ প্রঃ—(নীরব ও ইতস্তত ভাব)

বিঃ কঃ প্রঃ—"আপনাদের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা শেষ করে দেবার পূর্বে আমরা আপনাদের বিশেষ করে ভেবে দেখতে বলছি—সহযোগিতার জন্য আমাদের এই আহ্বানকে

অস্বীকার করার পূর্বে প্রকৃত সংগ্রামে কোনো ক্ষেত্রে—সর্ব ক্ষেত্রে না হোক- কোনো প্রকার সহযোগিতার সূত্র আছে কি না।

আমরা একটা নতুন প্রস্তাব আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি—ভেবে দেখুন সেটা গ্রহণ করতে পারেন কি না।

আপনারা মনে করেন শহরেই আপনাদের প্রধান জোর দিতে হবে এবং মজুর শ্রেণীকেই নামাতে হবে। বেশ তাই করুন এবং সেখানে আমাদের যতটা শক্তি আছে তা দিয়ে আপনাদের সাহায্য করব— যদি সাধারণ ধর্মঘট ডাকতে চান তাতে আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাবেন—যদি রাস্তায় ব্যারিকেড লড়াই করতে চান তাতেও আমাদের সমর্থন পাবেন একথা জেনে রাখুন—যদিও আপনারা তা করবেন কি না বা করতে পারবেন কি না সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু আপনারা তো গ্রামদেশে চাষীদের লড়াইটাও করছেন এবং তেলেঙ্গানাকেও সমর্থন করছেন। সর্বত্র তেলেঙ্গানার মতো সশস্ত্র-সংগ্রাম করবার শক্তি ও সংগঠন নেই বলেই হয়ত দেশে আরও তেলেঙ্গানার সৃষ্টি করতে সাহস পাচ্ছেন না। যদি আমাদের ও আপনাদের মিলিত চাষী সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটা যুক্ত পরিকল্পনা নেওয়া যায়—আঞ্চলিক কর্মপন্থা হিসাবেও—তাতে আপনাদের কি আপত্তি থাকতে পারে? যদি মনে করেন যে আপনাদের অস্ত্র শস্ত্র নেই বা সেই জাতীয় সংগঠন নেই—অর্থাৎ সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে তাদের ঘাঁটিতে গিয়ে আক্রমণ করবার অস্ত্র-শস্ত্রজনিত আয়োজন নেই—বেশ, আপনারা যেভাবে নিচে থেকে জনতার সংঘর্ষ ওঠাচ্ছেন সেই ভাবেই ওঠান আমরা নির্দিষ্ট অঞ্চলবিশেষে আমাদের শক্তি দিয়ে থানা ও স্থানীয় শহরের সৈন্য ও পুলিশদের নিরস্ত্র করবার ভার নিই—এবং আপনারা আপনাদের চাষীজনতাকে নিয়ে তা সমর্থন করার ও গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসুন, এইভাবে আমাদের ও আপনাদের কাজের ভাগ করা হোক। চাষীদের উপর অত্যাচার ও একতরফা মারের সূত্র যেখান থেকে আসে সেখানটা চূর্ণ করে দিতে আমরা কোথাও কোথাও প্রস্তুত আছি, বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে আমাদের কাজ আছে এবং আপনাদের কাজও সেখানে আছে। আপনারা আমাদের কাজকে সমর্থন করবেন কি?— না বলবেন যারা থানা দখল করেছে, যারা শহর দখল করেছে এবং অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নিয়েছে তারা আপনাদের বন্ধু নয়—তারা ট্রট্স্কীপন্থী দালাল ইত্যাদি। তাহলে ব্যাপারটা কি অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ায় বলুন তো? আমাদের তৈরি জনতাকে নিয়ে আমরা যে ক্ষমতা দখল করব তা তো আমাদের দলীয় সম্পত্তি নয়—তা হবে জনতার সম্পত্তি—এই সত্যকে তখন কি আপনারা স্বীকার করবেন? না ভিতরে ভিতরে আমাদের পরাজয় যাতে ঘটে তার জন্য চেষ্টা করবেন? অথবা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে প্রকারান্তরে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করবেন মাত্র? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এর জবাব আমরা আপনাদের কাছে দলগতভাবে দাবি করছি—আর দরকার হলে আমরা প্রকাশ্যে এ প্রশ্ন উত্থাপন করব এবং জনতার রায় নেব—এর জবাব আপনাদের এড়িয়ে যেতে দেব না।"

কঃ প্রঃ –(ইতস্তত ভাব) "এধরনের সংগ্রাম আমরা আজও অসময়োচিত এবং হানিকর হবে বলে মনে করি। তথাপি যদি বাস্তবে এইরূপ পরিস্থিতি ঘটে তবে আমাদের মনোভাব কি হবে তা পার্টির কাছে উপস্থিত করব। আপনারা লিখিতভাবে আমাদের দলের কাছে এ সম্বন্ধে একটা পত্র দিন –আমরা তা কমিটিতে আলোচনা করে তার সিদ্ধান্ত যথা-সময়ে জানাব। তবে একথা নিশ্চিত যে আপনাদের সঙ্গে এইরূপ কর্মবিভাগ করে কোনো যুক্ত কর্মপন্থা আমরা নিতে পারি না—কেননা সংগ্রামের সব ক্ষেত্রেই আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে—এতটুকু নিজেদের

হাতে রেখে বাকিটা অন্যদের দিয়ে করাবার নীতি আমরা গ্রহণ করতে পারি না। তথাপি বাস্তব ক্ষেত্রে যদি আপনারা এরকম কোনো ঘটনা ঘটিয়ে দেন তবে আমাদের মনোভাব কি হবে তা আমরা কমিটিতে বিচার করে দেখব —এক্ষুনি তার জবাব দিতে পারব না।"

বি. কঃ প্রঃ—"আচ্ছা তাই সই। আমরা লিখিতভাবে আপনাদের দলের ঊর্ধ্বতন কমিটির কাছে আবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কথা বলে দিচ্ছি, আপনারা আসেন আর নাই আসেন আমরা আমাদের পথে এগোবই—তবে তার পূর্বে আপনাদের ডাক দেওয়া এবং হুঁশিয়ার করে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করি। আমরা যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ আঘাত হানি তাতে হয়ত আপনাদের পরিকল্পনা ব্যাহত হতে পারে এবং শত্রুপক্ষ আপনাদের উপর অত্যধিক চাপ দিতে পারে। সেইজন্য সহযাত্রী হিসাবে আপনাদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া একটা বৈপ্লবিক কর্তব্য বলে মনে করি – যাতে আপনারা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে না পড়েন। অতএব আমরা একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র আঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, যাতে আপনাদের সহযোগিতা পেলে, শতগুণ সার্থক করা সম্ভব হতো। কিন্তু তা যখন হলো না তখন আমাদের নীতিকে আপনাদের মুখাপেক্ষী করে আমরা সব কাজে বিরত থাকতে পারি না—আমরা একক সংগ্রামের দুর্গম পথেই যাত্রা করব—কিন্তু হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, আপনারা অবহিত থাকুন। সুতরাং আপনাদের কাছে আমাদের যে লিখিত আবেদন যাচ্ছে তার জবাব যেন যথাসময়ে ও যথাশীঘ্র দেওয়া হয়—যাতে আমাদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে অকারণ দ্বিধার ক্ষেত্র না থাকে এবং আমাদের সময় বৃথা অপচয় না হয়।"

এইভাবে আমাদের আলোচনা শেষ হয়—এবং আমরা লিখিত আবেদন ওদের দলের সাধারণ সম্পাদকের নামে পাঠাই। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে যায় - কোনো উত্তর নেই। ওদের সেন্ট্রাল কমিটির বৈঠক হয়নি, পলিটব্যুরো বসেনি, যথাসময়ে চিঠি যথাস্থানে পৌঁছায়নি ইত্যাদি নানা ছুতোয় আমাদের পত্রের জবাব পেতে বিলম্ব হচ্ছে জানায়। প্রায়ই খোঁজ করি পত্রের উত্তরের জন্য—কিন্তু আজও তার কোনো উত্তর মেলেনি এবং আজ ওদের দলের পক্ষ থেকে উত্তর দেবার মতো কেউ নেইও বোধ হয়।

এইভাবে আশায়, প্রত্যাশায়, আলোচনায়, কাজে ও অকাজে বছরটা প্রায় কেটে গেল। সরকারের সঙ্গে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি দুর্বল হয়ে যেতে লাগল। আমাদের দলের ওপর আঘাত সমানভাবেই পড়তে লাগল। শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসগুলি প্রায় বন্ধ হতে লাগল এবং কম্যুনিস্ট পরিচালিত ইউনিয়ন আর বিশেষ কিছু রইল না। সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন হিসাবে দমদমের জেসপ কারখানায় আমাদের ইউনিয়নটি অত্যন্ত শক্তিমান ছিল এবং তার নেতৃত্বও খুব সচেতন ছিল যার ফলে কর্তৃপক্ষ প্ররোচনা দিয়েও, ইউনিয়নকে অপ্রস্তুত লড়াইয়ে টেনে নামাতে পারছিল না। তাছাড়া উক্ত কারখানায় আমরা পঞ্চায়েত গড়েছিলাম এবং প্রত্যেক শপে তার শাখা জোর কার্যকরী ছিল- এমন কি ইউনিয়ন সংগঠনের চেয়ে পঞ্চায়েত সংগঠন আরও বেশি প্রিয় ও কার্যকরী ছিল। দমদম অঞ্চলে অন্যান্য ছোট বড় কারখানা যা আছে তার ভিতরেও আমাদের কাজ ছিল—তবে জেসপ কারখানার মতো এতটা শক্তি আর কোথাও সংগঠিত ছিল না। আগামী কোনো একটা সংগ্রামে এই কারখানা ও এই অঞ্চলকে ব্যবহার করবার কথা আমাদের পরিকল্পনায় বর্তমান ছিল - অনেকদিন থেকেই।

ধান তোলার খন্দে ধানের স্বত্ব নিয়ে খেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব কৃষকদের যে স্বাভাবিক আন্দোলন,২৪ পরগনার গ্রামে গ্রামে এমনিতেই আছে সেই অসন্তুষ্টি ও দাবির উপর ভিত্তি করে

যে আন্দোলন বৈপ্লবিক পর্যায়ে ওঠা সম্ভব, তার দিকে আমরা পূর থেকে নজর দিই এবং বিশেষ করে বসিরহাট সাবডিভিসনের অন্তর্গত এলাকায় কৃষকদের মধ্যে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির কাজ চলতে থাকে গণবাহিনী গঠন ও শিক্ষার কাজ চলতে থাকে।

হাওড়া ও আগরপাড়া প্রভৃতি শ্রমিক অঞ্চলে এবং দক্ষিণে টালিগঞ্জ ও বেহালা অঞ্চলে যে সব কাজ আমাদের আছে—সেগুলিকেও তৎপর ও জোরদার করতে থাকি। বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে কোনো সাক্ষাৎ সংগ্রামের পক্ষে শ্রমিক ভিত্তির কিছু কিছু সামরিক উপাদান আমরা এইভাবে লক্ষ্য করতে থাকি এবং এগুলিকে নিয়ে কি জাতীয় সামগ্রির সংগ্রাম ওঠানো যায় ও সেই সংগ্রাম কেমন করে চাষীদের মধ্যে ব্যাপ্ত করা যায় এবং শেষ পর্যন্ত চাষী অঞ্চলে আর লিক ক্ষমতা দখল করে বৃহত্তর লড়াই চালানো যায় তা আমাদের বিবেচনার ও প্রস্তুতির বাস্তব বিষয় হয়ে দাড়ায়।

বাংলার অন্যান্য জেলায় আমাদের প্রস্তুতি আশানুরূপ দানা বেঁধে উঠল না বিহারের কয়লা খনি অঞ্চলে আমাদের সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠল না—আসামের পরিস্থিতি যথেষ্ট আশাপ্রদ হয়ে উঠল না—এ সবই আমরা লক্ষ্য করছি—আর লক্ষ্য করছি কম্যুনিস্ট পার্টি সত্যিকার কোনো বৈপ্লবিক পথে আসছে না বরং বৈপ্লবিক পরিস্থিতিটাকে অন্ধ আকুলিবিকুলি নেতৃত্ব দিয়ে পণ্ড করে দিচ্ছে। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে জেসপ কারখানার কর্তৃপক্ষ মজুরদের ওপর আক্রমণ চালাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—ঐ ইউনিয়নকে ভেঙে দিয়ে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন দাঁড় করাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ছাটাই করতে ও তলবের উপর হাত দিতে অগ্রসর হচ্ছে। যেমন কম্যুনিস্টদের চালিত শ্রমিকেরা ধর্মঘট করতে এগিয়ে আসে এবং তারপর লক আউট ও পুলিশের মারে সে ধর্মঘট শেষ হয়—জেসপ কোম্পানির কর্তারাও মনে করেছিল যে সেখানকার শ্রমিকদেরও ওরা ধর্মঘট করতে প্ররোচনা দেবে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের মার দিয়ে তা ঠাণ্ডা করে দেবে। কিন্তু অতীতে ইউনিয়নের দৃঢ়তা ও পটুতা তারা লক্ষ্য করেছে তাই হঠাৎ বোকার মতো অগ্রসর হতে সাহস করেনি কংগ্রেসী মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জী ভূপতি মজুমদার নেতাকে কোম্পানিতে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করা হতো এবং শ্রমিকদের বিপথগামী এবং কংগ্রেসগামী করাবার জন্য তাদের মুখ দিয়ে প্রায়ই বাণী শোনাত। কিন্তু এইসব মন্ত্রী ও ম্যানেজারেরা বুঝতে পারত যে জেসপের ইউনিয়নকে হাত করা বা জব্দ করার কাজটা খুব সহজ নয়। অন্যান্য কারখানার মজুরদের কাছেও জেসপের ইউনিয়ন একটা আদর্শ ইউনিয়ন হিসাবে পরিচিত ছিল এবং তারা জেসপের দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকত। সংঘর্ষ ও অকাল সংঘাত এড়ানোর জন্য যাবতীয় আইনসঙ্গত উপায় আমরা অবলম্বন করেছিলাম—এবং শ্রমিকদের সংযত ও সংগঠিত থাকবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনে বাছাই করা লোকেদের নিয়ে গোপন সংগ্রামী কমিটি গড়া ও তার শিক্ষা দেওয়া হতো – যাতে জঙ্গী লড়াইয়ের প্রয়োজনে এই সব শ্রমিক নওজোয়ান সত্যিকার লড়াই করতে পারে। মোটকথা কারখানার ভিতরে ও আশেপাশে জোর প্রস্তুতি ও শিক্ষার কাজ চলতে থাকে—এবং শ্রমিকেরা সাধারণভাবে বুঝতে পারে এবারে সরকার ও মালিকের সাথে একটা বোঝাপড়ার সংগ্রাম বা রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়া উপায় নেই।

প্রবল দমননীতির মুখে ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন ভারতে গণসংগ্রাম যে সশস্ত্র না হয়ে পারে না—এবং সশস্ত্র সংগ্রামই যে সংগ্রামের একমাত্র পথ—এই সত্য আমরা প্রথম থেকেই মেনে নিই। তার জন্য জঙ্গী কর্মীদের গণবাহিনীর শিক্ষা ও সামরিক শিক্ষাটা একটা প্রধান কাজ বলে মনে করি। আজ এতদিন পরে আমরা চীনের শ্রমিক নেতা সাও-চির পিকিংয়ে আন্তর্জাতিক

সম্মেসনে একই কথা শুনতে পাই যে আজকেব দিনে এশিযাব অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশ সমূহে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো পথ আজ জনসাধাবণেব জন্য খোলা নেই এবং তাই আজ একথা কম্যুনিস্ট ভাযাদেব কাছে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হযেছে—অথচ সেদিন ওবা কি বিবোধিতাই না কবেছে- অস্ত্রেব কথা তুললে চমকে উঠেছে। যাহোক, আমবা এ ভুল কবিনি —আব যত ভুলই কবে থাকি না কেন। আগামী সংগ্রাম যে কোনোরূপে দেখা দিক না কেন, তাতে অস্ত্রশস্ত্রেব দবকাব হবে এবং দবকাব হবে বৈপ্লবিক সামবিক নেতৃত্ব ও গণবাহিনী— এই সত্যটা বুঝতে আমবা কখনো ভুল কবিনি। তা যথাসম্ভব অস্ত্রেব শিক্ষা ও সামবিক শিক্ষাব ওপব জোব দিই। আমাদেব প্রস্তুতি কখনই সম্পূর্ণ হযনি—বহু দিকে নানা ত্রুটি লক্ষিত হচ্ছিল—কিন্তু আবও কিছু সময ও সুবিধা পেলে আমাদেব শক্তি পূর্ণ হবে অর্থাৎ কোনো একটা কিছু কববাব জন্য নিম্নতম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে এই মনে কবে আমাদেব আযোজন চালিযে যাচ্ছিলাম। আমবা যে খুব ব্যস্ত হযে পড়েছিলাম তা নয। আমাদেব শক্তি ও যোগ্যতা অনুযাযী প্রস্তুতিব কাজ বীতিমত দ্রুতগতিতে এগিযে চলেছে—বহুস্থানে বহু জঙ্গীকর্মী পেতে শুব কবেছি এবং আমবা মনে কবছি একটু সময পেলে আমাদেব শক্তি অমোঘ হযে উঠবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ইউনিযন (জেসপ ইউনিযন)-এব নেতাবা খবব দেন যে কোম্পানিব সঙ্গে সংঘর্ষটা আব বেশিদিন এড়ানো সম্ভব হবে না—ওবা ভিতবে ছাঁটাইযেব লিস্ট তৈবি কবে বেখেছে ওদেব ম্যানেজমেণ্ট কমিটিব ঘনঘন বৈঠক চলেছে—সবকাবেব সাথে বোঝাপড়া কবা হযে গেছে—এবং এখন ওবা যে কোনো দিন ছাঁটাইযেব নোটিশ ও ওদেব আক্রমণ শুরু কবে দিতে পাবে। অতএব আমাদেব তখন তাড়াহুড়ো পড়ে গেল—যতশীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হতে হবে।

আমাদেব আঘাতেব পবিকল্পনাটা যতদূব সম্ভব ব্যাপক ও নিখুঁত কবাব চেষ্টা হলো। বেলঘোবিযা আমর্ড পুলিশেব ব্যাবাক লুট কবতে হবে- সেখানে সহস্রাধিক বাইফেল ও প্রচুব গুলি বাবদ মিলবে। দমদম নাগেববাজাব ব্লক কবতে হবে— ওখানকাব ফাঁড়িটা তুড়ে দিযে যেতে হবে এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জেসপেব কাবখানাব দুযাবে উপস্থিত কবতে হবে—যাতে অন্তত এক হাজাব শ্রমিককে সশস্ত্র কবা যায। কাবখানায শ্রমিকেব সংখ্যা প্রায ৪০০০। ঐ স্থানে অবস্থিত অ্যামুনিশান ফ্যাক্টবি সশস্ত্র গার্ডকে নিবস্ত্র কবতে হবে এবং সেখানে যা অস্ত্রশস্ত্র পাওযা যায তা নিতে হবে। দমদম জেল ভেঙে দিতে হবে এবং সমস্ত বাজনৈতিক ও সাধাবণ বন্দীদেব মুক্ত কবতে হবে— আব যাবা ইচ্ছুক তাদেবকেও এই সংগ্রামে ডেকে নিতে হবে। দমদম থানা লুঠ কবতে হবে এবং পুড়িযে দিতে হবে। দমদম বিমানঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কবে দিতে হবে। একাজেব জন্য যে প্রচুব লোকবলেব দবকাব তা জেসপ কাবখানা থেকে পাওযা যাবে এবং শ্রমিকেবা যে কিছুতেই অকৃতকার্য হবে না সে বিষযে ইউনিযনেব নেতাবা ও জঙ্গী কর্মীবা খুব নিশ্চিত—কেননা বিভিন্ন সংগ্রামেব মধ্যে তাদেব দেখা গিযেছে ও তাদেব মত পাওযা গেছে যে তাবা সংগ্রাম চায। শ্রমিকদেব এক সাধাবণ সভায প্রবল উত্তেজনাব মধ্যে শ্রমিকদেব প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য কবা হয এবং তাবা সশস্ত্র সংগ্রামে যে পেছপাও হবে না এমন আশা কবাব কাবণ দেখা যায। সেই মিটিং-এব মনোভাব সবকাবি দালালবাও লক্ষ্য কবে এবং কতকটা ঘাবড়ে যায। কোম্পানিব অনেক লবি আছে—তাব প্রত্যেকটি ব্যবহাব কবতে হবে দ্রুতগতিতে লোকজন এখানে সেখানে প্রেবণেব কাজে—বিশেষ কবে দমদম বিমান ঘাঁটিতে প্রত্যেকটি জাহাজ ও বাড়িঘব ভেঙে ফেলবাব জন্য যে প্রচুব লোকজনেব দবকাব তা দ্রুত পৌঁছে দেবাব ব্যবস্থা কবতে হবে গাড়ি ও লবিব সাহায্যে। কাবখানায যে বোডবোলাব তৈবি

হয় সেগুলি চালিয়ে এনে রাস্তার মোড় আটক করে দিতে হবে –যাতে কলকাতা থেকে পুলিশ ও সৈন্য সহসা এসে পড়তে না পারে। সমবেত বিদ্রোহী জনতাকে তখন পার্টির নেতৃত্বে বসিরহাটের দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং বসিরহাট শহর দখল করে বসে সমস্ত মহকুমায় ছড়িয়ে পড়তে হবে ও চাষীদের বিদ্রোহকে মুক্তি দিতে হবে—সমস্ত মহকুমাকে নিয়ে আঞ্চলিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং মুক্তিফৌজ গঠন করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বারাসত থেকে বারাকপুর যাবার যে রাস্তা তা বন্ধ করে রাখতে হবে –যাতে বারাকপুরে অবস্থিত সৈন্যরা পেছন থেকে আমাদের বাহিনীকে আক্রমণ করতে না পারে এবং এতদুদ্দেশ্যে বারাসত শহর সঙ্গে সঙ্গে দখল করে রাখতে হবে। পথে যাবার মুখে যে সব থানা ও ফাঁড়ি পড়বে তা লুঠ করে যেতে হবে। বসিরহাট শহরে আগে থেকে চাষীদের শোভাযাত্রা এনে লোকবল মজুত রাখতে হবে—যাতে তারা শহর দখলের কাজে সাহায্য করতে পারে এবং পরে আমাদের বাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে পথ দেখাতে ও শত্রুদের ঘাঁটি দেখিয়ে দিতে পারে।

যতটা সম্ভব ঔষধপত্র নিয়ে একটা মেডিক্যাল কোর গঠন করা হয় এবং এই সংগ্রামে যারা যোগ দেবে তাদের রোগ প্রতিষেধক ইনোকুলেশনের কাজ অনেক দিন আগে থেকেই শুরু করা হয়। একটা বেতার বার্তা প্রেরণের ট্রান্সমিটার নেওয়া হবে এবং একটা রিসিভার- সঙ্গে লাউড স্পীকার যাবে। সাইক্লোস্টাইলের যাবতীয় জিনিস আগে থেকে গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয়—কিছু অস্ত্রশস্ত্রও যায়। গ্রামদেশে কোন কোন অঞ্চলে প্রধান শিবিরগুলি বসবে তার একটা মোটামুটি খসড়াও করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে গিয়ে প্রাথমিক কাজগুলি কি হবে তাও মোটামুটি ঠিক করা হয়। যারা বসিরহাট পর্যন্ত যাবে এবং বরাবরের জন্য লড়াই করতে যাবে তাদের আবশ্যকীয় কাপড় জামা ইত্যাদি নিয়ে যাবার কথা হয়।

এই পরিকল্পনার একটা দুর্বলতা ছিল এই যে—শহরের মজুরের সবাই শহর ছেড়ে গ্রামে থাকতে পারে না এবং ঘরবাড়ির সাথে তাদের সম্বন্ধ বজায় রাখার একটা অসুবিধাও থাকে। তবে সবাইকেই গ্রামাঞ্চলে রাখবার মতো আশা কখনই আমরা করিনি- কতক লোক থাকবে ও লড়াই করবে , এবং লোক থাকতে পারে—বিশেষ করে যারা অগ্রগামী জঙ্গী মজুর –তার একটা মোটামুটি ধারণা ভিতরে বুঝে নেবার চেষ্টা হয়।

এই প্রকার সংগ্রামের নীতিগত তাৎপর্য কি কি?

প্রথমত—আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের সংযোজনা করা এবং মুক্তি ফৌজের সাহায্যে সংগ্রাম চালু করা।

দ্বিতীয়ত—শ্রমিক আন্দোলনের সাথে কৃষক আন্দোলনকে যুক্ত করে সত্যিকার বৈপ্লবিক সহযোগিতা স্থাপন করা।

তৃতীয়ত—শহর অঞ্চলের শত্রু ঘাঁটি কতকটা ধ্বংস করে দিয়ে আধুনিক যন্ত্রচালিত সংগ্রামের সুযোগ যতটা সম্ভব গ্রহণ করা এবং প্রাথমিক এই আঘাতের ঘায়ে শত্রুকে কতকটা বিব্রত করে দিয়ে নিজেদের শক্তিকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে নেবার সময় ও সুযোগ সংগ্রহ করা।

চতুর্থত---প্রথম ধাক্কাতেই বেশ কিছুটা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে নেওয়া।

পঞ্চমত--অন্ধ ও বিক্ষিপ্ত সংগ্রামের পর্যায় শেষ করে সত্যিকার পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট পথে সামগ্রিক সংগ্রাম প্রবর্তন করা। অথচ এই পরিকল্পিত সংগ্রাম মজুর ও চাষীদের চালু সংগ্রামের উপর ভিত্তি করেই দাঁড় করাতে হবে—সংগ্রামহীন জনতার ঘাড়ে উপর থেকে চাপানো সংগ্রাম নয়। মজুর ও চাষীদের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হবে—যাতে প্রত্যেক খণ্ড সংগ্রাম ও প্রত্যেকটি সংগ্রামী লোকের ক্ষোভ এই

সমগ্র সংগ্রামেব মধ্যে আশ্রয় পায় এবং উন্নত ধবনের লডাইয়ে সার্থকতার পথে এগোতে পারে।

ষষ্ঠত—মজুরদেব দিয়ে একটি অমোঘ আঘাত সংঘটিত করে সমগ্র আন্দোলনটার উপব শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাবটাকে কার্যকরী করা।

সপ্তমত—সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের ধূমায়মান সংগ্রামটাকে জোরদার করে দেওয়া এবং আক্রমণকারী গণবাহিনীর সাহায্যে থানা, স্থানীয় শহর ও বন্দরগুলি কব্জা করার দরুন সমগ্র চাষী আন্দোলনের দ্বিধা দূর করে দেওয়া। যে অঞ্চলে আমরা শত্রুর সরকারি শক্তিকে চূর্ণ করতে পারব সেই অঞ্চলস্থিত সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের উপর আমাদের কৃষক নীতি ও কৃষি বিপ্লবের প্রোগ্রাম চালু করতে পারব এবং দ্বিধা ও সংশয়াকীর্ণ মধ্যবিত্ত কৃষক ও মধ্যবিত্ত সাধারণের দ্বিধা ও সংশয় দূব করতে পারব—ধনীদের প্রভাব থেকে তাদের সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়ে—কেননা ধনীদের সাথে তাদের যোগাযোগ ধনীকূলের প্রভাব অবসানের সাথে সাথে ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। আমরা যে মধ্যবিত্তদের শত্রু নই তা তারা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে এবং ধনী ও জমিদারদেব চাতুরী খাটাবার কোনো অবসর থাকবে না—ধনী বিমুক্ত মুক্ত-অঞ্চলে।

অষ্টমত— যথাসম্ভব অতর্কিত আক্রমণেব দ্বাবা প্রাথমিক জয় অর্জন করে নেওয়া—যাতে শত্রুব সেই বিধ্বস্ত ও বিভ্রান্ত অবস্থাব ও সময়ের সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তিকে গুছিয়ে নিতে পারি, ভুল ত্রুটি সামলে নিতে অবকাশ পাই এবং প্রস্তুতির অপূর্ণতা (যা কিছু না কিছু থাকতে বাধ্য) পূর্ণ করে নিতে পাবি। কেননা শত্রুব প্রতি-আক্রমণ রুখবার প্রয়োজনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

বলা বাহুল্য আমাদেব পার্টির সব শক্তিই এই সংগ্রামে নিযুক্ত হবে না—একটা বৃহৎ অংশ এই সংগ্রামে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকবে না—কেননা অমুক্ত অঞ্চলের জন্য অনেক কাজ থাকবে তখনও—মুক্ত-অঞ্চলকে শক্তিমান করার জন্য, মুক্ত-অঞ্চলের মুক্তিবাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং অমুক্ত-অঞ্চলে সংগ্রামেব জোর বাড়িয়ে ও অন্যান্য নানা উপায়ে মুক্ত-অঞ্চলের কাজ ও অগ্রগতি সহজ করবার জন্য।

মোটামুটিভাবে এই ছিল পরিকল্পনা। আজ এই সব কথা সমস্তই প্রায় সবকারেব জানা হয়ে গিয়েছে—জনসাধাবণই শুধু জানে না। অতএব সমগ্র পরিকল্পনা ও তাব বাস্তব ব্যবহার সম্বন্ধে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য আজ জনতার কাছে উপস্থিত করা দরকার মনে করেই আমরা এ সব লিখতে বসেছি। সবকারের কাছে সব তথ্য কেন পৌঁছে গেছে—এ অভিযোগ করে হয়ত আমাদেব দলের সংগঠন, ডিসিপ্লিন ইত্যাদির উপর কটাক্ষপাত করতে পারেন—কিন্তু একথা স্মবণ রাখা দরকাব যে আমরা যা করতে গিয়েছিলাম সেটা একটা ষড়যন্ত্র নয—একটা বিরাট ও উন্মুক্ত বিদ্রোহ ও বিপ্লব, যেখানে বহু জনতার সাক্ষাৎ যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং এ সব সংবাদ ঘটনাব পরে সবকারের নিকট পৌঁছে দেওযা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া আমাদের পরিকল্পনা যদি পূর্ণভাবে কার্যকরী হতো তাহলে গোপন করবার কিছুই থাকত না এবং গোপন কববাব মতো কোনো প্রয়োজনও থাকত না। আজ বরং সরকারেরই স্বার্থ হলো আমাদের পবিকল্পনা ও কাজটাকে যথেষ্ট প্রচারিত হতে না দেওযা—তারা যথাসম্ভব গোপনে সমস্ত ঘটনাটা চেপে দেবার চেষ্টা করছে এবং জনতার নিকট সমস্ত ব্যাপারটাকে জনকয়েক খামখেয়ালী অতিবিপ্লবীব হঠকারিতা বলে চালাতে চাইছে—যা অনেক ঈর্ষাপ্রবণ দল গ্রহণ ও প্রচার করতে ব্যস্ত। তা সত্ত্বেও সমস্ত সত্যকে একদম চেপে দেওয়া সম্ভব নয়। ধৃত বন্দীদের

বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা চলছে তাতে সরকারপক্ষ আমাদের সত্যিকার উদ্দেশ্য বিকৃত করতে বা একদম চেপে দিতে পারেনি বরং অনেক কথাই বলতে বাধ্য হয়েছে।

এই পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী হয়েছিল— কোথায় গিয়ে তা অকৃতকার্য হলো এবং কেন হলো—সেই সব আলোচনা এখন আমরা করতে যাচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে বলে রাখা দরকার।

আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করা বা মুক্ত-অঞ্চল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সেই মুক্ত-অঞ্চলে সমাজতন্ত্র স্থাপন করা নয়। আজকের সমাজতন্ত্র কোনো একটি অঞ্চলের উপর কায়েম করা যায় না—তার জন্য সমগ্র দেশটাও যথেষ্ট নয়--বিশ্বকে নিয়ে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের একটি মহাদেশ রচনা করবার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন ও তাগিদ যেখানে উঠেছে সেখানে একটা জেলা বা দশটা জেলা নিয়েও একটি ক্ষুদ্র সমাজতান্ত্রিক দেশ কল্পনা করা হাস্যকর মাত্র।

আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের নীতিকে আজকের যুগে বিপ্লবী সংগ্রামের একটি রণকৌশল হিসাবেই দেখতে হবে—একটা উপায় হিসাবে তার প্রধান ও প্রথম তাৎপর্য। যেখানে শত্রু পক্ষ নির্মম আঘাতে সাম্যবাদী দল ও জনতার সব শক্তি চূর্ণ করে দিতে বদ্ধপরিকর, যেখানে বিপ্লবীদের সব কথার কণ্ঠরোধ করে দিতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যেখানে দমননীতি নির্লজ্জ ফ্যাসিবাদী কায়দায় প্রগতিবাদকে পায়ের তলায় দলে পিষে দিতে ব্যস্ত, যেখানে নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত জনতার মধ্যে ফাটল ধরাতে ব্যস্ত— সেখানে বিপ্লবীদের অস্তিত্ব ও কাজ বজায় রাখা সম্ভব নয় যদি না তারা একটা মুক্ত অঞ্চলে গিয়ে দাঁড়াতে পারে যেখানে শত্রু নেই, পুলিশ নেই, গুপ্তচর নেই -যেখান থেকে বিপ্লবের বাণী পরিপূর্ণরূপে জগতকে শোনানো যায়, যেখানে বিপ্লবের কণ্ঠ দ্বিধা ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট নয় এবং যেখানে বিদ্রোহী জনতার নির্ভীক চরিত্র বিকশিত করা সম্ভব। মুক্ত অঞ্চলের মধ্যে কোনো শত্রু নেই যাকে গ্রাহ্য করবার দরকার—এমন কোনো শক্তি নেই যাকে তোষণ করতে হবে। শত্রু আছে মুক্ত অঞ্চলের সীমান্তে— যেখানে আমাদের সশস্ত্র গণবাহিনী ও জনতা তাদের রুখে চলেছে, আক্রমণ করে চলেছে—আর সেই যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের একতা, মনোবল, দক্ষতা ও সংগ্রামশক্তি বাড়িয়ে চলেছে এবং যেখানে সংগ্রামের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে বিপ্লবী সৈনিক ও বিপ্লবী সৈন্যাধ্যক্ষ। আজকের পরিস্থিতিতে এই জাতীয় পথই সাম্যবাদীদের বাঁচবার ও বাড়বার একমাত্র পথ। নইলে শত্রুর দমননীতির মধ্যে যদি বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হয়—তবে সাম্যবাদীদের সাম্যবাদ ত্যাগ করতে হবে—সাম্যবাদের আংশিক সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে সাম্যবাদকে বিকৃত করতে বাধ্য হতে হবে—সাম্যবাদের জন্য তথাকথিত আংশিক সংগ্রামে বা আইন সঙ্গত সংগ্রামে কার্যত তারা সাম্যবাদী রূপটাই হারিয়ে ফেলবে এবং ক্রমে অংশকে সমগ্র মনে করে সাম্যবাদকেই যাবে ভুলে। দীর্ঘকালব্যাপী কেবলই আংশিক সংগ্রাম ও আইন সঙ্গত অর্থনৈতিক সংগ্রাম করে সাম্যবাদীরা যে তাদের আসল লক্ষ্য ও সমগ্র কর্মপন্থাটাই ভুলে গিয়েছিল সে কথা তো আজ সবাই স্বীকার করে। তাছাড়াও দমননীতি ও দৃঢ় আক্রমণ এমন বেড়ে চলেছিল যে কোনো আংশিক সংগ্রামের বা আংশিক দাবি দাওয়া মেটাবারও কোনো পথ ছিল না—আইনসঙ্গত লড়াইয়ের ক্ষেত্র কার্যত একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—যার জন্য প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক সংগ্রাম মজুর ও চাষীর রক্তে ভেসে যাচ্ছিল—কোনো উপায় যেন আর ছিল না। শত্রুপক্ষের এই একতরফা মারের মুখে ও অসম শক্তির অন্যায় লড়াইয়ে (unequal fight) শত্রুপক্ষ ক্রমশ জনতাকে কোণঠাসা ও সম্ভবহীন করে দিচ্ছিল। অতএব আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্য হলো--প্রধানত জনতার লড়াইকে চালু করার প্রধান সোপান

হিসাবে মুক্ত-অঞ্চলের প্রতিরোধ শক্তির (Zone of resistance) পরিপূর্ণ বিকাশ করা—যেখান থেকে আক্রমণ ও প্রতিরোধ (Offensive and defensive) সত্যি করে সংগঠিত করা যায়। দ্বিতীয়ত অবশ্য এই উদ্দেশ্যও সফল হচ্ছে যে মুক্ত-অঞ্চলে আমরা জমিদার, মহাজন ও ধনীদের হাত থেকে জনতাকে মুক্ত করতে পারছি এবং ভূমিসংস্কার ও কৃষিবিপ্লবের সাহায্যে জনতার সত্যিকার সত্ত্ব কায়েম করতে পারছি —যার একটা গঠনমূলক চিত্র আছে, ভবিষ্যতের নতুন সমাজ গঠনের গোড়াপত্তন হিসাবে।

অতএব এই মুক্ত অঞ্চলকে আমরা কিভাবে রক্ষা করব বা মুক্ত-অঞ্চলে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি কি করে সম্ভব—এই জাতীয় প্রশ্ন অবান্তর। এ প্রশ্নের জবাব সমগ্র বিপ্লবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে এবং এই আঘাত ও মুক্ত-অঞ্চলের কার্যকলাপ সেই দেশব্যাপী বিপ্লবের কতখানি অগ্রগতি ঘটাতে পারে, ঘটনার পরবর্তী পর্যায়েই তা দ্রষ্টব্য। আর তা যে ভাল ছাড়া মন্দ হতে পারে না—চীন তার সাক্ষী।

এই জাতীয় চিন্তাধারার উপর যে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল তাকে কার্যকরী করার জন্য তখন আমাদের ভীষণ তাড়া পড়ে গেছে —কারণ যে কোনো দিন জেসপে গণ্ডগোল লেগে যেতে পারে কেননা যে কোনো দিন ওরা ছাঁটাইয়ের নোটিশ লটকে দিতে পারে। কোম্পানি ও মজুরেরা উভয়েই জানে যে এই ছাঁটাইয়ের নোটিশটাই সংগ্রাম ঘোষণা—বহুদিনের ধূমায়িত বহ্নি তখনই জ্বলে উঠবে। অথচ আমরা আরও কিছু সময় না পেলে যে উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করে উঠতে পারব তেমন দৃঢ় প্রত্যয় তখনও হয়নি। প্রস্তুতির পরীক্ষা হয়নি, লোকজনের কর্মবিভাগ চূড়ান্ত হয়নি, বিভিন্ন দলপতিদের বোঝাবার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, অস্ত্রশস্ত্রের পরিপূর্ণ তদারক হয়নি—বসিরহাট অঞ্চলে জিনিসপত্র রেডিও ইত্যাদি তখনো পাঠানো শেষ হয়নি। কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুত কাজ চলেছে—রাত্রিদিন সমানে কাজ করে চলেছে কর্মীরা ও কর্মকর্তারা।

এমন সময়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারির বৈকালে খবর এল যে ছাঁটাইয়ের লিস্ট কোম্পানি টাঙিয়ে দিয়েছে। অতএব আগামী কাল অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারি সকালে কারখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। সমস্ত কারখানার মজুরেরা নিস্তব্ধ অবস্থায় একটা বিরাট কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে—কেননা সমস্ত শ্রমিকেরা জানত যে বিপ্লবী কম্যুনিস্ট দল কোম্পানির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক শ্রমিক সে সংগ্রামে কিছু না কিছু অংশ নেবে—এধরনের ফিস্-ফাস্ কথাবার্তা বেশ কিছুকাল ধরে কারখানার প্রত্যেক শপে, প্রত্যেক বিভাগে জোর চালু রয়েছে। অগ্রগামী নেতৃস্থানীয় মজুর কর্মীরা যার যার বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছে—দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়ে গিয়েছে—এসব কথা মোটামুটি ভাবে সবাই জানত,—যদিও প্রত্যেকেই জানত না এবং জানতে দেওয়া হয়নি—পরিকল্পনাটা ঠিক কি —কেননা তা যদি সবকারের কানে পৌঁছায় তাহলে সব ভেস্তে যাবে। এতগুলি লোক নিয়ে যেখানে কারবার সেখানে এই জাতীয় পরিকল্পনা গোপন রাখতে যে কত বেগ পেতে হয় তা সহজেই অনুমেয়। তথাপি ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েত নেতৃত্বের প্রভাব এত বেশি ছিল যে কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা হয়নি—অথবা কোনো একটি শ্রমিককেও কোম্পানি প্ররোচনা দিয়ে অসময়ে কোনো আঘাত হানতে পারেনি।

অসম্পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য তখন ভয়ানক এক তাড়া পড়ে গেল আমাদের মধ্যে। আর ২/৪ টা দিনও যদি সময় পাওয়া যেত। তা তো আর হতে পারে না কেননা বিন্দুমাত্র গোলমাল বা একটা প্রতিবাদমূলক ধর্মঘট করলেও কোম্পানি তৎক্ষণাৎ লক আউট করে কারখানা

অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেবে এবং সরকারের সশস্ত্র বাহিনী কারখানা রক্ষা করে চলবে—এই গোপন সিদ্ধান্ত আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে আগে থেকেই জেনেছি। অতএব একটুখানি মৃদু আন্দোলনে কোনো ফল হবে না— সমস্তটার জন্য প্রস্তুত হয়েই কাজে হাত দিতে হবে। তাছাড়া আমরা বিশৃঙ্খল গোলমালের পক্ষপাতী নই কেননা বিশৃঙ্খল-গোলমালের যে কি অবস্থা হয় তা আমরা অপরাপর ধর্মঘট থেকে লক্ষ্য করেছি।

সমস্ত রাত কাজ চলল। যানবাহনের যাবতীয় উপায়—অর্থাৎ ট্যাক্সি, গাড়ি, সাইকেল, মোটর সাইকেল দুর্দান্ত ভাবে ছুটছে— সবাইকে ডাকা, খবর দেওয়া, জিনিসপত্র গোছানো, কাজ বোঝানো, দায়িত্ব বেঁটে দেওয়া, বসিরহাটে খবর পাঠানো, লোক পাঠানো—এসব কাজ চলেছে সমস্ত রাত। পরের দিন ভোর কখন হলো কারো খেয়াল করবার সময় নেই—অবিশ্রান্তভাবে কাজ চলেছে, দ্রুত প্রস্তুতির জন্য ছোটাছুটির চরম হচ্ছে—তথাপি বেলা বারটা একটা পর্যন্তও সমস্ত কিছুর নিম্নতম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হচ্ছে না। ঘোষণা-পত্র (বাংলা ও হিন্দীতে) তখনো প্রেস থেকে আসেনি—অস্ত্রশস্ত্র তখনো প্রত্যেক গ্রুপের হাতে ঠিক ঠিক মতো পৌঁছানো সম্ভব হয়নি—একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। এদিকে যে সমস্ত পার্টি কমিটির জঙ্গীকর্মী গণবাহিনীর লোকজন ডাকা হয়েছিল তারা ঠিক ঠিক যথাস্থানে পৌঁছে গেছে- শ্যামবাজারের মোড় থেকে বারাসাত পর্যন্ত যার যেখানে থাকবার কথা প্রায় সবাই এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাদের লক্ষ্য বস্তুর কাছে ঘোরাফেরা করছে—কিন্তু গ্রুপ লিডারদের কাজ তখনো শেষ হয়নি এবং অন্যান্য ছোটখাটো অনেক কাজ ফাঁকে ফাঁকে অসমাপ্ত রয়ে গেছে দেখা গেল। এদিকে বেলা পড়ে আসছে। তখন সমস্ত প্রস্তুতির দিকে তাকিয়ে হিসাব করা হলো যে সেদিন আক্রমণ ঘটানো সম্ভব নয়। দলের একজন প্রতিনিধি নেতা তখন জেসপ কারখানায় গিয়ে তথাকার নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং বল্লেন যে সেদিন আক্রমণ করা সম্ভব নয়— যেমন করে হোক সেদিনের জন্য শ্রমিকদের ক্ষান্ত করতে হবে এবং শান্ত রাখতে হবে।

এই সংবাদে সেখানকার নেতারা স্তম্ভিত হয়ে গেল— ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠল। কেননা তারা আমাদের জন্য প্রত্যেকটি মিনিট গুণে গুণে হিসাব করে চলেছে—এক তীব্র প্রতীক্ষায় তারা তখন অস্থির হয়ে উঠেছে—সমস্ত কারখানা এক বিপুল সম্ভাবনায় থম থম করছে। "আজি রণে ক্ষান্ত দাও, কালি হবে রণ" এক বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত যেন শ্রমিকেরা শুনতে পেল এবং তারা আমাদের দলকে অন্য সব ফাঁকা বুলিসর্বস্ব দল বলেই যেন সন্দেহ করতে লাগল। তাহলেও দলের প্রতিনিধি বেশ জোরের সঙ্গেই দলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল যে সেদিন কিছুতেই সংগ্রাম ঘোষণা করা সম্ভব নয় , এবং নেতাদের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হলো। যাহোক নৈরাশ্য সত্ত্বেও তারা দলের আদেশ মেনে নেয় এবং সেদিন কোনো কিছু উত্তেজনা ও প্ররোচনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা জানিয়ে দেয় যে যদি দল পরের দিন এগারটার মধ্যে কিছু না করে তবে তারা যা পারবে তাই করবে—দলের বা অন্য কারো কোনো অপেক্ষায় থাকবে না।

উপরের কথাগুলি একটু বিশদ করে লেখার উদ্দেশ্য হলো এই যে, হয়ত লোকের মনে একটা ধারণা আছে যে আমরা জোর করে, তাড়া দিয়ে, শ্রমিকদের অনিচ্ছাতেই তাদের ঘাড়ে একটা সংগ্রাম চাপিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। শ্রমিকদের অধীরতা আমাদের প্রস্তুতির অপেক্ষা সইছিল না—যদিও তারা এর দায়িত্ব ও গুরুত্ব সবই বুঝেছে, যদিও তারা নিজেরাও বুঝেছে যে আর কিছুদিন সময় পেলে ভাল বই মন্দ হতে পারে না। তারা কোম্পানির সাথে অনেক লুকোচুরিও খেলেছে যাতে কোম্পানি তক্ষুনি ছাঁটাইয়ের

নোটিশ না দিযে দেয। কিন্তু যখন নোটিশ দিয়ে ফেলেছে তখন শ্রমিকদেব তবফ থেকে প্রতিবোধেব কথাটা স্থগিত বাখা সম্ভব নয। তাদেব অধীবতা ও সন্দেহ এই ভাবেই বুঝতে হবে—কাবণ সচেতন সুশৃঙ্খল শ্রমিক হিসাবে জেসপেব মজুবদেব অবদান ভাবতেব কোনোও শ্রমিক ইউনিযনেব সঙ্গে তুলনীয নয- -একথা সবকাব্ব ও কোম্পানি জানে ও স্বীকাব কবে—বহুবাবেব বহু সংগ্রামে তাব প্রমাণ পাওযা গিযেছে। দল শ্রমিকদেব উপব চাপ দিযেছে একথা মোটেই সত্যি নয—ববং শ্রমিকদেব চাপেই দল চঞ্চল ও অস্থিব হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক আমবা মনে কবলাম ২৪ ঘণ্টা সময তো পাওযা গেল।—এই ২৪ ঘণ্টাব প্রত্যেকটি মিনিট কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা সময যেমন আমাদেব কতকগুলি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত কবতে সাহায্য কবল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আবো কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা এনে উপস্থিত কবল। এতগুলি লোক ববাববেব জন্য ঘববাড়ি ছেড়ে বেবিযে এসেছে – তাবা কোথায থাকবে, কি খাবে এবং ঠিক ঠিক মতো পবেব দিন যথাস্থানে উপস্থিত হতে পাববে কি না—এসব নিযে একটা বিবাট গণ্ডগোল পাকিযে গেল। তাছাড়া তাদেব মধ্যে কেউ কেউ এতটা ছেলেমানুষী হৈচৈ ও অসংযত হম্বিতম্বি কবে ফেলেছে যে বেলগেছিয়া অঞ্চলেব সাধাবণ লোকেবা পর্যন্তও টেব পেযে গেছে যে একটা কিছু হতে চলেছে , মা বোনেবা কান্নাকাটি শুরু কবে দিযেছে—যেহেতু ছোট ছোট ছেলেবাও কোথা থেকে আঁচ পেযে মেতে উঠেছে এবং বলাবলি কবছে যে তাবা "লালচীন" কবতে চলেছে। নেতৃস্থানীয কর্মীবা তখন নানা কাজে ব্যস্ত বলে খববদাবী ও তদাবকীতে মনোযোগ দিতে পাবছে না। এইভাবে মুখে মুখে নানা বকমেব কথা শুনে পুলিস দুটি ছেলেকে ধবে নিযে যায—যাব ফলে একটা ভয দাঁড়িযে গেল যে পুলিস হযত ব্যাপাবটা টেব পেযে গেছে বা যাবে। তখন অনেকেই বিশৃঙ্খল ভাবে এদিকে সেদিকে একটু গা ঢাকা দিতে ব্যস্ত—ফলে যোগাযোগ বক্ষাকাবী নেতৃস্থানীয় কর্মীদেব, গ্রুপ লিডাবদেব পক্ষে তাদেব যাব যাব বাহিনীব খোঁজ খবব বাখাটাই একটা অতিবিক্ত কাজ হযে দাঁড়াল। বাঙালী চবিত্রেব মধ্যে বিশৃঙ্খলাব যে একটা স্বাভাবিক কুঅভ্যাস আছে তা থেকে আমাদেব কর্মীবাও সম্পূর্ণ মুক্ত হযনি—এবং এই দোষে যে কত ভাবে কত ক্ষতি হযেছে তা যাবা সমস্ত ব্যাপাবটাব খুঁটিনাটি খবব বাখে তাবাই জানে। এখানে শুধু এটুকু বলে বাখা দবকাব যে Discipline এজাতীয কাজেব পক্ষে একটা বিবাট অপবিহার্য বস্তু এবং এতগুলি লোককে সুশৃঙ্খলভাবে চালনা কবাব গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ না হলে বিবাট কাজেব পবিবর্তে একটা প্রকাণ্ড পণ্ডশ্রম ঘটে যেতে পাবে।

এই বিশৃঙ্খলাব চূড়ান্ত নমুনা প্রকাশ পায পবেব দিন বেলা দশটায—যখন শোনা গেল যে, যে কর্মীব উপব ভাড়া কবা লবি দুটিব ভাব দেওযা হযেছে—বেলগেছিয়া আমর্ড পুলিস ডিপো থেকে লুঠ কবা বাইফেল ইত্যাদি বহন কবে নেবাব জন্য—তাকেও পাওযা যাচ্ছে না এবং লবি দুটিবও পাত্তা মিলছে না। সে যে কোথায কোথায ঘুবে বেড়াচ্ছে তা কেউই ঠিক কবে বলতে পাবে না। তখন হাতে মাত্র এক ঘণ্টা সময আছে—নতুন কবে লবি ভাড়া কববার বা জোগাড় কববাব অবসব কই।—অথচ অস্ত্রশস্ত্রেব প্রধান ভবসাই হলো বেলগেছিযা ডিপো। যে কোনো পবিকল্পনায বেলগেছিযাব ডিপোটাই আমাদেব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেব জন্য হাতেব পাঁচ হিসাবে গণ্য হতো—সেই কাজটাই এখন পণ্ড হতে চলল।

যাই হোক আমাদেব বসে থাকবাব সময নেই—হাহুতাশ কবাবও অবসব নেই। বেলগাছিয়াব প্ল্যান বাতিল কবে দেওয়া হলো—আব এখান থেকেই আমাদের পবাজয শুরু হলো বলা যায়। এম্যুনিশন ফ্যাক্টবি, থানা, ফাঁড়ি, জেল, বিমানঘাঁটি ইত্যাদি থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র

মিলবে তাতেই কোনো প্রকারে কাজ চালাতে হবে। আমাদের পরিকল্পনার অবশিষ্ট লক্ষ্য বস্তু সমূহ আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত স্থির রইল। তখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই—রাজনৈতিক দিক থেকেও নয় এবং সংগঠনের দিক থেকেও নয়। সে অবস্থায় যদি তখন আক্রমণ স্থগিত রাখতে যাই তা হলে শ্রমিকদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে—যার ফলে তাদের মধ্যে আমাদের প্রভাব একদম নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার প্রতিক্রিয়া দলের মধ্যে এমন ভাবে এসে যাবে যে দলের morale বা নৈতিক জোর যাবে ধসে, অথচ সমস্ত ব্যাপারটাই শেষ পর্যন্ত পুলিশের কানে উঠে যাবার সম্ভাবনা থাকায় সরকার কিছু না করার জন্যও আমাদের রেহাই দেবে না। অতএব এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এসময়ে কোনো অন্য পথ থাকতে পারে না—সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শক্তি আবার সম্পূর্ণ হতে পারে এবং ভুলত্রুটি সামলে নেবার অবকাশ মিলতে পারে। আমাদের পথ তখন অনিবার্যরূপে নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং সেই পথেই আমাদের ভাগ্যপরীক্ষা করতে হবে—এই অনুভূতিই তখন সংগ্রামের সংগঠক এবং মজুর ইউনিয়নের নেতাদের এক সাধারণ জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে—কোথায়ও এতটুকু দ্বিমত বা দ্বিধা জাগেনি, সামনে এগিয়ে যেতেই হবে—এই প্রতিজ্ঞা তখন সকলের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল—সিদ্ধান্তের কোনো দুর্বলতা কারো বুকে আশ্রয় করেনি। কর্মীদের সেদিনকার সেই নির্ভীকতা ও দ্বিধাহীন একনিষ্ঠা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—আদর্শবোধ মানুষকে কতখানি জাগিয়ে দিতে পারে সেদিনের সেই সংগ্রামের মুহূর্তে তা লক্ষ্য করা গেছে।

তারপরের ইতিহাস আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ১১টা ১৫ মিনিটের সময় যুগপৎ সমস্ত লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ করার হুকুম যায়। এম্যুনিশন ফ্যাক্টরি ও দমদম বিমানঘাঁটি আমাদের বাছাই করা গণবাহিনীর লোকেরা কয়েক মিনিটের মধ্যে দখল করে সশস্ত্র প্রহরীদের নিরস্ত্র করে ফেলে। জেলখানার গেটের নিকট আক্রমণকারী গ্রুপ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। কথা ছিল ৫/৭ মিনিটের মধ্যে কারখানার মজুরেরা এসে আমাদের সাথে যোগ দেবে—কেউ কেউ লরি নিয়ে, কেউ কেউ বোড রোলারগুলি নিয়ে, দলে দলে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে আসবে। জেলখানার গেট দখল তখনই শুরু হবে যখন অপর দিক থেকে জেলের দেওয়াল ড্রিলমেশিনের সাহায্যে ডিনামাইট স্থাপন করে উড়িয়ে দেওয়া হবে। থানা দখল করবার জন্য নির্দিষ্ট গ্রুপও যথাসময়ে প্রস্তুত ছিল—কিন্তু কারখানার শ্রমিকদের বের হয়ে আসার উপর অন্যান্য বাকি কাজ সম্পন্ন করা নির্ভর করছিল।

কিন্তু অতি আশ্চর্যের কথা কারখানার শ্রমিকেরা এসে হাজির হচ্ছে না—কারখানার ভিতর তুমুল গোলমাল ও শব্দ শোনা যাচ্ছে অথচ বাইরে লোক ছুটে আসছে না—অস্ত্র নিতে হবে সেকথা যেন কারো খেয়ালই নেই। এদিকে এম্যুনিশন ফ্যাক্টরি দখলকারী গ্রুপ অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে যাবার লোকের জন্য অপেক্ষা করছে—ওদিকে যারা বিমানঘাঁটি নিরস্ত্র করে যাবতীয় মোটরযানগুলি দখল করে বসে আছে, তারা বিমানঘাঁটিটি নষ্ট করে দেবার জন্য লোকবলের অপেক্ষা করছে—আবার অন্যদিকে জেলের গেটে দাঁড়িয়ে আছে অন্য এক সশস্ত্র গ্রুপ শ্রমিকদের আসার অপেক্ষায়। প্রায় ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কোনো লোক এল না, বরং কারখানার গোলমাল আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল—তখন দমদম বিমানঘাঁটিতে যারা অপেক্ষা করছিল—তারা দল বেঁধে গাড়িতে করে বসিরহাটের দিকে রওনা হয়ে গেল। আর বাকি সবাই আমাদের বাহিনীর প্রায় অর্ধেকের উপর ভগ্নমনোরথ এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কলকাতায় ফিরে গেল—জেলখানা আক্রমণ করা হলো না, এম্যুনিশন ফ্যাক্টরির অস্ত্রশস্ত্র

নেওয়াও হলো না। ওদিকে সরকারের আর্মড গার্ড তখন ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হতে শুরু করেছে।

কারখানার মজুরেরা, যাদের ডাকে আমরা এই আয়োজন করেছিলাম, তারা এই অদ্ভুত ব্যবহার কেন করল? তারা কি করল? তারা যে ভয়ে ভয়ে কিছু করেনি তা নয় —তারা কর্তব্য ভুলে গিয়ে সাহেব অফিসারদের উপর তাদের চিরকালের রাগ মেটাতে গেল- তাদের মেরে মেরে জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে ফেলতে লাগল—বহুকালের একটা প্রতিশোধ স্পৃহা যেন তাদের পাগলের মতো পেয়ে বসেছিল , অথচ এইজাতীয় কাজের কোনো প্রোগ্রাম মূল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কারখানা থেকে হাজারে হাজারে বেরিয়ে আসার পথে যদি কোনো বাধা পায় তাকে প্রতিহত করে বেরিয়ে আসার জন্যই সামান্য কিছু অস্ত্রপাতি ভিতরে সরবরাহ করা হয়েছিল। সমস্ত মজুরকে একত্র সমাবেশ করা ও তৎক্ষণাৎ সমগ্র পরিকল্পনাটি তাদের কাছে তুলে ধরা এবং বাইরে অপেক্ষমান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করা, রাস্তা বন্ধ করা, জেল ভাঙা, বিমানঘাঁটি ধ্বংস করা ইত্যাদি যাবতীয় বৈপ্লবিক প্রোগ্রাম কারখানার নেতারা গেল ভুলে। তারা ভুল কাজে লেগেছিল ব্যক্তিগত প্রতিশোধের নেশাকে তারা দমন করতে পারেনি এবং সেই কারণেই এতবড় একটা অভিযান একরকম ব্যর্থ হয়ে গেল। রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রাম বিজ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও যুক্তির উপরে ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় এমনি ধরনের এক বিপর্যয় এনে দিল।

বাহিনীর যে অংশ বসিরহাটের দিকে এগিয়ে গেল তারা কিছুটা দমে গেলেও অতুল বিক্রমে তাদের যাত্রাপথে অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়িগুলিকে অচল করে দিয়ে বসিরহাট থানা আক্রমণ করে দখল করে নেয়, পরে একদল পুলিশ কলকাতা থেকে লরিসহ গিয়ে তাদের আক্রমণ করলে তাদের মেরে ভাগিয়ে দেয়। গতদিন অর্থাৎ ২৫শে তারিখে চাষীরা গ্রাম থেকে এসে শহরে উপস্থিত ছিল, কিন্তু সেদিন কিছু না হওয়াতে তারা ফিরে যায়— আর পরেরদিন আসার কোনো সংবাদ বা নির্দেশ না পাওয়ায় আসেওনি। শহরের স্থানীয় কর্মীরা গতদিন কিছু না ঘটাতে কতকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল---তাদের নেতৃস্থানীয়রা কলকাতায় চলে আসে কি হলো এবং কি হবে তা বুঝবার জন্য—ফলে বসিরহাট শহরে এই বাহিনী তেমন কোনো স্থানীয় সাহায্য পেল না। একই সাথে থানা ও ট্রেজারি যে আক্রমণ করতে হবে—এই আসল নির্দেশটাই গোলমাল করে ফেলল। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় পেয়ে রাস্তার উপরে অবস্থিত ট্রেজারি ও জেলের সরকারি শান্ত্রিদের পক্ষ থেকে একটা বাধা আসলো— কিন্তু তৎক্ষণে বাহিনী তার পরের কর্তব্য সম্বন্ধে গোলমাল করে ফেলেছে--তাদের মনে একটা অরাজকতা এসে গেছে। যখন তারা অনুভব করল যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী সহস্র জনতার এক সশস্ত্র বাহিনীর পরিবর্তে এক জনতাহীন সংগ্রাম তারা চালিয়ে যাচ্ছে তখন সেই সংগ্রাম কিভাবে রূপ নেবে তা অত তাড়াতাড়ি ঠিক করতে না পেরে তারা ইটিণ্ডাঘাটের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল। এইখানেই এই আক্রমণের চূড়ান্ত পরাজয় হলো। যদি তারা সেই সময় বসিরহাটে ঘাঁটি করে অবস্থান করত তাহলে তাদের নিশ্চিহ্ন করবার বা শীঘ্র হটিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা সরকারের সেখানে কিছুই ছিল না—বাইরে থেকেও সহজে সরকারি ফৌজ অগ্রসর হতে সাহস পেত না—অন্তত অবস্থাটা না বুঝে , যেহেতু সরকারি ফৌজ ও পুলিসের মধ্যে তখন বেশ একটা আতঙ্ক ঢুকে গিয়েছিল। তারপর বিশ্রাম করে ধীরে সুস্থে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত্রির অন্ধকারে আমাদের প্রভাবিত গ্রামাঞ্চলে আস্তানা করে থাকতে পারত এবং তখনো হাতে যা অস্ত্রশস্ত্র ছিল তা দিয়ে চাষীদের নিয়ে একটা বাহিনী গঠন করে

সেখানে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল। কেননা তেলেঙ্গানায় এদের চেয়ে অনেক কম শক্তি নিয়েই তারা শুরু করেছিল এবং আজও তাদের অস্ত্রবল ও শিক্ষিত সৈনিক-শক্তি এদের সমকক্ষ নয়। দমদম থেকে বসিরহাট পর্যন্ত এদের মনোবল ও বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল কিন্তু তারপরে আর টেকেনি। পথে তারা বক্তৃতা করেছে, ঘোষণাপত্র বিলি করেছে, কংগ্রেস অফিস লণ্ডভণ্ড করেছে, জনতাকে সাহস দিয়েছে, এস ডি ও কে বন্দী করেছে—কোথায়ও এতটুকু ভয় বা দ্বিধা দেখায়নি। এই বেপরোয়া সাহস ও দুর্দান্ত আক্রমণের নমুনা সমস্ত ভারতবর্ষকে চমকে দিয়েছিল এবং সর্বত্র শ্রমিক ও মজুর সাধারণের বুকে সাহস সৃষ্টি করেছিল। তৎপররবর্তীকালের বিদ্রোহী ধর্মঘটগুলিকে—এলেনবেরীর স্ট্রাইক, বেঙ্গল পটারীর স্ট্রাইক ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ইত্যাদি—সাক্ষাৎভাবে এই অভিযানের দান বলা যায়।

তথাপি এতবড় আয়োজন ও এতবড় একটা শক্তি কেন এত সহসা ব্যর্থ হয়ে গেল তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করতে হবে—তলিয়ে দেখতে হবে কোথায় ভুল ছিল—যাতে আগামী যুগের বিপ্লবী জনতা সত্যিকারের শিক্ষা নিতে পারে এবং ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে।

(১) সবচেয়ে আশ্চর্য ও ভাববার কথা হলো জেসপ কারখানায় মজুরদের ব্যবহার।

একথা ঠিক নয় যে শ্রমিকেরা নিষ্ক্রিয় ছিল। তারা তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী শত্রু সাহেব অফিসারদের মারধোর করতে যে নির্মমতা দেখিয়েছে তাতেই বোঝা যায় তাদের ক্ষোভ কত গভীর ছিল। কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি বলেই তারা অতি মূল্যবান সময় একটা সামান্য কাজে নষ্ট করেছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি অবশ্য নেতৃস্থানীয় শ্রমিকেরাই জানত—কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে যেতে পারে এই ভয়ে বেশি লোককে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয়নি। মোটামুটি সর্বাত্মক লড়াই চালাতে হবে ও তা হবে প্রধানত সরকারের সাথে এবং এ লড়াই একদিনের নয় বৃহত্তম বৈপ্লবিক লড়য়ের সূচনা মাত্র এসব কথাও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। কারখানার বিপ্লবী নেতারা সমগ্র মজুরদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয় এবং একথাও বলে দেয় যখন লড়াই শুরু হবে তখন প্রথম কাজই হবে সমগ্র জনতাকে জড়ো করা, খোলাখুলিভাবে সমগ্র পরিকল্পনা ও সংগ্রামের চিত্রটা তাদের কাছে ধরিয়ে দেওয়া ও পরের পর যে সমস্ত নির্দিষ্ট কাজ আছে তাতে দলের পর দল তৈরি করে নিয়োজিত করা। সমবেত মজুর জনতার বৈপ্লবিক চেতনা ও প্রেরণা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেশ উঁচু পর্দায় তুলে দিতে হবে তার পরেই Specific job বা নির্দিষ্ট কাজগুলিতে হাত দিতে হবে এবং এই নির্দিষ্ট কাজগুলি সমাধা হয়ে যাবার পর আবার জনতাকে জড়ো করতে হবে ও দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য তাদেরকে বসিরহাটের পথে নিয়ে যেতে হবে।

কারখানার নেতারা কিন্তু ঠিক উল্টো দিক থেকে আরম্ভ করে —নির্দিষ্ট কাজের একটির উপর নেতাদের সবাই মনোনিবেশ করে বসে অর্থাৎ সবাই মায় নেতারা পর্যন্ত সাহেব ঠেঙ্গাবার কাজে মেতে যায়। এদিকে হাজার হাজার জনতা অপেক্ষা করছে নির্দেশের জন্য—তাদের ডাকা, সমবেত করা, উত্তেজিত করা, বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঘোষণা ও সূচনা করার কথা নেতারা বলছে না—ফলে সমগ্র জনতা তার সমবেত কর্মশক্তির কোনো ব্যবহারই করল না, কেবলমাত্র সাহেব মারার কাজেই ৪৫ মিনিট সময় নষ্ট করে দিল। এদিকে বাইরে আমাদের বাহিনী তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, বোডবোলোরের জন্য অপেক্ষা করছে, লরির জন্য অপেক্ষা করছে, জেলভাঙার জন্য ড্রিলিংমেশিনের অপেক্ষা করছে—এবং সর্বোপরি এম্যুনিশন ফ্যাক্টরির থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র জনতাকে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এসব আসল কাজের দিকে কারোরই খেয়াল নেই। এমনকি বাইরে একটি লোক পাঠিয়ে যে সংবাদ দেবে ভিতরে কি হচ্ছে

ও বাইবেব অবস্থা কি তা জানবে—তা পর্যন্ত কবেনি। অতএব আজ একথা বলা যায় যে, সব কিছু কবেও কাবখানাব নেতাবা শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিব দোষে নির্দেশ যথাযথভাবে পালন কবতে পাবেনি—যাব ফলে সমগ্র শ্রমিকশক্তিব কোনো সাহায্য পাওযা গেল না।

বাইবে যাবা বাছাই কবা গণবাহিনীব লোক তাবা তাদেব নির্দিষ্ট কাজ কবে চলেছে এবং প্রত্যেকটি মুহূর্ত জনতাব আগমনেব অপেক্ষা কবছে—তাদেব ভিতবে তখন একটা সন্দেহ ও বিভ্রান্তি আসতে বাধ্য। তাদেব নিজেদেব মনোবল ও প্রতিজ্ঞাব জোবেই তাবা এগিযে চলেছে—একথা সত্য , কিন্তু গণশক্তিব সাক্ষাৎ স্পর্শ ছাড়া এজাতীয অভিযান কিছুতেই বেশিক্ষণ স্থাযী হতে পাবে না এবং ক্রমবর্ধমানও হতে পাবে না। বিপ্লবেব বীতিই এই—তা সামান্য কিছু দিযে শুরু হলেও ক্রমশ তাব উত্তেজনা, শক্তি ও প্রেবণা বাডতেই থাকে এবং এই ক্রমবর্ধমান শক্তিই বিপ্লবেব জযযাত্রা সম্ভব কবে তোলে। সুতবাং শেষপর্যন্ত যে এই পবিকল্পিত অভিযান সহসা বন্ধ হযে গেল তাব প্রথম ও প্রধান কাবণ হলো গণশক্তিব সাক্ষাৎ সহযোগিতাব অভাব। অথচ এই গণশক্তিব সহযোগিতা কবাব প্রতিজ্ঞাব উপবেই আমাদেব পবিকল্পনা বচনা ও তা কার্যকবী কবাব এত তাড়া পড়েছিল , নইলে সেদিন বা তক্ষুনি একটা কিছু কবাব জন্য পার্টিব কোনো তাগিদ ছিল না—শ্রমিকদেব চাপেই আমাদেব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না কবেও অগ্রসব হতে হযেছিল। গণশক্তিকে সমবেত (mobilise) কবাব উদাহবণ এব পূর্বে বহুবাব বহু নেতৃত্ব ঢেব কম মেহনতেও দেখিযেছে—হাজাব হাজাব বিক্ষুব্ধ জনতাকে বাস্তাব মোড়ে জড়ো কববাব ইতিহাস ভাবতে বহুবাব ঘটেছে—অথচ জেসপেব মতো শক্ত ইউনিযনেব নেতাবা তা পাবে না এ হতেই পাবে না—আসলে তাবা তাদেব কার্যক্রমকে বুঝতেই পাবেনি—সমগ্র কর্তব্যকে ভুলে একটি মাত্র প্রতিশোধমূলক কাজেই সময এবং সুযোগেব অপব্যবহাব কবে সব মাটি কবে দিযেছে।

একথা মনে হতে পাবে যে সমগ্র পবিকল্পনাটা জন কযেক নেতৃস্থানীয লোকেব মধ্যে আবদ্ধ না বেখে আবও অধিক শ্রমিকদেব আগে থেকে জানানো ও বোঝানো উচিত ছিল। কিন্তু তাতে বিপদেব সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি এবং সংবাদ সবকাবেব কানে পৌঁছে যাওযা স্বাভাবিক—সেক্ষেত্রে সবকাবই প্রথমে আক্রমণ কবে সব তছনছ এবং লণ্ডভণ্ড কবে দিত, এবিষযে কোনো সন্দেহ নেই।

কাজেব প্রত্যেকটি খণ্ড ও সমগ্র পবিকল্পনাটা গোপন বেখেও—সাধাবণ মজুবদেব নিযে মোটামুটিভাবে আধুনিক শ্রেণীসংগ্রামেব বৈপ্লবিক বীতিনীতি সম্বন্ধে আবও বিস্তৃতভাবে বাজনৈতিক আলোচনা কবা উচিত ছিল—একথা আজ স্বীকাব কবতেই হবে। একটা কিছু সাংঘাতিক ভাবে কবতে হবে—এই জাতীয কথা সবাইযেব কাছে কানে কানে প্রচাব কবা হযেছে—সাধাবণ সভাযও বিদ্রোহ কববাব ইচ্ছা খোলাখুলিভাবেই বলা হযেছে এবং শ্রমিকেবাও তাতে সায দিযেছে। কিন্তু সেই বিদ্রোহেব আসল রূপটাব সম্বন্ধে যদি পূর্বাহ্নে শ্রমিকদেব মনে একটা পবিষ্কাব ধাবণা জন্মিযে বাখা হতো—পৃথিবীব সকল দেশেব বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেব ইতিহাস ও আবও নতুন উপায় সম্বন্ধে তাদেব সাথে নানাভাবে আলোচনা কবে—তবে উপযুক্ত সমযে যে কোনোও পবিকল্পনাই তাদেব সামনে উপস্থিত কবা হোক না কেন, তা তাদেব কাছে নতুন ও অভাবনীয বলে মনে হতো না , তাবা কোনো প্রকাব বিভ্রান্তি বা বিব্রত বোধ না কবে সেই পবিকল্পনা কার্যকবী কবাব জন্য চটপট প্রস্তুত হযে যেত এবং নেতাবাও তাদেব অনুবর্তী সাধাবণ জনতাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পাবত ও তাব স্বযংশক্তি (initiative) জাগাতে পাবত। অতএব বাজনৈতিক শিক্ষাব ব্যাপাবে যে স্থানীয নেতাবা

অবহেলা করেছে এবং পার্টির নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি বা অবহেলা করেছে—তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অপরপক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রামের কৌশল সম্বন্ধে ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত ও তথাকার পার্টি ইউনিট থেকে কি জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা পার্টির পক্ষ থেকেও দেখা উচিত ছিল। একথা স্বীকার করতেই হবে যে পার্টি এই তদারকের কাজ ভালভাবে করেনি এবং এও সত্য বলে মানতে হবে যে পার্টি স্থানীয় নেতাদের রিপোর্টের সত্যাসত্য যাচাই করে দেখেনি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে উত্তেজনামূলক প্রচারের ও জনতাকে উত্তেজিত করবার ক্ষমতাই বিপ্লবীদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জনতাকে বিপ্লবের কায়দা ও প্রতিটি পদক্ষেপ ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে যেতে হবে—তবেই সত্যকার রাজনীতি শেখানো হবে।

এই অসমাপ্ত রাজনৈতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দোষত্রুটিও দূর করা যেত যদি ইউনিয়ন নেতারা সমগ্র জনতাকে জড়ো করে বাইরে আনার কথাটা খেয়াল রাখত এবং আমাদেরকে সমগ্র জনতার সামনে তাদের কর্তব্য ও পথ সম্বন্ধে যাবতীয় কথা উপস্থাপিত করবার সুযোগ দিত। এটা তারা পারত, কিন্তু করেনি। দমদম অঞ্চল সাময়িকভাবে দখল হয়ে যেত, অতি সহজে, এবং সেই অবকাশে বাকি শিক্ষাটুকুও কত সহজেই না দেওয়া সম্ভব ছিল। দলের শৃঙ্খলা রক্ষার ও নেতৃত্বের ভাগ পরিষ্কার করে অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ পুনর্বণ্টন করে নেওয়া যেত, কেননা জনতা বিপ্লবের মুখে খুব দ্রুত শিখতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা বুঝতে বছরের পর বছর সময় লাগে বিপ্লবের সময় তা মুহূর্তে শিখে নেয়—একথার সাক্ষ্য আমরা প্রত্যেক বিপ্লবের ইতিহাস থেকে পাই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এক্ষেত্রে সেই শুভ সুযোগ আমরা পাইনি। আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল এবং যে পরিমাণ শক্তি যোজনা করা হয়েছিল, তাতে সমবেত জনতাকে একত্র করতে পারলে, কোনো তাড়াহুড়ার প্রয়োজন ছিল না—কারণ শত্রুকে ভয় করবার মতো আশু কোনো বিপদই ছিল না। আমরা খুব সুস্থ মস্তিষ্কে জনতাকে তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিতে এবং ঘটনাস্থলেই বাকি সাংগঠনিক কাজ সম্পূর্ণ করে নিতে পারতাম।

জনতা বিপ্লবের পূর্বেই পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক চেতনা পেতে পারে না—তাদের হাজার কথা শোনানো হলেও তা সব স্মরণ থাকবার কথা নয়—কিন্তু জনতা যদি বিপ্লবের জন্য আঘাত হানতে প্রস্তুত হয় তবে সংগ্রামের মধ্যেই, তার অভিজ্ঞতার ও প্রয়োজনের তাগিদে, পার্টি নেতৃত্বে সেই আগুয়ান জনতার বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশ সাধন করাকে সক্ষম হয়। বৈপ্লবিক চেতনা বৈপ্লবিক আঘাতের মধ্যেই বিকশিত হয় এবং প্রত্যেকটি আঘাত পার্টির পক্ষে জনতাকে পূর্ণ চেতনার পথে পদবিক্ষেপ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। অতএব একথা ঠিক নয় যে শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা সম্পূর্ণ না করে ঐ জাতীয় আঘাত হানতে যাওয়া উচিত হয় নি- বরং ঐ আঘাতের ভিতর দিয়েই বৈপ্লবিক চেতনা জাগানো সম্ভব ছিল। কিন্তু দলপতিদের ও দলের সবলোক এবং অগ্রবর্তী শ্রমিকদের আগে থেকেই যথাসম্ভব সচেতন করতে হবে, না হলে তারা সেই সংঘাত ওঠাতে পারবে না এবং সংঘাতের বৈপ্লবিক তাৎপর্য ও শিক্ষা জনতাকে দিতে পারবে না।

একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে পার্টির সশস্ত্র শক্তি দিয়ে অভিযানটা শুরু করার উদ্দেশ্য হলো—শত্রুকে অতর্কিত আক্রমণে প্রাথমিক জয়টা স্থির করে নেওয়া এবং কতকগুলি সুবিধা প্রথমেই অর্জন করে নেওয়া। কিন্তু তারপর যে ধারায় বিপ্লবকে অগ্রবর্তী করে দিয়ে যেতে হবে, তার মধ্যে ষড়যন্ত্রমূলক গোপনতা বা সাবধানতার স্থান নেই—সেই বিপ্লবের ধারাকে কেবল গণচেতনার ও গণসংগ্রামের উন্মুক্ত বৈপ্লবিক পথেই চালিত করতে হবে। সেইজন্যই বলা হয়—বিপ্লবে ষড়যন্ত্র আছে বটে, কিন্তু সে তার একটা সামান্য অংশ মাত্র এবং ষড়যন্ত্রই বিপ্লব

নয়। গোপনে দিন, তারিখ, পরিকল্পনা ইত্যাদি তৈরি করে, প্রস্তুতির কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারেই কেবল ষড়যন্ত্রমূলক কাজের দরকার আছে ;—কিন্তু প্রধান যে বৈপ্লবিক গতি, অর্থাৎ বিপ্লবকে ক্রমবর্ধমান পর্দায় নিয়ে যেতে যে কৌশলের ও নেতৃত্বের দরকার, সেখানে আর ষড়যন্ত্রের স্থান নেই—বিপ্লবের সাধারণ নীতিই সেখানে প্রযোজ্য—সেখানে গণশক্তিকে চালনা করার ক্ষমতা ও উপায়ই হলো আসল কথা। এই তথ্যকে কারখানার নেতারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি—অভিযানের পূর্বে যে গোপন প্রস্তুতি ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ চলেছিল, অভিযান ঘোষিত হবার পরেও তারা সেই মনোভাব ও অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। তাই তখনও জনতার উপর প্রধান নজর না দিয়ে তাদের সামান্য অস্ত্রপাতির উপরই ভরসা রেখেছিল—যার ফলে তারা চার হাজার বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রামকামী জনতাকে সমবেত করতে অবহেলা করে জনকয়েক অফিসারকে নিয়ে নিজেরাই সময় নষ্ট করেছে—যা পরিকল্পনার মধ্যে ছিলই না বলতে হবে। সাহেবকাটার দিকে নজর দিতে গিয়ে, সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করার যে বিরাট শক্তি হাতের মধ্যে রয়েছে তাকে অবহেলা করা একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়েছে। গণশক্তিকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে আড়ষ্ট করে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তুতির দ্বারা প্রথম অতর্কিত আক্রমণের সাহায্যে গণশক্তিকে জাগিয়ে তোলা ও আরও সুচারুরূপে সংগঠিত সংগ্রামের জন্য সুবিধা করে দেওয়া ছাড়া ষড়যন্ত্রের আর কোনো দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য থাকতে পারে না। আরম্ভ করার জন্য ষড়যন্ত্রের—অর্থাৎ পূর্বপরিকল্পিত পথ ও প্রস্তুতির গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন, তার বেশি নয় ;—এইখানেও বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝতে শ্রমিক নেতাদের গলতি হয়েছিল।

পার্টির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যে এসব কথা বলা হয়নি, বা এবিষয়ে শিক্ষিত করার চেষ্টা হয়নি তা নয়। কিন্তু সব কথার উপর সম্যক নজর দেওয়া ও তার উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার স্বভাব, দুঃখের বিষয় আজও আমাদের চরিত্রে ধাতস্থ হয়নি। অনেক ব্যর্থতার কশাঘাতে আমাদের চরিত্র ও স্বভাব অধিকতর মননশীল, চিন্তাশীল ও গম্ভীর হবে।

অতএব গণশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের অভাব ও কাজ সম্বন্ধে নেতাদের একটা উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের এই অভিযানের ব্যর্থতার প্রথম ও প্রধান কারণ।

(২) পরাজয়ের দ্বিতীয় কারণ হল পার্টি কর্মীদের যথেষ্ট নিয়মানুবর্তিতার অভাব এবং চারিত্রিক উদাসীনতা (Carelessness)। প্রত্যেকের কাজটি ভাল করে বুঝে নেওয়া, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা, সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করা, অবস্থান্তরে বা অবস্থার কল্পিত গতিপথের বিচ্যুতি ঘটলে উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা ঘটনাস্থলেই স্বকীয় নেতৃত্বে পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী কর্মপন্থার পরিবর্তন করা—এই সব স্বভাব ও শক্তি তাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয়নি। তারা কতকটা অটোমেটন বা গতানুগতিকতার দাস হয়ে পড়েছিল—যার জন্য শেষ পর্যন্ত কয়েকটা মারাত্মক ভুল করে বসে। বসিরহাটে যখন তারা পৌঁছায় এবং দখল করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হাতে নেয়—তখন সহসা ত্যাগ করে চলে যাওয়া তাদের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল হয়েছিল। তাদের বোঝা উচিত ছিল যে অপরিকল্পিত ও অনির্দিষ্ট পথে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাওয়া মানে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করা মাত্র। তখনও তাদের হাতে যে লোকবল ও অস্ত্রবল ছিল তা দিয়ে তারা বসিরহাট শহরে নির্বিঘ্নে ঘাঁটি করে বসতে পারত এবং শহরে সভা, শোভাযাত্রা করে নিজেদের উদ্দেশ্য সবাইকে জানাতে পারত। পরে কলকাতা থেকে শত্রুশক্তি এলে তাদের উচিত ছিল তাকে প্রতিরোধ করা, আর তা না পারলে, যে সমস্ত অঞ্চলে আমাদের চাষী আন্দোলন রয়েছে, সুপরিকল্পিত ও সশস্ত্রভাবে সংগঠনের সাথেই সেদিকে সরে পড়া—এবং গ্রামদেশে অবস্থান করে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে ও থানার

বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গেবিলা-সংগ্রাম পবিচালিত কবা। কিন্তু তাবা তা না কবে সহসা সব ভেঙে দিযে চলে যায। চাষীবা তাবপব আমাদেব অনেক গালি দিযেছে—আমবা সশস্ত্র শক্তিতে তাদেব কাছে উপস্থিত না হওযাব জন্য অভিযোগ কবেছে এবং যতটুকু অস্ত্রশস্ত্র তাদেব কাছে নিযে যাওযা হযেছিল তা তাবা লুকিযে বেখে দিযেছে ফেলে দেযনি। যে দু'এক জন তাদেব কাছে আশ্রয নিযেছিল তাদেব নিবাপদে কলকাতায চলে যেতে সাহায্য কবেছে। চাষীদেব কাছে পলাযনেব জন্য সাহায্য না চেযে যদি এক সুসংগঠিত সশস্ত্র শক্তি সেখানে তাদেব সংগ্রামে সাহায্য কবতে যেত তাহলে ২৪ পবগনাব পববর্তী চাষী আন্দোলন চতুর্গুণ শক্তিতে ফেটে পডতে পাবত।

এই ব্যাপাব থেকেও বোঝা যায যে বাজনৈতিক শিক্ষা তখনও পার্টি কর্মীদেব চবিত্রে ধাতস্থ হযে বসেনি—তাদেব উদাসীনতা ও গভীবভাবে চিন্তা কবাব স্বভাবেব অভাব থেকেই এইজাতীয় বিপর্যয ও মতিচ্ছন্নতা ঘটেছিল। বেলগাছিযাব আমর্ড ডিপো লুঠ কবাব কাজ না ঘটাব জন্যও এই জাতীয উদাসীনতা ও নিযমানুবর্তিতাব অভাবই দাযী। আজ যদি জনতা ও পার্টি এই দুটি বিবাট শিক্ষাব কথা না ভাবে তাহলে আবাব তাদেব পবাজয হওযা স্বাভাবিক। আজ প্রত্যেক বিপ্লবীব এবং প্রত্যেক বিপ্লবী দলেব এই দমদম-অভিযানেব তাৎপর্য ও তাব ব্যর্থতাব কাবণগুলি তন্নতন্ন কবে বোঝা দবকাব—অবহেলা বা অহঙ্কাব তাদেব কোনোই সাহায্য কববে না। দমদমেব শিক্ষা প্রত্যেক কাবখানাব প্রত্যেক মজুবেব ভাল কবে বোঝা দবকাব—কাবণ গত কয বছবেব মধ্যে যত বকমেব অভিযান ও আন্দোলন হযেছে, তাদেব মধ্যে দমদম-অভিযান সবদিক থেকে সবচেযে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভাবতীয আন্দোলনেব সমগ্র ইতিহাসে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা, বণকৌশল ও নীতি হিসাবে এত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য ঘটনা বড বেশি নেই। দমদম-অভিযান ব্যর্থ হযেছে বটে, কিন্তু সে এক মহান বার্থতা বলে স্বীকাব কবতে হবে—যাব মধ্যে এমন সব প্রযোজনীয অভিজ্ঞতা, এমন সব বীবত্বেব কাহিনী আছে, যাব থেকে পববর্তী গণঅভিযানকাবীবা প্রচুব মূল্যবান সম্পদ আহবণ কবে নিতে পাবে। আমাদেব ব্যর্থতাব বক্তাক্ত অভিজ্ঞতা দিযে ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দমদম-অভিযান জনতাব বুকে কোনোকালে কোনো নৈবাশ্য আনবে না—ববং জনশক্তিকে সংযোজিত ও পবিচালিত কবতে পাবলে যে মহান কিছু ঘটাবাব শক্তি এই ভাবতেব জনতাবও আছে—এই অভিযান সেই বিশ্বাস ও সম্ভাবনাব ইঙ্গিত কবেছে—যা ভবিষ্যৎ বিপ্লবীব বুকে সাহস ও প্রেবণা জোগাবে। কাজে কাজেই দমদম অভিযানকাবীদেব মনে কোথায়ও পবাজযেব গ্লানি আসেনি—ববং আবও দৃঢ, আবও সচেতন ও আবও অমোঘ আঘাত হানবাব জন্য একটা অতৃপ্ত ও অবদমিত মনোভাব বযেছে। দমদমেব মহান ব্যর্থতা সমগ্র জনতাব বুকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামেব স্বপ্ন জাগিযে বেখেছে।

* * * *

এখন দেখা যাক কম্যুনিস্ট পার্টি এই সময কি কবছে ও কি ভাবছে। বলা বাহুল্য কম্যুনিস্টদেব এদেশীয ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব অশোভন দ্রুততাব সঙ্গে আমাদেব কাজেব নিন্দা কবে ফেলল। অথচ তাবপব, এখানে সেখানে দমদমেব দুর্বল অনুকবণ কবতে ছাডেনি। এলেনবেবীব শ্রমিকেবা কম্যুনিস্ট পার্টিব নেতৃত্বে কাবখানা দখল কবে বসল—হাওডা এবং টালিগঞ্জে এক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধিযে দিল। কাবখানা দখল কবাব মধ্যে যে কি বৈপ্লবিক নীতি থাকতে পাবে তা বোঝা যায না। সবকাব দখল না কবলে যে কাবখানা দখল কবা যায না—এই সত্য তাদের বুঝতে হলো যখন কযেকদিনেব মধ্যেই কাবখানা ছেডে দিযে পালাতে হলো।

সাক্ষাৎভাবে সরকারকে আঘাত না করে নিকটবর্তী মালিকের উপর সমস্ত নজর দেবার অদ্ভুত অদূরদৃষ্টি কম্যুনিস্ট পার্টির একটা আশ্চর্য ব্যাধি। চাষীদেব জমি দখলেব লড়াই যে জমিতে সীমাবদ্ধ হতে পারে না—জমির উপর স্বত্ব স্থাপন করতে হলে যে থানার উপর চাষীদের দখল প্রথমে কায়েম করতে হয়—এই সত্য কম্যুনিস্টদের মগজে ঢোকানো কঠিন। তারই জন্য দেখেছি হাজার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি চাষী-সংগ্রামে, সেই একই সংগ্রামের চেহারা—চাষী জমি ও ধান দখল করছে—পুলিশকে পেছনে রেখে—যেন পুলিসের সঙ্গে লড়াইটা এড়িয়েই জমি দখল করা যায়—এমনি ভাব। পুলিশের সঙ্গে—সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংগ্রামের মধ্যে শত্রুকে আক্রমণ করবার এবং তাদের ঘাঁটিতে গিয়েই তাদের জব্দ করার মধ্যে যে আক্রমণকারী নীতি আছে—কম্যুনিস্ট পার্টির দুর্বল নেতৃত্বে তা কখনও সহজে ঠাঁই পায়নি—আক্রমণ করার চেয়ে আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে ওরা যেন সংগ্রামের সাফল্য সহজ বলে মনে কবে। আসলে তাতে সাফল্যের কোনো কণিকাও থাকে না—অযথা পুলিসের হাতে মার খেয়ে জনতা দমে যায়। এই জাতীয় ঘটনায় কম্যুনিস্ট পার্টিব ইতিহাস আজ বেশ পুষ্ট হয়েছে এবং জনতাকে একতরফা মার খাওয়ানোর মধ্যেই এদের অহঙ্কার ও গৌরব।

যা হোক, দমদম বসিরহাট সংগ্রামের পর জনতার সংগ্রামে সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রয়োজনেব কথা কম্যুনিস্ট পার্টি আর চেপে রাখতে পাবেনি। পলে কলকাতাব নানা কারখানায় ও চাষীদের মধ্যে একটা ব্যাপক আক্রমণাত্মক প্রেরণা জেগে যায়। কাকদ্বীপের লড়াই, হাজংয়ের লড়াই, মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, সর্বত্র একটা বিদ্রোহাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু তাদের ব্যবহারে কম্যুনিস্ট পার্টি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি, সংগ্রামের Technique বা কৌশলের কোনো উন্নতিও দেখায়নি —যেখানে যতটুকু সংগঠন ও গণশক্তি তাদের হাতে ছিল সেগুলিকে অন্ধ-সংগ্রামে অপব্যবহার করেছে—অত্যাচারের পাথরে মাথা ঠুকিয়ে নষ্ট করেছে। আজ ভেবে দেখা দরকার, যদি ওরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করত এবং যদি ওরা বিপ্লবকে পবিকল্পনামূলক নেতৃত্বের পথে নিয়ে আসত—তাহলে আমাদের মিলিত আঘাত কত বড় হতে পারত—দমদম পরিকল্পনার চেয়েও দশগুণ বড় পরিকল্পনা তৈরি করা যেত এবং তা সার্থক করবার মতো শক্তিবও অভাব হতো না। আমরা যেখানেই দেখেছি জনতার শক্তি এতটুকু দানা বেঁধে উঠেছে, সেখানেই আমরা তাকে পরিকল্পিত পথে উন্নততর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে এগিয়ে গিয়েছি—আর ওরা যেখানে যা সংগঠন ও শক্তি পেয়েছে তাকে অন্ধসংগ্রামে লিপ্ত করে পাগলের মতো নষ্ট কবেছে, বিন্দুমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা খাটাবার প্রয়োজন বোঝ করেনি। এই সমস্ত anarchic বা অন্ধ-সংগ্রাম তাদের দলকে ভিতরে ভিতরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে চলেছিল—বহু লোক ভয়ে ভেগে যায়, অনেকে কিছু বুঝতে না পেবে বসে পড়ে এবং আরও অনেকে প্রশ্ন করতে সাহস পায়। ওদের চিন্তাজগতে যে কোনো সংকট আসেনি—তা সত্য নয়। আমরা এখন ওদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল।

এই আলোচনার পূর্বে একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা দরকাব। কম্যুনিস্ট পার্টি ৯ই মার্চ তারিখে সারা ভারতে রেল ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই রেল ধর্মঘট থেকে সাধারণ ধর্মঘট হবে এবং সেই পথেই মজুর নেতৃত্বে দেশে বিপ্লব কায়েম হবে—এই আশাই ওরা করেছিল। ওরা ঠাট্টা করে বলত—দমদম-বসিরহাট জাতীয় সংগ্রামে বিপ্লব নিয়ে খেলা হয় মাত্র—এবার ওরা দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে বৈজ্ঞানিক-বিপ্লব চালু করতে হয়। কিন্তু কার্যত দেখা গেল ৯ই মার্চ কিছুই করা সম্ভব হলো না—ওদের অতবড় তোড়জোড় সহসা লজ্জায় শুকিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে সাবোতাজ করে রেল বন্ধ করার চেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

এই ব্যর্থতাই ওদেব টনক নড়িযে দেয—কেউ কেউ উগ্রপথে মাবধোব কবা ও বোমা, পটকা, এসিড বাল্ব ব্যবহাবে মেতে ওঠে এবং স্থানে স্থানে দমদম অভিযানেব দুর্বল অনুকবণ কবতে লেগে যায।

বহু খণ্ড খণ্ড ধর্মঘট থেকে সাধাবণ ধর্মঘট—সাধাবণ ধর্মঘট থেকে আইন-অমান্যকাবী জনসমাবেশ (Mass demonstration), জনসমাবেশ থেকে ব্যাবিকেড লড়াই, ব্যাবিকেড লড়াই থেকে একদিন সশস্ত্র অভ্যুত্থান বা Insurrection—এই ছিল ওদেব বিপ্লব বিজ্ঞানেব classic rule এবং শেষ কথা। শ্রমিক শ্রেণীব এইপ্রকাব পবেব পব অভিযান ও অগ্রগতিব এমন একটা ছক ওবা কেটে বেখেছিল—দেশকালপাত্র নির্বিশেষে—কিন্তু সব শেষে কার্যকালে দেখা গেল যে ভাবতীয় বিপ্লবেব অভিযানপথ সে ধাবও মাড়াল না। ক্রমবিবর্তনমূলক বিপ্লবেব (evolutionary revolution) এই কল্পনা ওদেব মাথায় চেপে বসেছিল বলে বিপ্লবকে অবস্থানুযাযী পবিকল্পনাব আওতায আনতে ওবা এত দ্বিধা কবত এবং চীন বিপ্লবেব শিক্ষাকে একেবাবে উড়িযে দিতে চাইত। এবই জন্য তেলেঙ্গানায ও ভাবতেব সর্বত্র যেসব চাষী বিদ্রোহ জেগেছিল, ওবা তাব পবিপূর্ণ মর্যাদা দেযনি এবং সেগুলিকে স্থানীয ঘটনা বলে অভিহিত কবা ছাড়া কোনো সর্বভাবতীয তাৎপর্য তাব মধ্যে দেখতে প্রস্তুত ছিল না। এই ধবনেব সংগ্রামগুলিকে কিভাবে গ্রথিত কবে ভাবতীয বিপ্লবেব প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে দাড় কবানো যায— আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল কবে মুক্তিফৌজ গঠন কবা যায—এইসব চিন্তা একেবাবে অগ্রাহ্য। কবে বিপ্লবেব classic পন্থাব স্বপ্নেই ওবা বিভোব ছিল এবং মজুব নেতৃত্ব কাযেম না হওযা পর্যন্ত কোথাযও ক্ষমতা দখলেব বাস্তব পবিস্থিতি দেখতে পাযনি। ফলে তেলেঙ্গানা প্রভৃতি মুক্তপ্রায অঞ্চলগুলিকে কোনো কেন্দ্রীয বা সর্বভাবতীয পার্টিব শক্তি দিযে সাহায্য কবেনি—একমাত্র প্রচাব ছাড়া। যাহোক ৯ই মার্চেব বৈপ্লবিক ধর্মঘটেব আশাভঙ্গেব পব ভাবতীয কম্যুনিস্ট পার্টিব পতন শুরু হলো বলা যায। আস্তে আস্তে তাদেব সংগঠন চূর্ণ হযে যায—ফলে জনতাব সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগও ছিন্ন হযে যায। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলখানায দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি কবে ও অনশন ধর্মঘট শুরু কবে, এই আশায যে বাইবেব জনতা তাতে উত্তেজিত হযে উঠবে। কিছুদিন ধবে এই অদ্ভুত বাজনীতিব পবীক্ষা চলে– ছাত্রদেব দিযে খুব পটকাবাজী ও হৈচৈ কবা হয , কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত স্তিমিত হযে আসে, ফলে তাবা অনশন ত্যাগ কবতে বাধ্য হয। আজ তেলেঙ্গানা ও হাজং, এমনি দু'একটি পকেট ছাড়া আব কোনো সংগ্রাম ওদেব নেই। বর্তমানে ওবা অতীতেব সমস্ত সংগ্রামটাকেই ভুল হযেছে বলে পুবান থিসিসটাকেই বাতিল কবতে চলেছে। বণদিভে নেতৃত্ব শাস্তি পেতে চলেছে এবং এক মধ্যপন্থী নেতৃত্ব কাযেম হতে চলেছে বলে শোনা যায।

সংগ্রামনীতিতে মাওএব অবদান ও নতুনত্ব অস্বীকাব কবা বাতুলতা মাত্র। পেছিযে পড়া দেশে, পবাধীন দেশে, আধা-ঔপনিবেশিক দেশে গণতন্ত্রহীন দমনক্লিষ্ট জনতাব সংগ্রাম প্রথম থেকে এই সশস্ত্র সংগ্রামেব পথে এগুতে পাবে এবং সেই সংগ্রামে নিপীড়িত চাষী ও গ্রাম্য দবিদ্রবা প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে গৃহীত হতে পাবে—মাও সে-তুং একথা কার্যত প্রমাণ কবেছেন। তাছাড়া মাওযেব শ্রেণী সংযোজনা কাল্পনিক বিচাবেব উপব নির্ভবশীল ছিল না। তিনি সেই যুগে তদানীন্তন সবকাবেব বিরুদ্ধে একটা আপসহীন সংগ্রামেব প্রবর্তন কবলেন এবং এই সংগ্রামে যাবাই তাব পক্ষ নিতে প্রস্তুত তাদেবই স্বপক্ষে বাখতে চাইলেন। কোনো শ্রেণী লড়বে কি লড়বে না—তাব কাল্পনিক সম্ভাবনা অথবা অসম্ভাবনা নিযে বৈঠকখানাব তর্ক তিনি কবেননি—একটা সংগ্রাম চালু কবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখে নিযেছেন কাবা সত্যি লড়তে চায

এবং কারা চায় না—এই সংগ্রামটাই তার শ্রেণী বিচারের পরীক্ষাক্ষেত্র। যারা সংগ্রামটার দিকে নজর না দিয়ে পুঁথিগত বিচারের দ্বারা শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক ভূমিকা দেখতে ব্যস্ত তাদের ভুল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি অথচ সংশোধন করার রাস্তাও কম। অপর পক্ষে সংগ্রামের পটভূমিকায় সাময়িক ভুল সংশোধন করে নেবার সুযোগ অনেক—এবং যদি সংগ্রামী কম্যুনিস্ট পার্টি মুক্তিফৌজের গঠনে ও নতুন সোভিয়েট রাষ্ট্রের গঠনে নিপীড়িত শ্রেণীর লোকদের নেতৃত্ব ও সংখ্যা শক্তি সর্বদাই স্পষ্ট ও কার্যকরী করে রাখে, তাহলে নানাজাতীয় দক্ষিণী-বিচ্যুতি দরকার মতো সামলে নেওয়া সম্ভব। প্রথম কথা হলো সংগ্রাম—দ্বিতীয় কথা হলো সংগ্রামী মুক্তিফৌজে কোন শ্রেণীব প্রাধান্য বেশি এবং তৃতীয় সংগ্রামলব্ধ মুক্ত-অঞ্চল ও তার সোভিয়েট সরকারের মধ্যে যে যুক্তফ্রন্ট আছে, তার নেতৃত্বই বা কোন শ্রেণীর হাতে থাকতে পারে। এই সব বাস্তব তত্ত্ব থেকে মাও-সে-তুং-এর কার্যাবলী বিচার করতে হবে—পুঁথিগত ছক কাটা সেকেলে তত্ত্ব দিয়ে তাব বিচার হবে না। তাছাড়া, মাও-সে-তুং-এর সংগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল কি প্রগতিশীল তার বিচার হবে কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে তার সত্যরূপ নির্ধারণে। চিয়াং-কাই-সেক ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত আপসহীন সংগ্রাম চলেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সংগ্রাম যে প্রকৃত শত্রুকেই পবাজিত করতে ব্যস্ত—এই অতিসাধারণ তথ্যটা ভুল করা অসম্ভব। কোনো রাজনৈতিক নীতির ভুল শুধু তাব সংগ্রামহীন তত্ত্বগত বিচারের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না—সংগ্রামশক্তি বাড়াবাব অথবা কমাবার মাপকাঠিতেই তার বিচার করতে হবে। অর্থাৎ মুখে আমরা যতই বামপন্থী হইনা কেন, কার্যত আমাদের এই বামপন্থা কি সংগ্রাম ওঠাতে পাবছে-- তা দিয়েই বিচার হবে আমরা প্রকৃত বামপন্থী কি না। আমাদের সকল রাজনীতিব পরীক্ষা ও পরিণাম হলো বাস্তব সংঘাতে--এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে অথবা শত্রুর প্রধান ঘাঁটির উপর আমাদের আক্রমণ কার্যত চালু আছে, ক্রমবর্ধমান আক্রমণ সংগঠন করা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঠিকই আছি—এই প্রত্যয় খুবই শুদ্ধ। নইলে শুদ্ধতাব আর কোনও মানদণ্ড নেই। অন্ধ্র কমিটির থেকে পলিটব্যুরোর নীতি যতই কেন না বাম বা বিপ্লবী বলে মনে হোক—যদি পলিটব্যুরোর নীতি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে চালু না রাখতে পারে, বর্ধিত করতে না পারে এবং শেষ পর্যন্ত তা পরাজয়ে পরিণত হতে বাধ্য হয়, অথচ ভুল রাজনৈতিক আদর্শ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ্রনীতি যদি সংগ্রামকে দীর্ঘায়ত ও ক্রমবর্ধমান করতে পারে—তাহলে বুঝতে হবে পলিটব্যুরোই ভুল এবং অন্ধ্র কমিটিই শুদ্ধ। কেননা প্রত্যেক পলিসির সার্থকতাই হলো সরকারের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ক্ষমতার বাস্তব হিসাবের মধ্যে।

চাষীদেব সংগ্রামকে বৈপ্লবিক তাৎপর্য দিতে কুণ্ঠা, আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলে কুণ্ঠা, গেরিলাযুদ্ধ চালাতে অসম্মতি, মুক্তিফৌজ গঠনে গাফিলতি, অস্ত্রশস্ত্র ধরতে নারাজ হওয়া—এই সব ত্রুটি পলিটব্যুরো নেতত্বকে কত ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল তা প্রমাণ হলো তাদের সংগ্রামের সম্পূর্ণ পরাজয়ে। তাদের সংগ্রাম যে তারা আজ বন্ধ করে দিয়েছে তা নয়, তারা সংগ্রামশক্তিই হারিয়ে ফেলেছে—তাই কোনো বৈপ্লবিক সংগ্রামকে কোনোদিনই কোনো উল্লেখযোগ্য স্তরে উন্নীত করতে পারেনি এবং জনতার সংগ্রামিক শক্তিকে দীর্ঘায়ত ও শক্তিমান করতে পারেনি। এই ভুল তাদের রুশ বিপ্লবের অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা থেকেই সম্ভব হয়েছে—অথচ রুশ বিপ্লবের সত্যিকার উদাহরণও কার্যত কোথাও যথা সময়ে খাটাতেও পারেনি, বা চায়নি।

এই বিতর্কের গোড়াকার রাজনৈতিক মূলনীতি নিয়েও অন্ধ্র কমিটির সাথে পলিটব্যুরোর মতানৈক্য হয়—সে হলো শ্রমিক নেতৃত্ব, পার্টি নেতৃত্ব ও শ্রমিক একনায়কত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে। অন্ধ্র কমিটির মতে পার্টি নেতৃত্বই শ্রমিক নেতৃত্বের সারবস্তু,—শ্রমিকনেতৃত্ব মানে শ্রমিকদের

সংখ্যাশক্তির নেতৃত্ব নয়—তা হলো শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক আদর্শ ও বৈপ্লবিক দায়িত্ব বোধের নেতৃত্ব এবং শ্রমিক শ্রেণীর এই আদর্শ ও দায়িত্ব (ideology and political programme) কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেই প্রকাশিত—কম্যুনিস্ট পার্টির জীবন শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ ও রাজনীতি দিয়ে তৈরি। অতএব সংগ্রামী কৃষক জনতা ও অপরাপর সংগ্রামী জনতার উপর যদি কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কায়েম হয় তবে ঐতিহাসিক অর্থে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম হলো বলতে হবে—অর্থাৎ সংগ্রামী জনতা যখন কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব মেনে নিল তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে মজুরশ্রেণীর আদর্শ ও কর্মপন্থাই মেনে নিল বলতে হবে। কাজে কাজেই কৃষক সংগ্রামের নেতৃত্ব যদি আজ কার্যত কম্যুনিস্ট পার্টি করতে পারে তবে সেই সংগ্রাম সার্থক হবার পথে কোনো ঐতিহাসিক অন্তরায় নেই—কেননা বিপ্লবের পথে কৃষক সংগ্রামের উপর শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাব ও নেতৃত্ব স্থাপিত হবার উপর সার্থকতার যে উপায় বা Condition নির্ভর করে, তা আজ কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কায়েম হবার ভিতরই পরিপূর্ণ হচ্ছে। অন্ধ্র কমিটির মতে, আজ ভারতের কৃষকদের উপর কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কায়েম হতে চলেছে—অতএব বিপ্লবের অগ্রগতির পথে এই শক্তি যোজনাই যথেষ্ট এবং এর উপর নির্ভর করেই বিপ্লবের সশস্ত্র স্তরে অগ্রসর হওয়া যায় অর্থাৎ গেরিলাযুদ্ধে চাষীদের নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া যায়—শহরে শ্রমিকরা বৈপ্লবিক আঘাত না দিতে পারলেও। আর তাছাড়া, মজুর শ্রেণীর একনায়কত্ব সংগ্রামের প্রথমেই কায়েম হতে পারে না এবং নয়াগণতান্ত্রিক স্তরে তার কোনো কথাই ওঠে না— বিপ্লব যখন সমাজতান্ত্রিক স্তরে উপনীত হবে তখনই শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব বা Dictatorship of the Proletariat (in alliance with the poor peasantry) কায়েম করবার প্রত্যক্ষ দাবি ও দায়িত্বের কথা উঠতে পারে—আজ নয়।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও একনায়কত্বের মধ্যে যে স্তরগত পার্থক্য আছে, সেকথা অবশ্য পলিটব্যুরো অস্বীকার করেনি—কিন্তু পলিটব্যুরো অন্ধ্র কমিটির মজুর নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করে। পলিটব্যুরোর মতে পার্টি নেতৃত্ব ও শ্রমিক নেতৃত্ব এক কথা হতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ ও কর্মপন্থা গৃহীত হলেই শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম হলো না— সংখ্যাগতভাবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সাংগঠনিক নেতৃত্বই শ্রমিক নেতৃত্ব, অর্থাৎ যে অবস্থায় সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে নেমেছে ও নিজেদের সংগ্রামে চাষীদের টেনে আনতে পারছে—সেই অবস্থায় শ্রমিক নেতৃত্ব পরিপূর্ণ হলো বলতে হবে। অতএব শ্রমিক শ্রেণীর যে অগ্রবর্তী অংশকে নিয়ে যে কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সেটাই শ্রমিক নেতৃত্ব নয়—সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে ও সাংগঠনিক শক্তিতে তার সংগ্রামিক নেতৃত্ব যখন স্থাপিত করতে পারবে তখনই শ্রমিক নেতৃত্ব কায়েম হলো বলা যায়।

পলিটব্যুরোর কাছে এই প্রকার মজুর নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ বাস্তব ইঙ্গিত হলো এই যে চাষীদের উপর পার্টি নেতৃত্ব কায়েম হলেও তাতে মজুর নেতৃত্ব কায়েম হয়নি—অতএব বিপ্লব বা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার Condition বা উপায় বা শক্তিযোজনা পূর্ণ হয়নি এবং চাষীদের উপর পার্টি নেতৃত্বের মাপকাঠি দিয়েই বিপ্লবের সশস্ত্র স্তর নির্ধারিত হয় না। সমগ্রভাবে শ্রমিকদের আন্দোলনে টেনে নামাতে না পারলে এই মজুর নেতৃত্ব স্থাপিত হতে পারে না এবং যেহেতু বর্তমান বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক পটভূমিকায় করা হবে, যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর সামগ্রিক নেতৃত্ব প্রথমত কার্যকরী করে তৈরি করতেই হবে। পলিটব্যুরোর মতে মজুরেরাই আজকের যুগে বিপ্লবের নেতা ও চালিকাশক্তি, চাষীদের চালিকাশক্তি হিসাবে ধরলে চলবে না। তাদের উপর কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব স্থাপিত হলেও না। রুশ বিপ্লবের নজীর দেখিয়ে পলিটব্যুরো বলছে যে

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব বলতে পার্টি নেতৃত্বই বোঝায়নি—সেখানে বিপ্লবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী সমগ্র জনতার উপর বাস্তব নেতৃত্ব করেছে এবং সেই বিপ্লব সার্থক হয়েছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারতেব শ্রমিক শ্রেণী সমগ্র ভাবে রাশিয়ার মতো তুলনামূলক শক্তি ও সংগ্রাম ওঠাতে পারছে এবং সমগ্র জনতার উপর বাস্তবে নেতৃত্ব করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবের স্তর গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম বা সামগ্রিক সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংঘাতের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারছে না। চাষীদেব নিয়ে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে বিপ্লবে এগিয়ে যাওয়ার উপব ঝোঁকটাকে পলিটব্যুরো একটা সুবিধাবাদী রাস্তা বলে আখ্যা দেয় এবং তারই জন্য নাকি অন্ধ্র কমিটিকে সমাজতন্ত্রের বদলে নয়াগণতন্ত্রেব কথা বলতে হয় ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল এই বিভাগ টানবার প্রেরণা জাগায়।

পার্টি নেতৃত্বেব চেয়েও মজুর নেতৃত্বের উপর সাংগঠনিক জোর দেবার মধ্যেও মজুরদের বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা দেবার মধ্যে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব বার বার উল্লেখের মধ্যে মনে হবে পলিটব্যুরো বুঝি সত্যিকার বিপ্লবী এবং অপরপক্ষ আপসকামী। এই জাতীয় চমকপ্রদ ও বাম-ধ্বনির মধ্যেই সত্যিকাব বিপ্লবী কারা তা বোঝাবার চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবে মজুর প্রাধান্য ও সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তার আড়ালে পলিটব্যুরোর যেটা সাফাই করার উদ্দেশ্য সেটা হলো এই যে চাষীদের নিয়েই বিপ্লব কবতে যাওয়া কম্যুনিস্ট পার্টির উচিত হবে না এবং শহবেব মজুরকে বিপ্লবের পথে সবচেয়ে অগ্রগামী শ্রেণী হিসাবে তৈরি করতে হবে। ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে গণচেতনা সর্বত্র সমান তালে এগিয়ে আসছে না—কোথাও তা সশস্ত্র সংঘাতে পবিণত হচ্ছে (যেমন তেলেঙ্গানায়) আবাব কোথাও বা তা মামুলি প্রাথমিক দাবি-দাওয়ার উপর ক্ষীণপথে শামুকেব গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। অর্থাৎ যেখানে যেমন স্তর সেখানে সেইরূপ পথ নিতে হবে—যেখানে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন প্রত্যক্ষসংগ্রামে উপনীত হচ্ছে সেখানেও পার্টিকে নেতৃত্ব কবতে হবে, আবার যেখানে (যেমন শ্রমিক আন্দোলনের অনেক ক্ষেত্রে আজও ট্রাইব্যুনালেব কোর্টে শ্রমিক দাবিদাওয়া নিয়ে কম্যুনিস্টদের হাজির হতে হচ্ছে) আইনসঙ্গত স্তর অতিক্রম করতে পারেনি সেখানেও পার্টিকে নেতৃত্ব করতে হবে—আইনী গণ্ডীর আওতার মধ্যেই। আন্দোলনের ক্ষেত্রে এইসব Specific Condition বা বিশিষ্ট ও বিভিন্ন স্তরগুলি উপেক্ষা করে কেবল সংগ্রামিক সাধারণ শ্লোগানগুলির উপরই নির্ভর করলে চলবে না—কিংবা সবক্ষেত্রেই বিপ্লব বিপ্লব বলে চেঁচালে চলবে না—অথবা প্রাথমিক স্তরগুলি উপেক্ষা করলে চলবে না ; কেননা অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামেব মধ্যে কোনো চীনের দেয়াল দিয়ে ভাগ করা নেই, ববং আজকের অর্থনৈতিক সংগ্রাম কালকেই রাজনৈতিক সংগ্রামে পবিণত হবার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। মোট কথা অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র আজও শেষ হয়নি—বহুস্থানেই তা আইনসঙ্গত স্তরেই লড়তে হবে এবং সেসব অবহেলা করে কেবল বাজনৈতিক সংগ্রামের মহড়া দিলেই চলবে না—কারণ জনগণেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপব নির্ভব না করার দরুন জনতার সঙ্গে যোগযোগ হারিয়ে যেতে পারে। এই মজুর নেতৃত্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক স্তর ও জনতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব উপর পলিটব্যুবো যে জোব দিচ্ছে তাব প্রকৃত তাৎপর্য, উদাহরণগুলির বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণের উপর পাওয়া যাবে না—পাওয়া যাবে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটা বোঝবার চেষ্টার মধ্যে। পলিটব্যুরোর একটি লাইন উদ্ধৃত করে আমরা তাদের আসল উদ্দেশ্যটা বোঝবার চেষ্টা করি। পলিটব্যুরো বলেছে "Ordinary party members would not like to speak of Telengana and filing the workers' case before tribunal in the same breath—and yet, life, the reality of class struggle is such that the

party which wields arms in Telengana, files cases before the industrial tribunals in Calcutta and Bombay অর্থাৎ পার্টির সাধারণ সভ্যরা একই সাথে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম ও শ্রমিকদের ট্রাইবুনালের দুয়ারে ধরনা দেবার নীতিকে গ্রহণ করতে রাজি নয়, কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা যা দেখি তা হলো এই যে যে পার্টি তেলেঙ্গানায় অস্ত্র ধারণ করেছে সেই পার্টিই কলিকাতা ও বোম্বাইতে শ্রমিকদের লড়াইয়ে ট্রাইব্যুনালের কোর্টে বিচারপ্রার্থী হিসাবে উপস্থিত হচ্ছে। এই উক্তির মধ্যে পলিটব্যুরো বাস্তবতার পবিত্র নাম নিয়ে নিজেদের প্রকাণ্ড রাজনৈতিক দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করছে। এমনি ধরতে গেলে মনে হবে পলিটব্যুরো খুব practical বা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করছে এবং সংগ্রামের specific task বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দায়িত্ব ও বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কর্তব্যগুলি যথাস্থানে যথাযোগ্যভাবে চালিত করবার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু আসলে এই উক্তির মধ্যে তাদের মনোভাবের একটা ছবি পাওয়া যায়। কিষান ক্ষেত্রে যেমন তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র সংগ্রাম চলতে পারে এবং পার্টি তা করছে– কিন্তু শ্রমিক কেন্দ্রে, যেমন কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে শ্রমিক আন্দোলনের স্তর এখনও ট্রাইবুন্যালের বিচারের স্তর থেকে অগ্রবর্তী হয়নি তাই জোর করে তা অতিক্রম করতে যাওয়াও অনুচিত—কেননা শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো সাধারণ রাজনৈতিক শ্লোগান বা সংগ্রাম সম্ভব নয়। তেলেঙ্গানা বা গ্রামের চাষীদের যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে কলকাতা বা বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের এতদিনের এত লড়াইয়ের পরেও, সে চেতনা বা অভিজ্ঞতা নেই? কলকাতা বা বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের চেতনা এতই নিম্নস্তরের যে তা দিয়ে তাদের ট্রাইব্যুনালের দুয়ার পর্যন্ত ছাড়া আর বেশিদূরে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এজাতীয় বিশ্লেষণ ওদের পার্টির লোকেরা কি করে হজম করেছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কলকাতা ও বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা এত নিম্নস্তরের—এই ধারণা পোষণ করা মানে আজকের বিপ্লবে শ্রমিক নেতৃত্ব কায়েম করবার বুলি ধরে রাখার ঠিক উল্টো কথা। অর্থাৎ বিপ্লবে শ্রমিক নেতৃত্ব চাই, আর বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা এত নিম্নস্তরের যে ট্রাইবুন্যাল পর্যন্ত তার দৌড়—এই দুই পরস্পর বিরোধী কথার অর্থ এই—মজুর নেতৃত্ব চাই অথচ মজুর নেতৃত্ব নেই, তার মানে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়নি এই কথা এসে যায়। সেই জন্যই কম্যুনিস্ট পার্টি কোনো বৈপ্লবিক সংগ্রামের কার্যক্রম গ্রহণ করতে এত দ্বিধা করেছে এবং বার বার আমাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম মজুরদের ট্রাইব্যুনাল সংগ্রামের দ্বারা কতটুকু উদ্বুদ্ধ হতে পারে? মজুর শ্রেণীকে দিয়ে এজাতীয় ট্রাইব্যুনালী লড়াই (!) করালে চাষীদের আন্দোলন তো জোরদার হয়ই না বরং তাদের নিরুৎসাহ করে মাত্র। এই হচ্ছে পলিটব্যুরোর মজুর নেতৃত্বের নমুনা এবং মজুর শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকার বিশ্লেষণ—এবং এরই উপর নির্ভর করে পলিটব্যুরো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছিলেন। এই প্রকার বিচারে তারা শ্রমিক শক্তিকে অতি কদর্যরূপে অপরঞ্জিত (underestimate) করেছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত থিওরির নজিরে তোতাপাখির মতো মজুর শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও ভূমিকা সর্ব অবস্থায়ই অতিরঞ্জিত করেছে। মুখে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকার অতিরঞ্জন আর কাজে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকার অপরঞ্জন হলো পলিটব্যুরোর নেতৃত্বের কৌশল। অথচ কলকাতা ও বোম্বাই-এর মজুরদের সত্যিকারের চেতনা একেবারেই অত নিম্নস্তরের ছিল না—শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে কলকাতার মজুর ও বোম্বাই-এর মজুর একেবারে নগণ্য ভূমিকা পালন করেছে একথা বলা ভুল, এমন কি সম্প্রতি তারা রাজনৈতিক সংগ্রামের তাৎপর্যও যথেষ্ট বুঝতে পারছিল। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের নিয়ে কোনো সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগ্রামত করায়ইনি বরং কেবল

রাজনৈতিক সংগ্রাম এড়িয়ে ও স্থগিত রেখে চলেছে—ফলে মজুরদের দুর্বলতা বেড়েই চলেছে এবং যার জন্য এই পলিটব্যুরো চালিত কম্যুনিস্ট পার্টিই দায়ী।

আসল কথা পলিটব্যুরো নেতৃত্ব কোনো সত্যিকার বৈপ্লবিক প্রোগ্রাম নেয়নি বলেই —কি চাষী, কি মজুর সকলের শক্তি ও চেতনাকেই তারা অপলঞ্জিত করেছে।

* * * *

এখন আমরা কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি নির্ধারণগত সংকটের বর্তমান পটভূমিকায় প্রায় এসে গেছি। তাদের এই বর্তমান সংকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কেননা এই বোধহয় প্রথম ওদের মার্কসিজম-লেনিনিজমের মূলসূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন হয়েছে—এর আগে ওরা কতকগুলি বাজারে বুলি ও মামুলি চিৎকারের উপর কম্যুনিজমের তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছিল। মাত্র এখনই ওদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে বলতে হবে—যেহেতু নানা ব্যর্থতা ওদের মূর্খের স্বর্গে এতদিনে অশান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের মধ্যেই যে নীতিগত সংকটের বীজ উপ্ত হয় এটা ওদের খেয়াল ছিল না। ওরা মনে করেছিল অতীতে যা সংস্কারবাদ অভ্যাস করা হয়েছে তা তেমন কিছু মারাত্মক নয়, অতীতে পার্টি কমরেডদের রাজনৈতিক চেতনায় যে কিছু মাত্র লেনিনিজম ছিল না এবং তার জন্যও ভবিষ্যতের কার্যক্রম চালু করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু অতীত যে এত শক্তিমান এবং অতীত সংস্কারবাদ যে অত সহজে মিলিয়ে যেতে পারে না—যার ইঙ্গিত আমরা পূর্বেই করেছি—তা এখন সর্বগ্রাসীরূপে অনেকের চোখে প্রতিভাত হয়ে উঠছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে ওদের রাজনৈতিক প্রস্তাব বা থিসিসে বিপ্লবের রাস্তা, কর্মপন্থা ও নির্দেশ সম্বন্ধে একটিও কথা ছিল না—এবং ওদের কংগ্রেসে তা নিয়ে এতটুকু আলোচনাও হয়নি। ওদিকে ওদের থিসিস পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার ওদের দলের উপর প্রবল আক্রমণ শুরু করে এবং ওরা তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিক্ষিপ্ত সংগ্রামের পথে এগোতে বাধ্য হয়। কি ভাবে সংগ্রাম চালু হবে তার কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা না করেই সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হলে তা অন্ধ সংগ্রাম হতে বাধ্য। তখনো ওদের Strategy ও Tactics (রণনীতি ও কৌশল) ধার্য হয়নি অথচ লড়াই করতে হবে। লড়াই চালু হয়ে গেল। শ্রেণীসংগ্রাম যা সাধারণ অবস্থায় চলে থাকে, তাকেই আর একটু গরম বুলির রং লাগিয়ে চালু করল কোনো সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রোগ্রাম তৈরি হলো না। কিন্তু লড়াইয়ের পথে নেমে ওদের কর্মীদের আর এ প্রশ্ন না উঠিয়ে চলা সম্ভব হলো না, ধীরে ধীরে দলের নানান কোণে নানা রকমের প্রশ্ন উঠতে লাগল—কোনো নির্দেশ পূর্ব থেকে না থাকার দরুন ওদের থিসিসের ব্যবহার যার যেমন ইচ্ছে তেমনি করতে লাগল। এরই মধ্য দিয়ে মতানৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্যে ওদের একটা মৌখিক একমত দেখা গিয়েছিল, যেন ওরা সত্যিই রাতারাতি সবাই সংস্কারবাদ থেকে মুক্ত হয়ে বিপ্লবী হয়ে গেল এবং কারো কোনো মতানৈক্য রইল না—এমনকি স্বয়ং যোশীর পর্যন্ত না। সেই মতৈক্যের ও বৈপ্লবিক ঐক্যের (Revolutionary Unanimity & Party Solidarity) স্বপ্ন সংগ্রাম লাগার সাথে সাথেই চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে লাগল এবং সংস্কারবাদ নানান অছিলায় নানান ভঙ্গিতে প্রত্যেক গ্রুপের মধ্যেই প্রকাশিত হতে লাগল।

প্রায় আটমাস পরে ওদের পলিটব্যুরোর অধিবেশন বসে এবং এইসব নীতিগত প্রশ্নের উপর একটা নোট তৈরি হয়, যা Notes on Strategy & Tactics বলে আজ খ্যাত। এই নোট

অত্যন্ত উপাদেয ও গুরুত্বপূর্ণ একখানি বাজনৈতিক দলিল যাব মধ্যে এমন সব কথা খুব জোবেব সঙ্গে প্রকাশিত হযেছে যা থিসিসেব মধ্যে লুকিযেছিল এবং যাব মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বেব জোবালো বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হযেছে। আমবা এই নোটেব বিশদ আলোচনা কবব—কেননা এব ভিতব গুরুত্বপূর্ণ বাজনৈতিক কথাব উত্থাপন কবা হযেছে—যাতে আমাদেব নীতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচাবেব স্থান বযেছে। এই নোটেব মধ্যে যে সব বাদানুবাদেব অবতাবণা কবা হযেছে ও যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষযেব সূচনা বযেছে তা শীঘ্র মিলিযে যাবাব নয এবং তাব ঐতিহাসিক পবীক্ষা আবো দূব ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চলতে বাধ্য।

এই নোটে প্রথমে দেখানো হযেছে যে তাদেব বাজনৈতিক থিসিস মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি ববং ঘটনাব সংঘাতে আটমাস পবে তাদেব বক্তব্য আবও দৃঢ সমর্থন পেযেছে।

তাবপবই আসল বাদানুবাদেব ও অন্তর্দ্বন্দ্বেব আলোচনা শুরু হয এবং শেষ পর্যন্ত এই বাদানুবাদেবই বিচাব চলতে থাকে। পলিটব্যুবোব তৎকালীন বণদিভে নেতৃত্বেব সাথে অন্ধ্র প্রদেশিক কমিটিব বাজনৈতিক দ্বন্দ্বই এই নোটেব বক্তব্য বিযয। আজ যখন এই পলিটব্যুবোব নেতৃত্ব খতম হতে চলেছে এবং অন্ধ্র নেতৃত্ব কাযেম হতে চলেছে তখন বুঝতে হবে এই দ্বন্দ্বেব তাৎপর্য ওদেব পক্ষে এবং দেশেব পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ– অতএব এবিষয়ে আজ দীর্ঘ আলোচনা মোটেই অপ্রযোজনীয হতে পাবে না। কম্যুনিস্ট পার্টিব নতুন নেতৃত্বেব জন্ম কথা ও পটভূমিকা মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবেই। এইখানেই ওদেব ভবিষ্যৎ সন্ধান কবতে হবে। নতুন নেতৃত্বেব নবজাত শিশুব জন্ম দিযেই তাব ভবিষ্যৎ বিচার্য নয কেননা দেশ ও পবিস্থিতিব ঘাতপ্রতিঘাতে এই নতুন নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত কি রূপ নেবে তা তাব জন্মকথা থেকেই একমাত্র বোঝা সম্ভব নয—তথাপি আমবা বুঝতে চেষ্টা কবব দেশেব বাজনীতিব উপব এই নতুন নেতৃত্ব কি জাতীয প্রভাব বিস্তাব কবতে চাইবে। দেশেব বুকে সর্বদাই নানাজাতীয শক্তি চালু থাকে—কোনোটা বৈপ্লবিক, কোনোটা সংস্কাবপন্থী আবাব কোনোটা পবিষ্কাব প্রতিক্রিযাশীল - এই তিন জাতীয শক্তিব কোনটাব উপব নতুন নেতৃত্ব ভব কববে তা অনেকটা নির্ভব কবে তাব জন্ম সত্তা দিযে।

Strategy ও Tactics সম্পর্কিত দলিলে কম্যুনিস্ট পার্টিব পলিটব্যুবো দলেব উপব সবকাবি অত্যাচাবেব ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিযেছে তা নিযে বিশদ আলোচনা কবে। সাধাবণ ভাবে সাধাবণ কর্মীবা অত্যাচাবেব মুখে নৈতিক বল বজায বাখতে পাবলেও—অনেকক্ষেত্রে যে ভাঙন দেখা দিযেছে তাব তীব্র সমালোচনা কবে। এই ভাঙ্গনেব রূপ প্রথমতঃ দুই প্রকাবেব।

প্রথম রূপ হলো তাব পবিষ্কাব পলাযনপবতা। এমন কি বহু নেতৃস্থানীয ব্যক্তিবাও অত্যাচাব ও সংগ্রামেব মুখে টেকে না ও ভযে দলত্যাগ কবে—একথাবও উল্লেখ কবে।

যাবা থিসিসেব মর্ম গ্রহণ কবেনি ও ভিন্ন থিসিস দাখিল কববাব তালে ছিল, যাদেব দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ নাকি কখনো কখনো বামপন্থী উগ্রতাবাদেব রূপ ধবেও অগ্রসব হতো তাদেব এই ধবনেব বাজনৈতিক সুবিধাবাদ দ্বিতীয পলাযনপবতারূপে দেখা দেয। এই বাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও পলাযনপবতাব প্রতিনিধি নাকি অন্ধ্র প্রদেশিক কমিটি, যাবা অন্ধ্র ডকুমেন্ট বলে পাল্টা দলিল পেশ কবে যা মূল থিসিসেব বিবোধী।

পলিটব্যুবোব মতে দলেব মধ্যে ভাঙনেব ও সুবিধাবাদী পতনশীলতাব মূলে বযেছে পার্টি সংগঠনেব শ্রেণীগত ভিত্তি। অতীতেব সংস্কাববাদ পার্টিব গঠনে গুরুতব গলদ সৃষ্টি কবে গিয়েছে। বিশেষ কবে মধ্যবিত্ত ও ধনী কৃষকদেব সন্তানসন্ততিতে ভবা এবং শ্রমজীবী মজুব

শ্রেণীব সংখ্যালঘুতাব জন্য অন্ধ্র ও বাংলাব পার্টিতে সুবিধাবাদেব ও সংস্কাববাদেব শ্রেণীগত ভিত্তি পার্টিব মধ্যে পুবোমাত্রায বিদ্যমান ছিল। এবই জন্য যখন সবকাবি অত্যাচাবেব স্টিমবোলাব পার্টিব বুকেব উপব দিযে চলতে শুরু কবে তখন একদল ভযে পালায এবং অপব দল বাজনৈতিক থিসিসেব নির্দেশ অবহেলা কবে অথবা তা এড়িযে সুবিধাবাদী পথ অনুসবণ কবে ও নতুন পথেব সন্ধান দিতে থাকে—যে পথ পুবাকালীন যোশী নেতৃত্বেব দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আব কিছুই নয। পলিটব্যুবো আবও বলে যে যেখানে যেখানে পার্টিব মধ্যে শ্রমিক ও খেতমজুব জাতীয গবিবদেব প্রাধান্য বেশি—যেমন কেবালা ও তামিলনাদে, সেখানে সবকাবি অত্যাচাব কোনো ত্রাস সৃষ্টি কবতে পাবেনি—কিন্তু বাংলা ও অন্ধ্রে এজাতীয দুর্নীতি অত্যন্ত প্রবল হযে উঠেছে।

এইখানে আমাদেব একটু বক্তব্য আছে। বণদিভে নেতৃত্ব দলেব নৈতিক শক্তিব পবীক্ষাব যে মানদণ্ডটি বচনা কবেছেন তা একটু অদ্ভুত। পার্টিকে ও পার্টি পবিচালিত জনতাকে যেন প্রবল অত্যাচাবেব মুখে ফেলে বিচাব কবতে হবে কাবা টিকলো আব কাবা ভাগলো। একতবফা অত্যাচাব ও মাবেব মুখে জনতাব ও পার্টিব সাধাবণ সভ্যদেব মনোবল সর্বদাই বেড়ে যেতে পাবে না বব, তা ভেঙে যাওযাই স্বাভাবিক। বিপ্লবেব নৈতিক বল সার্থক সংগ্রামেব মধ্যে বাড়িযে নিতে হয। তাবই জন্য লেনিন বলেছিলেন জনতাকে অযথা মাবেব মুখে ফেলে দিতে নেই। জনতাব চোখে সার্থক সংগ্রামেব চিত্র দেখাতে হবে, জযেব পব জযেব সম্ভাবনা দেখাতে হবে তবেই জনতাব এবং পার্টিব দৃঢতা ও সংগ্রামশক্তি বাড়বে। জযেব পব জয ত দূবেব কথা—কোনো একটা জযযুক্ত আংশিক সংগ্রাম এই নেতৃত্ব কোথাও দেখাতে পেবেছিল কি? জনতাকে মাব খাওযানোব পবিবর্তে মাব দেবাব সুযোগ সংগঠিত কবা ও তাব কৌশল শিক্ষা দেওযা হযেছিল কি? সবকাবেব একতবফা আঘাতেব বদলে প্রত্যাঘাতেব কোনো বাস্তব প্রোগ্রাম কম্যুনিস্ট পার্টিব ছিল কি? এমন কি সংগ্রামেব কোনো বৈজ্ঞানিক পথ জনতাব সামনে বেখেছিল কি? মোটেই না—একেবাবেই না—কোথাও না। আক্রমণ কবা যে আক্রান্ত হওযাব চেযে ঢেব বেশি ভাল নীতি অধিকন্তু আত্মবক্ষাবও একটা প্রধান উপায, এবং জনতাব আক্রমণ কবাব ক্ষমতাব উপবেই বিপ্লবেব সার্থকতা নির্ভব কবে, কেননা বিপ্লব সাধাবণত আক্রমণমূলক। এই অতি সাধাবণ ও প্রাচীন সত্যটাকে কম্যুনিস্ট পার্টি চিবকাল অগ্রাহ্য কবে এসেছে—জনতাব সামনে কোনোদিন কোনো Positive প্রোগ্রাম দেযনি। সংগ্রামে কম্যুনিস্ট পার্টি সর্বদাই জনতাকে আক্রান্তপক্ষ বানিযে বেখেছে এবং সর্বদাই সবকাবকে আক্রমণ কবতে সুযোগ ও সময় দিযেছে। তাব কাবণ কম্যুনিস্ট পার্টি বিপ্লবেব নীতি সম্পর্কে কখনো কোনো শিক্ষা নিজেদেব জন্যেও বাখেনি এবং জনতাব জন্যেও বাখেনি। ধবি মাছ না ছুই পানি গোছেব সংগ্রামকে ওবা ছুঁযে থাকত—বলিষ্ঠ হাতে ও দৃঢচিত্তে তা কখনও গ্রহণ কবেনি এবং পবিপূর্ণ দাযিত্ব নিয়ে জনতাকে সম্মুখ সংগ্রামে পবিকল্পনানুযাযী অগ্রসব হতে বলেনি।

অতএব পলিটব্যুবোব কাছে একটি মাত্র চিত্রই বর্তমান এবং সেইজন্যেই তাব মধ্য থেকেই এই বিচাবেব চেষ্টা—অর্থাৎ জনতা ও পার্টিব সংগ্রামশীল কর্মীবা মাবেব মুখে টিকতে পাবছে কিনা—এবং যদি না পাবে তবে নিশ্চয তাবা পাতিবুর্জোয়া—যেন শ্রমিক ও খেতমজুবেবা কখনও ক্রমাগত মাবেব মুখে পালায না বা তাদেব মনোবল ভেঙে যায না। মাবেব মুখে দাঁড়াতে পাবা না পাবাব মধ্যে মূলগত কোনো শ্রেণী বিচাব নেই এবং এ ধবনেব পবীক্ষানীতিতে অতিবিক্ত সবলতা বা Simplicity আছে। যদি কেবালাব ও তামিলনাদেব গবিব পার্টি কমবেডদেব সংগ্রামশক্তি ও সহ্যশক্তি এতই প্রচুব তবে তাদেব আজ আব কোনো সংগ্রাম নেই

কেন? যদি অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানায় পার্টি কেবলমাত্র সুবিধাবাদী পাতিবুর্জোয়ায ভরা থাকাব জন্য দুর্বলতা আসতে বাধ্য—তবে যা কিছু সংগ্রাম তা কেন আজও পর্যন্ত কেবলমাত্র অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানায চালু আছে এবং কেন তা কেরালার মতো মুছে যায নি? মুছে যায়নি, ভেঙে পড়েনি তার একমাত্র কারণ হলো এই সেখানকাব সংগ্রামশীল জনতা ও পার্টি কমরেডবা সংগ্রামের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে নিয়েছে যেখানে আত্মরক্ষা কবার চেষ্টা চলে ও যেখানে মনোবল রক্ষা করা চলে—কেননা তারা লড়াই কববার মতো, প্রত্যাঘাত দেবাব মতো সশস্ত্রশক্তি ও গেরিলাবাহিনী সেখানে গড়তে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু যেখানে জনতার—সে শ্রমিকই হোক বা খেতমজুরই হোক—সেই সংগ্রামশক্তি দানা বাঁধতে পারেনি, যেখানে লড়াই করবার কোনো কায়দা ও কৌশলই আয়ত্ত করতে পারেনি সেখানে তাবা ভেঙে গিয়েছে ও মুছে গিয়েছে। অতএব কেবলমাত্র অত্যাচার সহ্য করার মধ্যেই মনোবলের জন্ম বা বৃদ্ধি ব্যাপকভাবে হতে পাবে না—পারে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো নিম্নতম সঙ্গতি ও প্রতিআক্রমণ বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা ও কৌশলের মধ্যে। কম্যুনিস্ট পার্টি সর্বভারতে এই বিধবাব সতীত্ব পরীক্ষার নীতির মতো জনতার মনোবল পরীক্ষা কবতে চেয়েছিল—অর্থাৎ সর্বত্র জনতাকে একতরফা মাব খাইয়েছে, তাদের সংঘশক্তিকে চুরমার হতে দিয়েছে এবং তারপর হয়ত এখন সাফাই গাইবে যে, যে জনতা সরকারেব এই প্রাথমিক আঘাতেই দাঁড়াতে পারল না, হটে গেল সে জনতা আরও আঘাত আরও গুরুতব আঘাত সহ্য করবে কি কবে? অতএব লড়াই আমাদের খতম—কেননা জনতা কাজের নয়, এমনকি চীনাদেব পদধূলির যোগ্যও নয় ইত্যাদি। মাও-সে-তুং বিশ বছর ধরে লড়াই করেছে, কত জয় পবাজয় তাকে ভুগতে হয়েছে, জনসাধারণকে কত দুঃখ বহন করতে হয়েছে এই বিশ বছব ধরে---আব ভারতের জনতা একটি বছুব অত্যাচার ও দুঃখ সহ্য করতে পারল না!—এমনিই হযত তাদেব কটাক্ষপাত। কিন্তু মাও-সে-তুং জনতাকে ক্রমাগত মাবই খাওযাযনি—জনতাকে বক্ষা কবতে—জয়ী কবতেই তার বিশ বছবের সংগ্রাম চলেছে—সংগ্রামের প্রত্যেক স্তবে বৈজ্ঞানিক উপাযে পথ বাৎলে চলবার জন্য চিন্তার অবধি ছিল না—মাও-সে-তুং কখনও দাবিত্বহীনেব মতো জনতাকে খামখেয়ালীভাবে শত্রুর গুলির সামনে এগিয়ে দেযনি বা একটা প্রাণও অযথা নষ্ট হতে দেয়নি। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের দুঃখকষ্ট সহ্য কবার ক্ষমতা জনতাকে ও পার্টিকে অর্জন করতেই হবে—কিন্তু সেই ক্ষমতা ক্রমাগত মার খাওযালেই তৈরি হয না—দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের সংযোজনা ও ক্ষেত্র তৈরি করার উপরেই সেই কঠিন সহ্যশক্তি ও মনোবল সৃষ্টি হতে পারে।

অবশ্য অনেক লোক যে সংগ্রামের নামে এবং প্রথম চাপেই পালাবে তা আমবা জানতুম। কেননা ওদের দলের সংস্কারবাদী যুগে যে সমস্ত নরমপন্থী লোক ও নেতা ঢুকেছিল তারা যে ওদের থিসিসের তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারেনি ও নেহাৎ কাপুরুষ বলে পরিচিত হবার ভয়েই সভায় উচ্চবাচ্য করেনি—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চুপ মেরে গিয়েছে ও সংগ্রামেব মুখে পালিয়েছে, যা খুবই স্বাভাবিক। কোনো কোনো চতুর লোক যে ভিন্ন মতবাদের আশ্রয়ে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করেছে তাও খুবই স্বাভাবিক। এদের বাদ দিয়েও যে সংগ্রামী জনতা ও সাধারণ পার্টি কর্মী ওদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল—তাদের সংখ্যার ও সংগ্রামের দাম কম নয়। সেই সংগ্রামী জনতার মনোবল আজ ভেঙে যাবার কারণ তাদের পাতিবুর্জোয়া জন্মতত্ত্ব নয়—কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিহীন আবোল তাবোল অন্ধ সংগ্রাম—যার অনিবার্য পরিণতি হলো একতরফা সরকারি অত্যাচার।

অন্ধ্র কমিটির সুবিধাবাদী নীতির প্রধান রাজনৈতিক রূপ দেখাতে গিয়ে পলিটব্যুরো বলেছে যে ভারতে ও পৃথিবীতে বর্তমানে যে শ্রেণী-যোজনা দাঁড়িয়েছে, পার্টির থিসিস অনুযায়ী তাতে ভারতের গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীটাই আজ ক্ষমতায় আসীন এবং বর্তমান ভারতে যে সাম্রাজ্যবাদী, দেশী বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক—এই ত্রয়ী শক্তির জোট বেঁধেছে—তার নেতা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী, যেহেতু কংগ্রেসের অতীত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ইতিহাসের জন্য একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীরই জনতার উপরে প্রভাব আছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র ভারতে সম্পূর্ণরূপে অপ্রিয়—তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র নেতৃত্ব করার ভার কংগ্রেসের হাতে অর্থাৎ দেশীয় বুর্জোয়ার হাতে দিতে বাধ্য হয়েছে। কংগ্রেসও সাম্রাজ্যবাদের ও ধ্বংসশীল সামন্ততন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ক্ষমতা চালনা করবার অনেকটা স্বাধীনতা পেয়ে গেছে। এই ত্রয়ী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মূলত আজ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে এবং ভারতীয় বুর্জোয়া বৃহত্তর ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কোনো নীতি গ্রহণ করবার ক্ষমতা আজ আর তার নেই। ভারতের বর্তমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম—জনতার গণতন্ত্রের সংগ্রাম মূলত এই সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াশীল ত্রয়ী-শক্তির বিরুদ্ধে—অর্থাৎ একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সম্মিলিত বিরোধী শক্তিগুলিকে পরাজিত করে ও ধ্বংস করে জনতার হাতে, অর্থাৎ মজুর-চাষী মধ্যবিত্তের হাতে যে গণতান্ত্রিক সরকার আসবে তা আর নতুন করে কোনো ধনতন্ত্রের গঠন করতে পারে না—তাই জনতার এই গণতান্ত্রিক সরকার সোজা সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য। অতএব বলা যায় ভারতের বিপ্লব কেবলমাত্র গণতন্ত্র বা নয়াগণতন্ত্রের সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—তা মূলত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য—সুতরাং বর্তমান বিপ্লব কেবল গণতান্ত্রিক নয়—সমাজতান্ত্রিকও বটে।

অন্ধ্র কমিটির বিচার কিন্তু তা নয়। তাদের মতে সমগ্র ধণিক শ্রেণীই এই সরকারের ক্ষমতা পায়নি—অথবা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে যোগ দেয়নি—একমাত্র বড় বড় বুর্জোয়ারাই এই সাম্রাজ্যবাদী-সামন্ততান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দিয়েছে। মাঝারি ও ছোট বুর্জোয়ারা বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো সুবিধা পায়নি—বরং বিদেশী ও দেশী ধনকুবেরদের একচেটিয়া আধিপত্যের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না বলে তারা এই জোটের বিরুদ্ধে আছে এবং তার উপর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটে এই মধ্য বুর্জোয়াদের দল যত বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে ততই তারা এই জোটবিরোধী হতে বাধ্য হচ্ছে। অতএব সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে শত্রু বলে মনে করা ভুল বরং তাদের মধ্যে যে অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত অংশ রয়েছে সেই সব মধ্য বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংগ্রামী জনতার যুক্তফ্রন্ট গঠন করা সম্ভব। তাছাড়া ভারতের বিপ্লব বর্তমানে কোনো প্রকারেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্গত নয়—তা এখন নয়াগণতান্ত্রিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য—এবং এই স্তরে বা পর্যায়ে সংগ্রাম কখনও ধনতন্ত্রবিরোধী হতে পারে না—তা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বড় বড় বুর্জোয়াবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী মাত্র। এখনই ধনতন্ত্র বিরোধী ধ্বনি তোলা অন্যায়, অনিষ্টকর ও অতিবামপন্থা মাত্র। অতএব বর্তমান বিপ্লবের সীমানা যখন নয়াগণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয়—তখন গ্রামদেশে চাষী ও খেতমজুরদের লড়াই আজ ধনী কৃষক বা গ্রাম্য ধনীদের বিরুদ্ধেও নয়—তা আজ মাত্র জমিদার ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে—ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে চালু করা অন্যায় হবে। এই সংগ্রামে ধনী কৃষকদের নীরব ও নিরপেক্ষ করে রাখতেই হবে, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে সামন্ততন্ত্র খুব প্রবল (যেমন

তেলেঙ্গানায়) সেখানে তাদের সহযোগিতা পাওয়াও সম্ভব—তাই ধনী কৃষকদের স্বার্থে এখনই আঘাত হানবার কোনো প্রয়োজন নেই।

পলিটব্যুরো দেখাচ্ছে এই পথেই আর এক ধাপ নেমে গেলেই পুরাতন যোশী নেতৃত্ব চলে আসে—যা বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল অংশ ভাগ করে দেখার নামে, প্রগতিশীল বুর্জোয়াদেব সাথে সহযোগিতার নামে বুর্জোয়ার তাঁবেদারী ও দালালী করে পার্টির চরিত্র নষ্ট করে দিয়েছিল এবং পার্টিকে অবৈপ্লবিক সংস্কাববাদী পথে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। কলকাতা কংগ্রেসে সেই প্রতিক্রিয়াশীল পথ পরিত্যাগ করে যে আপসহীন সংগ্রামের জন্য থিসিস নেওয়া হয় তাকে বানচাল করে দেবার জন্য অন্ধ্র কমিটি গোপনে যোশীদের ফিরিয়ে আনছে এবং এই পথ গড়াতে গড়াতে একদিন পুরাতন মাউণ্টব্যাটেন রেজলিউশনে পৌঁছে যেতে বাধ্য ; অতএব এই নীতি পার্টিকে আবার সংস্কারবাদের পথে ফিরিয়ে নেবার একটা অপচেষ্টা মাত্র।

বুর্জোয়াদের মধ্যে ভাগ ও বিভাগ টানবার ইচ্ছার মাঝে যে বাসনা লুক্কায়িত আছে অন্ধ্র কমিটির ক্ষেত্রে তা হলো ধনী কৃষকদের স্বার্থে আঘাত হানবাব অনিচ্ছা, যেহেতু অন্ধ্র পার্টিতে প্রচুর ধনী কৃষকদের সন্তানসন্ততি বর্তমান কিন্তু গরিব চাষী ও খেতমজুরদেব প্রতিনিধি খুবই কম। সমগ্র কৃষক সাধারণের ঐক্য বজায় রাখার নামে খেতমজুব ও ভূমিহীন চাষীদের সংগ্রাম ও ন্যায্য দাবি যেমন অতীতে চেপে রাখা হতো আজও তেমনি অন্ধ্র নেতৃত্ব ধনী কৃষকদেব স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। গ্রামদেশে ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুরদের ওপব যে অকথ্য শোষণ ও সামাজিক নির্যাতন ধনী কৃষকদের হাতে ঘটে থাকে, সেখানে ধনতান্ত্রিক শোষণের যে নয়া কৌশল গরিব কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে চলেছে—সেই নিষ্ঠুর সত্যকে অবহেলা করে, ধনী-কৃষকদেব সঙ্গে সহযোগিতার নামে, আসলে গরিব কৃষকদের ন্যায্য দাবি ও বৈপ্লবিক আপসহীন সংগ্রাম সম্ভাবনাকে এই অন্ধ্র নেতৃত্ব দমন করে দিচ্ছে। তাছাড়া গতায়ু জমিদাব ও সামন্ততন্ত্রীদের মধ্যে ধনতান্ত্রিক স্বত্ব অধিকার করে ধনী-কৃষক হবার যে প্রথা চালু হয়েছে এবং জমিদাবী স্বত্বের জন্য খেসারত দিয়ে জমিদারী উঠিযে দিয়ে সেই জমিদারদেরই কৃষক ধনপতিরূপে পুনস্থাপিত করবার যে চেষ্টা বুর্জোয়া কংগ্রেসী সরকারের রয়েছে—এই সব পরিষ্কার ঘটনাগুলিকে এরা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। কংগ্রেসী সরকার তাদের রাজত্ব গ্রামদেশে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ধনী-কৃষক ও কৃষক-ধনপতিদের শক্তিমান করে চলেছে—আর এরা এই নতুন শক্তি যোজনা ও শ্রেণী যোজনার তাৎপর্যকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

এইভাবে ধনতন্ত্র ও ধনী-কৃষকদের সাথে সুবিধাবাদী সহযোগিতা করে অন্ধ্র নেতৃত্ব পার্টিকে আবার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির পথে টেনে নিতে চায়।

অতঃপর পলিটব্যুরো অন্ধ্র কমিটির নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্বনির সমালোচনা করতে শুরু করে। অন্ধ্র কমিটি বলে যে বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসে রুশ অভিজ্ঞতা শেষ কথা নয় এবং রুশ বিপ্লবেব পর গত ত্রিশ বছরে বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং চীন বিপ্লবে মাও-সে-তুং মার্কসিজম-লেনিনিজমের শাস্ত্রে কিছু সম্পদ দিতে সমর্থ হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে নয়াগণতন্ত্র একটি বিশেষ অবদান বলে তাঁরা স্বীকার করেন এবং ভারতের পক্ষে আজ সমাজতন্ত্র বা মজুর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) কাজের কথা নয়—আজ ভারতের জন্য যে বিপ্লব দরকার ও সম্ভব সে হলো নয়াগণতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও বড় বুর্জোয়া বিরোধী যাবতীয় শ্রেণীর সম্মিলিত একনায়কত্ব।

পলিটব্যুরো মার্কসিজম লেনিনিজম-এর সমাজ-বিজ্ঞান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিন ছাড়া অন্য কোনো নেতার বা নতুন দানের কথা স্বীকার করে না এবং মাও-সে-তুংএর নয়াগণতন্ত্রের মধ্যে কোনো নতুন অবদান দেখতে রাজি নয় বরং মাও-সে-তুংএর নীতিতে দুর্বলতা ও সুবিধাবাদের লক্ষণ দেখতে পায়। বিশেষ করে যেখানে মাও তার "নয়াগণতন্ত্র" নামক পুস্তিকায় বলেছেন যে নয়াগণতন্ত্র চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের ধ্বংস করতে চায়ত না-ই—বরং জাতীয় ধনতন্ত্র যাতে বাড়তে পারে (Promote its development) তাই দেখবে। নয়াগণতন্ত্র যা চায় না তা হলো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশাশ্রিত ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র—কিন্তু দেশী বুর্জোয়াদের নয়াগণতন্ত্র সাহায্য বই ক্ষতি করবে না—এই উক্তিকে পলিটব্যুরো জোর আক্রমণ করে এবং বলে কোনো কম্যুনিস্টই এজাতীয় উক্তি সহ্য করতে পারে না বা একে লেনিনিজম বলে চালাতে পারে না।

পূর্ব ইউরোপের জনতার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কমরেড জানভ (Zdhanov) বলেছেন সেখানকার গণতন্ত্র ধনতন্ত্রকে পুষে তো রাখবেই না বরং ধীরে ধীরে অবশিষ্ট ধনতন্ত্রকে পিষে দেবে (Squeeze Out) ও সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাবে। পূর্ব ইউরোপের জনতার গণতন্ত্র তাই মাও-সে-তুংএর নয়াগণতন্ত্রের থেকেও পৃথক—এবং এই দুই বস্তু বাস্তবে এক নয়। একথা অবশ্য ঠিক যে চিয়াং-কাইসেকের পতনের সাথে সাথেই চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি হয়ে যেতে পারে না—কেননা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনেব যাবতীয় যান্ত্রিকশক্তি চীনের নেই এবং সেখানে রাতারাতি সমাজতন্ত্র গঠন করাও সম্ভব নয়। রাতারাতি সর্বত্র সমাজতন্ত্র কায়েম করবার ও ধনতন্ত্রের যাবতীয় শিকড় উপড়ে ফেলার ক্ষমতা রুশ বিপ্লবে মজুর একনায়কত্ব স্থাপিত হবার পরও সোভিয়েট সরকারের হয়নি—তারই জন্য লেনিনকে "নতুন অর্থনৈতিক নীতি" (N.E.P) প্রবর্তিত করতে হয়েছিল যাতে ধনতন্ত্রকে কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়েছিল এবং কৃষকদের ও কৃষি ব্যবসায়ীদেব অনেকটা স্বাধীনতা স্বীকার করেছিল—কিন্তু তার উদ্দেশ্য ধনতন্ত্রের উন্নতি সাধনও নয় কিংবা সমাজতন্ত্রকে খর্ব করাও নয়—আর্থিক দুর্বলতার দুর্যোগটা কাটিয়ে ওঠা এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পের গঠনটাকে শক্তিমান করার পথে সাময়িক ভাবে ধনতান্ত্রিক অবশেষকে সহ্য করে যাওয়া মাত্র। লেনিনের নয়া অর্থনৈতিক তন্ত্রে একদিনের জন্যও মজুবদের একনায়কত্ব শিথিল করতে হয়নি অথবা সমাজতন্ত্র স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে স্বীকারও করতে হয়নি। অবস্থার ও যান্ত্রিকশক্তির দুর্বলতার খাতিরে সব পিছিয়ে পড়া দেশেই প্রথমে ধনতন্ত্রকে হয়ত এই জাতীয় সুবিধা ও সাময়িক জীবন দিতে হবে—কিন্তু তাই বলে এমন ধরনের কথাকে গ্রাহ্য করা যায় না যে চীনের জনগণ একজাতীয় ধনতন্ত্রের বদলে অন্যজাতীয় ধনতন্ত্র প্রবর্তন করতে চলেছে এবং সমাজতন্ত্র তারা চাইতে পারে না—অথবা সমাজতন্ত্র ছাড়া চীনের পুনর্গঠন ও দারিদ্রের অবসান করার ক্ষমতা গতায়ু দেশীয় ধনতন্ত্রেরও থাকতে পারে। ছয় বৎসর পূর্বে লেখা আজ ছয় বৎসর পরে ঠিক বলে মাও-সে-তুং স্বীকার করেন কিনা এবং চীনের পুনর্গঠনের বর্তমান অধ্যায়ে চীনা ধনতন্ত্র যথেষ্ট কিনা আজ বোধহয় তা লক্ষ্য করতে হবে।

নয়াগণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র—এই বিতর্কে আমাদের নিজস্ব বিচার ও যুক্তি এখুনি তুলছি না—কেননা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আমরা এবিষয়ে আলোচনা করব। এখানে অন্ধ্র কমিটি বনাম পলিটব্যুরোর বিতর্ক যথাযথ তাদের ভাষায়ই আমরা লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি। তবে দেশীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল এই প্রকার বিভাগ সৃষ্টি করার মধ্যে যে শ্রেণী সহযোগিতার প্রেরণা রয়েছে এবং তা কালে যে একদিন বর্তমান সরকারকেও সমর্থন করে

বসতে পাবে—অন্তত তাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে বসতে পারে পলিটব্যুরোর এই ইঙ্গিত যথেষ্ট সমর্থন যোগ্য। তাছাড়া পলিটব্যুরো অতীতের সংস্কারবাদকে এমনভাবে তীব্র আক্রমণ করেছে যাতে তাদের নিজেদের উপকাব হবে—কেননা এমন কড়া করে নিজেদের আত্মসমালোচনা ওবা কখনই করেনি। পলিটব্যুরোর অন্যান্য বিষয়ে গুরুতর গলদ আমরা দেখিয়ে দেব এবং এও দেখিয়ে দিতে পাবব যে পলিটব্যুরোর আপাতসুন্দর ও কড়া বিপ্লবী নীতির মধ্যেও ভয়ানক বকমের খাদ আছে যার ফলে কার্যক্ষেত্রে তাদেব পথ রুদ্ধ ও ব্যর্থ হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত চাইকি ব্যর্থতার পথ ধরে সংস্কারবাদ মাথা তুলতেও সুবিধা পায়। তাহলেও তাদের দলের অতীত সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে, বর্তমান সংস্কারবাদী পলায়নপরতাব বিরুদ্ধে ও নয়াগণতান্ত্রিক গোঁজমিলের বিরুদ্ধে যতটুকু মন্তব্য তারা করেছে তা খণ্ডিত করা অসম্ভব হবে অন্ধ্র নেতৃত্বের পক্ষে। এই সমালোচনা তাদের দলের ইতিহাসে একটা স্থায়ী আসন করে রাখতে সমর্থ হবে, আপাতত পরাজিত হলেও।

অন্ধ্র কমিটির এই দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক ঝোঁকটার তীব্র সমালোচনা পলিটব্যুরো ঠিকমতো করলেও পলিটব্যুরো রাজনৈতিক পলিসির ও বাস্তব সংগ্রামের জ্ঞান সম্বন্ধে সেকেলে থাকার জন্য কার্যত তা অন্ধ্র কমিটিব কাছে কার্যক্রম নির্ধাবণের ব্যাপাবে একটা মস্ত হার হেবে গিয়েছিল। অন্ধ্র কমিটি রাজনৈতিক শ্রেণী সংযোজনার ক্ষেত্রে এবং বিপ্লবের স্তব বিন্যাসে যতই ভুল করুক না কেন তারা সংগ্রামেব কৌশল সম্বন্ধে একটা ঠিক কথাব উত্থাপন করেছিল—অর্থাৎ আমাদেব দেশেব বিপ্লবী সংগ্রাম চীনদেশের সংগ্রামেব কায়দায় নিয়ে যেতে হবে, চীন দেশের মতো দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের ও গেরিলা যুদ্ধের পথে মুক্তিফৌজ গঠন করে এগুতে হবে। শহরে শত্রুদের কেন্দ্রীভূত শক্তির বিরুদ্ধে মাথাঠুকে না মবে এখন যে সমস্ত অঞ্চলে গ্রামদেশে কৃষকদের সংগ্রাম তীব্র হয়ে-উঠেছে তাকে ভিত্তি করেই গেরিলাযুদ্ধ ও মুক্তিফৌজ দাঁড় কবাতে হবে। তা নাহলে আমরা কোনোক্রমেই সংগ্রাম চালু রাখতে পাবব না।

পলিটব্যুরো এই নীতিকে ঠাট্টা করেছে এবং বলেছে জওহরলাল সবকাবেব বিরুদ্ধে কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধ নাকি অত্যন্ত হাস্যকর এবং তা একটা শক্তি হিসাবেই দাঁড়াতে পারে না—যদি না শহরের মজুরশ্রেণী সমগ্রভাবে ও ব্যাপকভাবে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে পারে। মোটমাট কথা মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব সংগ্রামে কায়েম না হলে চাষীদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কোনো সার্থকতা আসতে পারে না। অর্থাৎ রাশিয়াতে যা ঘটেছিল তাব ব্যতিক্রমে ভারতে কোনো বিপ্লব সম্ভব নয়। সর্বব্যাপারে পলিটব্যুরো রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ছাড়া আর একবিন্দু কোথা থেকেও গ্রহণ করতে রাজি নয়। ফলে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পলিটব্যুরো এক মারাত্মক ভুল করে বসে—যাব পরিণাম পরাজয় এবং সংস্কারবাদের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া মাত্র। রাজনৈতিক শ্রেণীসহযোগিতার যত দোষই নয়াগণতন্ত্রে থাকুক না কেন—মাও-সে-তুং-এর সংগ্রাম নীতি যে অপূর্ব এক কৌশল এশিয়াব নিপীড়িত জনতার কাছে উপস্থিত করেছে এই সত্যকে অস্বীকার করা নিছক অন্ধতা মাত্র। পৃথিবীর সব কোণে যখন কম্যুনিজমের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, যখন প্রাচীন রুশবাদী বিপ্লবীরা আর কোনো দেশে হুবহু রুশ কায়দায় বিপ্লব সংঘটিত করতে পারছিল না বলে সংস্কারবাদী পথে পাক খেয়ে মরছিল তখন এই মাও-সে-তুং এক পেছিয়ে পড়া দেশে সংগ্রামের এক নতুন কায়দা দেখিয়ে দেন এবং পৃথিবীব্যাপী কম্যুনিজমের পুনরুত্থান সম্ভব করেন।

শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে, পার্টি নেতৃত্ব ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সর্বদাই এক বস্তু বলে দেখাবার মধ্যে অনেক বিপদজনক ভুল থাকা স্বাভাবিক। শ্রমিক শ্রেণীই

আজকের বিশ্ববিপ্লবে নেতৃত্ব করতে পারে এবং প্রস্তুত—এ যদি সত্য হয় তবে ভারতের স্বাধীনতা, পূর্বে এশিয়ার স্বাধীনতা ও গণ-বিপ্লবের সহায় হিসাবে এবং নেতা হিসাবে ইংলন্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে আগুয়ান হয়ে আসতে দেখতুম। কিন্তু তা তো দেখা গেলই না, উপরন্তু ঐসব দেশের স্বাধীনতা ও গণবিপ্লব দমন করতে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী সরকারগুলোকে কম সাহায্য করেনি এবং আজও ঠিক একই ভাবে সাহায্য করে চলেছে। ইন্দোচীনে আজও যে দেড় লক্ষ ফরাসী সৈন্য আর মালয়ে লক্ষাধিক ইংরেজ সৈন্য তথাকার বিপ্লব দমনে ব্যস্ত এবং তারা যে শ্রমিক শ্রেণী থেকে আসেনি একথা তো বলা যায় না ; আর ফরাসী দেশের বা ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী এই দমন নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এমন কথাও বলা চলেনা। কোথাও কোথাও প্রতিবাদ হচ্ছে, কোথাও কোথাও নাবিকেরা ও শ্রমিকেরা অস্ত্র প্রেরণে বাধা দিয়েছে বটে কিন্তু তাতে করে নেতৃত্ব কববার মতো ভূমিকা বা সক্রিয় সহযোগিতা সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, একথা বললে অতিরঞ্জিত চিত্র আঁকা হবে। যে কোনো কাবণেই থাকুক না কেন আমরা এই ঘটনাগুলিকে (facts) কোনো মতেই অগ্রাহ্য করতে পারিনা। তাই বলে পৃথিবীব কোথা থেকেও শ্রমিক নেতৃত্ব এশিয়ার গণবিপ্লবকে সাহায্য করছে না বা নেতৃত্ব করছে না এমন ধরনের যুক্তিও ভুল। কেননা আজ পৃথিবীতে বিশ্ব-বিপ্লবের ভূমিকায় এক জায়গায় অন্তত মজুব নেতৃত্ব কায়েম হয়েছে যা সমগ্র নিপীড়িত শ্রেণীর নেতৃত্ব করবার মতো ঐতিহাসিক ক্ষমতা রাখে—সে হলো রাশিয়া। রাশিয়ার নেতৃত্ব ঐতিহাসিক ও বাস্তব দিক দিয়ে (historically and objectively) আজ পৃথিবীর গণ-বিপ্লবের প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট ও স্পষ্ট স্থান অধিকাব করেছে—যার থেকে দেশে দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ধারা নির্দিষ্ট হচ্ছে এবং তারই মধ্য দিয়ে নিপীড়িত জনতার ওপর নেতৃত্ব কায়েম করার রাস্তা সুগম হয়েছে। পূর্ব ইউরোপ ও চীনে গণরাষ্ট্র ও গণবিপ্লব ঘটাবার জন্য এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক নেতৃত্ব আরও স্পষ্ট এবং আরও শক্তিমান হয়েছে। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তও অনিবার্য নয়—যেহেতু পৃথিবীতে আজ শ্রমিক নেতৃত্বে বিশ্বকেন্দ্র ও বিশ্বপটভূমিকা সৃষ্টি হয়েছে সেইহেতুই এই বর্তমান বিশ্ব-নেতৃত্ব নির্ভুল হতে বাধ্য। শ্রমিক নেতৃত্ব এক কথা আর নির্ভুল শ্রমিক নেতৃত্ব অন্য কথা। শ্রমিক নেতৃত্ব কায়েম হলেই তা অনিবার্যরূপে শুদ্ধ ও নির্ভুল নেতৃত্ব হতে বাধ্য এমন ধরনেব কোনো যুক্তি নেই। এই বিশ্বশ্রমিক নেতৃত্বকেও হুঁশিয়ার থাকতে হবে—আত্মশ্লাঘাব পথে সেই নেতৃত্ব সর্বদাই নির্ভুল পথ নিতে পারে এমন ধরনের বিশ্বাস থাকা ঠিক নয় এবং উচিতও নয়। নেতৃত্বে—বিশেষ করে রাশিয়ার নেতৃত্বে—কখনো ভুল হতে পারে না, এমন ধবনের অন্ধবিশ্বাস স্বয়ং লেনিনও করতেন না। নেতৃত্বের ভুল ত্রুটি ও বিস্তার যে কেবল রাশিয়াতেই সম্ভব অন্য কোথাও নয়—চীন দেশে তার কোনো বিস্তার ও গভীরতা হতে পারে না, সব কিছুই রাশিয়াতেই আবিষ্কৃত হতে হবে এবং রাশিয়ার মানদণ্ড ছাড়া বিপ্লবের বিচার সম্ভব নয়—এমন ধরনের যুক্তিও হাস্যকর। রাশিয়ায় যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই এই দৃষ্টিভঙ্গি যাদের, তারা কোনো দেশে কোনো বিপ্লব সার্থক করতে পারেনি।

চীন বিপ্লবও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে এমন ধরনের একটা ঢিলে কথাও আজকাল শোনা যায়। কিন্তু সে শ্রমিক নেতৃত্বের অর্থ সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের সামিল নয়, এ কথাটা ভাল করে বুঝতে হবে। যে নেতৃত্বে চীনবিপ্লব কায়েম হয়েছে, সেটা হলো কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব এবং যেহেতু কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক

দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ ও কর্মপন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, কেবল সেই অর্থেই বলা যায় চীনবিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে, কর্মপন্থায় ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে— অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শগত পথ জয়যুক্ত হতে চলেছে। তা হলে চীনবিপ্লবে সাক্ষাৎভাবে সমগ্র মজুর শ্রেণীর নেতৃত্ব কাজ করেছে বলা যেমন হাস্যকর তেমনই বাস্তব সত্য বিরোধী। বাস্তব সত্যটা হলো এই যে, কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গ্রামদেশের চাষী-শক্তিকে চালিকাশক্তি হিসাবে সংগঠিত করে যে মুক্তিফৌজ গঠিত হয়েছিল, সেই মুক্তিফৌজই সমগ্র চীনকে মুক্ত করার পথে একদিন মুক্ত করেছিল শহরের মজুরকে। মুক্ত শ্রমিক সাধারণ মুক্তির সাথে সাথেই তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অনেক ক্ষেত্রেই চট করে ধরতে পারেনি। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী শ্রমিক যারা আত্মগোপন করে অতি কষ্টে বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল—চিয়াং-কাইসেকের বর্বর শাসনের মধ্যে থেকেও—একমাত্র তারা ছাড়া সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণী নিষ্পেশনের দৌরাত্ম্যে কোনো বৈপ্লবিক চেতনা পোষণ করতে সমর্থ ছিল না ; কারণ তারা সবদিক থেকে নৈতিক বল হারিয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়েছিল। মুক্তিফৌজ এসেই তাদের উদ্ধার করে এবং কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে তখন মুক্ত শ্রমিক- শ্রেণীকে নব চেতনায় সচেতন করে তুলতে হয় আর তাদের নতুন দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতার কথা বুঝিয়ে দিতে হয় ; বড় বড় কল-কারখানার ওপর তাদেরই মালিকানা এসেছে এই কথা বুঝিয়ে দিতে হয় এবং নতুন করে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা শিক্ষা দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নে, কারখানা ম্যানেজমেন্টে আর সরকারি শাসন যন্ত্রে তাদের নেতৃত্ব, স্থানীয় দায়িত্ব ও কাজ বুঝিয়ে দিতে হয়। যদি এ কথা না বিশ্বাস হয় তবে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে চাই।

সারা চীনের শ্রমিক ফেডারেশনের (A.C F.L) মুখপাত্র Daily Worker কাগজের সম্পাদক চেন ইউঙ্গ ওয়েন (Chen Yung Wen) এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ কম্যুনিস্ট পার্টি, যখন গ্রামদেশ থেকে চাষীদের সাহায্যে মুক্তিফৌজ নিয়ে শিল্প প্রধান নগরগুলি মুক্ত করল এবং শ্রমিকদেরও মুক্ত করল তখন তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো তথাকার শ্রমিকদের নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা আর তারাই যে নেতা এই সত্যকে তাদের কাছে উপলব্ধি করানো ; কারণ শ্রমিকেরা জানে না যে এক ঐতিহাসিক বিধানে তারাই আজ নতুন যুগের নেতা এবং মালিক। সেই সময়ে কারখানা পরিচালনা করা, শহর পরিচালনা করা, নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা ইত্যাদি ব্যাপারে যাবতীয় দায়িত্ব—যা সদ্যমুক্ত শ্রমিকদের স্কন্ধেই এসে পড়ে, তা পালন করবার মতো শ্রেণীচেতনা ও দায়িত্ব বোধের অভাব শ্রমিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আস্তে আস্তে চেষ্টা করে কম্যুনিস্ট পার্টিকেই পিছিয়ে পড়া শ্রমিক শ্রেণীকে নতুন শিক্ষায় সচেতন করে তুলতে হয়। "With the exception of a relatively small number of advanced workers who were engaged in underground revolutionary activities and whose level of class-consciousness was high, the long period of savagely oppressive and reactionary K M.T. rule **had dulled the spirit of the great masses of the urban working people.** Thus, at the time of liberation, these masses of industrial workers did not at once realize that the revolution had made them the real masters of stateowned enterprises. They were not prepared to assume their great new responsibilities. Because of the revolution's special conditions in urban centres, the foremost task of the trade unions has been to educate the workers in order to

raise their class-consciousness, and to instruct them in revolutionary policies of New Democracy" (Peoples China—1st May, 1950).

উপরোক্ত চিত্র থেকেই বোঝা যায় যে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত ও সংগঠনগত নেতৃত্ব আর শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব এক বস্তু নয়। শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব—যা কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয় তা বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বত্র সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত ও সংগঠনগত নেতৃত্ব থেকে আলাদা হতে পারে; অর্থাৎ সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী পিছিয়ে পড়ে থাকলেও কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও নেতৃত্ব রয়েছে, তাকে পিছিয়ে পড়ে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, আর সেই অগ্রগামী নেতৃত্ব, শ্রমিক-শ্রেণীর দুর্বলতা ও অসহায়তা থাকলেও অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বিপ্লব অভিযান সার্থক করে তুলতে পারে এবং পিছিয়ে পড়া শ্রমিকশ্রেণীকেও উদ্ধার করতে পারে।

তথাপি শ্রমিকশ্রেণীর এই আপেক্ষিক দুর্বলতা যে বরাবরই থাকবে তা নয় এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বাদ দিয়েও যে চীন বিপ্লব আগুয়ান হতে পারে বা সমাজতন্ত্রের পথে এগুতে পারে তা একেবারেই সম্ভব নয় ; কেন না পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র অংশকে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা দেখাতেই হবে এবং তাব দায়িত্বও পালন করতে হবে। চীনবিপ্লব কখনও বর্তমান স্তরে অর্থাৎ নয়াগণতান্ত্রিক স্তরে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তাকে সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগুতেই হবে তা না হলে প্রতিক্রিয়ায় ও আপন দুর্বলতায় পঙ্গু হয়ে যাবে। সেই অগ্রগামী পথে আরও এগিয়ে যাবার শক্তি সমগ্র মজুর শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগামী মুষ্টিমেয় শক্তির ওপর নির্ভরশীল, একমাত্র কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করে না—সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকেই সেই পরবর্তী অধ্যায়ে অতি সচেতন ও বেগবান ভূমিকা পালন করতে হবে। আজ তারই জন্য দেখতে পাই চীনে কম্যুনিস্ট পার্টি সব চেয়ে যেটা প্রধান সংগঠনিক কাজ বলে হাতে নিয়েছে তা হলো পিছিয়ে পড়া সদ্যমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, একটা বিশিষ্ট শ্রেণীশক্তি হিসাবে আলাদা করে সংগঠিত করে তোলা আর তাদের শ্রেণীচেতনা ও বৈপ্লবিক দায়িত্ব তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা, যাতে করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিযে যেতে চীন-বিপ্লব নতুন শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করতে পাবে। আজকের চীনের কাগজপত্র যেই লক্ষ্য করে পড়বে সেই এই কম্যুনিস্ট উদ্যমের বিশেয ধারাটি লক্ষ্য না করে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগঠিত নতুন শক্তি যদি দানা বেঁধে না ওঠে তবে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতি সহজ হবে না এবং নয়াগণতন্ত্রে যে সমস্ত ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি জীবিত ও বর্ধিত হবার চেষ্টা করছে তাদের অতিক্রম করা সম্ভব হবে না, বরং তাদের তরফ হতে অদূর ভবিষ্যতে একটা বাধা আসতে বাধ্য, যেমন বাধা এসেছিল রাশিয়ার নয়া অর্থনৈতিকতন্ত্রে (N.E.P.) বর্ধিত কুলাক শ্রেণীর কাছ থেকে। যে নয়াগণতন্ত্রেব অন্তর্গত এই Potential and persistant resistance from the capitalist eliements, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির ভবিষ্যৎ প্রতিরোধটাকে দেখতে পায় না, সে কম্যুনিস্ট তো নয়ই এবং মার্কস্‌সিজম-লেনিনিজমের বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও অর্জন করতে পারেনি। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব চিরকাল কায়েম থাকতে পাবে না—ঐতিহাসিক কারণে যদি একদিন সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নেতৃত্ব করবার মতো সংগঠন ও চেতনা তারা জাগাতে না পারে, তবে তা সুবিধাবাদের পথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা থাকবে এবং প্রতি-বিপ্লবী শক্তিরও পুনরুত্থানের আশঙ্কা থাকবে। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে তাই নিরাপদে আরাম নেবার মতো পরিস্থিতি আজও আসেনি এবং আসবেও না,—যদি না তাদের বর্তমানের এই গোঁজামিল দেওয়া নয়াগণতান্ত্রিক পর্যায় শেষ করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চালু হয়।

এই প্রসঙ্গে শেষ করার আগে আর একটা কথা স্মরণ কবা দরকার। কম্যুনিস্ট পার্টির কথা উঠলেই যে শ্রমিকশ্রেণীব পার্টিব কথা ওঠে এ সম্বন্ধে কিছুটা সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকাব। মজুর শ্রেণীর পার্টি, এ কথার অর্থ এই নয় কে কম্যুনিস্ট হলেই তাকে মজুর থেকে আসতে হবে, অথবা মজুর মানেই কম্যুনিস্ট। প্রথমত বুঝতে হবে কম্যুনিস্ট পার্টিত কম্যুনিস্টদেরই পার্টি—অর্থাৎ যাবা কম্যুনিজমেব নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ কবছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা কার্যকবী করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কম্যুনিজম্ জিনিসটা মজুরেরা আবিষ্কার করেনি বা মজুরদেব মাথা থেকেও আসেনি ; এসেছে জ্ঞানবিজ্ঞানেব অনুশীলনে, এসেছে ইতিহাসের অব্যাহত গতির নির্দেশে চেতনার অভিযানে। অতএব কম্যুনিজম জন্মগত অধিকাবই শ্রমিকদের মধ্যে আপনা থেকে জন্মায না--তা জ্ঞানবিজ্ঞানেব ক্ষেত্র থেকে মজুরশ্রেণীব মধ্যে আনতে হয় এবং মজুরশ্রেণীর মধ্যে তাব প্রতিফলন ভাল হতে বাধ্য, কেননা ইতিহাস আজ মজুরশ্রেণীকেই বাহন করে মানব সমাজে নতুন যুগের সৃষ্টি করতে পারে। কম্যুনিজম এসেছে ওপর থেকে—চেতনার ক্ষেত্রে থেকে—কিন্তু তাব প্রযোগ ও গ্রহণ কববাব শক্তি তৈবি হযেছে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক বিবর্তনে। এই চেতনাব বিকাশ বাস্তবেব বিকাশের ওপর নির্ভবশীল--অর্থাৎ বাস্তব অবস্থাব সংঘাতেই কম্যুনিজমেব চেতনা বা বিজ্ঞানের জন্ম ও বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘটিযেছে। কাজে কাজেই মনে হয কম্যুনিজম যেন বাইবে থেকে চাপানো কোনো এক নীতি, তাবই জন্য চেষ্টা করে, ধৈর্য ধবে ও কঠিন সংগ্রাম কবে শ্রমিকশ্রেণীব সাধারণ লোকদেব কম্যুনিজম বোঝাতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বেগও পেতে হয় খুব বেশি বকমের। শ্রমিকশ্রেণীর জনমতের হিসাবে কম্যুনিস্টদেব বিচাব ও বিশ্লেষণ নির্ভর করে না (See Lenin's "What is to be done")। দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি হলো এই—একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর লোকেরাই যে কম্যুনিজম গ্রহণ করতে পাবে এ কথা ঠিক নয। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের হিসাব নিলে দেখা যায় অশ্রমিক জন্ম যাদের তাদেরই সংখ্যা বেশি—তবে তাবা বর্তমানে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন দিযে ঐতিহাসিক শ্রমিক চেতনা গ্রহণ কবেছে। আবার এমন বহু শ্রমিকও দেখা যাবে যাদেব এই ঐতিহাসিক শ্রেণীচেতনা তো নেইই বরং তাবা ক্ষুদে-বুর্জোযা চেতনায আচ্ছন্ন।

আজ দেশে দেশে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে যে সমস্ত খেতমজুর গরিবচাষী আর মধ্যবিত্ত পরিচালিত হচ্ছে—কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের কেউ নয়, তা কেবল পরের পার্টি অর্থাৎ মজুর শ্রেণীরই পার্টি এই কথারও কোনো মনে হয় না। কম্যুনিস্ট পার্টির জন্য তারা মরতে প্রস্তুত এবং তারা এই পার্টিকে জয়যুক্ত দেখতে চায়, অথচ এই পার্টি তাদেব কেউ নয়,—এমন ধরনের যুক্তির কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা হয় না—একমাত্র কুটনৈতিক দার্শনিক অর্থ ছাড়া। বহু চাষী ও খেতমজুর আজ পার্টির সভ্য এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়বে বই কমবে না, তথাপি এটিকে একমাত্র মজুরশ্রেণীর পার্টি বলার মধ্যে একটা বিশেষ অর্থ আছে ; যে বিশেষ অর্থে তাকে মজুরশ্রেণীর পার্টি বলা হয়—তা হলো আদর্শগত ও ইতিহাসগত অর্থ, অর্থাৎ মজুরশ্রেণীর যে দায়িত্ব তা যারা বহন করে তারাই কম্যুনিস্ট—তারাই মজুর সভ্যতার সৈনিক ও নাগরিক। বাস্তব ক্ষেত্রে যেটা খুব সহজ ঘটনা সেটা হলো এই যে, কম্যুনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্টদেরই পার্টি এবং যারাই কম্যুনিজমকে গ্রহণ করতে রাজি তারাই এই পার্টিতে আসতে পারে।

পরিশেষে কম্যুনিজমে কেবল মাত্র শ্রমিক শ্রেণীরই মুক্তি বোঝায় না। শ্রেণী-সংগ্রামের পথে ইতিহাসের বিবর্তন আজ এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছেছে যে মজুরশ্রেণীর মুক্তি আজ কেবল মাত্র তাদের নিজেদের মুক্তির মধ্যেই সম্ভব নয়—অপরাপর সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী সমূহের মুক্তির সাথেই মজুর শ্রেণীর মুক্তি নির্ভরশীল—অর্থাৎ সমস্ত প্রকার শোষণ প্রথা

থেকে সকল মানুষকে মুক্ত করার ওপরই মজুর শ্রেণীর মুক্তি অপেক্ষমান। কম্যুনিজম আজ প্রায় সকল মানুষের মুক্তির স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, অর্থনৈতিক সঙ্কট ইত্যাদি মিলে মানুষের ভাগ্যে যে অভূতপূর্ব বিপদ এনেছে, তার থেকে মুক্তির রাস্তা আজ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ ছাড়া আর কিছু নেই। এই জ্ঞান যত প্রসারিত হচ্ছে, তত নিপীড়িত শ্রেণীর সকল মানুষই কম্যুনিজমের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। ১৮৮৩ সালে এঙ্গলস্ কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন "This struggle (class struggle), however, has now reached a stage where the exploited and oppressed class (the proletariat) can no longer emancipate itself from the class which exploits and oppresses it (the bourgeoisie) without at the same time forever freeing the whole society from exploitation, oppression and class struggles." মজুরশ্রেণীর স্বার্থ আজ তাই বেশির ভাগ জনতার স্বার্থের থেকে অভিন্ন নয় ; এবং বেশির ভাগ লোকের স্বার্থ, এমন কি মানব জাতির স্বার্থ আজ কম্যুনিজমের মধ্যে নিহিত। এঙ্গলস্-এর আমলের সেই কথা আজ বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে আরও কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—আজকে মানুষের ভাগ্য ধনতন্ত্রের কবলে সম্পূর্ণরূপে বিপদগ্রস্ত। কম্যুনিজম আজ আর তাই কোনো secterianism নয় কিম্বা secterian call নয়—it is almost human call তার মানে এই নয় যে শ্রেণীসংগ্রামের আর কোনো দরকার নেই। সকল মানুষ কম্যুনিজম নিতে পাবে, এমন কি ধনীরাও। তার মানে এই মুষ্টিমেয় ধনীর বিরুদ্ধে ও ধনতন্ত্রবাদকে নির্মূল করার কাজে আজ কম্যুনিজমের ডাকে বেশিরভাগ জনতাকে জড়ো করা যায়। এই ডাকে কেবলমাত্র যে শ্রমিকেরাই এগিয়ে আসবে তা নয়, গরিবচাষী এবং দরিদ্র জনসাধারণ মাত্রেই এগিয়ে আসবে—এই ধনতন্ত্রবিরোধী সাম্যবাদী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য। অতএব আজকের দিনের কম্যুনিস্ট পার্টিকে মনে রাখতে হবে যে সে শুধু শ্রমিকশ্রেণীরই নেতা নয়, প্রায় সমস্ত মানুষেরই নেতা। সমস্ত নিপীড়িত জনতার নেতা হিসাবে আজ কেবলমাত্র শ্রেণী বিশেষের দাবির মধ্যেই তার তার কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয় ; কেননা কম্যুনিস্ট আজ—মনুষ্যত্ব বিরোধী, সভ্যতা ও সমাজ বিরোধী ধনীদের বাদ দিয়ে—সমগ্র মানুষ জাতিরই প্রকৃত প্রতিনিধি।

এখানে অন্ধ্র কমিটির কৃষক নীতি ও পলিটব্যুরোর কৃষক নীতির সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করা যাক। অন্ধ্র কমিটির মতে ধনী কৃষকদেব বিরুদ্ধে এখন সংগ্রাম চলবে না, তাদের নিরপেক্ষ করে রাখতে হবে এবং মধ্যবিত্ত কৃষক সাধারণকে স্থায়ী বন্ধু হিসাবে পাওয়া যাবে আর গরিবচাষী ও ভূমিহীন কৃষকরা তো বিপ্লবের মধ্যে প্রধান শক্তি। অতএব কৃষক ফ্রন্টে কোনো ফাটল ধরাবার দরকার নেই। জমিদার শ্রেণীকেই আজ কৃষকের গ্রাম্য শত্রু বলেই নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে ধনতন্ত্রকে আক্রমণের কথা ওঠে না।

পলিটব্যুরো দেখাচ্ছে অন্ধ কমিটির দৃষ্টি আজকের দিনে গ্রামদেশে ধনতান্ত্রিক শোষণটাই অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে এবং গরিব খেতমজুর ও ভাগচাষীদের ওপর যে অকথ্য ধনতান্ত্রিক শোষণ হয়ে থাকে তাকে না দেখার অর্থ হলো কৃষক সংগ্রামটাকে নির্বীর্য করে ফেলা। যেখানে যেখানে ধনী কৃষকেরা মজুর খাটায়, সেখানকার ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আজ না দাঁড়ানোর অর্থ সত্যিকার শ্রেণী-সংগ্রাম পরিত্যাগ করা—ভারতীয় অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক শোষণের রূপটাকে অগ্রাহ্য করা। কৃষকদের ঐক্যের নামে ধনী কৃষকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার এই অভিসন্ধি অত্যন্ত জঘন্য। তাছাড়া খেতমজুর ও গরিবচাষীরা সামাজিক ভাবে যে অত্যাচার ভোগ করে তাও একটা বিরাট ঘটনা, কেননা তারা সাধারণত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলে ধনী চাষী ও গ্রাম্য

ধনীদের (যারা প্রায়ই উচ্চ বর্ণের হিন্দু) হাতে নানা প্রকারের সামাজিক নির্যাতন ও অপমান পদে পদে ভোগ করে থাকে। এই নির্মম শোষণ আর অকথ্য অপমানের বিরুদ্ধে আজ যদি দরিদ্র কৃষকদের দাঁড় করানো না যায় তবে তাদের মধ্যে সত্যিকার বিপ্লবী চেতনা জাগতে পারে না এবং তারা কম্যুনিস্ট পার্টির আন্তরিকতায় বিশ্বাসবান হতে পারে না। নিকটবর্তী শ্রেণী-শত্রুর প্রাত্যহিক শোষণ আর অপমানগুলিকে অগ্রাহ্য করে দূরের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে তারা দেখতেই পায় না। কাজে কাজেই তার কাছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা একটা অস্পষ্ট আহ্বান শোনায় মাত্র—যার সঙ্গে তার দৈনন্দিন জীবনের ও শ্রমের সাক্ষাৎ সম্পর্কই নেই। তাছাড়া যেখানে সামন্ততন্ত্র নেই, জমিদারী নেই সেখানে তার শত্রু কে তা তো তাকে দেখিয়ে দিতে হবে—যদি সে প্রত্যক্ষ শত্রু তার শোষক না হয়?

বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি এই কৃষক সমস্যাটাকে আরো বিশদভাবে আলোচনা করেছে এবং অনেকদিন থেকেই ভারতের কৃষক সমস্যাকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবার জন্য বলে আসছে। ভারতের সমস্যা যে ভারতের কৃষকদেরই সমস্যা এই মূল কথাটা অগ্রাহ্য করবার নয় ; অতএব ভারতের কৃষক সমস্যাটকে একটা গৌণ তাৎপর্য দিয়ে কেবলমাত্র ধনিক ও শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালে ভারতের সমস্যাকে বোঝা শক্ত হবে। জটিল কৃষক সমস্যাটা বামপন্থীদের কাছে ভালে লাগে না, তাই সোজাসুজি ধনিক ও শ্রমিকের লড়াইটাকে দেখতে ভালবাসে কিন্তু এভাবে সমস্যার সরলতা খুঁজতে গেলে শেষ পর্যন্ত ধনিক-শ্রমিক সং গ্রামটাও বোধহয় হবে না—কেননা ভারতের কোটি কোটি চাষীর ব্যবহারের ওপরই নির্ভর করে কোন পক্ষ জয়ী হবে—ধনিক না শ্রমিক। চাষীকে বাদ দিয়ে ধনিক ও শ্রমিকের লড়াই শেষ হতে পারে না। চাষীই হচ্ছে ভারতে প্রধান ফ্যাক্টর বা সমস্যা—অথচ চাষী সমাজ-বিবর্তনের পথে একটা বাধা নয়, বিপ্লবী শ্রমিকের বা বামপন্থীদের অনভিপ্রেত সাথী নয়, কেননা সাথী করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে পিছু পড়ে থাকতে হবে না ; বরং কোনো ক্ষেত্রে চাষীই হয়ত শ্রমিকের মুক্তিব পথ তৈরি করে দিতে পারে। এই অদ্ভুত তত্ত্বটা ভাল করে বোঝাবার ওপরই স্বীকার করাটা নির্ভর করে। চাষীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তরায় হিসাবে ভয় করে এসেছে কম্যুনিস্ট ও ট্রটস্কিপন্থীরা, যেন এই পাড়াগেঁয়ে চাষীদের চাপেই এবং তাদের অজ্ঞতার ভারেই ভারতে প্রগতি আজ এত মন্থর! কিন্তু ঠিক পথে চালনা করার ওপর চাষীদেরকে এমন এক সংগ্রামে আগুয়ান করে নেওয়া যায় যার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে প্রগতিবাদী শহরবাসীরাও পেরে উঠবে না ; তার প্রমাণ আমরা চীন-বিপ্লব থেকেও পাই। যা হোক, যাঁরা আমাদের চাষী সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিটা ভাল করে বুঝতে চান তাঁদেরকে আমাদের "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন?" এই পুস্তিকাটি পড়তে অনুরোধ করি।

আমরা দেখিয়েছি জমিদারী জায়গীরদারী শোষণ কৃষকের ওপর বর্তমানত যুগের সমষ্টিগত শোষণের একটা অংশ মাত্র, আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ধনতন্ত্রই হচ্ছে অপর বিরাট শোষণের কারণ। যন্ত্রশিল্প প্রসারের পর গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংসের দরুন গ্রামবাসীদের প্রায় প্রত্যেককেই প্রথমে চাষীতে পরিণত হতে হয় ও জমির ওপর অত্যধিক চাপ পড়ার ফলে চাষীর হাতে জমির পরিমাণ ক্রমশই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। চাষের ব্যয় চাষের আয় থেকে বেড়ে যাবার জন্য কৃষকদের দেনা দাঁড়ায়, জমির হস্তান্তর হতে থাকে ও ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা দিনকেদিন বেড়ে যায়। ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হবার এই যে অনিবার্য গতি তার কারণ সামন্তপ্রথা নয়—ধনতন্ত্র। গ্রাম জীবনে বেকার সমস্যাজনিত ও বৃত্তিহীনতাজনিত যে দারিদ্র্য তারও কারণ ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা—সামন্তপ্রথা নয়। চাষীর উৎপন্ন ফসল উচিত দামে বিক্রি না করতে পারার যে ক্ষতি

তার কারণ একচেটিয়া বাজার ও বাজারের উঠতি পড়তি—যা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক নিয়ম, সামন্ত্রাতান্ত্রিক কিছু তাতে নেই। চাষী যে কৃষিজাত জিনিস সস্তা দরে বিক্রি করে দিয়ে চড়া দরে শহরজাত জিনিস কিনতে বাধ্য হচ্ছে তাও ঐ ধনতান্ত্রিক চাতুরী। আবার আজকের দিনে ধনতন্ত্র শিল্পবিপ্লব ঘটিযে দেশে কল-কারখানা বাড়িয়ে গ্রাম থেকে উদ্বৃত্ত মানুষ সরিয়ে আনতে পারছে না, তারও কারণ ধনতন্ত্রের গতায়ু দশা—যার উৎপাদিকা শক্তি গেছে প্রায় ফুরিয়ে। জমিদারী প্রথা বিনা খেসারতে তুলে দিয়ে জমি চাষীদেব মধ্যে বিলি করে দিতে অনিচ্ছা বর্তমান যে সরকারের, সে সরকারও ধনতান্ত্রিক, অর্থাৎ ধনতন্ত্র আজ আর সামন্ততন্ত্রকে উচ্চেদ করতে প্রস্তুত নয় বরং তাদের রক্ষাকর্তা হয়েছে। এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচারের প্রকৃত কারণ যদি খুঁজতে যাওয়া যায় তো দেখা যাবে যে আজকের দিনে চাষীদের প্রধান শত্রু হলো ধনতন্ত্র—যা আজ সামন্ততন্ত্রকে রক্ষা করে চলেছে। অতএব চাষীদের সংগ্রাম আজ ধনতন্ত্রবিরোধী এবং ধনতান্ত্রিক সরকারবিরোধী হতে বাধ্য। তা ছাড়া যে কোনো সংগ্রামই চাষী করতে যাক না কেন তাকে যে সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, সে হ'লো ভারতীয় বুর্জোয়াদের সরকার—যার পিছনে রয়েছে অকুণ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য ও শর্তহীন সামন্ততান্ত্রিক সহযোগিতা। অতএব আজকের চাষীসংগ্রাম একই সাথে সামন্ত্রতন্ত্রবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ধনতন্ত্রবাদবিরোধী—তাই এই সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্গত। তার মানে এই, আজকের কোনো দাবি এবং চাষীদের কোনো সামগ্রিক উন্নতি বা মুক্তি ধনতন্ত্রেব মধ্যে নেই, তার মুক্তি আজ প্রকৃতপক্ষে মজুরদের মতো সমাজতন্ত্রেই নিহিত রয়েছে, তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে গরিব চাষীদেরকে এগিয়ে আনা মোটেই শক্ত হবে না। অবশ্য এই চাষী ফ্রণ্টে ধনী কৃষকদের ও কৃষক ধনীদের কোনো ঠাঁই নেই, কেননা এরা আর সরকারবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী নেই, এরা দিনকে-দিন প্রতিক্রিয়ার শিবিরে ঢুকে যাচ্ছে। তাছাড়া আজ এই দরিদ্র দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, উৎপাদিকা, শক্তির আধার বিকাশ ও সর্বাঙ্গীন জাগরণের ক্ষমতা গতায়ু ধনতন্ত্রের বিন্দুমাত্র নেই, তাই কেবলমাত্র সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটলেই যে চাষীদের ও চাষীতে ভরা এই দেশের মঙ্গল হবে এবং সর্বাঙ্গীন নবজাগরণ আসবে এমন ধরনের বিশ্বাস সত্যই অত্যন্ত হাস্যকর। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক গঠন ছাড়া সে উন্নতি ও সে জাগরণ আশা করা যায় না এবং চাষের ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের চাষ বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিচালিত চাষের প্রবর্তন করা আজ দেউলে ধনতন্ত্রের ক্ষমতার বাইরে। একমাত্র সমাজতন্ত্রই আজ মৃতপ্রায় গ্রামগুলিতে সত্যিকার পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবার ক্ষমতা রাখে। তাই চাষীদের সংগ্রামে সমাজতন্ত্রের কথাটা অপাংক্তেয় তো নয়ই বরং কার্যত দেখা যায় যে বুঝিয়ে বলতে পারলে চাষীরা সমাজতন্ত্রের দাবিকে স্বীকার করে নেয় এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর বিশ্বাস করে না।

কিন্তু কঠিনতম সমস্যাটা হচ্ছে এই যে চাষীদের মধ্যে যে বিভাগ আছে, যেমন সাধারণ মধ্যবিত্তচাষী, গরিবচাষী, ভাগচাষী ও খেতমজুর এদের নিয়ে যে বিরাট কৃষক সমাজ তাদের নিজেদের মধ্যেও ছোটখাটো অনেক বিবোধ আছে—জমির পবিমাণ নিয়ে, চাষের ভাগ নিয়ে এবং মজুরি নিয়ে—এই বিরোধগুলিকে অতিক্রম করে কি করে বেশিরভাগ চাষীকে এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায়? এমন রাস্তায় চাষীদের সংগ্রামকে এগিয়ে আনতে হবে যাতে কবে তাদের নিজেদের মধ্যে ঘরে ঘরে মারামারি ও ধস্তাধস্তি না হয় এবং সমবেত গরিব ও সাধারণ চাষীদেরকে সরকারি শিবির আক্রমণ করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এইখানেই কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কৃতিত্ব দেখাতে পারে।

কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সব সময়েই চাষীর সমবেত স্বার্থ ও দাবির উপর নজর দেবে। খণ্ড ও আশু স্বার্থের উপর সমস্ত নজর আকৃষ্ট করে রাখলে—অর্থাৎ আশু দাবিদাওয়া নিয়ে গরিব-

চাষীদের মধ্যবিত্ত-চাষীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলে, গরিব-চাষীব দাবিও মিটবে না এবং মধ্যবিত্ত চাষীরও তাতে মঙ্গল হবে না। বুঝতে ও বোঝাতে হবে কোন্ সাধারণ শত্রু তাদের সমবেতভাবে শোষণ ও দমন করছে—এবং কেন গ্রাম্যজীবনের সম্পদ আজ এত সঙ্কীর্ণ যে কারো বিকাশের পথ নেই। কেন বন্য পশুদের মতো এত সঙ্কীর্ণ খোঁয়াড়ে আবদ্ধ থেকে চাষীরা একটু স্থানের জন্য নিজেদের মধ্যে সদাই ঝগড়ার কারণ সৃষ্টি করে রেখেছে, কেন প্রতিবেশী গরিব চাষীকে সহযোগী হিসাবে দাঁড় না করিয়ে প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড় করাবার ক্ষুদ্র বুদ্ধি জেগে উঠছে ইত্যাদি।

দুটি সাধারণ সূত্র এমন আছে যার উপর এই সংযুক্ত গণ-ফ্রন্ট গড়ে তোলা যায়—গ্রামের যাবতীয় গরিবদের নিয়ে। একটি হলো সরকারবিরোধী মনোভাব—কেননা এই সরকার জমিদার, মহাজন, গ্রাম্যধনী, চোরাবাজারী, কালোবাজারী, বদমায়েস সবারই আশ্রয়দাতা—ট্যাক্স খাজনা এবং যাবতীয় পাওনার ও শোষণের প্রতিমূর্তি—অতএব এই সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত দরিদ্রসাধারণের ক্রোধ একটি সাধারণ বস্তু। এই সাধারণ বস্তুর বিরুদ্ধে গ্রামের যাবতীয় দরিদ্রদের এক করাতে হবে এবং তার উপর যখন সংগ্রাম উঠবে তখন আত্মরক্ষা ও আক্রমণের স্বার্থে সমবেত জনতার একতা আরো দৃঢ়, আরো শক্তিমান হবে ও নিজেদের মধ্যের বিরোধটা আরো দূরীভূত হবে। দ্বিতীয় পন্থা হলো ভবিষ্যৎ সমাজেব রূপ। এই সরকারকে খতম করে দিয়ে জনতার যে সবকার কায়েম হবে সেই সরকার কিভাবে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করবে, শিল্প কিভাবে গড়ে, তুলবে, গ্রাম্যজীবন কিভাবে পুনর্গঠিত করবে, শিল্প ও বাণিজ্যকে কিভাবে সকলের সম্পত্তি হিসাবে গড়ে তুলবে, এবং কিভাবে যন্ত্রচাসিত সমবেত চাষের দ্বারা উৎপাদন বাড়ানো হবে সেই চিত্রটা সবার চোখে স্পষ্ট করে তুলতে হবে—যার ভিতর সমস্ত দরিদ্র জনসাধারণের আশা আকাঙক্ষা মেটাবার ও সত্যিকার মুক্তির পথ রয়েছে। এই সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ সহজ নয় বা একদিনেই তা হবে না একথাও তারা বুঝবে এবং এও তারা বুঝবে যে তা এমন একটা জিনিস যার জন্য কষ্ট সহ্য করা চলে, দুঃখ বরণ করা চলে, এমনকি প্রাণ দেওয়াও চলে। এই সংগ্রাম সার্থক করতে হলে সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে শোষিত শ্রেণীসমূহের একতা দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলতে হবে এবং শহরের মজুরশ্রেণীকে সংগ্রামে টেনে আনতে সাহায্য করতে হবে—এসব বণনীতিগত কৌশলও চাষীদের বোঝাতে হবে এবং সংগ্রামের মধ্যেই তাদের চেতনাকে অনবরত বিস্তৃত ও গভীর করে যেতে হবে।

অতএব একদিকে সরকারবিরোধী সংগ্রাম ও অপব দিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিকল্পনা এই দুই শক্তি চাষী সাধারণকে একত্রিত করে রাখার উপায় বলে জানতে হবে।

সমগ্রভাবে আজকের বিপ্লবের নেতৃত্বের ঐতিহাসিক দায়িত্ব যেমন শ্রমিক শ্রেণীর উপর, তেমনি কৃষক-বিপ্লবের ক্ষেত্রে গ্রামদেশে এই সমবেত চাষীসাধারণের যে ফ্রন্ট তার মধ্যে নেতৃত্বে স্থান হবে গরিব খেতমজুর, ভাগচাষী ও দরিদ্র চাষীর। খেতমজুর ও ভাগচাষীরা সবচেয়ে শোষিত ও সর্বহারা—তাদেরই সংগ্রামভঙ্গিতে একটা আপসহীন দৃঢ়তা থাকা স্বাভাবিক ও তারাই সমবেত চাষের কল্পনাকে বেশি গ্রাহ্য করতে পারে ও সমাজতন্ত্রকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। অতএব গ্রামদেশে কৃষক বিপ্লবের নেতা হবে এই দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীরাই। যে সংগ্রামে যে মুক্তফৌজ হবে তাতে তাদেরই সংখ্যা রাখতে হবে বেশি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক চেতনাও বাড়াতে হবে সবার চেয়ে বেশি করে। কেননা তারা সবচেয়ে [illegible] বলে যদি মধ্যবিত্ত চাষীদেরকে চটিয়ে দেয় তবে তাদের আসল সংগ্রাম ব্যর্থ হবে—

ধনীদের সরকার মধ্যবিত্ত চাষীদের হাত করে ফেলবে এবং চাষী-সংগ্রামকে বিভক্ত করে দিয়ে নষ্ট করে দেবে। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি যেমন আজ সমস্ত (ধনী চাষীদের বাদ দিয়ে) মুক্তির উপরও নির্ভর করে এই সত্যটাকে তাদের হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে কেননা, কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের ও আশু দাবিদাওয়ার উপরই যদি তাদের নজর আবদ্ধ থাকে তাহলে তাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হবে—গ্রাম্যজীবনে কারো মুক্তি সম্ভব হবে না। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞানটা কম্যুনিস্টদের দিতেই হবে এবং সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তা আরো দৃঢ় করাতে হবে। উদারনৈতিক স্বার্থবাদ দিয়ে এই রাজনৈতিক স্বার্থবোধ সৃষ্টি করা যায় না একথা কম্যুনিস্টদের খেয়াল রাখতে হবে।

এইভাবে দরিদ্র চাষী ও চাষীসাধারণের সমবেত ফ্রণ্ট—সংগ্রামী ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে হবে—একাজ হয়ত সহজ হবে না—ক্ষণে ক্ষণে হয়ত নিজেদের মধ্যেই বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, কিন্তু বুদ্ধিমান নেতৃত্ব ও কঠিন পরিশ্রম দিয়ে প্রত্যেকটি বিরোধের মীমাংসা করে দিয়ে সংগ্রামী ঐক্য বজায় রাখতে হবে।

জমিদারদের বিরুদ্ধে, গ্রাম্য ধনীদের বিরুদ্ধে, বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে ও সর্বোপরি সরকারের বিরুদ্ধে, খেতমজুব, চাষী ও ভাগচাষীর প্রতিরোধ বাড়িয়ে যেতে হবে এবং সংগ্রামী শক্তি, সংগঠন ও গণবাহিনী গড়ে যেতে হবে। দেখতে হবে ভাগচাষীদেব তেভাগার লড়াই বা খেতমজুরদের মজুরির লড়াই মধ্যবিত্ত চাষীদের বিরুদ্ধে একদম না যায় যেন। গত কয়েক বছর ধরে কম্যুনিস্ট পার্টি খেতমজুরদেব লড়াই ও ভাগচাষীদের লড়াই লাগিয়েছে—কিন্তু যেহেতু সেসব সংগ্রাম কোনো বৈজ্ঞানিক নীতিতে পার্টির দায়িত্বে চালিত হয়নি—গ্রামদেশে লড়াই ওঠাও বলে ভাগচাষী ও খেতমজুবদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে—তাই সে লড়াই স্বভাবতই শক্ত শত্রুর বিরুদ্ধে না গিয়ে দুর্বল মধ্যবিত্ত চাষীব উপর গিয়ে পড়েছে। বড় বড় জোতদার বড় বড় জমিদাবের ও গ্রাম্য ধনীদের ক্ষেত্রে লড়াই করতে গেলে যে ভয়ানক নির্মম প্রতি-আক্রমণ আসে ও সঙ্গে সরকারি ফৌজ এসে উপস্থিত হয়। তাকে এড়াবার জন্যই এইসব বড় বড় শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই উঠেছে কম—দরিদ্রপ্রায় মধ্যবিত্ত চাষীদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম উঠেছে—যাতে করে মধ্যবিত্ত চাষীদের উপর সরাকারি প্রভাব বেড়ে যাবার পথ সুগম হয়েছে। এজাতীয় আত্মহত্যাকাবী পলিসি বর্জন করতে হবে—সব সময়েই শত্রুদের প্রধান ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করার নীতি বলবৎ রাখতে হবে—তাহলেই সাধারণচাষী ও মধ্যবিত্তচাষীদের জোট শক্ত করা যাবে এবং মধ্যবিত্ত চাষীরা ধনীদের দলে ঢুকবে না বা দোদুল্যমান থাকবে না।

শুধু এইভাবে সংগ্রামে শ্রেণীমোবচা বচনা করলেই মোরচা অটল ও শক্ত থাকবে না। এই শ্রেণীমোরচা কিভাবে কি জাতীয় সংগ্রামে নিযুক্ত হবে তার উপরেও এই শ্রেণীমোরচা টিকবে কিনা তা নির্ভর করবে। কেননা সংগ্রামের রূপটাই হলো সংগ্রাম। খুব চমৎকার শ্রেণীবিন্যাস করেও যদি ভুল পথে সংগ্রাম চালাই তবে সে শ্রেণীবিন্যাস ভেঙে খান খান হয়ে যাবে।

যেমন ধরুন কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রাম নীতি। ওরা গ্রামদেশে অথবা শহরে চাষী ও মজুরদের দিয়ে সরকারবিরোধী সংগ্রাম ওঠাতে প্রথমে কিছুতেই চায় না— সবকারবিবোধী সংগ্রামটাকে কেবলি এড়িয়ে বা স্থগিত বেখে চলতে যায়—কারখানায় মালিকের সাথে লড়াই করবে অথবা সরকারকে এড়াতে চাইবে—ধনী কৃষকদেব বিরুদ্ধে লড়াই করবে অথচ থানাটাকে এড়িয়ে যেতে চাইবে। মালিক ও ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে ওদের সংগ্রামের আয়োজন ও তোড়জোড় যত বেশি সরকারের বিরুদ্ধে, সংগ্রামের আয়োজন যেন তত কম। অথচ মালিক শ্রেণী যে অস্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে সে হলো রাষ্ট্রযন্ত্র—তাই রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ঘায়েল ও কাবু করবার প্রত্যক্ষ

কোনো রণকৌশল ও আয়োজন যদি না থাকে তবে মালিকের সঙ্গে সংগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য। গ্রামদেশে ওরা করে কি—করেছে কি? ধান বা জমিদখল নিয়ে একটা জনতার সৃষ্টি করে—হয়ত মালিকের বাড়ি চড়াও করে—তারপর পুলিস এসে গুলি ও লাঠি দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়ে যায়—এরই পুনরাবৃত্তি ওরা হাজারবার করেছে এবং বলেছে এটাই হলো চাষী-সংগ্রামের অপূর্ব কৌশল। অথচ এই সংগ্রামী জনতাকে দিয়ে অনায়াসেই একটা গণবাহিনী গঠন করা যায়,—তাদের যথাসম্ভব অস্ত্রপাতিতে সজ্জিত করা যায় এবং এই বাহিনীকে দিয়েই থানাগুলি আক্রমণ করানো যায় ও দখল করা যায়। এমনি কতকগুলি থানা দখল করে ফেললেই একটা মুক্ত অঞ্চলের মতো অবস্থা দাঁড়িয়ে যায় এবং দাঁড়িয়ে যায় একটা মুক্তিফৌজ। মুক্ত অঞ্চলের আওতায় যে সমস্ত দোদুল্যমান চাষী ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আছে তাদের দ্বিধা অনায়াসে ও অতি সহজেই তখন দূর করা সম্ভব কেননা মুক্ত অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী গণসরকার ও গণফৌজের কি নীতি তা তারা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছে এবং যেহেতু মুক্ত অঞ্চলে বড় বড় ধনী, জমিদার, ও গ্রাম্যধনীদের উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে তাই মধ্যবিত্তদের নিয়ে চাতুরী করা বা তাদের ধনীদের আওতায় টেনে আনার কোনো যোগাযোগই নেই। মুক্ত অঞ্চলের মধ্যে কাবা নতুন গণসরকারের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং কারা করবে না তা প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অতি সহজেই যাচাই করে নেওয়া সম্ভব হবে। তখন এক অতি সহজ বিচারের মাপদণ্ড সৃষ্টি হয়ে যাবে—অর্থাৎ যারা এই মুক্তিফৌজের সংগ্রামে সাহায্য কববে তাবাই মিত্র আর যারা করবে না তারাই শত্রু। এই পরিস্থিতিতে হয়ত গ্রাম্য ধনীদের মধ্যে কেউ কেউ গণসরকারকে ও গণফৌজকে মেনে নেবে না ববং উচ্ছেদের জন্য চেষ্টাও করবে। এদের ব্যবহার দেখে এদের সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এইভাবে মুক্ত অঞ্চল ও মুক্তিফৌজ প্রদেশের পর প্রদেশ নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল বলেই চীনদেশে মুক্ত অঞ্চলে আবদ্ধ দেশীয় ধনীরা ও মোটা চাষীরা মাও-সে-তুং এর সরকারকে ভয়ে হোক কি ভক্তিতেই হোক সমর্থন করেছে এবং সেখানে মধ্যবিত্তদের দ্বিধার কোনো ক্ষেত্রও থাকেনি। চীনের অমুক্ত-অঞ্চলের ধনীরা মাও-সে-তুংকে সাহায্য করবার জন্য কোনো চেষ্টা করেছে কি? কখনই না, তারা সম্মিলিতভাবে চিয়াং-সরকারকেই সাহায্য করেছে—কিন্তু মুক্তিফৌজ যখন এগিয়ে এসেছে, নতুন নতুন জায়গা দখল করে বসেছে তখনই তারা মাও-সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখাতে বাধ্য হয়েছে।

কাজে কাজেই বর্তমান ক্ষেত্রে চাষীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এই জাতীয় মুক্ত অঞ্চল ও মুক্তিফৌজ সৃষ্টির নীতি গ্রহণ করতে হবে। নইলে পলিটব্যুরো নেতৃত্বের কায়দায় চাষীদের নিজেদের মধ্যে ঘরে ঘরে লড়াই বেধে যাবে এবং আসল শত্রুকে জোরদার অত্যাচার চালাবার বেশি সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হবে। লড়াইয়ের কায়দার উপর শ্রেণীমোরচা এভাবে শক্ত ও অক্ষুণ্ণ না রাখতে পারলে চাষীদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম উঠতে পারে না—তা ব্যর্থ হতে বাধ্য হয় এবং গ্রাম্য ধনীদের প্রভাবই বেড়ে যায়। অতএব অন্ধ নেতৃত্বের শ্রেণীসহযোগিতামূলক সুবিধাবাদী রাজনীতির সম্যক উত্তর কার্যক্ষেত্রে পলিটব্যুরো দেখাতে পারেনি—নিজেদের ভুল পথ অনুসরণ করার জন্য, বিপ্লবে নতুন কোনো পথ অস্বীকার করার জন্য ও অন্ধ গোঁড়ামির জন্য। যার ফলে ভারতের সর্বত্র যে সব চাষী-সংগ্রাম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—বিশেষ করে বাংলায় ও কেরালায়,—তা কোথাও আজ আর টিকে নেই, পরাজিত হয়েছে। পরাজিত হয়েছে এই জন্য নয় যে অন্ধ কমিটির মতে তারা ধনীকৃষক ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল বলে—পরাজিত হয়েছে সংগ্রামের কৌশল না মানার জন্য। অন্ধ

কমিটির কাছে নীতি হিসাবে পলিটব্যুরোর পরাজয় হয়েছে একথা বলা যায় না—কিন্তু কৌশল হিসাবে সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে। পলিটব্যুরোর নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, কোনো বৈপ্লবিক নীতির অনুসন্ধান ছিল না—তারা কেবল পাগলের মতো রাশিয়ার চিত্র ভারতের জমিতে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিল—তাই কোথাও সামগ্রিক লড়াই করতে পারল না এবং পরাজিত হলো। আজ পরাজিত কম্যুনিস্ট পার্টি হয়ত ভাবছে যে তারা ধনী কৃষকদের সাথে হাত মেলায়নি ও সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে শত্রু বলে ভুল করেছে বলেই বুঝি তাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হলো এবং যদি তারা ধনী কৃষকদের সাথে হাত মেলাত ও দেশীয় ছোট ধনী ও মাঝারি ধনীদের সাথে হাত মিলিয়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা না বলত তাহলে হয়ত তাদের লড়াই খুব জোরদার হতো, বিপ্লব এতদিনে খুব এগিয়ে যেত। এ ধরনের চিন্তা অতি অতি হাস্যকর আত্মপ্রতারণা! লড়াইয়ের শিবিরে শ্রেণী বিচারের ভুলে ওদের পরাজয় হয়নি এবং ভিন্ন শিবির বা শ্রেণী বিচারেও লড়াই সার্থক হতো না। আসলে ওরা লড়াইয়ের পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে লড়াইয়ের কায়দা ও কৌশল না জানার জন্য। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যেমন ওরা খণ্ড খণ্ড ধর্মঘট থেকে সাধারণ-ধর্মঘট—সাধারণ-ধর্মঘট থেকে ব্যারিকেড লড়াই—ব্যারিকেড লড়াই থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ক্রমিক পর্যায় ও বিকাশ দেখেছিল—তেমনি কৃষক-বিপ্লবের স্তরও দেখেছিল সেই নিচে থেকে সংগ্রামের মধ্যে অর্থাৎ খেতমজুর ও ভাগচাষীর লড়াইয়ে তাদেব গ্রাম্য জমির উপরে শত্রুকে ডেকে এনে পরাজিত করার হাস্যকর প্রচেষ্টা। উভয় ক্ষেত্রেই সংগ্রামের কৌশল আয়ত্ত না থাকার দরুন এই পরিণাম ঘটেছে। ফলে ওরা নিজেদের থিসিসটাকেই দোষী মনে করে তা বর্জন ও পবিত্যাগ করতে চলেছে।

* * * *

আজ এই পলিটব্যুরোর নেতৃত্বের অবসান হতে চলেছে—কমিনফর্ম অন্ধ্র কমিটির সিদ্ধান্তকে সাফাই করে যখন তাদের কাগজে লিখেছে তখন আর নিস্তার নেই, পলিটব্যুরোকে যেতেই হবে। সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতির যুক্তিতে পলিটব্যুরো পার্টি থেকে অন্ধ্র কমিটি ও পার্টিকে নাকচ করেছিল—এখন এই অন্ধ্র কমিটিই নেতৃত্ব পেতে চলেছে আর এই পলিটব্যুরোর বিরুদ্ধে দলের চারিদিক থেকে বিদ্রোহ ভেঙে পড়েছে। এই পলিটব্যুরোকে তাই এখন বিদায় নিতেই হবে—তাছাড়া এই পরাজয় ও কমিনফর্মের নিন্দা পলিটব্যুরোকে সকল ক্ষতির জন্য দায়ী করে ছাড়বে, ওদের থিসিস উল্টে দেবে ও গত দুই বছরের "সংগ্রামকে"ও নিন্দা করে ছাড়বে—কেননা দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া এখন খুব চালু হয়েছে এবং সর্বত্র একটা পরাজিতের মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

এই পলিটব্যুরোর বিরুদ্ধে নীতিগত ও কৌশলগত ব্যাপারে আমরা যত আক্রমণই করে থাকি না কেন তার ভালর দিকটাও আমরা উপেক্ষা করতে চাই না। দলের মধ্যে সংস্কারবাদ ও অতীতের বুর্জোয়া তাঁবেদারীর বিরুদ্ধে এই পলিটব্যুরো যে তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিল তার অবদান পার্টি ও কম্যুনিজমের পক্ষে একটা মস্ত উপকার। এই ধরনের তীব্র আক্রমণ না করলে পার্টির ভিতরকার রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও দুর্বলতা কখনও প্রকাশ হতো না। অবশ্য একথা সত্য পার্টির ভিতরকার দুর্বলতা ও সুবিধাবাদ এই পলিটব্যুরো সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারেনি, যেহেতু তাদের নিজেদের চেতনায় নানা গোঁজামিল ছিল এবং তারাও সম্পূর্ণরূপে অতীতের মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত কংগ্রেস ও ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির এই প্রথম আপসহীন আক্রমণ—অতীতে কংগ্রেস ও বুর্জোয়ার তাঁবেদারী করে ওরা শ্রেণী-সংগ্রামের যাবতীয় ধার নষ্ট করে ফেলেছিল—কিন্তু এই পলিটব্যুরোই কংগ্রেস

ও ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীকে নির্মম ও কঠিন আঘাত করেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। তৃতীয়ত মুসলিম লীগকে তোষণ করার যে নীতি অতীতে কম্যুনিস্ট পার্টির একটা পলিসী ছিল সেই নির্লজ্জ নীতিকে এই পলিটব্যুরো তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে এবং তার ভিতরকার কদর্যতা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। চতুর্থত দলের মধ্যে মার্কসিজম, লেনিনিজম সম্বন্ধে যে বিরাট অজ্ঞতা ছিল, দলের কর্মীরা এমন কি নেতারাও যে কম্যুনিজমের প্রামাণ্য বইপত্র পড়ত না, চিন্তা করত না, বোকার মতো হৈ চৈ করে বেড়াত তামসিক অন্ধ বিশ্বাসের উপর—পলিটব্যুরোর রাজনীতি সেখানেও একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, যার ফলে দলের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ঢুকতে শুরু করেছিল একথাও বলা যায়। মত ও পথ বেছে নেবার ক্ষেত্রে উপরেব নির্দেশ অন্ধভাবে মেনে চলার বিরুদ্ধে একটা মনোভাব গড়ে উঠেছিল এবং চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশ পাচ্ছিল। যদি এই পলিটব্যুরো নেতৃত্ব ভারতের মাটিতে একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম আজও চালু রাখতে পারত তবে কমিনফর্মের ঐ জাতীয় নির্দেশ (For Lasting Peace for Peoples Democracy—15 Jany. '50) কম্যুনিস্ট পার্টি অত সহজে মেনে নিতে পারত না আর কমিনফর্মও নির্দেশ দিতে সাহস পেত না। সর্বশেযে একথাও স্বীকাব কবতে হবে যে এই পলিটব্যুরোর নেতৃত্বকালেই এই প্রথম ওদের পার্টি সরকাবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম ঘোষণা করেছে, এর পূর্বে কম্যুনিস্ট পার্টি কখনও সবকারবিরোধী কোনো সংগ্রামে অংশও নেয়নি। এই অপর্যাপ্ত ও অবৈজ্ঞানিক সংগ্রামেও দলেব সাধারণ কর্মীবা ও দলের আওতার চাষী, মজুর ও ছাত্ররা যথেষ্ট উৎসাহ, উদ্যম ও ত্যাগের নমুনা দেখিয়েছে ; এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচুব সাহস দেখাতে ও সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। ওদের কর্মী ও জনতার এই সংগ্রামী রূপ দেখে মাত্র এইটুকুই শোচনা আসতে পারে যে পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত পথে এই সংগ্রাম চালু কবতে পারলে এই সংগ্রামী কর্মীরা এবং জনতা সত্য সত্যই আজ কিছু করতে পারত্রে।

আজ এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যখন তাদেব দল খড়্গহস্ত হযেছে এবং নতুন নেতৃত্ব কায়েম হতে চলেছে তখন হয়ত তাদের পরাজিত মনোভাবের প্রতিক্রিয়ার পথে এই নেতৃত্বের উপরোক্ত দানগুলিকেও অস্বীকাব কবা হবে ও দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের চোটে আবাব সেই অতীতের যোশীবাদী নীতি কায়েম হবে। এই উপলক্ষে এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে পি. শি. যোশী আবার মুখর হয়ে উঠেছে এবং এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ ও আক্রমণ আজকেব নেতৃত্ববিরোধী কর্মীদেব কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে সেগুলি তারই অনুকরণ—অর্থাৎ কর্মীদের পলিটব্যুরো বিরোধী যুক্তি আজ পি. শি. যোশী সরবরাহ করছে, ফলে আবার দরেল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে অতীতের যাবতীয় সুবিধাবাদী দুর্নীতির ফলে পার্টিব চরিত্র সংগঠনে ও চেতনায় যে ঘোর সংস্কারবাদ আশ্রয় করেছিল এমন কি রণদিভে নেতৃত্বের সবলতাও তাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি ; এই জন্যেই তাদের সংগ্রাম সরকারের বিরুদ্ধে লাগার সাথে সাথেই দলের মধ্যেও সংগ্রামটা প্রবলতর হয়ে উঠল এবং দলের ভিতরকার এই দ্বন্দ্ব, অজ্ঞতা ও সুবিধাবাদ তাদের আঘাতের শক্তিকে শিথিল ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ কবে দিয়েছিল।

রণদিভে নেতৃত্ব খতম করার ঝোঁকে যদি এই সংগ্রামী মনোভাবটাকে খতম করে দেওয়া হয় তবে তার চেয়ে বেশি অনিষ্টকর আর কিছু হতে পারে না এবং তা শুধু পরাজয়ই নয়—পলায়নও বটে। ভীতু, অপদার্থ, ঘোর সুবিধাবাদী বলে পার্টি থেকে যারা তাড়া খেয়েছিল বা বসে পড়েছিল, তারা আবার যদি পলায়নীপথে এসে দলের আসর জমিয়ে বসে তবে তাদের

এই দুবছরের সংগ্রাম, নির্যাতন ও মৃত্যুবরণ,—সবটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং জনতার উপর তার একটা ঘোর কালো প্রতিক্রিয়া নামবে। সংগ্রামে হারতে হয় অনেক কারণে—কিন্তু সংগ্রামী মনোভাবটাই যদি ত্যাগ করা হয় তবে সেইটাই হবে সত্যিকার গ্লানি। সংগ্রামের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা যদি মুছে ফেলা হয়—এই নেতৃত্বের দাগ মুছে ফেলার বর্তমান উৎসাহে—তবে কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো ভবিষ্যৎ নেই ; এবং জনতার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাও তারা আর পাবে না। পরাজয়ের সাথে নৈতিক অধঃপতনটাকে জুড়ে দিলে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদীদের পথ প্রশস্ত করে দেবে। এই বিবাদ আজ কম্যুনিস্ট পার্টির সামনে ঝুলছে।

শোনা যাচ্ছে পার্টির মধ্যে একটা কথা চালু হয়েছে যে পি. শি. যোশীর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রণদিভের বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটেছিল—এই দুই বিচ্যুতির মধ্যে যে মধ্যপন্থা বর্তমান ছিল, তা হলো অন্ধ্র-নেতৃত্ব—এবং এই সঠিক অন্ধ্র নীতিই আজ দলের নেতৃত্বে স্থাপন করা হবে।

অন্ধ্র নেতৃত্বের পরিচয় যা আমরা পাই সে হলো তার "অন্ধ্র ডকুমেন্ট" নামক দলিল। কিন্তু সেই দলিল কম্যুনিস্ট পার্টির সেই সংগ্রামশীল দিনে রচিত—১৯৪৮ সালের শেষের দিকে। তারপর অনেক জল নদী দিয়ে বয়ে গেছে। সমগ্রভাবে কম্যুনিস্ট সংগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে—একমাত্র তেলেঙ্গানায় তা বন্ধ হয়নি, যেহেতু বন্ধ হবার কোনো ক্ষেত্র নেই, কারণ সেখানকার সংগ্রাম জনতাকে হয় জয়ী হতে হবে নয়ত শেষ হয়ে যেতে হবে : যেহেতু সরকার পক্ষ আজকের কম্যুনিস্ট পার্টির দুর্বলতার ও পলায়নের মুখে তেলেঙ্গানা সম্বন্ধে কোনো আপোষ করতে প্রস্তুত নয় কেননা পলায়মান কম্যুনিস্টদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য সরকারি ঔদ্ধত্যের আজ আর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যদি কম্যুনিস্ট পার্টি সর্বত্রই সংগ্রামের নীতি পরিবর্তন করে ফেলে তবে তেলেঙ্গানার পরাজয় মাত্র এতটুকু সময়ের ব্যাপার। তাছাড়া তেলেঙ্গানাকে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের কেন্দ্র হিসাবে পুনর্গঠিত করা এবং পার্টির সর্বশক্তি দিয়ে জোরদার করার কোনো ইঙ্গিত বা ইচ্ছা আজ আর দলের কোনো কোণ থেকেই শোনা যাচ্ছে না। তেলেঙ্গানার সংগ্রামকে আপসহীন বিপ্লবী পথে চালিত করবার ইচ্ছা কম্যুনিস্ট পার্টির যদি কোনো কালে থাকত তবে দুটি প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য তারা স্পষ্ট করে ঘোষণা ও পালন করত। এক হচ্ছে—তেলেঙ্গানাকে "জনতার সরকার" হিসাবে ঘোষণা করা ও রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া। দ্বিতীয় হলো—তেলেঙ্গানার সংগ্রামী দলটাকে "মুক্তিফৌজ" বলে ঘোষণা করা ও সেই ভাবে গড়ে তোলা। এই দুটি কাজ করলে তেলেঙ্গানার সাথে ভারত সরকারের কোনো আপসের ক্ষেত্র থাকত না। এ দুটি না করে তেলেঙ্গানায় সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ করে রাখা হয়েছে এবং আপসের ক্ষেত্রও মুছে ফেলে দেওয়া হয়নি। যদি আজ সরকার তেলেঙ্গানার চাষীদের জমির উপর স্বত্বটা মেনে নেয়—যে জমি তারা তিন বছর ধরে দখল করে নিয়েছে ও ভাগ করছে—এবং যদি তেলেঙ্গানায় ফাঁসীর আসামীদের ফাঁসী মকুব করে ও অত্যাচার উঠিয়ে নেয় তবে তেলেঙ্গানায় এক্ষুণি একটা আপস হয়ে যেতে পারে যেটা তথাকার কম্যুনিস্টরা ও ভারতের কম্যুনিস্ট নেতৃত্বও আজ মনে প্রাণে কামনা করছে। সংগ্রামের ও শক্তির উঠতি পথে হয়ত সরকার কম্যুনিস্টদের এই দাবি মানতে পারত কিন্তু সংগ্রামের পড়তি পথে সরকার আজ আর তাদের গ্রাহ্য করবে না এবং চাষীদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ভীত সন্ত্রস্ত করে দেবার লোভও সরকার আজ ত্যাগ করতে পারে না।

১৯৪৮ সালের অন্ধ্র-নেতৃত্ব সেদিন চীনের মতো গেরিলা যুদ্ধের প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে বলেছিল কেননা ভারতের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব চীনেরই মতো। কিন্তু সেদিন তারা নেতৃত্ব

পায়নি—দল থেকে তাড়া খেয়েছিল। আজ যখন তারা নেতৃত্ব পেতে চলেছে, আজ কি তারা সেই গেরিলাযুদ্ধের কথা স্মরণ করবে এবং তেলেঙ্গানাকে চীনের সংগ্রামের মতো নতুন করে সংগ্রামের রাস্তায় নিয়ে আসবে?—না পরিস্থিতি পালটে গেছে বলে তেলেঙ্গানাকেও বিসর্জন দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রবর্তন করবে! নতুন কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব হিংসা ও সাবোতাজের পথ ত্যাগ করতে চলেছে বলে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে—তার পিছনে কোন জাতীয় ইঙ্গিত পাই? যদি হিংসা ও সাবোতাজ ত্যাগ করা হয় তবে গেরিলাযুদ্ধ ও মুক্তিফৌজ, এমন কি তেলেঙ্গানার কথাও ত্যাগ করতে হয়। ১৯২৭ সালে সাংহাই ও ক্যান্টনে কম্যুনিস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর চিয়াং কাইসেকের যে দমননীতি কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে পিষে মারবার অভিযান চালায় সেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেদিন কি কম্যুনিস্টরা পিছপা হয়েছিল? সেদিন কি মাও-সে-তুং গ্রামে গিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে আজকের জয়যুক্ত সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেনি? সেদিন কি মাও-সে-তুং বা কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব সরকারের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করেছিল বা পুনর্গঠিত হবার অজুহাত দেখিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে পা বাড়িয়েছিল?—না, একেবারে না। বরং সেই পরাজয়কে পরাজিত করার জন্য আরও দৃঢ়তর, আরও আপসহীন, সশস্ত্র সংগ্রাম করতে এগিয়ে গিয়েছিল—যার রূপ হলো গ্রামদেশে সোভিয়েট সরকার স্থাপন করা ও লালফৌজ গঠন করে তা রক্ষা করা। চিয়াং কাইশেকের সাথে অতীত সহযোগিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে, তাদের সংহাই ও ক্যান্টনের পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসাবে—চিয়াং-সরকারের বিরুদ্ধে আপসহীন নির্মম গেরিলাযুদ্ধ সংগঠন করেছিল। আজ কি অন্ধ্র নেতৃত্ব তাই করতে চলেছে?—এইটাই কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার দ্বারা আজ বুঝতে হবে অন্ধ্র নেতৃত্ব বিপ্লববাদী, না যোশীপন্থী সুবিধাবাদী।

কম্যুনিস্ট মুখপত্র বলেছে যে ভারতে সংগ্রামী জনতার মধ্যে মজুর, চাষী, সমগ্র কৃষক শ্রেণী (ধনী-কৃষকদের নিয়ে) মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও মাঝারি বুর্জোয়াদের নিয়ে সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরি করতে হবে—ধনী-কৃষক ও মাঝারি বুর্জোয়াদের সংগ্রামী জনতার সহায়ক হিসাবেই দেখতে হবে। তারা আরও বলেছে ভারতের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক একেবারেই নয়—তা আজ গণতান্ত্রিক বিপ্লব—অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির বা স্বাধীনতার আন্দোলন এবং সামন্ততন্ত্র অবসানের বিপ্লব—এই বিপ্লব ভারতীয় ধনতন্ত্রের বিরোধী নয়। এই বিপ্লব চীনের অনুকরণে চালাতে হবে—শ্রেণীযোজনার দিক থেকে, সামাজিক লক্ষ্যের দিক থেকে এবং সংগ্রামের কৌশলের দিক থেকে—সবদিক থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের বিপ্লব চীনের অনুকরণ করুক—এই তাদের ইচ্ছা। অন্ধ্র নেতৃত্বও একদিন এই কথা বলেছিল—তাই আজ তারা নেতৃত্ব পাচ্ছে। কমিনফর্মও একথা বলেছে যে যখন দেশের মধ্যে সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী গড়বার মতো অনুকূল অবস্থা হবে তখন চীনের মতো ভারত এবং পাকিস্তানেও মুক্তিফৌজ গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্তু যখন অনুকূল অবস্থা হবে—এই যখনের বিচার করবে কে? যখনকে কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা যায় না—আবার এই যখনকেই কি সক্রিয় চেষ্টার দ্বারা এখনই পরিণত করা যায় না? এই যখন কথাটির উপরই সুবিধাবাদ বেশি করে আশ্রয় নেবে এবং সংগ্রাম চালু করতে বিলম্ব করবে। এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের পিকিং সম্মিলনে, চীন বিপ্লবের অন্যতম নেতা লিউ-সাও-চি বলেছেন যে, এশিয়ার মতো দেশে এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশে আজকের গণবিপ্লব প্রথম থেকেই সশস্ত্র-সংগ্রামের পথ ছাড়া এগুতে পারে না—এবং তাই তিনি শ্রমিক সম্মেলনকে, নিপীড়িত জনতার উদ্দেশে মুক্তকণ্ঠে, স্পষ্ট করে একথা ঘোষণা করতে বলেছেন যে, আজ মালয়ে, ব্রহ্মে, ইন্দোচীনে যে সশস্ত্র-

সংগ্রাম চলেছে, সেই সংগ্রামের পথই একমাত্র ঠিক পথ। অথচ ভারতেব কম্যুনিস্ট পার্টি যদি সশস্ত্র-সংগ্রামের কথাটা নানা অজুহাতে এড়িয়ে যায়, তাহলে কমিনফর্মের নির্দেশ ও চীনবিপ্লবীদের অভিজ্ঞতা—কোনটাকে মানা হবে? মাও-সে-তুং-এর রাজনীতি গ্রহণ করলাম কিন্তু তার মুক্তিফৌজ গঠনের কথা এখনই গ্রহণ করলাম না—এই ধরনের অবস্থা অত্যন্ত হাস্যকর ও আত্মবঞ্চনামূলক। মুক্তিফৌজকে বাদ দিয়ে মাও-সে-তুং-এর নয়াগণতন্ত্র গ্রহণ করা মানে—তরলতা বাদ দিয়ে জলকে গ্রহণ করার, তাপকে বাদ দিয়ে আগুন গ্রহণ করার মতো কথা। সংগ্রামটাই এখানে নীতির বা কৌশলের সারবস্তু—যদি সংগ্রামই বন্ধ করা হয় তবে মাও-নীতি বা লেনিন-নীতি কোনোটাই গ্রহণ করা হয় না। কম্যুনিস্ট কর্মীরা তাদের নতুন পথ ও নেতৃত্ব তৈরি করার মুখে আজ বড়ই চিন্তান্বিত বলে তাদের চিন্তার খোরাক হিসাবে যোগান দেবার মতো এই সব সম্ভাবনাগুলিকে উপস্থিত করে রাখলাম। এর বেশি এখন আর বলা সম্ভব নয়—কেন না নতুন নেতৃত্ব বাস্তবক্ষেত্রে কি রূপ নিয়ে দাঁড়ায় তা দেখবার অপেক্ষায় আছি—তবে আশাপ্রদ লক্ষণ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

* * * *

এখন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ও আমাদের কাজ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করি। আমাদের হাতে এখন অনেক অভিজ্ঞতা ও অনেক চিন্তনীয় বিষয় উপস্থিত আছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে আমাদের নীতিগত দ্বন্দ্ব কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরকার নীতিগত অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ ভাববার পক্ষে অনেক বস্তু যুগিয়েছে। প্রত্যেক কর্মী তাতে উপকৃত হবে, সত্যিকার সচেতন হতে সুবিধা পাবে এবং ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণে অনেক সাহায্য পাবে।

কম্যুনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি, উভয়েই প্রায় একই সময়ে বর্তমান সংগ্রামে এগিয়ে যায়। বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রামী ধারা তার বহু পূর্ব থেকে চালু থাকলেও—স্বাধীনতা আন্দোলনের অবসানে কার্যত যে নয়াসংগ্রাম ওঠে তা কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রামের প্রায় সমসাময়িক। আজ কম্যুনিস্ট পার্টি সংগ্রাম গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত—অর্থাৎ তারা সম্মুখ সংগ্রামের রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিচ্ছে বলে মনে হয়। তারা যে শুধু সংগ্রামের Tactics বা কৌশলই বদলাচ্ছে তা নয় Strategy বা সাধাবণ রণক্ষেত্রটাও বদলাচ্ছে। বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে এজাতীয় Strategic retreat বা রণক্ষেত্রগত পশ্চাদপসরণের প্রশ্ন ওঠেনি—কৌশলগত পরিবর্তন সাধন হযত অবস্থা বুঝে করতে হবে। মোট কথা এই বিরামহীন বিপ্লবী যুদ্ধে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো একটি বা দুটি পরাজয় আমাদের যুদ্ধ করবার সিদ্ধান্তই পাল্টিয়ে দিতে পারে না (Defeat in a battle does not defeat our determination to continue the war)। আমরা যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত নই—বরং আরও দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য পণ করেছি। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে ফিরে যাচ্ছি না, কোনো একটি মোরচায আমবা প্রতিহত হয়েছি বলেই সমগ্র সংগ্রামের প্রয়োজনটাকে অস্বীকার করতে পারি না। অতএব বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি পরাজয় মানতে প্রস্তুত নয়। এই মনোবৃত্তি ও প্রেরণার উপর নির্ভর করেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ করছি এবং বর্তমান বিরামহীন সংগ্রাম ও প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট ও যত্নবান আছি।

আমরা অবস্থার প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করি না এবং পথের দুর্গমতাকে উপেক্ষা করি না। ভারতবর্ষে সত্যকার বৈপ্লবিক সংগ্রাম আজও যে আমরা বর্মা বা ইন্দোচীনের মতো সশস্ত্র পর্যায়ে ওঠাতে পারিনি এবং তার জন্য যে আমাদের সংগ্রাম করার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য। সেদিনকার ভারতে আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করা ও মুক্তিফৌজ

সংগঠিত করে নেওয়া যতটা সহজ ছিল, আজ, এই কয়বছর পরে তা আর তত সহজ নেই;—অথচ শহর অঞ্চলে শ্রমিক সাধারণের বৈপ্লবিক উত্থান ঘটানোর পক্ষে যে গণতান্ত্রিক সুবিধার প্রয়োজন তাও নেই। দমননীতি আজ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত,—সরকারি ফৌজ, পুলিস, গুপ্তচরের সংখ্যা আজ চারগুণ বেড়ে গেছে—জনতার সংগঠনগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—তার উপর সাম্প্রদায়িক সমস্যা জনসাধারণের মনে গ্লানির ছাপ ক্রমশই বাড়িয়ে দিচ্ছে ; এসবের উপর কম্যুনিস্ট পার্টি যদি সংগ্রামক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় বা সরে যায়, তাহলে হৈচৈ করেও তারা সে আসরটা গরম রেখেছিল তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এইসব মিলে জনতার বুকে একটা নৈরাশ্য জাগাতে চাইছে। আমরা এসব লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেছি—আমরা অন্ধ নই।

কিন্তু আমরা জানি যে আজ জনতার পক্ষে পিছু হটবার মতো কোনো ক্ষেত্র নেই এবং বামপন্থীদের পক্ষে বা বিপ্লবীদের পক্ষে জনতার সংগ্রাম চালু রাখবার জন্য বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তাছাড়া আমরা দেখছি—জনসাধারণের দুর্ভোগ চরম সীমায় উঠেছে, অর্থনৈতিক দারিদ্র সবাইকে শঙ্কিত করে তুলেছে এবং লক্ষ লক্ষ গৃহহীন বাস্তুহারা এই দারিদ্রকে ভয়াবহরূপে সমগ্র দেশের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা দেখছি—কংগ্রেসী সরকার দেশের এই দুঃখ, দুর্ভোগ ও দারিদ্র এতটুকুও দূর করতে পারছে না, বরং বাড়িয়ে তুলছে—আর আমরা এও জানি যে সরকারের অর্থনৈতিক শক্তি ক্রমশ দেউলে হয়ে উঠেছে এবং তারই জন্য তারা আরও স্পষ্টত অ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির সাথে মিলিত হবার তাগিদ প্রকাশ করছে।

এই সমস্ত নিষ্ঠুর আঘাত ও হতাশা, বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনতার বুকে তীব্র তিক্ততা সৃষ্টি করছে এবং তাদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সেই ক্ষুব্ধ চেতনার ও আহত আক্রোশের স্বরূপটাকে আজ কোন জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যে ফাটিয়ে দেওয়া যায়—সেইটাই হবে আমাদের একমাত্র গবেষণার বস্তু। তবে, এ বিষয়ে কেনো সন্দেহ নেই যে সংগ্রামের আঘাত ছাড়া সেই চাপা ক্ষোভকে ব্যাপক বিদ্রোহে পরিণত করার পক্ষে অন্য কোনে পথ নেই। যত কঠিনই হোক, আমাদের সংগ্রাম ওঠাতেই হবে—জনসাধারণের ক্ষোভ প্রকাশের একটা রাস্তা তৈরি করতেই হবে ;—একবার তার মুখটা খুলে দিতে পাবলে অনর্গল ধারায় বিক্ষোভের আগুন বেরিয়ে আসতে থাকবে। কেননা আজ কংগ্রেসী-সরকার স্রেফ ভয় দেখিয়ে ও মার দিয়ে জনতাকে চুপ করিয়ে রেখেছে—কংগ্রেসের উপর তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা ভক্তি নেই। এই ভয় ও মারের বিরুদ্ধে জনতার হাতে শক্তি ও সংগঠন তুলে দিতে হবে। নিজেদের ভুলে ও গাফিলতিতে আমরা আমাদের পথ দুর্গম করে ফেলেছি—আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় ও বুদ্ধিতেই পথ সুগম করে নিতে হবে। আমরা আজ আমাদের অজ্ঞতার ও আলস্যের দেনা পবিশোধ করছি মাত্র।

আন্তর্জাতিক-ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক সঙ্কট আর কতকাল ঠেকিয়ে রাখবে অথবা আন্তর্জাতিক সংগ্রাম কবে ফেটে পড়বে—এই দুই বস্তু আজ ভারত-সরকারের দুই দুঃস্বপ্ন। এই দুঃস্বপ্নগুলি কবে ও কিভাবে বাস্তব রূপ নিচ্ছে তা একটি হিসেবের বস্তু কেননা উক্ত আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির সংঘাতে আমাদের রাজনীতির পথ অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে—তা আবার জনতার জয়যাত্রা মুখর হয়ে উঠতে পাবে এবং এই দমনবাজ্য সহসা কেটেও যেতে পারে। কিন্তু সে সব ফ্যাক্টর জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের নিজেদের করায়ত্ত ও আয়াসসাধ্য শক্তির উপর নির্ভর করেই আমাদের কার্যক্রম তৈরি করব—কোনো অজ্ঞাত শক্তির সম্ভাব্য অনুকূল আঘাতের অপেক্ষায় বসে থাকব না, বরং সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট এগিয়ে

আনতে ও দ্রুতগামী করতে, আমরা যদি আমাদের দেশে কোনো উপায় পাই, নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করব। সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক সঙ্কটকে তরান্বিত করে আনার মধ্যেই বিপ্লবী শক্তির দানা বেঁধে ওঠবার পথ প্রশস্ত হবে, আঞ্চলিক-ক্ষমতা দখল করার পথও সহজ হবে এবং দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের সম্ভাবনাটাও আবার জেগে উঠতে পারে, বিশ্বপরিস্থিতির কোনো অনুকূল মুহূর্তে। ভবিষ্যৎ যে কোনো রূপেই দেখা দিক না কেন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য সংগঠন ও প্রস্তুতি অকেজো প্রমাণিত হবে না বরং সকল অবস্থাতেই তার ব্যবহার করা চলবে।

আমাদেব এই বাস্তব কার্যক্রমের সংঘাতঘটিত যাবতীয় কাজ ছাড়াও—নীতিগত ব্যাপারেও (in theoretical matters) আমাদের যথেষ্ট কাজ ও সংগ্রাম আছে। বিশ্ববিপ্লবের পটভূমিকায় আজ আমরা আমাদের দেশের মোরচায় যে সংগ্রামে ব্যস্ত, তারই বিকাশের পথে আন্তর্জাতিক বিশ্বসমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং এখানেও আমাদের দায়িত্ব আছে—কেননা বিশ্ববিপ্লবের পরিপূর্ণ চেতনার সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কনে প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার দান থাকতে বাধ্য। বিপ্লবের বিশ্বনেতৃত্বও অনিবার্যরূপে মস্কোর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট হতে বাধ্য এমন কোনো কথা নেই—সেই নেতৃত্ব গঠনে প্রত্যেকে দেশের অবদান থাকা উচিত, অন্তত চেষ্টা থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে বিশ্ববিপ্লব সম্পূর্ণ হতে এখনো ঢের বাকি এবং দুর্দান্ত বাধা ও দুর্গম পথ বিশ্ববিপ্লবের পথে আজও বর্তমান, এমনকি বিপ্লবী শিবিরের অভ্যন্তরেও বিপ্লবের বাধা নানারূপে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। একথা অস্বীকার করা মানে অতিরিক্ত সরলতা যার অপর নাম মূর্খতা মাত্র।

আমরা পূর্বেই বলেছি আজ পৃথিবীতে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী যে-দুটি শিবির গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে বিপ্লবী শিবিরে আমাদের স্থান, অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, পূর্ব ইউরোপ, ইন্দোচীনের সংগ্রামশীল অংশ, বর্মার বিদ্রোহীরা, মালয়ের বিদ্রোহীরা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিদ্রোহীরা এবং প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত সাম্যবাদী ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামশীল শক্তি আছে—তাদের মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে সম্মিলিত ফ্রন্ট সেই গণবিপ্লবের শিবিরেই আমাদের স্থান—আমাদের জন্য কোনো তৃতীয় শিবির তৈরি হতে পারে না। কিন্তু এই শিবিরের মধ্যে নানাস্তরের নানা রকমের শক্তিও আছে—কেউ বিপ্লবী, কেউ অতিবিপ্লবী, কেউ প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী, কেউ সুবিধাবাদী, কেউ নিয়মতান্ত্রিক—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এক সক্রিয় ও সংগ্রামশীল সমাবেশ এই শিবিরে দেখতে পাওয়া যায়। এই শিবিরের মধ্যে যে শক্তি আজ প্রধান তাহলো স্ট্যালিন-নেতৃত্ব। এই স্ট্যালিন-নেতৃত্ব অচল অনড় কোনো বস্তু নয়—তারও ওঠা নামা ও ডাইনে বামে ঝোঁকার ইতিহাস আজ অবিদিত নয়। এই শিবিরের মধ্যে মত ও পথের সন্ধান নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছেই এবং থাকবেই—যতদিন না বিশ্ববিপ্লব সম্পূর্ণরূপে সার্থক হবে—এবং বিপ্লবের নেতৃত্বের ধারা শেষ পর্যন্ত কার হাতে ও কেমন ভাবে প্রকাশিত হবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। তবে সে ধারার যে গতি আছে একথা স্বীকার করতে হবে এবং সে ধারা যে সব সময়েই শুদ্ধপথ বেছে নিতে পারবে এবং কোনো অনিবার্য নিয়ম নেই। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সকল দেশের বিপ্লবী অভিজ্ঞতাই সেই নেতৃত্বকে সার্থক পথে ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব বহন করবার শক্তি ও চেতনা জুগিয়ে দিতে পারে। একথা অস্বীকার করা মানে অতিরিক্ত সরলতা যার অপর নাম মূর্খতা।

বিশ্ববিপ্লবের সম্মিলিত শিবিরে যে বিশ্বনেতৃত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত তার বাস্তব শক্তির ব্যবহার ও চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে এখন একটা চিত্র নেওয়া যাক—সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ও চেতনার ক্ষেত্রে তার যে সমস্যা তারও একটা হিসাব নিকাশ করা যাক ; কেননা বাস্তব সমস্যার সাথে সাথে

চেতনার সমস্যাও সমান্তরালে বর্তমান থাকে (Practical and Theoretical Problems and Tasks before International Leadership)।

প্রথমত আজ এই জিনিসটাই পরিষ্কার হয়নি যে বিশ্ববিপ্লবের প্রয়োজনে বিশ্বনেতৃত্ব বা কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে কিনা। পূর্বে যখন তৃতীয় আন্তর্জাতিক বর্তমান ছিল তখন সমস্ত পৃথিবীর বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিনিধিত্বমূলক এক বিপ্লবী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হতো, যাতে সমস্ত দেশের বিপ্লব পরস্পরের সহযোগিতার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা পায় এবং "সমস্ত পৃথিবীর শ্রমজীবীরা এক হও" এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটা বাস্তব সাংগঠনিক রূপ প্রকাশিত হয় তার জন্য। স্ট্যালিন একদিন এই আন্তর্জাতিক সংঘ অপ্রয়োজনীয় বোধে উঠিয়ে দেন ; কিন্তু তারপর যুদ্ধের পরে আবার কমিনফর্ম নামে এক সংগঠন ইউরোপের জন্য তৈরি হয়—যদিও তার নেতৃত্ব আজ সকল দেশেই চালু হচ্ছে। এই কমিনফর্ম তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মতো স্পষ্ট নয়,—কেননা এরা উপদেশ দেয় কিন্তু দায়িত্ব নেয় না, ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেয় কিন্তু কোনো দেশের বৈপ্লবিক উত্থানের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে কোনো সাহায্য করে না। তাই, মনে হয় যেন বিশ্বনেতৃত্ব আজ বিকেন্দ্রীভূত—কিন্তু বাস্তবে বিশ্বনেতৃত্ব আজও কেন্দ্রীভূত—স্বয়ং স্ট্যালিন ব্যক্তি হিসাবে আজও এই নেতৃত্বের কর্ণধার বলা যায়—যার কথায় বহুদেশের কম্যুনিস্টরা বিনাদ্বিধায় ওঠে বসে। কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব ও দায়িত্ব আছে অথচ ঠিকমতো তা নেই—এই রকমের এক লুকোচুরির অবস্থা আজ প্রতীয়মান হয়। এ জাতীয় লুকোচুরির একটা বাস্তব ক্ষেত্র আছে, যার থেকে বিশ্বনেতৃত্বের ব্যাপারে এই অস্পষ্টতা জন্ম নিয়েছে। আমরা একটু পরে তার বিশ্লেষণ করব।

দ্বিতীয়ত বিশ্বপ্রতিবিপ্লবী শিবিরের নেতৃত্ব যার হাতে সেই আমেরিকাও প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিক্রিয়াকে রক্ষা করার দায়িত্ব শপথ করে নেয়নি, অথচ কার্যক্ষেত্রে তার নেতৃত্ব আজ সব ধনতান্ত্রিক দেশগুলিই মানতে বাধ্য—এখানেও একটা লুকোচুরি আছে—আছে এইজন্য যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জনতা যেন না ধরে নেয় যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তাদের গ্রাস করতে চলেছে। আমেরিকা তাই সর্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শাসকশ্রেণীকে সহানুভূতি দেখায় মাত্র। কিন্তু এখানে বিশ্ববিপ্লবের নেতা রাশিয়া ও বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার নেতা আমেরিকার সহানুভূতিব ওজনগত পার্থক্য এত বেশি যে তাতে গুণগত পার্থ্যকই দাঁড়িয়ে যায়। আজ আমেরিকা প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিপ্লব রুখবার জন্য যে পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ, সেনাবিশারদ, যুদ্ধবিশারদ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে? সহানুভূতি দেখায় তার তুলনায় বিশ্ববিপ্লবের নেতা রাশিযা তার শিবিরস্থিত বিপ্লবী শক্তিগুলিকে কি সাহায্য করে? তুলনায় কিছু নয়। গ্রীস, তুর্কী, ইরাক, ইরান, বর্মা, ইন্দোচীন, মালয়, কোরিয়া, থেকে আরম্ভ করে খাস ইউরোপে যে পরিমাণ অস্ত্রপাতি, অর্থ, সৈন্য, যুদ্ধোপকরণ—এমন কি সাক্ষাৎ নেতৃত্ব—যা আমেরিকা দিচ্ছে—তার তুলনায় বিপ্লবীরা কি পায়? চীন যা পেয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে তাব শতগুণ বেশি পেয়েছিল আমেরিকার কাছে থেকে চিয়াং-কাইশেক। অতএব প্রতিবিপ্লবী আমেরিকার নেতৃত্ব বিপ্লবী রাশিয়ার নেতৃত্বের চেয়েও ঢের বেশি স্পষ্ট, দায়িত্বপূর্ণ ও কর্তৃত্বশীল। বর্মার বিপ্লবীরা, মালয়ের বিপ্লবীরা, ভারতের বিপ্লবীরা অর্থ, অস্ত্র ও সহযোগিতার অভাবে যে পরিমাণ মার খেয়ে চলেছে তার তুলনা চলে না—অপরপক্ষে এই সব দেশেরই শাসকবর্গ কত বেশি সাহায্য ও সহানুভূতি, নিজেদের শিবির থেকে পেয়ে যাচ্ছে—বিপ্লবীদের মার দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় বিশ্ববিপ্লবী-নেতৃত্ব থেকে আরো কিছু বেশি সাহায্যের আশা এই দেশগুলির সংগ্রামী জনসাধারণ কি করতে পারে না এবং তা করাটা কি অন্যায়?

স্ট্যালিন-নেতৃত্ব একথার উত্তরে বলে যে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি—কেননা তাতে করে শাসক শ্রেণী এই মিথ্যা রটাতে পারবে যে রাশিয়া লালসাম্রাজ্য বাড়িয়ে চলেছে এবং এই অজুহাতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষাব নামে জনতাকেও বিভ্রান্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু আমরা মনে করি এই ভয়ের মধ্যে অতিরঞ্জন আছে এবং এই যুক্তি দিয়ে এড়িয়ে যাবারও ইচ্ছা রয়েছে। সংগ্রামী জনতা মারের মুখে অন্যান্য দেশের বিপ্লবীদের সাহায্য কত ব্যাকুলভাবে চায এবং চেয়ে চেয়ে না পাওয়ার জন্য যে তাদের হতাশা আসে, এই যুক্তির দ্বারা সেই সত্যটাকেই অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। অর্থ, অস্ত্র ও লোকবল যদি নাও মেলে—সহানুভূতি ও উৎসাহতো তো মিলতে পারে—কিন্তু আজ পর্যন্তও স্ট্যালিন-নেতৃত্ব বর্মার অথবা ভারতের সংগ্রামী জনতাকে একটা উৎসাহ দিয়ে পাঠিয়েছে কি? কখনও বলেছে কি আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা জনসাধারণের উপর যে অন্যায় করে চলেছে তা গর্হিত এবং জনসাধারণের তা সহ্য করা উচিত নয়? কখনও বলেছে আমি তোমাদের সংগ্রামের সার্থকতা কামনা করি? অতএব বিশ্ববিপ্লবের এই নেতৃত্ব আজও স্পষ্টত দায়িত্বশীল নয়। এ কথাটা বললে অন্যায় আক্রমণ করা হবে না বলেই মনে হয়।

তৃতীয়ত আন্তর্জাতিকতা কি, সে তথ্যও আব আলোচিত হয় না। বিভিন্ন দেশগুলির সমাবেশ বা সমষ্টিই আন্তর্জাতিকতা নয়—জাতীয়বাদের ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতিক নিজস্ব সত্তা আজ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই অপেক্ষমান নয়—মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তার বিকাশ অপেক্ষমান। পিছিয়ে পড়া পাড়াগেঁয়ে দেশের শিল্পোন্নতি বিপ্লবের পরেও একান্তভাবে সেই দেশেরই অন্তর্গত শিল্পশক্তিব উপরই নির্ভবশীল থাকবে—এই আড়ষ্ট চেতনাই নয়াগণতান্ত্রিকতার জন্মকথা। যদি মনে করা যেত বিপ্লবী শিবিরে যে সমস্ত দেশ আজ বিজয়ী তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ বিজয়ী দেশগুলির সমষ্টিগত শক্তিতে ও এক সম্মিলিত পরিকল্পনায় গড়ে নিতে হবে, তবে পিছিয়েপডা দেশের আর্থিক দুর্বলতাব উপর এত জোর দিয়ে সেখানে সমাজতন্ত্রের সময় হযনি বলে মন্থরগতিতে নয়াগণতান্ত্রিক গোঁজামিল চালু করা নিয়ে কোনো নীতিগত তর্ক (Theoretical Controversy) উঠত না। যদি প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব সমস্ত ইউরোপের জন্য একটা অর্থনৈতিক ও সামরিক কাউন্সিল তৈরি করতে জাতীয়তার গণ্ডি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে, যদি জার্মানী, ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির কয়লা, লৌহ প্রভৃতি মূলশিল্পগুলি একটি জাতীয়তাতীত সংগঠনের নেতৃত্বে চালাতে এগিয়ে যেতে পারে, তবে বিপ্লবীশিবিরের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কেন একই সামগ্রিক পরিকল্পনায় ও একই সামরিক পরিকল্পনার পথে এগিয়ে আসবে না? কেন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বশিবিরে আজও জাতীয়তাবাদের এত প্রাধান্য থাকবে? জাতীয়তার এই খণ্ডস্বার্থ যখন বিপ্লবীশিবিরেও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে চায (যার একটা প্রকাশ হলো টিটোইজম্) তখনও কেন আন্তর্জাতিকতার উপর জোর দেওয়া হয় না?

এই কথাগুলি ভাল করে বুঝতে হলে কি আমরা করতে চলেছি—কোন পৃথিবী আমরা গড়তে চলেছি, তার সঙ্গে প্রতিদিন আমরা কি করি ও কেমন ভাবে ভাবি তার একটা তুলনামূলক চিত্র পাশাপাশি রাখা দরকার।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিপ্লবের পথে পৃথিবীতে সকল মানুষকে নিয়ে আমরা এমন একটি মহাদেশ গঠন করতে চাই—যেখানে শ্রেণী নেই, শ্রেণীযুদ্ধও নেই—দেশ নেই, জাতীয়তার যুদ্ধ নেই, সাদা কালোর ঝগড়া নেই, রাষ্ট্র নেই এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলও নেই। কেননা দল শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্যই গঠিত হয় ;—তাই যখন শ্রেণী

থাকবে না তখন দলেরও প্রয়োজন থাকবে না। সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান, ধন, সম্পদ, সবকিছুর উপর সকল মানুষের সমষ্টিগত অধিকার চালু হবে, স্বার্থচেতনার বদলে সমাজচেতনা মানুষের একমাত্র চরিত্র হবে এবং জাগবে বিশ্বচেতনা সকল মানুষের মনে। সমস্ত মানুষকে নিয়ে এই যে সুপরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা তারই নাম বিশ্ব-সাম্যবাদ। এইরূপ পৃথিবী ও সমাজ গঠনই হলো সকল দেশের কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য ও আদর্শ।

এই বিশ্বসমাজ গঠন করবার পক্ষে যে অর্থনৈতিক উৎপাদিকাশক্তিব বাস্তব প্রয়োজন তার বুনিয়াদ সাম্রাজ্যবাদই তৈরি করে দিয়েছে এবং বর্তমানে রাশিয়ার অগ্রগামী অর্থনৈতিক শক্তি সেই বুনিয়াদের ভিত্তি আরও প্রশস্ত করে দিয়েছে, যার জন্য সবাই বলে থাকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডি পার হতে চলেছে—যার জন্য মার্কসিস্টবা বলে থাকে উৎপাদিকাশক্তির উপর ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ আজ একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই উৎপাদিকা শক্তিকে আজ মুক্ত করতে হবে ও তা মুক্ত করলেই চলবে না—জাতীয়তার সীমা থেকেও তাকে মুক্ত করতে হবে কেননা তার জাতীয় সীমা তাকে পিষে রাখছে—অর্থাৎ তাকে আন্তর্জাতিক সীমাহীনতার মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। অতএব বিশ্বসমাজের গঠনে বিশ্ব-উৎপাদিকাশক্তি আজ অপেক্ষমান।

এই বিশ্বসমাজ কায়েম করবার জন্য যে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন তার বুনিযাদও বহুকাল আগে থেকে মার্কস ফেলে গিয়েছেন ও লেনিন তার বিকাশ ও বাস্তব বিবর্তন কবে গেছেন রাশিয়ার মাটিতে এবং তার বিস্তৃতি আজ বহুদুর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। আজ পৃথিবীব সবদেশে সেই রাজনৈতিক বিপ্লব ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। অতএব বিশ্বসমাজ গঠনের জন্য যে বিশ্ববিপ্লবের প্রয়োজন তার পটভূমিকা ও ক্ষেত্র উভয়ই আজ তৈরি।

তথাপি বাস্তব জীবনের আজও জাতীয়তার উপর এত মোহ কেন—কম্যুনিস্টদের? আজও আন্তর্জাতিকতার উপর ঝোঁক দেওয়া হয় না কেন? আজও বিশ্বসমাজকে উপর থেকে দেখবার—সমগ্রভাবে দেখবার, মার্কসিস্ট উপায়ে দেখবার ভঙ্গি কম্যুনিস্টদের আসে না কেন? কেন প্রত্যেকটি সমস্যাকে বুর্জোয়া বিজ্ঞানের ধারায় নিচে থেকে দেখে? কেন সমাজের বেদি থেকে ব্যক্তিকে দেখে না? কেন ব্যক্তি স্বার্থ থেকে সমাজকে দেখতে চায়? কেন এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রতা বা individualism? কেন তাদের চিন্তাধারা এখনও এত আড়ষ্ট, ভীরু ও সঙ্কীর্ণ?

নয়াগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান আপত্তিই এই যে এই তন্ত্র ব্যক্তিস্বার্থকেই পুষ্ট করতে চায়—বিশেষ করে যদি বা চীনের মতো একটি বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত না থাকে। যেখানে বৈপ্লবিক সংগ্রাম কার্যত চালু রয়েছে সেখানে মানুষের সমাজচেতনা থাকতে বাধ্য কিন্তু যারা রাজনৈতিক সংঘাতটাকে বাদ দিয়ে নয়াগণতন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিবাদী। তাদের মধ্যে কম্যুনিস্ট মনোবৃত্তির এক কণাও নেই—তাদের আহত ব্যক্তিবোধ নতুন তন্ত্রে পুষ্ট হবে বলে তারা আশা করে। এজাতীয় মনোবৃত্তিত আজও রাশিরায় উৎসাহ পায় এবং পূর্ব-ইউরোপেও তার প্রাধান্য রয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তি বিকশিত হয় না—জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদ, গোঁড়ামী ও আত্মম্ভরিতার লক্ষণ দেখা যায়—নানারকম চক্র ও চক্রান্তের সৃষ্টি সম্ভব নয়। Individualism কে নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ করে দেওয়াত হয়ই না, বরং তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। যার ফলে নানাজাতীয় প্রতিক্রিয়ারি বীজানু এর মধ্যে বাসা বাঁধে এবং বিশ্বসমাজ গঠনে কেবলি দ্বিধা ও সংকোচের ক্ষেত্র তৈরি করতে থাকে।

আমরা বর্তমান কালটাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাল বলে আরোপ করে থাকি এবং নয়াগণতান্ত্রিক অন্তর্বর্তিতাকে অগ্রাহ্য করি বলেই একথা বলি না যে সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য

কোনো কিছুর জন্য আমরা লড়াই উঠাতে প্রস্তুত নই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াইয়ের মধ্যে নানাজাতীয় গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া বিদ্যমান আছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক-স্বাধীনতা চাষীর হাতে জমি বণ্টন ইত্যাদি যে সমস্ত দাবি আজ জনতার মধ্য থেকে উচ্চারিত হয় সেগুলিকে আমরা এই বলে অগ্রাহ্য করে ভুল করি না যে তা সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি নয়। এজাতীয় ভুল অতিশয় সুবিধাবাদিতার লক্ষণ। এই ধরনের সুবিধাবাদিতার লক্ষণ আজ ট্রটস্কীপন্থী ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (R. S. P. I.) মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। তারা চীন, ব্রহ্ম ও মালয়ের বিপ্লবকে অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্থন তো করতেই পারে না বরং বিরূপ সমালোচনা করে থাকে—এই ছুতোয় যে তথাকার বিপ্লব আন্দোলন পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে ও মজুর শ্রেণীর একানায়কত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই নীতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী ; যেহেতু এতে করে বড় একটা নীতির নাম করে আশু কর্তব্যকে অবহেলা করা হয় এবং নিজেদের নিষ্ক্রিয়তাকে চতুর ছলনার দ্বারা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় মাত্র। আমরা বিপ্লবকে একটা ক্রমবর্ধমান ও বিকাশমান ধারায় (growing revolution) বিচার করে থাকি। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান হিসাবে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হিসাবে কিংবা মামুলি গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করার অভিযানের মধ্যে দিয়ে যে বিপ্লব শুরু হয় তাকে গ্রহণ করতে, পরিচালিত করতে ও পরিবর্ধিত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে—কেননা আমরা দেখেছি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভিন্ন প্রথমোক্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কায়েম করা আজকের যুগে আর সম্ভব নয়। অতএব বুঝতে হবে গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়াগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাইরে কোনো স্বয়ং-সম্পূর্ণ দাবিদাওয়া নয় বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববিরুদ্ধ কোনো ব্যবস্থা নয় বরং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক ও অন্তর্নিহিত আধার। তাহলে এটা পরিষ্কার করে বোঝা সম্ভব যে আমরা যখন আজই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চাই বলি তখন জনতার গণতান্ত্রিক দাবিগুলিকেও অস্বীকার করি না বরং গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করবার জন্য যে সামাজিক অধিকারের প্রয়োজন সে কথাটার উপরও জোর দিই। যেমন জমি তাদেরই মধ্যে বিলি করে দাও যার নিজ হাতে চাষ করে—এটি একটি গণতান্ত্রিক দাবি এবং বস্তুত পক্ষে তা সমাজতন্ত্র নয় ; কেননা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমি সমবেত ভাবে চাষ ও ভোগ করার কথা আছে। সুতরাং জমি তার যার হাতে লাঙ্গল এই ব্যবস্থার জন্য চাষীরা যখন লড়াই ওঠাবে তখন আমরা তাকে সমর্থন করব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখাব যে শুধু জমিই আমরা চাষীকে দিতে চাই না রাষ্ট্রও দিতে চাই এবং চাষী ও শ্রমিকেরা রাষ্ট্র, জমি, খনি ও কলকারখানা হাতে নিয়ে এমন ভাবে তার ব্যবস্থা করবে যাতে সত্যি করে দারিদ্র্য দূর হবে, চাষী ও মজুরেরা শক্তিমান হবে অধিকন্তু তাদের নিজেদের শক্তি ও অধিকার চিরকালের জন্য কায়েম রাখতে পারবে। এগুলিকে সম্ভব করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধনীদের পথকে অনুকরণ না করে সমাজতান্ত্রিক উপায়ে পুনর্গঠনের কাজে হাত দেওয়া। কিভাবে জমি, খনি, কলকারখানা এক কথায় যাকে বলা যায় সমস্ত উৎপাদিকা-শক্তিকে ব্যবহার করলে এই উন্নত সমাজ ও নিশ্চিন্ত শক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব? একমাত্র সমাজতান্ত্রিক উপায়েই তা করা সম্ভব—অর্থাৎ সমবেত চাষ, সমবেত ভোগ ও অধিকার স্থাপন করার উপরই সমস্যার সত্যিকার সমাধান রয়েছে। তাই আমরা এখন থেকেই চাষীদের মধ্যে সমবেত জীবনের আদর্শ প্রচার করতে এবং রাষ্ট্র বিপ্লবের সাথে সাথেই সমবেত ও যৌথ চাষের নমুনা স্থাপন করে নতুন সমাজের সুবিধাগুলিকে দেখিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এতে করে চাষীরা সমবেত চাষের ও ভোগের সুবিধা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে।

নয়াগণতন্ত্র বা কোনো প্রকারের নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র যে বর্তমান যুগের পর্বত-প্রমাণ দারিদ্র্য, পচন ও অশান্তি দূর করতে পারেনা এবং সমাজতন্ত্র—বিশ্ব সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের ভাগ্য যে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই কথা আজ চেপে চেপে বলা মানে আত্মপ্রতারণা করা মাত্র। যা সত্যি তাকে চেপে রাখার চেষ্টা মানে দুর্বলতাগুলিকে প্রশ্রয় দেওযা। এই দুর্বলতাই একদিন সর্বনাশ করে ছাড়বে এবং তা জনতার বুকে সত্যিকার চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করতে অসমর্থ হবে। পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো জাতির জন্য আজ চাই সমাজতন্ত্র এবং এখানে কোনো জাতীয়তার গণ্ডী টানা আজ অবৈজ্ঞানিক ও অনিষ্টকর অন্ধতা, তাছাড়া ভারতীয় বিপ্লব যখন সত্যি সত্যি কায়েম হবে অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমজীবী জনসাধারণ যেদিন সত্যি সত্যি এদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হবে, তখন দেখা যাবে হয়ত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিপ্লব কায়েম হয়ে গিয়েছে—কেননা আমরা আমাদের নিজেদের দোষে যেন প্রায় সবার পিছনে পড়ে যাচ্ছি তখন সেই বিশ্ববিপ্লবের মহাসমুদ্রে ভারতীয় জনতা বিশ্বসমাজতন্ত্রের একটা সমাজতন্ত্রী অংশ হিসাবে নিজেদের দাঁড় করাবে না, এবং তারা নযাগণতন্ত্র বা নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র আঁকড়ে থাকবে, এই জাতীয় দৃশ্যের কল্পনা অত্যন্ত হাস্যকর ও লজ্জাকর বিড়ম্বনা মাত্র।

বিশ্বসংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ হিসাবে আমরা সবাই বলি, পৃথিবীতে দরকার একটি রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্র আর ভারতের বেলায বলব সমাজতন্ত্র নয়, নয়াগণতন্ত্র বা নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র? সমগ্রভাবে বিশ্বের যা যা প্রয়োজন তা হলো সমাজতন্ত্র আর ভারতের জন্যে প্রয়োজন গণতন্ত্র? তাছাড়া ভারতীয় দারিদ্র্য, ভারতীয় সমস্যা ও সংকটের যদি বৈজ্ঞানিক বিচার করা যায়, তাহলে বুঝতে পারা যাবে ভারতেব সর্বাঙ্গীন উন্নতি সমাজতন্ত্র ছাড়া আব কিছুতেই সম্ভব নয় ; তথাপি নিজেদের দুর্বলতার খাতিরে বলব সমাজতন্ত্র আজকের দবকাবি জিনিস নয়, আজ কেবল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ চলে গেলেই হবে? সমগ্রভাবে বিশ্বের প্রয়োজন ও সমগ্রভাবে ভারতের প্রয়োজন আজ একই,—সে হলো সমাজতন্ত্র—অতএব নীতি নির্ধারন হাস্যকর গোঁজামিল ও জড়তা আজ একেবারে যুক্তিহীন। পরিষ্কার বুঝতে হবে, কি পৃথিবীর ব্যাপারে, কি ভারতের ব্যাপারে আজ ইতিহাস মানুষকে যে স্তরে এনে পৌঁছে দিয়েছে—সে হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ, অপর কোনো গোঁজামিল বিপ্লবের যুগ নয়। আমাদের স্বীকার করতেই হবে আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে এসে গেছি।

তাছাড়া কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, হাতে রাখার জন্য—সমাজতন্ত্রের আওয়াজ তুলতে আমরা এত দ্বিধা করছি ও কেন গণতান্ত্রিক আওয়াজের মধ্যেই আমাদের আজকের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে চাই? কমিউনিস্ট পার্টি বলে অতিকায় ধনীদের বিরুদ্ধে মধ্যবর্তী ধনীদের হাতে রাখতে পারলে নাকি, জনগণের ফ্রণ্টটা আরও ব্যাপক হবে এবং শক্তিশালী হবে। হাস্যকর চিন্তা! মধ্যবর্তী ধনীরা কি জানে না যে কমিউনিজম তাদেব অধিকারকেও স্বীকার করবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের স্বত্বকেও উচ্ছেদ কবে ছাড়বে? তারা কি রাশিয়ার ইতিহাস পড়েনি বা কমিউনিজম কি জিনিস তা বোঝে না? নিরক্ষর জনসাধারণের চেয়ে ভালই বোঝে। অতএব এ কথাও বোঝে যে সাম্রাজ্যবাদ ও বিরাট বিরাট ধনীদের ক্ষমতা চূর্ণ হয়ে গেলে, তাদের ক্ষুদে ধনিকতন্ত্রও দাঁড়াতে পারে না। কমিউনিজমের চেয়ে অতিকায় ধনীরা তাদের বেশি শত্রু, এমন ভুল তারা করবে না এবং পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ চূর্ণ হয়ে গেলে ভারতীয় ধনতন্ত্র টিকে থাকতে পাবে এমন ধারণা করার মতো বোকা তারা নয়। পৃথিবীর হালচাল, কমিউনিজমেব গতি ও ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিব তোড়জোড় তাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে, তাই যত আক্রোশই থাকুক না কেন বিরাট ধনীদের বিরুদ্ধে, ক্রমশ তারা সাম্রাজ্যবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়তে বাধ্য। এদেশেই

সাথে যুক্ত ফ্রন্ট তৈবি কবা মানে বিপ্লবকে স্থগিত বাখা, হীনবল কবা এবং অর্থহীন কবা। একটা খোঁড়াব সাথে একসাথে দৌড়বাব পণ মানে দৌড় বন্ধ কবা। যদি এই মধ্যবর্তী ধনীদেব সাথে যুক্তফ্রন্ট কবাব নীতি নেওয়া হয় তা কিছুতেই সশস্ত্র সংগ্রামেব নীতি হবে না, বড় জোব ইলেক্‌সনে প্রতিযোগিতা কবাব জন্য কংগ্রেস বিবোধী একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন কবা সম্ভব। কিন্তু তাতে বিপ্লবেব কথা বলা বা মুক্তি-বাহিনীব সশস্ত্র সংগ্রামেব কথা বলা চলে না। অতএব কমিউনিস্ট পার্টিব বর্তমান যে নীতিব কথা উঠছে—যাতে প্রথমত—যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট (ধনীদেব নিয়েও—মধ্যবর্তী ধনীদেব নিয়ে) ও সঙ্গে সঙ্গে জনতাব মধ্যে আজও বিদ্যমান যে ধনবাদী ক্ষুধা—তাকে সমর্থন কবে যে যুক্তফ্রন্ট হবে—তাব বিপ্লবী ধাব যাবে ভোঁতা হয়ে এবং তা দিয়ে তাদেব যে দ্বিতীয় কথা অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী গঠন কবে মুক্তি-সংগ্রাম—সশস্ত্র সংগ্রাম কবাব কথা তা যাবে ব্যর্থ হয়ে। অর্থাৎ যুক্ত জাতীয় ফ্রন্টেব ওপব কোনো বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রাম তৈবি কবা সম্ভব নয়। অতএব কমিউনিস্টদেব প্রথম নীতি দ্বিতীয় নীতিব প্রতিকূল এবং বিরুদ্ধবাদী। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও মুক্তিফৌজ পবস্পব বিবোধী। মাও-সে-তুং যে সমস্ত মধ্য-ধনীদেব হাত কবতে পেবেছিলেন তা তাদেব সম্মতি নিয়ে নয়, বাধ্য কবে—কথাব বাধ্যবাধকতা দিয়ে নয়—মুক্তিফৌজেব জোবে। মুক্তিফৌজকে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টেব ওপব নির্ভব কবতে দেননি—গণতান্ত্রিক ফ্রন্টটাকে মুক্তিফৌজেব ওপব নির্ভবশীল কবিয়েছিলেন এবং নির্ভবশীল কবতে সমর্থ হয়েছিলেন। একথা পূর্বেও দেখানো হয়েছে—মুক্তিফৌজ ও সশস্ত্র সংগ্রামটাই হলো আসল কথা এবং বিচাবেব মাপকাঠি—এইটেই হলো আসল প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামেব জন্য যাবা এগিয়ে আসবে একমাত্র তাদেবই সাথে যুক্তফ্রন্ট কবা যায় ও কবা উচিত—নাহলে যে কোনো ছুতোয় একত্র হবাব জন্যই একত্র হওয়াব কোনো সার্থকতা নেই।

স্টালিনপন্থী কম্যুনিস্টবা উত্তবে বলে—এত তাড়া কেন, আস্তে আস্তে হবে—অতীতেব মোহ কি এক সহজে কাটে—জাতীয়তাব ব্যক্তিত্ববাদেব শিকড় কি এত তাড়াতাড়ি উপড়ে ফেলা যায়? এত তাড়াতাড়ি কবতে গেলে ফল উল্টো হবে —অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীলেবা ভুল বোঝাতে সুবিধা পাবে। তাছাড়া সামাজিক ও আর্থিক পবিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে মানসিক বিস্তৃতি কি কবে সম্ভব? কেননা চেতনা তো বাস্তবেবই দান—বিশ্ববিপ্লব যখন পূর্ণ হবে তখন বিশ্বচেতনা পূর্ণ হতে পাবে, সাম্যবাদ যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন প্রকৃত সাম্যবাদী মন তৈবি হবে—মন তো অবস্থাকে ছাড়িয়ে চলে যেতে পাবে না?

এইখানেই আমবা সমস্যাব মূলে এসে গেছি এবং কম্যুনিস্ট পার্টিব সঙ্গে আমাদেব পার্টিব পার্থক্যেব মূলগত প্রভেদেব ক্ষেত্রে এসে পড়েছি।

এই প্রভেদেব হেতু হলো কম্যুনিস্ট পার্টিব ডায়ালেকটিকাল মেটেবিয়ালিজম্ সম্বন্ধে জ্ঞানেব অভাব বা বিকৃত জ্ঞান। মার্কসিজম লেনিনিজিম এব দৃষ্টিভঙ্গি এই Dialectical Materialism ছাড়া বক্ষা কবাব কোনো উপায় নেই।

মন যদি অবস্থাকে ছাড়িয়ে না এগুতে পাবে— কোনোও অবস্থায়ই, তবে মানুষেব অগ্রগতি কি কবে সম্ভব? মন যদি সর্বদাই অবস্থাব দাস হবে তবে অবস্থাব ওপব মনেব কোনো হাতই থাকে না এবং মন একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিবিম্ব ছাড়া আব কিছুই হতে পাবে না। মনেব একটা সক্রিয় শক্তি আছে যা অবস্থাব ওপব আঘাত কবে অবস্থাকে রূপান্তবিত কবাব চেষ্টা কবে -অবশ্য সে মন স্বাধীন নয়, তাব স্বাধীনতাবও একটা সীমা আছে -সেই সীমা হলো নতুন পবিস্থিতিব সীমা। আন্তর্জাতিক বিশ্বসমাজেব আর্থিক পবিস্থিতি যখন তৈবি তখন মন বা চেতনা কেন তাব পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ কবতে পাববে না? এটাই হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো, এই সমাজে রাষ্ট্রের যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরিবর্তন বিপ্লবের পথে ঘটে—সব কিছুরই যেমন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে—তেমনি মনের পরিবর্তনও বৈপ্লবিক পথে ঘটে। মনের বেলায় কি Dialectical Materialism নেই? মন ধারাবাহিকতার পথে, ক্রমবিকাশের পথে নতুনকে গ্রহণ করে না, দ্বন্দ্বগতির পথে, বৈপ্লবিক পথে পুরাতনকে বর্জন করে নতুনকে গ্রহণ করে। পুরাতন কখনও আস্তে আস্তে ধারাবাহিকতার পথে নতুন হয় না, পুরাতন পচে যায়, ধ্বংস হয়ে যায় নতুন হয় না। আজকের এই সামাজিক বিপ্লবের যুগে যে বস্তু সবার চেয়ে আগে বিপ্লবে সাড়া দিয়ে ওঠে—সে হলো মন, নাহলে বাস্তব সমাজব্যবস্থাকে নতুন রূপ গ্রহণ করাবে কে? বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান দানই হলো গণমনে বিপ্লব—পুরাতনকে সহজে পরিত্যাগ করে নতুনকে গ্রহণ করার নাম হলো বিপ্লব। অতএব বিপ্লবে মন সামাজিক অবস্থার পেছনে চলে না, আগে আগে চলে, পথ দেখিয়ে চলে, বাস্তবের কৃপণতাকে অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করে অতিদ্রুত এগিয়ে যেতে চায়। গণমনে এই যাদু—এই নতুন সৃষ্টির আবেগ—এই মোহমুক্তি—এইটেই হলো বিপ্লবের প্রধান দান এবং এই মনসম্পদ না হলে কে করবে সাম্যসমাজ? কতকগুলি স্বার্থপর ভীতু, নিচুমনা লোক সাম্যসমাজ তৈরি করবে এবং তারপর সেই—সাম্যসমাজ প্রকৃত সাম্যবাদীর জন্ম দেবে? আশ্চর্য অজ্ঞতা! আশ্চর্য মার্কসবাদী জ্ঞান! বিপ্লব যে কেন এত দরকারি জিনিস—বিপ্লব যে একটা অনভিপ্রেত প্রয়োজন নয়—বিপ্লব ভিন্ন যে সমাজের রূপান্তর ঘটানো যায় না—সমাজতন্ত্রকে ডিক্রিজারী করে অথবা আইন পাশ করিয়ে তৈরি করা যায় না—এইকথা কম্যুনিস্ট পার্টি হৃদয়ঙ্গম করেনি এবং বিপ্লব কাকে বলে তাও ভাল করে বোঝে না। বিপ্লব কেন মানুষের মনে আশ্চর্য চেতনা, প্রেরণা, উদ্যম ও উৎসাহ সহসা সৃষ্টি করে দেয়—এই তত্ত্ব বুঝতে যতদিন ওদের বাকি থাকবে ততদিন বিপ্লবী সাম্যবাদী দলকেও তারা বুঝতে পারবে না। ওদের বিপ্লবের বদলে লালফৌজের কল্পনা ও বিপ্লবে অস্ত্রের যোজনার হিসাব যেমন হাস্যকর তেমনি ক্ষতিকারক।

সংক্ষেপে এই সমস্ত রাজনৈতিক নীতি নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংগ্রাম আমাদের আজও আছে এবং এই জাতীয় দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রকৃত বৈপ্লবিক নীতি প্রকাশিত হবে। এই নীতিগত সংগ্রাম কেবল নীতির খাতিরে নয়—এর বাস্তব প্রয়োজন সংগ্রামের ক্ষেত্রে পদে পদে দেখা যায় এবং যাবে। বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্র যত বাড়ছে, দুর্দান্ত প্রতিরোধও তার বিরুদ্ধে বাড়ছে, সেই প্রতিরোধকে পরাজিত করতে হলে, নিজেদের শিবিরকে অনবরত শক্তিমান করতে হবে, তা করার উপায় হলো শিবিরের মধ্যস্থিত দুর্বলতা, সুবিধাবাদ, অজ্ঞতা ও রাজনৈতিক ভীরুতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ববিপ্লব এগিয়ে চলেছে, পূর্ব ইউরোপ ও চীনকে মুক্ত করেছে, আরো অনেক অঞ্চলে মুক্তিসংগ্রাম চলেছে এও যেমন সত্য,—আবার গ্রীক বিপ্লব প্রচুর রক্তের মধ্যে ডুবে গেছে, বার্মা, মালয়ের সংগ্রাম দিনকে দিন কঠিন হচ্ছে, ইন্দোচীনে দ্বিতীয় গ্রীসের ট্রাজেডি তৈরি করার জন্য আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এগিয়ে আসছে। ইয়োরোপে বিপ্লব বিরোধী শক্তিগুলি মরিয়া হয়ে এক হতে চলেছে, ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন প্রতিহত হয়েছে—এই দিকটাও অবহেলা করলে চলবে না। অতএব বিপ্লবের পক্ষেও বহু বিপদ আজ বর্তমান—এই বিপদ, ক্ষয় ও সাময়িক পরাজয়গুলি অতিক্রম করতে হলে ও বিশ্ববিপ্লবী নেতৃত্বের চেতনাকে আরও সচেতন, আরও বেগবান, আরও গভীর করতেই হবে এবং তারই জন্য নীতিগত সংগ্রামের প্রয়োজন এত বেশি এবং গড্ডালিকাভাব দূর করার এত তাড়া।

গ্রামদেশে কাজ করা

॥ ১ ॥

শিক্ষা, শিক্ষক ও গ্রাম

শিক্ষিত শ্রেণীব কেউই গ্রামে পড়ে থাকতে রাজি নন, অথচ গ্রামের সামগ্রিক উন্নতির জন্য কিছু শিক্ষিত লোকের দরকার আছেই আছে। একমাত্র চোখের সামনে যাদেব দেখি, যারা গ্রামে থাকতে বাধ্য অথচ শিক্ষিত, তাবা হলেন গ্রাম্য শিক্ষকেবা। গ্রামে গ্রামে স্কুল নানা রকমের বাড়ছে ফলে একদল শিক্ষক ও শিক্ষিকা গ্রামে থাকতে বাধ্য। তাবাই হয়ত আজ গ্রামোন্নয়নের কাজে নেতৃত্ব কবতে পারেন। শিক্ষকেরা যদি নিজেদের হতভাগ্য মনে করেন, যদি তারা ভাবেন যে বাধ্য হয়েই তারা গ্রামে এসে পড়েছেন—কেননা কোন শহরে চাকুরি তারা যোগাড় করতে পারেন নি – অথবা তাদেব সহপাঠীবা বুঝি বা শহরে সমস্ত মজা লুটে বেড়াচ্ছে তবে অবশ্য ভরসার কথা নেই। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে যাবা দেশভক্ত, যারা দূরদর্শী তাদের বুঝতে কঠিন হবে না যে আজকেব যুগে যখন গ্রামগুলি গড়ে তোলবাব জন্য তাগিদ সব দিক থেকে উপস্থিত তখন তাবা এই গ্রামের কাজে কত বড স্থান গ্রহণ কবতে পারেন। গ্রামে শিক্ষকদের স্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে তারা অনায়াসে সমস্ত অভিভাবকদের হৃদয় জয় করে নিতে পারেন। পিতামাতার হৃদয় জয় কববাব উপায় হলো তাদের ছেলেমেয়েদের সত্যিকাব ভালবাসা। ছেলেদেব হাত করতে পারলে অভিভাবকদের হাত কবা সহজ। অনেক শিক্ষক এই স্থান এমনিতেই অধিকার করে আছেন। একটা বিবাট উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছা নিয়ে যদি অগ্রসর হন তবে অভিভাবকদেব সহযোগিতা তাবা সহজেই পাবেন।

গ্রামের কাজ বাদ দিলে এবং একমাত্র শিক্ষাব কথাটা ধরলেও দেখা যায় যে যদি শিক্ষাব বিষয়ে বাপ-মা ও অভিভাবকেবা শিক্ষকেব কাজে সহযোগিতা না করেন তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া কত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্কুলে যা পড়ানো হয়, শেখানো হয়, যে ভাবে চলতে বলা হয় তা যদি ঘবেব মধ্যে অনুকূল সহযোগিতা পায় তবে সে শিক্ষা অনেক সহজ ও কার্যকরী হয়। গ্রামেব স্কুলটিকে কোন ক্রমেই গ্রাম ছাড়া কবা ঠিক নয়। গ্রামের জীবনকেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র করলে চলবে না, স্বতন্ত্র হয়ে পড়লে শিক্ষকের সাথে অভিভাবকের কোনো যোগাযোগই থাকে না, সহযোগিতা তো দূরেব কথা। শুধু মাত্র শিক্ষকই কোন ছেলেকে মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন না। ছাত্রের সমগ্র জীবনের সংস্পর্শে আসতে হবে শিক্ষককে, একই সাথে মা-বাবা, শিক্ষক ও একটি সুন্দর সুস্থ পরিবেশের সহযোগিতা ছাড়া ছেলেদেব মানুষ করে তোলা কঠিন। Environment বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদেব চরিত্র গঠনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। একটি সুন্দর সুস্থ আশাবান আবহাওয়া সৃষ্টি কবা চাই ছেলেদের সমগ্র জীবন ঘিরে। কাজেই কেবল ক্লাস এবং স্কুলের প্রাঙ্গণেই শিক্ষকেব কাজ সীমাবদ্ধ হলে চলবে না, ছাত্রেব বৃহত্তর জীবন, সমগ্র জীবনের উপর শিক্ষকেব একটা হাত থাকা চাই। তাই গ্রাম থেকে আলাদা হয়ে, আলগোছে গ্রামের পাশ কাটিয়ে নিজেদের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকলে শিক্ষক-মহোদয়দের চলবে না।

গ্রামে শিক্ষকদেব জীবন সার্থক হবার কোন রাস্তা নেই, তাদের জীবন ব্যর্থ হলো এমন ধবনের চিন্তা কত ভ্রান্তিপূর্ণ ও বিকৃত। ক্রমে আমরা গ্রামের কাজ বলতে কি বুঝি, কত ব্যাপক তার এলাকা, কত গভীরভাবে জীবনকে দেখা ও ভোগ করার উপায় রয়েছে গ্রামেও, সে সব

বিষয আলোচনা কবব। আমাদেব পববর্তী বক্তব্যেব মধ্য দিযে সেই সমগ্র চিত্রটি ফুটে উঠবে। এখন শুধু এইটুকু আশ্বাস দিযেই ক্ষান্ত হই যে গ্রামে শিক্ষাদীক্ষাব ও রুচিব কোন অপচয বা অপব্যবহাব হবে না ববং গ্রামে বসে সুদূবপ্রসাবী গবেষণা কবা সম্ভব হবে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রেও নিজেদেব জীবন সার্থক কবাব নানা উপায সৃষ্টি করা সম্ভব হবে আব অর্থনৈতিক দিক দিযেও তাবা চিবকাল বঞ্চিত থাকবেন না। শহবেব বস্তি জীবনেব তুলনায তাবা জীবনকে উপভোগ কবাব সুযোগও কার্যত বেশি পাবেন।

গ্রামেব শিক্ষাব মানে কি? সকলকে কেন লেখাপডা শিখতে হবে? লেখাপডা না শিখলে মানুষ কত বকমে মূর্খ থাকে এটাই শেষ কথা নয। দিক্-দুনিযাব খবব বাখাটাই শিক্ষাব চবম কথা নয। আধুনিক বিজ্ঞানেব শেষ কথাটা না বুঝলে জীবন ব্যর্থ হলো এমন ধবনেব সচেতনতা গ্রামে কেন শহবেও অনেকেব নাই। মুষ্টিমেয ছেলেই মেধাবী ও প্রতিভাবান হয। যাদেব উচ্চ শিক্ষাব জন্য বাইবে যাবাব সুবিধা দেওযা দবকাব তাদেব জীবনযাত্রাব প্রণালী ও তদনুরূপ ভিন্ন বকম হতে বাধ্য গ্রামবাসীদেব থেকে। কিন্তু গ্রামেব বেশিব ভাগ লোককে চিবকালই গ্রামে বাস কবতে হবে। গ্রামে থেকেই তাদেব রুজি বোজগাব সংগ্রহ কবতে হবে, জীবন তাদেব গ্রাম্য জীবনেব ধাপে থেকে যাবে। আগামী বহুকাল পর্যন্ত একে বাস্তব অবস্থা বলে ধবে নিলেই সেটা হবে বাস্তবতাজ্ঞান বা realism। শিক্ষাব মূল উদ্দেশ্য হলো জীবনকে গডে তোলা, জীবনকে সাহায্য কবা। গ্রামবাসীদেব শিক্ষা দেওযা মানে তাদেব জীবনকে গডে তোলা, তাদেব সত্যিকাব যে জীবন অর্থাৎ গ্রাম্য জীবন তাকেই গডে তোলা, সুন্দব কবে তোলা, সহজ সমৃদ্ধ ও গৌববময কবে তোলা। কোন কল্পিত জীবন বা hypothetical life নয আদর্শ সুন্দব বলিষ্ঠ গ্রামবাসী কবে গডে তোলাই হবে গ্রামশিক্ষাব সাধাবণ উদ্দেশ্য। মুষ্টিমেয ছেলেমেযে হযত একদিন গ্রাম ছেডে শহবেব জীবনে আসন নেবে—তাবা হযত যোগ্যতা ও মেধাব বলে শহববাসী কোন উন্নত জীবন ভোগ কববে। আব হযত কিছু কিছু লোক কাবখানায কাজ নেবে দেশে যখন কলকাবখানাব লোকেব টান পডবে। নইলে সর্বসাধাবণ চাষীব ছেলেমেযেবা যদি জজ্-ম্যাজিস্ট্রেটেব স্বপ্ন দেখে তবে তাবা একূল ওকূল দুই-ই হাবাবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পডতে হবে সবই, কিন্তু পডতে হবে জীবনেব পটভূমিকায। জীবনেব যে পটভূমিকায় ছাত্রদেব থাকতে হবে সেই দিকটা খেযাল বেখে তাকে সে সব শিক্ষা দিতে হবে। এই দিক থেকে দেখতে গেলেও গ্রামেব স্কুলকে গডে তুলতে হবে গ্রামকে কেন্দ্র কবে। গ্রামেব জীবনেব যাবতীয প্রযোজনগুলিব দিকে খেযাল বেখে পাঠক্রম তৈবি কবতে হবে। বাস্তব যোগাযোগ বাখতে হবে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রামেব চাষবাস, সমাজ শিল্প, পশু, পাখি, গৃহকাজ ইত্যাদিব পটভূমিকায পডাতে হবে। তবেই সেই শিক্ষা কার্যকবী, লাভজনক ও জীবন্ত শিক্ষা হবে। সে শিক্ষা ছাত্রদেব জীবনকে সুন্দব ও সমৃদ্ধ কববে, তাদেব বর্তমানেব সঙ্গে ভবিষ্যতেব যোগাযোগ থাকবে, আদর্শেব সঙ্গে বাস্তবেব যোগাযোগ থাকবে। এদিক থেকে দেখলেও গ্রামেব শিক্ষককে কত গভীবভাবে গ্রামেব সাধাবণেব জীবনেব সঙ্গে সংযুক্ত থাকা দবকাব।

গান্ধীজিব নঈ তালিম বা বুনিযাদী শিক্ষাব তাৎপর্যও তা ই। বর্তমান সবকাব এই বুনিযাদী শিক্ষাব প্রচলন কবতে অগ্রসব হচ্ছে কতকটা। পৃথিবীব প্রায সর্বত্রই শিক্ষাব বাস্তব প্রযোগ সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলছে। বাশিয়াতেও polytechnical institute-এব মাবফৎ শিক্ষাব ব্যবস্থা চলছে। কতকগুলি প্রাণহীন বুলিব মধ্য দিয়ে নয, কবাব মধ্য দিযে শিক্ষাব যে ব্যবস্থা তাবই নাম বুনিযাদী শিক্ষা। এ শিক্ষায় শিশুদেব প্রাণ ওষ্ঠাগত কবে তোলে না, শিশুদেব

অনুসন্ধিৎসা ও আনন্দ ও সত্যিকার শিক্ষা এতে মেলে, যার সাহায্যে জীবন সংগ্রামে তারা সহজে সার্থকতা দেখাতে পারে। যাহোক, বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য দেখাবার উদ্দেশ্য আমাদের নয়—এ সম্বন্ধে আজকাল বাজারে বই-এর অভাব নেই। আমাদের শুধু এইটেই ধরিয়ে দেবার ইচ্ছা যে আজকাল শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণাটাই পাল্টে যাচ্ছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে সর্বতোভাবে যুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। জীবনকে তৈরি করার হাতিয়ার হিসাবেই শিক্ষার প্রধান দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হচ্ছে। ফলে বাস্তবতা বা practical দিকে নজর সর্বত্র। বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশেষ কোনো একটি শিল্প (গ্রাম শিল্প, তাঁত, চরকা বা চাষ) দিয়ে বা মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের মতে কোন একটি বিশেষ শিল্পের সাহায্য বা বিশেষ শিল্পের জন্যই সমস্ত শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে হয়ত বা সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট হয়ে ওড়তে পারে এবং হয়ত একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে। কোন একটি শিল্পে শিক্ষিত হয়ে উঠার দরকার বটে কিন্তু তাছাড়াও সমগ্র গ্রাম জীবন নিয়েই তাকে শিক্ষিত করে তোলা উচিত। গ্রাম জীবনের যাবতীয় কর্মকেই শিক্ষার অন্তর্গত বা বাহন করে নিলে তা আরো বেশি কার্যকরী ও আকর্ষণীয় হবে। গ্রামের সমাজ, গ্রামের অর্থনীতি, চাষ, শিল্প, পশুপাখি, ঘরবাড়ি, গাছ ইত্যাদি সব বিষয়ই শিক্ষার সাধারণ পাঠক্রম হওয়া দরকার। তা হলেই সেটা হবে সমগ্র শিক্ষা এবং এই সমগ্র শিক্ষাই ছাত্রকে সত্যিকারের সমাজচেতনা ও দেশভক্ত করে তুলবে এবং integrated personality বা সমগ্র মানুষ বা খাঁটি গোটা মানুষ হতে সাহায্য করবে। যারা বড় বা বুড়ো হয়ে গেছেন গ্রামে তাদের জীবন আজ স্বপ্নহীন ও এলোমেলো, তাদের চট্ করে নূতন জীবন গ্রহণ করা, নতুন আদর্শ গ্রহণ করা কঠিন হয় অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু যারা পরবর্তী পুরুষ বা next generation সেই ছেলেমেয়েরা বা শিশুরা তারা সর্বত্রই প্রাণবান্—প্রাণধর্মের সাধারণ নিয়মেই তারা জিজ্ঞাসু, অগ্রগামী ও আদর্শপ্রবণ। এদের সম্পর্কে আসছেন কারা? এই শিক্ষকেরা। শিক্ষকেরা তাই পচা মাল নিয়ে কাজ করবেন না, তারা কচি কচি তাজা প্রাণ নিয়ে কাজ করবেন। তাদের গড়ে তোলা সহজ, তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ করা ও সমাজ সচেতন করে তোলা সহজ। এ কাজ আরও সহজ যদি তারা অভিভাবকদের সহযোগিতা পান। এই পরবর্তী পুরুষকে তো তৈরি করে তুলতেই হবে। এ কাজ কি শিক্ষকদেরই নয় প্রধানত, এ কাজের চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে? তাছাড়া দেখা যায় ছেলেমেয়েরা বড্ড নেতৃত্ব ভক্ত ও Hero worshipper—তারা যে শিক্ষকের মধ্যে সেই Hero বা নেতাকে দেখতে পায় সে শিক্ষক তাদের বড় প্রিয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন— সেই শিক্ষকের কথায় তারা ওঠে বসে, এমন কি প্রাণ দিতে পারে। এ অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা যা সবারই নজরে পড়তে বাধ্য। শৈশবে এই নেতৃত্বের ক্ষুধা মেটানো একটা মস্ত কাজ। এই নেতৃত্ব যদি ভালো লোকের মধ্যে না পায়, তবে সে নেতৃত্বের ক্ষুধা শিশুরা ও যুবকেরা অসৎ ও দুষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে মেটাতেও পিছপা হয় না। ফলে ছেলেরা অসৎ পথে চালিত হয়। গ্রামের শিক্ষকদের মধ্যে যদি এই ছেলেদের নেতৃত্ব করার মতো লোক মেলে তবে সে শিক্ষক হবেন আদর্শ শিক্ষক।

সাধারণভাবে পল্লী জীবনে যে সমস্ত দলাদলি, স্বার্থ-সংঘাত, শ্রেণীসংগ্রাম, জাতি ভেদাভেদ আছে তা থেকে পল্লীর শিক্ষকেরা অনেকেই বাইরে। ফলে প্রতিদিনকার জীবনের ক্ষুদ্রতা ও নীচতা থেকে তারা মুক্ত। তাদের হাত নোংরা নয়—কোন দুষ্ট স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে কলুষিত নয়। তারা পক্ষপাতদুষ্টও নয়। ফলে তাদের কথা অনেক বেশি সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া স্বাভাবিক। এদিক থেকেও তারা পল্লীজীবন পুনর্গঠনের কাজে আরো বেশি যোগ্য ও অধিকারী। অবশ্য শিক্ষকদের ব্যক্তিগত জীবনের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। যে শিক্ষক সত্যিই দেশপ্রেমিক,

শিক্ষার মূলগত আদর্শ যিনি গ্রহণ করেছেন, যিনি শিক্ষকের কাজ নিয়ে দুঃখিত বা লজ্জিত নন বরং গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁর কাছে এই কাজ অতি স্বাভাবিক ও সহজ।

আজ গ্রাম দেশে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কি? কি করে গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়—এই হলো শিক্ষার লক্ষ্য। কোন মতে কতকগুলি বিদ্যা আয়ত্ত করে শহরে সহজ চাকুরি জীবন পেতে পারবে এই হলো ছাত্র ও অভিভাবকদের লক্ষ্য। এই মারাত্মক পলায়নপরতা সম্ভব হয়েছে গ্রামবাসীদের অসহ্য দারিদ্র্য ও দুরবস্থার জন্য। একটু শিক্ষিত লোক এবং মেধাবী ছেলে মাত্রই গ্রাম থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে। যদি ভালো ছেলেরা সবাই গ্রাম থেকে চলে যায় এবং আর গ্রামে ফিরে না আসে তবে গ্রামগুলি মরে যাবে না কেন? মরে যাচ্ছেও তাই। অতএব গ্রামগুলিকে যদি আবার বাসযোগ্য না করা যায়, যদি তাতে বসবাস করে মানুষের জীবন সার্থকতাও আনন্দ না পায় তবে সবই পণ্ড হতে বাধ্য। আর এত লোক, পালিয়ে যাওয়া লোক, শহরে সঙ্কুলান ও হচ্ছেনা ঠাঁই পাচ্ছে না—বেকার ও বস্তির সংখ্যা বাড়াচ্ছে মাত্র। প্রচলিত শিক্ষার ব্যর্থতা এইখানে। শিক্ষা, বিশেষত পল্লীর শিক্ষা-ব্যবস্থা, এমন হওয়া চাই যাতে পল্লীতে সেই শিক্ষার সাহায্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও কৃষ্টিশীল জীবন যাপন করা যায়। শিক্ষাকে তাই গ্রামের সেবায় লাগাতেই হবে। শিক্ষার মোড় ফেরাতেই হবে—নইলে ছেলেমেয়েদের গ্রামে রাখাই সম্ভব হবে না। এই কাজ নির্ভর করছে গ্রামশিক্ষকের উপরে অনেকটাই। গ্রাম থেকে পালাবার শিক্ষা দেবেন না তারা, দেবেন সেই শিক্ষা যাতে ছেলেমেয়েরা গ্রামকে ভালবাসতে শেখে। গ্রামের বর্তমান অসহ্য দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা, অজ্ঞানতাকে দূর করবার জন্য প্রেরণা দিবেন শিক্ষকেরাই। তবেই গ্রামবাসীরাও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ দূর করে দিতে এগিয়ে আসবে, শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করতে এগিয়ে আসবে। প্রাণ দিয়ে গ্রামকে ভালবাসতে না পারলে এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া সম্ভব নয় এবং গ্রামবাসীদের সহানুভূতি ও সাড়া পাওয়াও সম্ভব নয়।

শিক্ষকদের বর্তমান দুরবস্থা এমনটি থাকবেও না। কেননা নানা দিক থেকে শিক্ষকের গুরু দায়িত্বের উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া আরও একটা দিক থেকে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ও দাম বেড়ে যেতে বাধ্য। আজ দেশের আদর্শ ও কর্মপন্থা হলো সমাজতান্ত্রিক। সমাজতন্ত্রে একটা জিনিস থাকা চাই-ই চাই- সে হলো সকলের সমান অধিকার বা সুযোগ। এই সমান অধিকার কায়েম করা চাট্টিখানি কথা নয়— অর্থনৈতিক বৈষম্য আজ এত যে সহজে তার সাম্য আশা করা দুরাশামাত্র। নানাবিধ কয়েমী স্বার্থ তাদের দুর্গ রক্ষার জন্য নানা কৌশল করে চলেছে- সহসা তাদের গদিচ্যুত করার কোনো প্রোগ্রাম কারো দেখি না বা করতে গিয়ে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হয় সে সাহস ও যোগ্যতা কোথাও দেখা যাচ্ছে না—ফলে সমাজের পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ঘটিয়ে এই সমান অধিকারের দিকে যাবার ইচ্ছাই দেখতে পাই। কিন্তু একটা দিকে সকলকে এখুনি সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া কঠিন নয়—সেটা হলো শিক্ষার ক্ষেত্র। সকলেই যদি পড়াশুনার অধিকার ও সুযোগ পায় তবে শিক্ষা সম্বল করে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জীবন গড়ে নিতে পারে। শিক্ষার দিক থেকে কায়েমী স্বার্থকে এখনই পরাজিত করা মোটেই অসম্ভব নয়। নরনারী সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা, শিক্ষার খরচ সরকার ও সমাজের বহন করা ও শিশুদের কাজ করা (child labour) বন্ধ করা যাতে তারা লেখাপড়ার সময় পায়—এই তিনটি জিনিস একত্রে চালু করলে শিক্ষা সম্বন্ধে সমান অধিকারের প্রথম ধাপটি এখনই নেওয়া সম্ভব। সরকার এই সর্বজনীন শিক্ষার ভার কতকটা

নিতে পারে। সরকার সবটা না পারলেও সমাজ বা গ্রাম কতটা নিতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে শুধু মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবি সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রাথমিক ধাপ এবং এ দাবি আজ ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, ফলে শিক্ষকের মূল্য ও মর্যাদা ও দায়িত্ব দ্রুত বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের কাছ থেকে অনেকটা বেশি সাড়া আশা করা উচিত।

॥ ২ ॥

নতুন সভ্যতায় নতুন গ্রাম

গ্রামের কাজ করার কথা হলেই মনে পড়ে যে আমাদের দেশে অতীতে অনেকবারেই অনেকে "গ্রামে ফিরে এসো" আওয়াজ তুলেছেন। কিন্তু কার্যত শেষ পর্যন্ত গ্রামে ফিরে যাওয়া হয়নি— সাময়িকভাবে কিছুটা গ্রামের সাথে সংযোগ হয়েছিল মাত্র। তাতে রাজনৈতিক আন্দোলন মাঝে মাঝে শক্তিমান হয়েছে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রামগুলির কোন স্থায়ী উন্নতি হয় নেই। এখানে প্রথম কথাটা হলো এই যে, আজ 'গ্রামে ফিরে' চলো এর মানে এই হবে না যে পুরানো দিনের গ্রাম্য সভ্যতায় ফিরে চলো। কেননা সেটা হয় না, অতীতে কারো ফিরে যাবার উপায় নেই। সেই পুরাতন গ্রামে আর কোনো আকর্ষণ নেই। গ্রাম্য জীবনের দুর্দশা, হতশ্রী, দারিদ্র্য, জাত পাত, অজ্ঞানতা-কুসংস্কারের স্তূপীকৃত আবর্জনা এসে গেছে—তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বরং সে চিত্রকে যতই কেননা রঙীন করে ধরা হোক তাতে কারো সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। 'গ্রামে ফিরে চল' এ কথার মানে হবে আজ নতুন গ্রাম গড়ে তোলা, গ্রাম সভ্যতায় প্রাণ ফিরিয়ে আনা, এক মহান্ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নতুন সভ্যতা গড়ে তোলা গ্রামের সামগ্রিক জীবনে। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন সহজ, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে হবে, গ্রামের কৃষ্টিজীবন সুন্দর করে তুলতে হবে সবার জন্য। যে সমস্ত লোক আজ পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটছে তারা আজ শহরেও স্থান পায় না, তারা বস্তির সংখ্যা আর বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে শহরের জীবনকেও কঠিন আর নোংরা করে তুলেছে। তবু সেখানে পালায় এই আশায় যদি বা কুলিগিরিটা মেলে তবে হয়ত সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে আর ক্বচিৎ কদাচিৎ শহরের উচ্ছিষ্ট আমোদ প্রমোদ হয়ত বা ভোগ করতে পারবে। মধ্যবিত্ত যারা তারাও গ্রাম থেকে পালাচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাপে : আর যারা ইচ্ছে করলে গ্রামেও থাকতে পারত তারাও পালাচ্ছে কতকটা বিকৃতরুচির ও অর্থের লোভে। কেননা তারা গ্রামকে ঘৃণা করতে শিখেছে। কিন্তু আজ গ্রামের সমগ্র চেহারাটাই বদলে দেবার যুগ এসেছে— যাতে দরিদ্রের গ্রাম ছেড়ে পালাবার দরকার না হয় এবং শিক্ষিত ও রুচিবানদের রুচি গ্রামেই চরিতার্থ হতে পারে। অর্থাৎ, গ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত জীবন সবটারই আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

কিন্তু অতীতে যা সম্ভব হয় নিই আজ তা সম্ভব হবে কেন? সম্ভব হবে অনেক কারণে। প্রথম কারণ এই যে অতীতে দেশ স্বাধীন ছিল না—দেশে জনগণের হাতে কোন গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ছিল না—আজকের এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা রকম শক্তি ক্রমশ দুর্বার গতিবেগ সঞ্চয় করছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের তরফ থেকে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও নানা প্রকারের ভূমি সংস্কারের চেষ্টা গ্রামবাসীদের জীবনে গুরুতর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং ক্রমশ চাষীদের দাবি শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং ভূমি সংস্কারের চূড়ান্ত

মীমাংসার জন্য চাপ পড়েছে। তৃতীয়ত, দেশের খাদ্য সমস্যা ও বেকার সমস্যা আজ বড় সাংঘাতিকরূপে উপস্থিত, যে খাদ্য ও বেকার সমস্যা দূর করার চাপ কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এই দুই সমস্যার শিকড় আজ গ্রামে। গ্রাম শুধু খাওয়াই যোগাড় করবে না, আজকের দিনে বহু বেকারকেও কাজ দিতে হবে নানা রকমের গ্রামশিল্প ও কুটির শিল্পকেই। ফলে গ্রামের উন্নতি করতেই হবে। চতুর্থত, আজ দেশবাসীর চোখ অনেক খুলে গেছে এবং তাদের দাবিদাওয়ার আওয়াজ ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যার ফলে এক প্রবল রাজনৈতিক চাপ বা tension সৃষ্টি হচ্ছে সমগ্র দেশের ভিতরে। এর ফলে সকল দিক থেকে, সকল পার্টি থেকে, এ কথা গ্রাহ্য হয়েছে যে, ভারতবর্ষকে সমাজতন্ত্রের পথে এগুতেই হবে, অন্য কোনো পন্থা নেই। পঞ্চমত, পৃথিবীর ও ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন একটা স্তরে এসে পড়েছে যে গযংগচ্ছ চালে আর ভারতের চলবার উপায় নেই—তাকে আজ পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাল মানিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং তার গতিবেগ এত যে ভারতকে সত্যি সত্যি শুধু উঠে বসতে হবে না, দৌড়তে হবে। এই গতিবেগের তাড়া আজ আমরা জীবনের প্রত্যেক পর্যায় অনুভব করতে পারছি। আজ আমাদের ধীরে সুস্থে চলবার উপায় নেই। নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের মুক্তির ও জাগরণের সাড়া উঠেছে। চারিদিকে অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। মোট কথা ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তনের চাপ আজ আর অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে , সেই পুরানো ভারতবর্ষ আর নেই। এই ভারতবর্ষ আজ আর দারিদ্র্যকে সহ্য করবে না। অত্যাচার ও অন্যায় সহ্য করবে না। কাজেই আজ রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলেছে ভারত, এবং গ্রামগুলির রূপান্তরও তাই অনিবার্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, কমিউনিটি প্রজেক্ট ও নানা প্রকারের আইনকানুনের উদ্যোগ যা আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে বা উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, এ তারই লক্ষণ। কিন্তু উপর থেকে চেষ্টার দ্বারাই সমাজতন্ত্র বা দেশের আমূল অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয় , নীচের থেকে, জনতার থেকেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা চাই। সরকারি বেসরকারি আধা সরকারি সব রকমের উদ্যোগে আজ দেশে কর্মকোলাহল সৃষ্টি করতে হবে। দেশের লোকই বা জনতাই সমাজতন্ত্র আনতে পারে, রাষ্ট্র কারও জন্য সমাজতন্ত্র এনে দিতে পারে না। রাষ্ট্রের সাহায্যে জনগণই নিজেদের কাজ অনেকটা এগিয়ে আনতে পারে মাত্র। কিন্তু এখানে প্রধানকর্তা হলো জনতা। এই জনতা আজ গ্রাম দেশেই বেশির ভাগ—শতকরা ৮০ জন। এই আশি ভাগ জনতা যদি তাদের গ্রামগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলতে না দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তবে উপরের চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। কাজেই গ্রামগুলিকে আজ নতুন করে গড়ে তোলার চাপ চারিদিক থেকে আসতে বাধ্য এবং তা সার্থক হতেও বাধ্য।

অতীতে যে সমস্ত গ্রামের কাজে কখনো কখনো হাত দেওয়া হয়েছে তখন এই পরিস্থিতি ছিল না। তা ছাড়া তখনকার কাজগুলি ছিল সংস্কারপন্থী –একটু আধটু সুবিধা বা সামান্য লেখাপড়ার কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েই ক্ষান্ত ছিল অথবা আধা খাপ্‌চা করে কোনো একটা উদ্যম দু'দিনের জন্য করে পরে ফেলে দেওয়া হত এবং কতকটা হুজুকেই তা শেষ হতো। আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এর গভীরতা ও ব্যাপকতা ঢ় অনন্ত বেশি। আজ অবহেলা করে কিছু করার নেই। বাস্তবের প্রকাণ্ড তাগিদ এসেছে, একে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই।

আজও সংস্কারমূলক কাজ আছে। গ্রামের সাধারণ টুকিটাকি উন্নতি করবার কাজ যে নেই তা নয় , কিন্তু আজকের সংস্কারমূলক কাজগুলির পটভূমিকা যুগান্তকারী। সংস্কারগুলিও আজ সমাজ-বিপ্লবের অঙ্গ বিশেষ, যদিও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে সেগুলি প্রাথমিক চাপ

মাত্র। এই বৃহত্তর পটভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে ছোটখাটো সংস্কার আজ আর নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ থাকতে পারে না। পরে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা আসবে—এখন কেবল গ্রামের কাজের আজকের পটভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হব, কেননা গোটা দেশটা হবে সমাজতান্ত্রিক আর গ্রামগুলি থাকবে তার সাবেক কালের, এমন তো হতে পারে না! কিন্তু আজ এই কাজ অনেকটা জটিল। ভারতে এমন কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সহসা ঘটে যায় নি। ফলে অতীতের সব কিছু মুছে নিয়ে, একটা clean state এর মতো অবস্থা হয় নিই। ফলে অতীতের অনেক আবর্জনার মধ্য থেকেই নূতনের জন্ম হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতার বিপ্লব ও অন্যান্য সামাজিক বিপ্লব কতকটা অপেক্ষাকৃত বিস্ফোরণহীনভাবে ঘটেছে এবং আজও অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়েই তাব অপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব পূর্ণ হতে চাইছে। ফলে এই অবস্থার জটিলতাও অনেক আছে। পুরাতন আবর্জনাগুলিকে ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলে নতুনের জন্ম নিতে কত কষ্ট ও কত সময় পেতে হবে—তা নির্ভব করবে জনসাধারণের চেতনা ও দেশনাযকদের নেতৃত্বের উপর। এই পুস্তিকায় সে কাজ গ্রাম দেশে দ্রুতগামী করার অনুকূলে একটা গঠনমূলক বিপ্লবের পথ দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে এবং সে চেষ্টা যাতে সকলের পক্ষেই যথাসম্ভব কার্যকরী হতে পারে তার বিচার করা হচ্ছে। বিশেষ করে নীচে থেকে গ্রামবাসীরা নিজেরাই কি ভাবে অগ্রসব হতে পাবে তাব একটা দিক দেখবার চেষ্টা হচ্ছে।

গ্রামে প্রথম কাজ হলো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই। তাব মানে অর্থনৈতিক সংগ্রামই প্রধান। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অন্যান্য সমস্যা একটার পব একটা দূর করতে হবে এবং তাবই মধ্য দিয়ে নতুন সমাজ বা New social relations তৈরি করতে হবে। তৃতীয় কাজ হলো গ্রামের সংস্কৃতি জীবন গড়ে তোলা—শিক্ষা তাব বাহন। অক্ষরজ্ঞানই শুধু নয়, সত্যিকার জ্ঞান দিতে হবে সবাইকে, স্ত্রী-পুরুষ সবাইকে। জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র গ্রাম হতে পারে না অথবা গ্রামের লোক বই লিখতে, চিন্তা করতে, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক হতে পারে না এমন ধবনের চিন্তা হাস্যকর। পৃথিবীর অতি বৃহৎ বৃহৎ প্রতিভা অতীতে গ্রাম থেকেই ফলবান হয়েছে। কলকাতা শহরের ভাড়াটিয়া বাড়িতে বিজলী আলো ও পাখার বাতাসে কি পরিমাণের জ্ঞানী বিজ্ঞানী বেরিয়েছে আর কি পরিমাণ গাধার সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনামূলক বিচাব করলে কলকাতার গৌরব করা যায় না। গ্রামদেশেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র সৃষ্টি হতে পারে যদিও সব জাতীয় গবেষণা গ্রামে সম্ভব নয় এবং দরকারও নয়। গবেষণাব মনোবৃত্তি ও আবহাওয়া সৃষ্টি করাটাই আসল কথা। Agronomy, Biology, Zoology, Botany, Physics, Chemistry, Astronomy, Mathematics ইত্যাদি গবেষণার অনেক কিছুই গ্রাম্য গবেষণাগারে করাও সম্ভব। আব কৃষ্টির দিক থেকে বলতে গেলে এমন দাবিও করা যায় যে আদর্শ গ্রামগুলিই একদিন সত্যিকার Cultural centre হিসাবে গড়ে উঠবে। গ্রামের প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা বাইরে শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ করে আপন গ্রামে বসেই অনেক গবেষণা করবে এমন আশা করাটা অন্যায় নয়।

কিসের জন্য শহর আজ গ্রামবাসীদের আকর্ষণ করে? যদি তা পাকা রাস্তা, দ্রুত চলাচল, সংবাদ সরবরাহ, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবিকা, জীবনের আমোদ প্রমোদ, গান-বাজনা, হাসপাতাল, মোটরযান, লাইব্রেরি, খেলাধূলা, ছায়াচিত্র, নাট্যমঞ্চ, রেডিও, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ইত্যাদি হয়ে থাকে তবে তা সবই একদিন গ্রামে প্রাপ্য। আজকার সভ্যতার অনেক অবদান Mass production এর যুগে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। গ্রামগুলিকে সুন্দর করার মানে এই যে শহরের আধুনিক সুবিধাগুলিকে গ্রামেও প্রবর্তিত করা। আর শহরগুলিকে সুন্দর করা মানে

কিং শহরগুলিকে কতকটা গ্রামায়িত করে তোলা যাতে গ্রামের প্রকৃতির সাহচর্য শহরেও পাওয়া যায়। কাজেই গ্রাম ও শহরের উভয়ের উন্নতি ক্রমশ পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া, দু'য়ের ব্যবধান কমিয়ে আনা।

অতএব গ্রামে ফিরে চল মানে পুরানো গ্রামে ফিরে যাওয়া নয়—নতুন গ্রাম গড়ে তোলা। এ পিছিয়ে যাওয়া নয়—এগিয়ে যাওয়া। মেয়েদের বেলায় ঘরে ফিরে যাও এ কথার মানে এই নয় যে অতীত জীবনে ফিরে যাও। কতক মেয়ে হয়ত অবিবাহিত জীবন যাপন করতে চাইতে পারেন, কিন্তু বেশির ভাগ মেয়ের ঘরসংসারই করবেন। তার মানে কি স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন মানে রইল না? তা নয়—কেননা তারা যে নতুন ঘর সৃষ্টি করবেন তা হবে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সমান অধিকারের উপর। পুরানো যুগের দাসীবৃত্তিতে তারা ফিরে যাবেন না। তেমনই গ্রামে ফিরে চল মানে গ্রাম্য কূপমণ্ডুকতায় ফিরে যাওয়া নয়—নতুন গ্রামে সুন্দর সমাজে অগ্রসর হয়ে যাওয়া।

॥ ৩ ॥
কর্মী

কাজ কি করে শুরু করা যায়? যে কাজ করতে যাবে তাকে প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হবে। তার মানে কর্মী নিজেকে প্রথমে দেখে নেবে। কর্মীর উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কর্মীকে নিজেকে গড়ে তোলার কোনো শেষ নেই, নিজের চারিত্রিক উন্নতি, যোগ্যতার উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতির কোনো শেষ নেই। নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা না করে পরের উন্নতি করতে যাওয়ার লোভটা অতি সাধারণ একটা মোহ। যেমন শূন্যের পর শূন্য যোগ দিলে, লক্ষটা শূন্যের যোগফলও শূন্য তেমনই অকর্মণ্য নিষ্ঠাবিহীন তথাকথিত কর্মীর দলবলের ক্ষমতাও শেষ পর্যন্ত শূন্য। বর্তমান কর্মীদের নিজেদের শিক্ষাদীক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে—কেননা এ বিষয়ে বড্ড ফাঁকি চলেছে। কথার সঙ্গে কাজের বিস্তর অসঙ্গতি দেখা যায়—আত্মসমালোচনার কোনো প্রয়োজনই যেন বোধ করে না। আরও অনেক রকমের দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। ফলে আন্দোলনের চেহারায় দিনকে দিন উজ্জ্বলতা আর দেখা যায় না। আদর্শ স্তিমিত হয়ে আসছে। আত্মত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব দেখা যাচ্ছে।

তার মানে এই নয় যে যতদিন আমি উন্নত ও খাঁটি লোক হতে না পারব ততদিন কোনো কাজে আমার যোগ দেওয়া উচিত হবে না। বস্তুত কাজের মধ্যে ছাড়া নিজেকে তৈরি করাই সম্ভব নয়। বনে জঙ্গলে মানুষের সঙ্গ ও দায়িত্ব এড়িয়ে জপতপ করে যে তৈরি হওয়া সে ধরনের তৈরি মানুষের দ্বারা সামাজিক জীবনের কোন কাজ হয় না। দেশকে গঠন করা, সমাজের রূপান্তর ঘটানো এ সব কাজের জন্য যোগ্যতা ও শক্তি অর্জন করা সামাজিক শিক্ষার মধ্যেই সম্ভব। সমাজের নানাবিধ ঘাতপ্রতিঘাতে বুক পেতে অংশ নিতে হবে এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই অভিজ্ঞতা জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হবে। তপোবনের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কুলোয় না actual battle of life বা সমাজের জীবন-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেই সে শিক্ষা হয়। অতএব একদিন আমি তৈরি হব তারপর কাজে নামব এ রকম চিন্তা করলে কখনো তৈরি হওয়াই সম্ভব হয় না। মোট কথা দেশের কাজে নেমে পড়তে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, নিজেকে সর্বদা সজাগ রাখতে হবে, সর্বদা আত্মসমালোচনা করতে হবে। যখনই দেখব যে কোনো কাজ এগোচ্ছে না তখনই

এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেব না যে গ্রামের লোক আমার কথা ধরবার মত যোগ্যতা বা জ্ঞান রাখে না, তারা বড় বোকা ইত্যাদি। এমনও হতে পারে, এবং তা প্রায়ই হয় যে, আমারই যোগ্যতার অভাবে তারা সাড়া দিতে পারছে না। যে জিনিসটি কেটে ফেলতে চাই তা কাটল না দেখে মনে করার কারণ নাই যে জিনিসটা বড্ড শক্ত, এমনও হতে পারে যে আমার হাতিয়ারটাই ভোঁতা। অতএব চাই সজাগ মন ও বিনয়। অহঙ্কার সার্থকতার পথে প্রধান অন্তরায়। অহঙ্কারই মানুষের চোখ অন্ধ করে রাখে নিজের ভুল দেখতে দেয় না—বাস্তব অবস্থার সঠিক বিচার করতে দেয় না। কর্মীর বিনয় জিনিসটা পদে পদে দরকার। নিজের উন্নতিকে অবারিত করার উপায় হলো একটি বিনীত মন, জিজ্ঞাসু ও সদাজাগ্রত ও সর্তক মন, বিচারশীল মন। অন্যের সব অপরাধ ক্ষমা করা যায়, কিন্তু নিজের কোনো অপরাধকে ক্ষমা করা যায় না—এই হলো আদর্শ কর্মীর standard বা মানদণ্ড।

কর্মীর কত রকমের গুণ চাই এর কি কোনো শেষ আছে। সব গুণই তার চাই যখন যেটা দরকার—কোনোটার অভাব হলে চলে না। সব গুণ একার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় না, সেখানে দরকার হয় সহযোগিতার, অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতা। সম্মিলিত নেতৃত্ব বা collective leadership এর মানে এই। কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে কখনোই সব দিক দেখা সম্ভব হয় না—কাজ করতে করতে যে যে কাজটি নিয়ে আছে সেইটুকুতেই তার মোহ জন্মে যেতে পারে। চিন্তা একপেশে বা একচোখো হয়ে যেতে পারে। সমগ্র সত্যকে সবদিক থেকে দেখার ক্ষমতা একজনের পক্ষে সম্ভব হয় না সে যত বড় নেতাই হোক না কেন। ফলে সমবেত নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিরহঙ্কার না হলে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা, দশজনের বুদ্ধি নেবার,পরামর্শ বা মত নেবার ইচ্ছাই হয় না। বস্তুত তিনিই হলেন সার্থক নেতা যিনি তাঁর কালের যাবতীয় যোগ্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা ঘটাতে পারেন, সকলের বুদ্ধিকে এক করতে পারেন। তাঁরই নাম organiser বা সংগঠক কিন্তু অহঙ্কারী লোকের পক্ষে সত্যিকার সংগঠক হওয়া সম্ভব নয়।

নিজের দুর্বলতা, কাজের মধ্যে যখনই সেটা ধরা পড়ছে, তখুনি তাকে সংশোধন করে নিতে হবে। অহঙ্কার যে কত কৌশলে কত ভাবে ঢুকতে পারে তার কোনো শেষ নেই। সত্যিকার নিরহঙ্কারী হওয়া বড় সোজা কথা নয়। অহঙ্কারের মোটা দিকগুলি আমরা সহজে দেখতে পাই বটে কিন্তু তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকাশগুলিকে অনেক সময় ধরাই যায় না। দেশের ভালো করব এই সদিচ্ছার মধ্যেও তার প্রকাশ কখনো কখনো দেখা যায়। যদি মনে করি আমার দ্বারা মহৎ কাজ হবে, আমি ছাড়া দেশের গতি নেই, দেশের মুক্তি আমার অপেক্ষায় বসে আছে তাহলেও একটা অহং বোধ আমার কাজটাকে তুচ্ছ করে নিজেকেই ফাঁপাতে ফোলাতে ব্যস্ত থাকে। ফলে নিজের সম্বন্ধে একটা বড়াই এসে যায়। কিন্তু সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি ও spirit হলো এই যে, দেশের কাজে আমার একটা অংশ আছে তা আমাকে পালন করতেই হবে এবং দেশের কাজের মধ্য দিয়েই আমি আমার দুর্বলতা ত্রুটি ও চরিত্রের নানা অভাব দূর করব—নিজেকেও সার্থক করে তুলব—কেবলমাত্র দেশেরই উপকার করা হচ্ছে না,—নিজেরও বিস্তর উপকার করা হচ্ছে এইমাত্র। এখানে অহংকারের কোনো স্থান নেই। নানা প্রকারের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেরই অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে, নিজেরও মস্ত উপকার হচ্ছে।

কর্মীকে ভাবতে হবে, দেখতে হবে আমি যে মহান সব আদর্শের কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার করে চলেছি সে সব মহান আদর্শ বহন করবার মতো আমার কতটুকু যোগ্যতা আছে। আমার কথার সাথে আমার চরিত্রের, আমার কাজের মিল আছে কি না। যদি না থাকে তবে গ্রামবাসীরা

তখুনি তা ধরে ফেলবে। তারা হয়ত ভদ্রতার খাতিরে তক্ষুনি জবাব দিয়ে দেবে না কিন্তু সাড়াও দেবে না। আন্তরিকতা না দেখতে পেলে এক পাও এগুবে না, কেননা তারা দেখেছে যে বাবুলোকেদের কাছে, শিক্ষিত লোকেদের কাছে তারা চিরকাল ঠকেই এসেছে। তাই শিক্ষিত লোকেদের সম্বন্ধে তাদের একটা সহজাত ভয় আছে, কেননা শিক্ষা আজও পর্যন্ত তাদের কোনো উপকার করে নি। এই বাবুলোকেদের সম্বন্ধে যদি তাদের এই সহজাত সন্দেহটা না থাকত তবে তাদের আরো সর্বনাশ হয়ে যেত। বড্ড ভুল হবে যদি মনে করি নিরক্ষর দরিদ্ররা বুঝি সব মূর্খ। তারা মূর্খ নয়, লোক চেনবার তাদের একটা সহজাত অনুভূতি বা Instinct আছে, মানুষ মাত্রেরই আছে—এমন কি পশু পক্ষীরও আছে , নইলে লক্ষ লক্ষ বৎসর তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারত না। তাদেরও কোনো স্কুলকলেজ নেই, ভাষা নাই—তবু মানুষের চেয়ে তারা কমদিন বেঁচে নেই—বরং মানুষের চেয়ে তাদের বয়স ঢের ঢের বেশি। অতএব, আমাদের, মানে শিক্ষিত লোকেদের এই যে অহংকার যে, গ্রামের লোকেরা বোকা—এটাই হলো আমাদের প্রথম মূর্খতা যার জন্ম অহংকার থেকে। অতএব এ ভুল যেন না হয় যে কর্মীর চালাকি, ফাঁকি অথবা কপট দেশভক্তি গ্রামবাসীরা ধরতে পারবে না। ধরতে পারবেই, এমন কি চোখ বুজেও ধরতে পারবে। তাদের কাছে বরং সরল মনে উপস্থিত হতে হবে, খোলাখুলি ভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। তবে তারা কর্মীর ত্রুটিগুলিকেও ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারবে এবং তা সংশোধন করে দিতে সাহায্য করবে। নিজেদের ছেলের যদি কোন ত্রুটি দেখে তবে কি কোনো মাতা পিতা তাকে দূর করে দেয়? তাই গ্রামবাসীরা যখন মনে করবে যে, কর্মী তাদের আপনজন পরমাত্মীয় তখন তারা তার জ্ঞানগম্যের কোনো ত্রুটি দেখলেই তাড়িয়ে দেবে না, বরং সংশোধন করে নিতে সাহায্য করবে। লোকের ভালবাসা শ্রদ্ধা, সমর্থন ও সাহায্য ভিন্ন কর্মী বেঁচে থাকতে পারে না—তার ক্ষমতা বাড়ে না। কেননা এটা কারো একলার বাহাদুরী বা একলার কীর্তি নয়। আমরা কেউ নিজের সৃষ্টি নই। কোন শ্রেষ্ঠ নেতাও আপন সৃষ্টি নয়, সমস্ত দেশের সৃষ্টি। তাঁর শক্তি সমস্ত দেশ থেকে আহরণ করা। From the people and with the people। জনতার কাছ থেকে সংগ্রহ করে জনতার হাতে দিতে হবে সব, এই হলো কর্মী বা নেতার কাজ। এখানে নিজের বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই।

কর্মীকে শুধু হৃদয়বান, চরিত্রবান হলেই চলবে না , তার শিক্ষা, বুদ্ধি ও জ্ঞান থাকা চাই। বোকা লোক হৃদয়বান হলেও বেশি কিছু সাহায্য করতে পারে না। এ যুগ কেবল হৃদয়ের যুগ নয়। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ , সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান, চাষের বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান কর্মীকে অর্জন করেত হবে। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। গ্রামদেশে আজ যে অন্ধকার বিরাজমান তা দূর করবার মত জ্ঞানবিজ্ঞানের মশাল তার হাতে থাকা চাই। অতএব আজ গ্রামদেশে প্রথম শ্রেণীর কর্মীদের ও নেতাদের যাওয়া দরকার, মানে কাজ করা দরকার। প্রকৃত নেতৃত্বের স্থান আজ নীচে। উপরের দিকে অনেক নেতার অযথা ভীড় ও অশোভন প্রতিযোগিতা—উপরের কয়েকটি আসন দখল করার জন্য হাজারো নেতার মারামারি। অথচ জনতার জন্য লক্ষ লক্ষ আসন আজ শূন্য। যেখানটায় ভিৎ সেখানটা কাঁচা রেখে উপরের দিকটা মজবুত করার যে চেষ্টা চলেছে তাতেই দেশ সত্যি সত্যি জেগে উঠছে না। শ্রেষ্ঠ কর্মীদের আজ ভিৎ গঠনের কাজে লাগা উচিত। ওঁরা, প্রায় নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীদের গ্রামসংগঠনে পাঠিয়ে বুদ্ধিমান ও বিদ্বান সব নেতারা রাজধানীতে বসে দেশ গঠন করতে চাইছেন। এ হয় না, হতে পারে না। নিরক্ষর গ্রামবাসীরা নেতাদের বক্তৃতা পড়ে না, শোনেও না, বোঝেও না। শ্রেষ্ঠ কর্মীদের প্রাণপাত পরিশ্রম ও দীর্ঘ

সাধনা চাই —এই গোড়া বা ভিৎকে সত্যি সত্যি শক্ত কবা চাই। যদি ভিৎই শক্ত না হল তবে দেশেব স্বাধীনতা ঠুন্‌কো স্বাধীনতা মাত্র—এব দ্বাবা কাবো কোনো উপকাব হবে না, জনতাব তো নযই। দেশেব সমাজতন্ত্র তৈবি তো দূবেব কথা, স্বাধীনতা বক্ষা কবাই সম্ভব হবে না।

আব আজকালকাব গ্রামকর্মীদেব পক্ষে কেবল গোটা কযেক বাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্যা সম্বল কবেই সার্থক কাজ কবা সম্ভব নয। তাব গ্রামেব সকল কাজ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা চাই। চাষবাস, পশুপালন, পোলট্রি পালন, ভূমি আইন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কুটিবশিল্প ইত্যাদি সকল বিষযে জ্ঞান থাকা চাই, যাকে বলে multipurpose man অর্থাৎ, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যাবতীয জ্ঞান থাকা চাই। এ ধবনেব কর্মী গ্রামবাসীদেব সব সমযে সাহায্য কবতে পাবে—গ্রামবাসীবা তাব প্রযোজন পদে পদে অনুভব কববে। কর্মীকে গোটা কতক বাজনৈতিক বুলি সম্বল কবে গেলে চলবে না—তাহলে তাকে তাবা একটা নতুন উৎপাত বা পবগাছা মনে কববে। গ্রামে থাকা বা বাস কবাব দরুন কর্মীকে যেন একটা গলগ্রহ হযে পডতে না হয। যদি তাব সেই গ্রামে বাস কবাব দরুন গ্রামবাসীবা প্রত্যক্ষভাবে নানা উপাযে উপকৃত হয এবং গ্রামেব আয তাব কর্মপ্রেবণায বেডে যায এমন দেখা যায তবে সে কর্মীকে গ্রামেব লোক কখনও বর্জন কবতে পাবে না—এ অতি সাধাবণ হিসাব। তাছাডা গ্রামেব সব কাজেই সাহায্য দবকাব। জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, technical know how সব কিছুব তাদেব অভাব—কাজেই কর্মীকে এ সব বিষযে যথাসম্ভব অভিজ্ঞ হওযা চাই। এই জ্ঞান থাকলেই চাষীবা তাব উপদেশ গ্রহণ কববে, নইলে না জানা লোকেব উপদেশকে তাবা উপব চালাকী বলে মনে কববে। কোথায কি জিনিস পাওযা যায, কোথা থেকে কি সাহায্য আসতে পাবে এই সব কর্মীব নখদর্পণে থাকা চাই।

সাধাবণভাবে এ-ই হলো কর্মীব শিক্ষাদীক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক মূলধন। এই মূলধন নিযে তাকে "কবেঙ্গে ইযে মবেঙ্গে" এই জেদ নিযে কাজে লাগতে হবে। এই জাতীয কর্মীব স্পর্শে যাদু আছে, এবা অতি সহজেই গ্রাম দেশে নব জাগবণ আনতে পাববে।

॥ ৪ ॥

গ্রাম-পরিকল্পনা

গ্রামগুলিকে কিভাবে ধবা বা approach কবা যায এ কথা জিজ্ঞাসা কবাব সাথে সাথে মনে বাখতে হবে যে, প্রত্যেক গ্রামেব চেহাবা ও বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা। কোন দুটি গ্রাম ঠিক এক বকম নয। সাধাবণভাবে গ্রামেব সমস্যাগুলি এক ভাবেব কিন্তু প্রত্যেক গ্রামেব খুঁটিনাটিতে অনেক বকম পার্থক্য আছে। গ্রাম সমস্যা এক ভাবেব বলাতে শুধু এই বোঝায যে তা শহবেব সমস্যা নয—কেননা শহব এক জিনিস আব গ্রাম অন্য জিনিস। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামেব যে আলাদা সমস্যা আছে সেটা ভালো কবে তলিযে না দেখে যদি কোনো কর্মী গ্রামেব জন্য একটা ঢালাও প্রোগ্রাম নিযে উপস্থিত হয় তবে তাতে ভুল হবে। গ্রামেব লোক সংখ্যা, চাষেব জমি, পতিত জমি, শ্রেণীবিন্যাস, জাতপাত, ব্যবসায আদি, হিন্দু মুসলমান, বর্ণহিন্দু, [illegible] চাষী, মহাজন, মধ্যবিত্ত, গবিব চাষী, ভূমিহীন চাষী, বেকাব, শিল্প ইত্যাদি ব্যাপাবে প্রত্যেক গ্রামেব স্বতন্ত্রৰূপ আছে। তাছাড়া প্রত্যেক গ্রামেব একটা ইতিহাস আছে যাব ফলে [illegible] চেহাবাটাও সেখানে একেক প্রকাবেব। ভৌগোলিক পার্থক্যও কোন কোন ক্ষেত্রে [illegible] যেমন শহবেব কাছে না দূবে, বেল এবং বড় বাস্তাব সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত ইত্যাদি। তাছাড়া

দলাদলির অবস্থাটা কি? গ্রাম্য দলাদলি ছাড়া রাজনৈতিক দলাদলি আছে কিনা, সেখানে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল কিনা—এগুলি সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন কর্মীর লক্ষ্য করার বিষয়। সমস্ত কিছুর যথাসম্ভব পাকা হিসাব নিতে হবে। গ্রামটির বাস্তব অবস্থা (objective situation)ও মানসিক অবস্থা (subjective factors) ইত্যাদি জানা থাকলে কি কাজের পর কি কাজে হাত দিতে হবে এবং কোথায় সহজে ও প্রথমে সাড়া পাওয়া যাবে—এসব বিষয়ে সুবিধা হবে। মোট কথা কোনো একটা বাঁধাধরা প্রোগ্রাম হতে পারে না। প্রত্যেকটি গ্রামের বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং আমরা দেখতে পাব যে, কোনো একটি প্রোগ্রাম নিয়ে কর্মীকে উপস্থিত হবার চেয়ে প্রোগ্রামটি গ্রাম থেকে গ্রামবাসীদের সক্রিয় মাথা ও সহযোগিতা থেকে সৃষ্টি করিয়ে নিতে পারলেই অনেক বেশি ভাল ও কার্যকরী হবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, খুঁটিনাটি বা details বোঝার উপর সবকিছু নির্ভর করে। এ স্থলে কর্মীর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর কথাটাও মস্ত। যদি কর্মীর তেমন প্রতিভা, প্রতিপত্তি, পূর্বপরিচিতি বা social credit থাকে তবে তার নেতৃত্বের প্রভাবে অনেক ছোটখাটো খুঁটিনাটি ও তজ্জনিত বাধা তিনি অনায়াসেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—তার শক্তিমান ও বেগবান নেতৃত্বের টানে সহজে ও সত্বরই গ্রামে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন। মনে রাখতে হবে যে, সব জিনিসটাই একটা মুদীখানার লাভালাভের হিসেবীপনা নয়। আন্দোলন বা movement এর একটা ঢেউ তোলা চাই, সবার প্রাণে একটা জাগরণের প্রবাহ সৃষ্টি করা চাই। তুচ্ছাতিতুচ্ছ টুকিটাকি কানাঘুষি ও সন্দেহের ধূলাবালি অতিক্রম করতে হলে বেগবান ও শক্তিমান ডাক আনা চাই। সমগ্র দেশ সম্বন্ধে বড় নেতার যে ভূমিকা ছোট একটি গ্রাম সম্বন্ধে কর্মীরও সেই ভূমিকা। সুচিন্তিত বাস্তব বিচার যেমন সব নয়—তেমনই আবেগপূর্ণ আবেদনই যথেষ্ট নয়। শুধু realism এর ঠাণ্ডা কথায় যেমন কারো প্রাণ জাগে না তেমনি শুধু কেবল idealism বা আদর্শের নিশান ওড়ালেই সবাই এসে জড়ো হয় না—চাই practical idealism বা বাস্তব আদর্শবাদ।

এটা হলো plan বা পরিকল্পনার যুগ। পরিকল্পিত উপায়ে দেশকে সমাজকে সমগ্রভাবে গড়ে তোলা সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। ধনতন্ত্রের পরিকল্পনা অসম্ভব। কেননা সেখানে সবাই যার যার তার তার—অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে ঠেকেঠুকে ঠোকাঠুকি করে সবাইকে এগুতে হয়—সমস্ত কিছুই বাজারের উপর নির্ভরশীল—জিনিসের বাজার, টাকার বাজার, চাকুরির বাজার, মজুরির বাজার। আর, বাজারে রয়েছে অন্ধ প্রতিযোগিতা—দরের ওঠা-নামা। কাজেই সেখানে মানুষ ভাবে এক—হয় আরেক, মানুষ চায় এক বাধ্য হয়ে হয় সম্পূর্ণ অন্য। সমাজতন্ত্রে সমগ্রভাবে গোটা সমাজের জন্য ও তার প্রত্যেকটি নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য থাকবে সুনির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব এবং তা পাবার জন্য সুযোগ ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা। এখানে কেউ ফালতু বা অতিরিক্ত নয়, কেউ অগ্রাহ্য নয়—প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক ঘটনার (eventualities) জন্য পূর্ব থেকে ব্যবস্থা থাকবে। শিশুর জন্মের পূর্ব থেকেই যেমন তার যাবতীয় প্রয়োজন মার শরীরে আগে থেকেই তৈরি থাকে তেমনি সমাজে প্রত্যেকটি আগন্তুকের জন্য তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একটা সুব্যবস্থা সৃষ্টি করাই সমাজতন্ত্রের পণ।

তাই আজ প্ল্যান করে গ্রামে গ্রামেও অগ্রসর হতে হবে। সমগ্র দেশের জন্য যেমন একটি পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান—প্রত্যেক গ্রামের জন্যও তেমনি এক একটি পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান। নইলে সমগ্র দেশের প্ল্যানও সার্থক হতে পারে না। দেশও এই গ্রামগুলিকে বাদ দিয়ে নয় ; বরং ভারতবর্ষ আজও গ্রামপ্রধান—গ্রাম সমুদ্রে শহরগুলো আজো দু'একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। অতএব কর্মীকে প্রথমেই তার গ্রামের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের আওয়াজ তুলতে হবে। প্ল্যানটি

তার একটি মাথা থেকে তৈরি হলে চলবে না। প্ল্যানটি তৈবি হওয়া চাই গ্রামবাসীদের সকলের উৎসাহে ও সক্রিয় সহযোগিতায়। গ্রামবাসীরাই তো সে প্ল্যান কার্যকরী করবে—কাজেই অপরের প্ল্যান তারা কখনোই গা লাগিয়ে কার্যকরী করবে না। তাছাড়া যে করার ভিতরে চিন্তার সহযোগিতা নেই—তাতে কখনও উৎসাহ বা রং ফুটবে না। ধমক দিয়ে অথবা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কাজ কোনো স্থায়ী ফল দেয় না, কখনো কখনো একটা হুজুগ সৃষ্টি করতে পারে মাত্র—যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এবং মানুষের চরিত্র এতে খোলে না। একটা কথা যেন সর্বদা মনে রাখি যে, চাষবাস, গৃহ, রাস্তা, হাসপাতাল যা কিছুই করছি তা মানুষের জন্য। চাষের জন্যই চাষ করি না, ঘরের জন্যই ঘর করি না, রাস্তার জন্যই রাস্তা করি না, বিদ্যালয়ের জন্যই বিদ্যালয় করি না—করছি, সব কিছু মানুষের জন্য। শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজের বিচার হবে মানুষ তৈরির মানদণ্ড নিয়ে—কি জাতীয় মানুষ, কত উঁচুদরের মানুষ, কত সুন্দর নরনারী তৈরি হয়েছে তাই দিয়ে সব কিছুর মূল্যামূল্য নির্ধারিত হবে। সরকারি টাকায় অথবা কোন বড় লোকের দানে হঠাৎ যদি কোনো গ্রামে চাষের ট্র্যাক্টর, দরদালান, রাস্তাঘাট, গাড়ি ইত্যাদি মিলে যায় বা জুটে যায় তাতেও শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের স্থায়ী সুখ ও শান্তি হবে না। নিজেদেরটা নিজের মাথা ও শক্তি দিয়ে যেদিন করে নিতে পারবে সেদিনই হলো তাদের সত্যিকার মুক্তি, সত্যিকার বিকাশ। এ অবস্থা হলে রাষ্ট্রের উত্থান পতনে বা কর্মীর অবর্তমানে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে না। এই আত্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি করা কর্মীর একটা প্রধান লক্ষ্য।

এরই জন্য চাই গণতন্ত্র, সত্যিকার জনগণতন্ত্র। গণতন্ত্রের অর্থ কেবলমাত্র কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর একটা নির্বাচন নয়। নেতা বেছে দিলেই গণতন্ত্র হল না—ভোটতন্ত্র মানে গণতন্ত্র নয়। জনগণ কেবল ভোটার নয়, তারা মানুষ—পরিপূর্ণ এক একটা মানুষ। তাদেরকে চিন্তা করতে শেখানো, ভাবতে শেখানো হল গণতন্ত্রের প্রথম কাজ। এই চল্লিশ কোটি লোক একদিন ভাবতে শিখবে—নিজেদের মাথা দিয়ে ভাবতে শিখবে, ভাববার সুবিধার জন্য লেখাপড়া শিখবে, দিক্-দুনিয়ার সবকিছু বিচার করে দেখবে এই হলো আদর্শ গণতন্ত্রের কাজ। গড্ডালিকা সৃষ্টি করা নয়, হুক্কাহুয়ার দল সৃষ্টি করা নয়, গলাবাজী করে ভোট বাগিয়ে নেওয়া নয়, সত্যিকার সচেতন, সক্রিয় জনগণ সৃষ্টি করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এ কাজ কালে-ভদ্রে ভোটের জন্য একবার বক্তৃতা করে এলেই হয় না। কেবল প্রচার বা প্রোপাগ্যাণ্ডার কাজ নয়, শিক্ষা বা education এর কাজ। দৈনন্দিন জীবন গঠনের বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাকে পাকা করে নেবার প্রয়োজন আছে এতে। ধরে ধরে শেখানো দরকার যেমন শিশুদের একদিন ধরে ধরে অ-আ, ক-খ, শেখানো হয়। কেননা অশিক্ষিত নিরক্ষর গ্রামবাসীরা এখনো ভাবতে শেখে নি, একত্রে বসতে শেখে নি, গণতন্ত্র কি তাও বোঝে নি।

গ্রামের কর্মীব পক্ষে তাই তার নিজের প্ল্যানটা তাদের মাথায় চাপিযে দিয়ে রাতারাতি কাজ হাসিল করার তাড়া শেষ পর্যন্ত কোনো ফল দেবে না। গ্রামবাসীকে দিয়েই তাদের প্ল্যান কবিয়ে নিতে হবে—কর্মীর নিজের শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাতে সাহায্য করবে মাত্র। তাতে যত সময় লাগে লাগুক, ধৈর্য হারালে চলবে না। প্রত্যেককে ভাবতে ও বলতে উৎসাহিত করতে, প্রত্যেকের নিজের অবস্থা ও তার বিচার অনুযায়ী গ্রামের অবস্থা বর্ণনা করতে দেবার সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যেক পরিবারের কাছে বা ঘরে তাকে যেতে হবে, তাদের সঙ্গে সত্যিকার আলোচনা ও পরামর্শ করতে হবে—তাদের কথা শোনার অভ্যাস ও ধৈর্য সৃষ্টি করতে হবে, সেই পরিবারের কি অবস্থা, আগামী পাঁচ বছরে সেই সংসারটি কি করবে বলে আশা করে,

কতটা সহযোগিতা পেলে কতদূর এগুতে পারে, গ্রামের সহযোগিতা পেলে কি হতে পারে—সমগ্র দেশের সরকারের কাছ থেকে কি আশা করে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা, বিবাহাদি ব্যাপারে কি প্রয়োজন, তাদের চাষবাস দায়-দেনা সম্বন্ধীয় সমস্যা কি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে প্রত্যেকের পরামর্শ নিতে হবে। কর্মীরা নিজে বুঝতে পারলেই হলো না—গ্রামবাসীদের সব জিনিসটা নিজেদের বোঝা চাই। এই সব আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক তাদের মাথা বা চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে তুলবে এবং তাদের বুকে আশা ও উৎসাহ সৃষ্টি করবে। এমনি করে প্রত্যেককে আলাদাভাবে ও সকলকে একত্র করে গ্রাম সভায় সমস্ত প্ল্যানটি আলোচিত ও সংশোধিত করে পাস করিয়ে নিতে হবে। তবেই হল প্ল্যান বা গণতান্ত্রিক প্ল্যান। এই জাতীয় প্ল্যানে সকলের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও উৎসাহ থাকবে, সেই প্ল্যান কার্য্যকরী করার দায় বেড়ে যাবে সবার পক্ষে এই প্ল্যান রচনাতে কার্যকরী হবে গণতন্ত্র, যাকে বলে democracy in action and thought।

কর্মী অবশ্য এই প্ল্যান রচনার কাজেই ক্ষান্ত হবেন না। সমস্ত গ্রামখানি একটি পরিবার এবং তিনি তার একজন সদস্য এমনি ধরণের ভাব তার মনে সর্বদা থাকা চাই। গ্রামের জমি জায়গা, ছেলেপিলে, গাছ-গাছড়া সব তার অন্যান্যদের সাথে কাজের ভাব, প্রত্যেকটি সমস্যা যেন তার নিজের, এমনি মনে করা চাই। তাকে প্রথম দিন থেকেই গ্রামের নানা কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে হবে—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, চাসবাস ইত্যাদি সব কাজে হাত ও মাথা লাগাতে হবে। ছোট থেকে ক্রমে বড় বড় কাজে হাত দিতে হবে। ছোট্ট ছোট্ট দু' একটি কাজ ভালোভাবে সমাধা করে দিতে পারলে লোকের আস্থা তার উপর বাড়বে এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যাবে। আস্থা বাড়ার অনুপাতে অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজে হয়ত হাত দিতে হবে। প্রথমেই একটা ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী মামলা মিটিয়ে দেবো অথবা ভূমিবণ্টন করে দেব এমন ধরণের জটিল ও বড় কাজে হাত দেওয়া দুরাশা হবে তার পক্ষে। বিনোবা ভাবে'র মতো লোক হয়ত প্রথমেই গ্রামদান চাইতে পারেন, এবং তাঁর যা প্রভাব তাতে হয়ত ফল হয়, কিন্তু একজন সাধারণ কর্মী এতবড় দাবী করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে কত বছরের সাধনা ও ত্যাগ বিনোবাকে আজ বিনোবা করেছে এবং তাঁর পিছনে কত good-will আছে। তাই প্রত্যেকের নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই। শক্তির বাইরে কাজ নিয়ে একটি অসার্থকতা বা failure এর ছবিটা প্রথমেই দেখিয়ে ফেলা যুক্তিযুক্ত নয়। ছোট থেকে তাই ক্রমশ বড় কাজে হাত দিতে হবে—সেই সব কাজে, যাতে কোন বিতর্ক বা controversy বা জটিলতা নাই। গ্রাম পরিষ্কার করা, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া এমনি ধরনের টুকিটাকি অথচ অবশ্যকীয় কাজে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই—সকলের সহানুভূতি তাতে পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীকে কয়েকজন ছাত্র কর্মী জিজ্ঞাসা করেন, "গ্রামে যে যাবো সেখানে আমরা কি কাজ পাব—কে আমাদের কাজ দেবে?" তিনি তক্ষুনি সহাস্যে উত্তর দিলেন যে তিনি যত গ্রাম দেখেছেন এত বোধ হয় কেউ দেখে নি—কাজেই তিনি গ্রামের প্রকৃত হাল জানেন। তিনি দেখেছেন প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একজন ঝাড়ুদার বা মেথরের প্রয়োজন আছে—কেননা এত নোংরা ও ময়লা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে যে গ্রামের আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত দূষিত। যদি কর্মী ঝাড়ু হাতে সে সব জঞ্জাল পরিষ্কার করতে লেগে যায় তবে আপাতত তাই তার পক্ষে যথেষ্ট ও প্রথম কাজ—বাকী সময় যদি কিছু থাকে তবে বসে বসে চরখা কাটতে পারে। ক্রমে গ্রামবাসীরা এই নীরব কর্মীকে তাদের অন্যান্য কাজে সাহায্য করতে ডাকবে এবং সেধে সেধে কাজ দেবে। গান্ধীজির

দৃষ্টিভঙ্গি একই সময়ে কত আদর্শবাদী অথচ কত বাস্তব তাই একথা থেকে বোঝা যায়। সহজ থেকে শক্ত কাজে হাত দিতে হয়—জানা থেকে অজানায়।

এ ভাবে একই সঙ্গে, প্রচার ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে কর্মীকে এগুতে হবে। ক্রমে আরও কর্মী জুটে যাবে। গ্রাম থেকেই তৈরি হবে কর্মীব দল—তৈরি হবে সংগঠন। শক্ত জোয়ানদের হাত করতে হবে—মায় মেয়েদের পর্যন্ত উৎসাহিত করে তুলতে হবে—কেননা সবার জাগরণ চাই। এইভাবেই শুরু হবে কর্মীর জয়যাত্রা।

॥ ৫ ॥
পঞ্চায়েত ও গ্রামরাজ

কর্মীরা এখন কোন হাতিয়ার মারফৎ সমগ্র গ্রামশক্তিকে দাঁড় করাবে? সংগঠনগত সংবিধান গ্রামের জন্য কি? এখানেই পঞ্চায়েতের কথা এল। গ্রাম পঞ্চায়েত নতুন কবে গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। গ্রামেব সমস্ত কিছু শক্তির আধার হবে এই পঞ্চয়েত। এই পঞ্চায়েতের সামাজিক তাৎপর্য কি? এই প্রতিষ্ঠানকে কি কবে প্রগতিব কাজে লাগানো যায়?

ভাবতীয় সংবিধানেব 20 নং ধারায় রয়েছে "The state shall take steps to organise village panchayets and endow them with such powers and authority as may be necessaty to enable them to function as units of self government।" অর্থাৎ রাষ্ট্র থেকে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠন করে তাদের হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া হবে যাতে গ্রামবাসীরা স্বায়ত্তশাসনেব অধিকাব পান।

সবকার কতটুকু ক্ষমতা গ্রামেব হাতে দেবেন এবং তা দিয়ে সত্যি কতটা কাজ হবে— সে ক্ষমতা কতিপয় সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের অন্যায় স্বার্থরক্ষার কাজে লাগাবে কিনা, গ্রাম্য দলাদলি এতে আরও বাড়বে কিনা, ক্ষমতালোভীদের কারসাজি করার সুবিধা বাড়বে কিনা, সরকাবের উচ্ছিষ্ট ক্ষমতায় আগের দিনের ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ে কোনো ভাল কাজ হবে কিনা ইত্যাদি সন্দেহ সঙ্গে সঙ্গেই আসে—এবং এই নিয়ে দেশে কম বাদ-বিতণ্ডা ও মতান্তর হয় নি।

যদি দেখা যায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা খুব সামান্য, তার আর্থিক সঙ্গতি যৎসামান্য—যেমন, বর্তমান ইউনিয়ন বোর্ডের যা আয় তাতে চৌকিদারদেব মাইনে দেবার পরে আর বিশেষ কিছু থাকে না ; তবে খুব কিছু আশা করা যায় না পঞ্চায়েত থেকে। তাহলে ইউনিয়ন বোর্ডের কাজে যেমন জনতার কোনো আশা উৎসাহ নেই পঞ্চায়েতের বেলায়ও তাই হবে। রাজস্বের কতটা টাকা পঞ্চায়েতের কাছে থাকবে, পঞ্চায়েতেব ট্যাক্স বসাবার ক্ষমতা থাকবে কি না, এ জাতীয় প্রশ্নের মধ্যেও পঞ্চায়েতের আর্থিক সঙ্গতিব প্রতি নজরটাই প্রধান। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কিছুটা অন্য।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত কার হাতে? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণেব হাতে (sovereignity lies with the people)—এই হলো গণতন্ত্রের সংজ্ঞা। রাজনৈতিক দর্শনে এই বিষয়ে বিভিন্ন মত ও পথের লড়াই আছে। কেননা কার্যত দেখা যায় জনগণের নাম করে এমন এমন শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তিকে দখল করে বসে যাদের স্বার্থ জনগণের

বিপরীত। তখন রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণকে দাবিয়ে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তটাই বেশি। তা হলেও যুগের যা ইঙ্গিত এবং ইতিহাসের যা ধারা তাতে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তবপ্রকাশ ক্রমশ নিকটবর্তী হয়ে আসছে। গণতন্ত্রকে যদি শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ আনয়নে ব্যবহার করা যায় তবে ক্রমশ জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক গতি আজ তাই গণমুখী বা গণতন্ত্রমুখী।

তত্ত্বগত তর্ক বা theoretical dispute এই সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে যতই থাকুক—ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশ কোথায়? ভারতে এই ক্ষমতার প্রকাশ কেন্দ্রে পার্লামেন্টের হাতে—প্রদেশে প্রদেশে আইনসভাগুলিতে। ভারতের সংবিধানটিও এই ক্ষমতার একটা চূড়ান্ত আধার, এবং, এই সংবিধানকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা যে Constituent Assembly'র তার নেপথ্য অস্তিত্বটাও স্বীকার করতে হবে। এই সব ক্ষমতার আধার ছাড়া ও নিম্ন থেকে উর্ধ্বতম আদালতগুলির মধ্যেও জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে আত্মরক্ষামূলক ক্ষমতার বিকাশ রয়েছে। পুলিশ, সৈন্য ইত্যাদিগুলিও ঐ ক্ষমতারই বিকাশ। কিন্তু সবটাই বলা হয় শেষপর্যন্ত জনসাধারণের ক্ষমতা। কিন্তু জনসাধারণ জানেও না যে তাদেরই এই সব ক্ষমতা। একমাত্র ভোট দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো করবার মতো কিছু কাজ নেই রাষ্ট্র ব্যাপারে। এই সমস্ত শক্তিগুলি ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে চলেছে--এই সব বিশাল হাতিয়ার ব্যবহার করা জনসাধারণ ভাবতেই পারে না। তাদের দৈনন্দিন জীবনে দেশের ক্ষমতা যত বাড়ছে বলা হয় তত যেন তারা অক্ষম হয়ে পড়ছে। এই জন্যই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কথাটার উপর এত নজর পড়েছে আজকাল।

যখন ভারতীয় সংবিধান রচনা হয় তখন পঞ্চায়েত গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিধান রচনাকারীদের কোনো খেয়াল ছিল না। গান্ধীজিই বিধান রচনাকারীদের একথা স্মরণ করিয়ে দেন। কেননা গান্ধীজি স্বরাজ বলতে গ্রামবাসীদের জন্য গ্রামরাজের কথা বলতেন, অর্থাৎ স্বরাজ জনগণ সত্যি সত্যি ভোগ করবে ও ব্যবহার করবে জনগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে—এই ছিল গান্ধীজির একটা মস্ত দাবি। তাছাড়া ভারতের ইতিহাসে গ্রামরাজ ও পঞ্চায়েতের ব্যবহার ছিল বহুকাল—সেই village democracy'র উপর দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ বহু ঐতিহাসিক ঝড়বাদল সহ্য করে টিকে ছিল-- সেই ঐতিহ্যকে গান্ধীজি ভুলতে দিতে নারাজ। ফলে ভারতীয় সংবিধানে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে ২০ নং ধারাটিকে প্রবিষ্ট করা হয়। এই ধারার ফলে সত্যি সত্যি গ্রামরাজ হবে কিনা তা ঐটুকু লেখার মধ্যে নেই—তা নির্ভর করবে ভারতের ইতিহাসের উপর, ভরতবাসীদের কার্যকলাপের উপর।

সংবিধানে যে নির্দেশ রয়েছে তারই প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন আইনসভায় পঞ্চযেত আইন পাস হয়েছে বা হচ্ছে বা হবে। কতকগুলি ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে আসছে। এই ক্ষমতা কেউ বাড়াতে চায়, কেউ কমাতে চায়- যারা বিকেন্দ্রীকরণবাদী তারা বাড়াতে চায়, যারা কেন্দ্রীকরণেই বিশ্বাসী তারা কমাতে চায়। বিভিন্ন স্বার্থ এই সব দাবিদাওয়ার পিছনে কাজ করছে। ভারী শিল্প বেশি চাই কি কুটির শিল্প বেশি চাই—এই অর্থনৈতিক ঝগড়াও উপরোক্ত রাজনৈতিক ঝগড়ার আড়ালে কাজ করে চলেছে। কেউ আবার মনে করেন যে কেন্দ্রেই প্রগতিশীল শক্তি রয়েছে বেশি, আবার কেউ মনে করেন প্রগতির যেটা সত্যিকার আধার অর্থাৎ জনগণ, তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দূর করে নিলে কেন্দ্রীয়শক্তি বেশি দিন প্রগতিশীল থাকতে পারে না—যেহেতু তা ক্রমশ আমলাতান্ত্রিকতা ও ডিক্টেটারি শাসনে পরিণত হতে থাকে। এসব তর্কের শেষ নেই।

কিন্তু একটা দিক দিয়ে যদি অগ্রসর হই তবে এই তর্কের একটা সীমানা খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা চাই কি? আমরা ধরে নিয়েছি যে আমাদের সমাজতন্ত্রের দিকে এগুতে হবে। সমাজতন্ত্রের পরিণত রূপ হলো শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, শোষণহীন সমাজ। কেউ কেউ একে সর্বোদয় সমাজ বলেন। এপথে যেতে হলে ক্রমশ সমাজ যত শ্রেণীহীন হতে থাকবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন তত কমে আসতে থাকবে। ফলে দেখা যায় রাষ্ট্রের শক্তির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন বা তাকে চিরন্তনী শক্তি হিসাবে ধরে নিয়ে তার শক্তি কেবল বাড়িয়ে নিলেই চলবে না—তার শক্তিটা ক্রমশ নিষ্প্রয়োজনীয় করে তুলতে হবে। সে পথে যেতে হলে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণের একটা শক্তিকেও এখন থেকেই দাঁড় করাতে হবে—সে হলো বিকেন্দ্রীকরণ শক্তি ; অর্থাৎ, গ্রামে গ্রামে জনগণের হাতে স্বায়ত্তশাসনের শক্তি, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নেবার ক্ষমতাটাকে সৃষ্টি করে দেবার শক্তি। কেন্দ্রীয়শক্তিটা খর্ব করে দেবার সময় এখনও আসে নেই—সংযত করার প্রয়োজন হয়ত এসেছে। কেননা ধনতান্ত্রিক রাজনীতিকে রাষ্ট্রীয়করণের পথে সমাজতন্ত্রে আনতে গিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি বাড়াতে হবেই। তাছাড়া, দেশের সর্বাঙ্গীন পুনর্গঠন ও শিল্পায়ন (industrialisation) এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে হলে রাষ্ট্রেব কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বাড়তে দিতেই হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যেন কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ উভয় জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। এই বিসদৃশ ও উল্টোউল্টি সমস্যার তাৎপর্য কি?

যদিও কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকবণ কথা দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ তথাপি এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। বর্তমানে এই দুইটি শক্তিরই প্রয়োজন আছে। সমাজতন্ত্র গঠনের পক্ষে এই বিপরীত শক্তি দুটিকে একই সঙ্গে ব্যবহার করার দরকার আছে। অথচ বিপরীতের মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য রাখতে হবে। কে রাখবে এই সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য? জনসাধারণ। কেননা কেন্দ্রে ও পল্লীতে জনসাধাবণকেই নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করতে হবে। সার্বভৌম ক্ষমতা একই, এবং তা জনসাধারণেরই। কিন্তু আজকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সে শক্তিকে উপর থেকে এবং নীচের থেকে অর্থাৎ উভয় দিক থেকেই ব্যবহার করতে হবে। কেন্দ্রেও যার শক্তি পল্লীতেও তারই শক্তি অর্থাৎ জনসাধারণের শক্তি। ভারতের সমগ্র জনতার মিলিত শক্তির কেন্দ্র হবে কেন্দ্রীয় শক্তি, আর তাব প্রত্যহের ব্যবহারিক বিন্দুশক্তি বা আশুশক্তি হবে পল্লী পঞ্চায়েতগুলি। কতকগুলি সর্বভারতীয় কাজ আছে যা কেন্দ্র থেকেই হতে পারে—যেমন, দেশরক্ষা, যানবাহন, সংযোগ, ভারী শিল্প ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে অবহেলা করার উপায় নেই। কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন অত্যন্ত। আবার কতকগুলি কাজ আছে যা নেহাৎ নিত্যকার, যার মাধ্যমে সমাজজীবন নতুন করে ঢেলে গড়তে হবে, যা চাযবাস, কুটিরশিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনিবার্য, তা হবে তার বিকেন্দ্রিত পল্লী-পঞ্চায়েতগুলি। লোকশক্তির দ্বিমুখী প্রকাশ—এক নীচে থেকে, আরেক উপর থেকে। কাজেই দ্বিমুখী ধারা দেখে, এই আপাত বিপরীত মূর্তি দেখে বিভ্রান্ত হবার কোনো কারণ নেই। একদিন অবশ্য রাষ্ট্র থাকবে না ; কিন্তু সমাজ থাকবে চিরকাল—স্বয়ংচালিত সমাজ, রাষ্ট্রহীন সমাজ। সেই সমাজের রূপ আজ থেকেই গ্রামে গ্রামে একটু একটু করে গড়বার প্রয়োজন আছে। পল্লী-পঞ্চায়েত হবে তার হাতিয়ার। নইলে সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে আজকের পরিস্থিতি বিচার করলে বলা উচিত যে, আজ যেমন কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীকরণই চাই না, তেমনই কেবলই কেন্দ্রীকরণও চাই না। চাই কেন্দ্রীভূত বিকেন্দ্রীকরণ, শব্দটা শুনতে যতই কেননা অদ্ভুত লাগুক। শুধুমাত্র কেন্দ্রীকরণ যেমন আমলাতান্ত্রিকতা, যান্ত্রিকতা ও প্রাণহীন একটা দানবের আকার নিতে পারে—তেমনই

বিকেন্দ্রীকরণের আওয়াজ দুর্বল ভাবতবর্ষকে আবার ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে, তার স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে, জনগণের ভারতব্যাপী ঐক্য নষ্ট হতে পারে, তার সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রেই হোক্ বা পল্লীতেই হোক্ লোকশক্তি যদি অধিষ্ঠিত থাকে তবে ভযের কারণ নেই। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে যদি জনগণের প্রতিনিধিবাই থাকেন এবং ঠিক ঠিক কাজ কবেন তবে জনগণের পল্লী গঠনের কাজ তার সাহাযাই পাবে, ক্ষতি তাতে হবার কথা নয়।

কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে আজও জনগণ সত্যি সত্যি সর্বশক্তিমান হয় নেই। তাদের নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নেই—তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতি নিয়ত সংগ্রাম রয়েছে। সেক্ষেত্রে কেবল সংবিধানগত ধারাগুলির তাৎপর্য বিচার করে কাব কি ক্ষমতা তা নির্দিষ্ট হবে না ; হবে সমাজ বিবর্তনের পথে, নানা জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে সে সংগ্রাম বেশ চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ নেবার দরকার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখবাব জিনিস নয়, পাবার জিনিসও নয়। রাজনৈতিক দলগুলির মারফৎ এ সব সংগ্রাম চালু বয়েছে, তারা সর্বভাবতীয় ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট, আইন সভায় সে সব সংগ্রামে লিপ্ত। নিত্য নতুন আইনকানুনের মধ্য দিযে তার জয়-পবাজয়েব নানান ছবি দেখতে পাওযা যায়। এ সব সর্বভারতীয় সংগ্রামে জনগণ তাদেব দলবল নিশ্চয়ই প্রযোগ করবে, এবং সে বিযযে তাদেব অবহেলা করা উচিত নয। কিন্তু এখানে, অর্থাৎ দলবল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ও জনসাধাবণেব সাক্ষাৎ হাত ক্রমশই যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। জনগণ যেন প্রত্যক্ষভাবে তাদের কর্মশক্তি তাদের ভাগ্যগঠনের ক্ষেত্রে লাগাতে পারছে না—তারা যেন কোনো কাজের ক্ষেত্রই পাচ্ছে না। কিন্তু যদি পল্লী পঞ্চায়েতের কাজগুলিকে সত্যি সত্যি নতুন সভ্যতা গডবার কাজে লাগানো হয়, যদি পল্লীজীবনের আমূল সংস্কারের কাজ শুরু হয়, তবে জনগণ তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগাবার একটা দৈনন্দিন ও প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র পাবে। বস্তুত এই গ্রামদেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনেব কাজে জনগণ যতটা অংশ নিতে পারে তাব শতাংশের একাংশও নিতে পারবে না কেন্দ্রীয় শক্তিক্ষেত্রে, অর্থাৎ পার্লামেণ্ট ও আইনসভা ইত্যাদিতে।

আইন থেকে পঞ্চায়েত যে ক্ষমতাটুকু পাবে গ্রামবাসীদের ততটুকু ক্ষমতা নিয়েই থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। জনসাধারণ তার সার্বভৌম ক্ষমতারই একটা বিকাশ যদি পঞ্চায়েত মারফৎই প্রকাশ করতে চায় তবে তারও একটা বাস্তব উপায় আছে। সংবিধান ও আইনসভা থেকে যে সামান্য অধিকারটুকু পাবে সেটা হলো গৌণশক্তি। জনগণের আসল শক্তি হলো তার একতা থেকে। আজ কোন গ্রামে যদি তারা একমত হয়ে ঠিক করে গ্রামের সমস্ত জমি এক করে ফেলবে বা সমবায় প্রথায় চাষ করবে, যদি বলে তারা জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ তুলে দেবে, অথবা, যদি বলে অনেকগুলি বাড়ির বদলে তারা একটা মস্ত পাকা দালান করবে, তবে রাষ্ট্র থেকে বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে না। যা আইনে বারণ করা নেই স্পষ্টভাবে তা করতে পারে গ্রামবাসীরা আইনতই, —আর যা আইন থেকে করবার আদেশ রয়েছে তা তো পারেই। গ্রাম-পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এভাবে অসম্ভব বাড়িয়ে তোলা যায়। সবটা নির্ভর করছে গ্রামের লোকদের মতৈক্যের উপর।

যে গ্রামে দলাদলি নেই, যে গ্রামে সর্বসম্মত পঞ্চায়েত আছে—গ্রাম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা প্রায় অসীম। কোন আদর্শ গ্রামে যেখানে পঞ্চায়েত সর্বসম্মত ভাবে নির্বাচিত হবে সে গ্রামের যাবতীয় সমস্যা গ্রাম-পঞ্চায়েতেই মীমাংসা হয়ে যাবে, কোনো মামলা

আদালতে যাবে না—ফলে আদালতের প্রবেশ নিষেধ হবে। কোনো মারামারি, চুরি-ডাকাতি হবে না, ফলে পুলিশের প্রবেশ নিষেধ হয়ে যাবে। ভূমি-ব্যবস্থা যদি তারা নিজেরাই করে নিতে পারে তবে আইনওয়ালাদেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু যদি গ্রামে দলাদলি থাকে তবে পঞ্চায়েতের পক্ষে সর্বশক্তিমান হওয়া তো দূরের কথা, রাষ্ট্র থেকে পাওয়া যে ক্ষমতার উচ্ছিষ্টটুকু, তারও সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। সেই পঞ্চায়েতের আদেশ পদে পদে অমান্য করার চেষ্টা হবে, এবং গ্রাম ছাড়িয়ে পুলিশ, আদালত ও ম্যাজিস্ট্রেটের শরণাপন্ন হবে, গ্রামকে তুচ্ছ করবে। কাজেই দলাদলি হবে গ্রামের প্রধান শত্রু, তার স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজের শত্রু। পঞ্চায়েতকে আমরা একতার দ্বারা সর্বশক্তিমান করতে পারি, আবাব দলাদলির দ্বারা ধূলিসাৎ করে দিতে পারি। পঞ্চায়েতকে কোনো আইনের দেওয়া শক্তিতে শক্তিমান না করে জনগণের যে সার্বভৌম ক্ষমতা তারই সাহায্যে আরও শক্তিমান করে নিতে পারি। এবং তা ঐকমত্য থেকেই সম্ভব। সে হলো লোকশক্তি বা people's sanction। এই লোকশক্তি না হলে আদর্শ গ্রামগঠন করা সম্ভব নয়, গ্রামদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়, সমাজতন্ত্র গঠনও সম্ভব নয়। অথচ নতুন সভ্যতা গড়ে তুলবার পক্ষে ও গ্রাম-স্বরাজ গঠন করার জন্য কত বড় experiment আমবা কবতে পারি এক একটা গ্রাম ধবে। Sovereignty of the people বা জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার আস্বাদ আমবা গ্রামদেশে অতি সত্বর উপভোগ করতে পারি এবং কাজে লাগাতে পারি।

এই আদর্শ পঞ্চায়েত মানে পাঁচজনের মোড়লী নয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সমস্ত কাজ সঁপে দিয়ে যদি গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমায় তবে তা মোটেই কার্যকবী হবে না। সমস্ত গ্রামবাসীদেরই সক্রিয় হতে হবে এবং সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইকে যদি পঞ্চায়েত জাগিয়ে রাখতে না পারে, সবাইকে যদি গ্রামোন্নয়নেব কাজে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে না পারে, তবে সে আদর্শ পঞ্চাযেত হলো না। সেটা মামুলী গণতন্ত্র হলো মাত্র, সত্যিকারের জনগণতন্ত্র হলো না। সমস্ত গ্রামবাসীদের সচল করে তোলা চাই—সচেতন করে তোলা চাই, জাগ্রত করে রাখা চাই,—তবেই হলো democracy in action। কাজেই প্রত্যেক গ্রামে একটি করে পঞ্চাযেত থাকলেই হলো না, সমস্ত গ্রামবাসীদের নিয়ে একটা গ্রামসভাও চাই। এই গ্রামসভায় নির্দিষ্ট সময়ে মাঝে মাঝে অধিবেশন করতে হবে এবং পঞ্চায়েতকে তার কাছে কাজের রিপোর্ট পেশ করতে হবে, পাস করাতে হবে—সমস্ত গ্রামসভার কাছে উপস্থিত কাজগুলিকে তুলে ধরতে হবে, সমস্ত গ্রামসভাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

কিন্তু গ্রামে দলাদলির অভাবের জন্য যে এতটা জোর দেওয়া হলো সেটা কার্যত হবে কি করে? এটা একটি গুরুতর প্রশ্ন। গ্রামে এমনিতেই দলাদলি আছে, তার উপব বাজনৈতিক দলাদলিও রয়েছে এবং ভোটের সময ভারা প্রচুর দলাদলিকে জীইয়ে তোলে। অতএব দলাদলিহীন পঞ্চায়েতের কথা বলা কি একটা স্বপ্ন দেখা নয়? আর, দল ছাড়া গণতন্ত্র চালু করার কোনো ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও কোনো দেশে নেই। যদিও দল বা পার্টির উল্লেখ কোনো দেশের সংবিধানে থাকে না, তথাপি পার্টি ছাড়া কোন গণতন্ত্র বা সংবিধান চালু হতেও আধুনিক যুগে কোথাও দেখা যায় নি। পার্টি জাতীয় জীবনে যদিও নেপথ্যে বর্তমান থাকে, তবু তার অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও সক্রিয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠনেব ব্যাপাবে আমরা দলাদলি আনতে নিষেধ করছি এই জন্য যে, গ্রামের যাবতীয় শক্তি ও উন্নতি সর্বথা একতার উপরেই নির্ভর করছে এই সত্যকে খেয়াল রেখে। কাজেই দলও থাকছে অথচ গ্রামে দলাদলি

বন্ধ রাখতে হবে—এই পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গতি ও সমাধান কি করে করা যায়? এই দলাদলি সম্পর্কে তাই বিশদ আলোচনা দরকার। এর জন্য একটা আলাদা অধ্যায় তৈরি করা যাক।

গণতন্ত্র হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত সংখ্যালঘুরা মেনে নেয় যেখানে সেখানেই গণতন্ত্র চালু হতে পারে। গ্রামে সকলের মত নিয়ে কাজ করতে হবে এই নির্দেশের মানে এই নয় যে, সকলের মত না পেলে কোনো কাজে হাত দেওয়া চলবে না। তাহলে জন কয়েক, এমন কি একজনের আপত্তিতেই গ্রামে অচল অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। ব্যক্তির ভেটো (veto) ক্ষমতা থাকলে কোনো কাজই সম্ভব নয়। অতএব বর্তমানে সর্বোদয়বাদীদের মতে সর্বত্র কাজ করা সম্ভব নয়, কেননা তাঁরা এখনই এমন অবস্থা চান যে, সকল ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য চাই। সে হয়ত গ্রামদানী গ্রামগুলিতে সম্ভব, এবং সেই জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করার দিকে সকল কর্মীরই সক্রিয় চেষ্টা থাকা চাই, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বেশির ভাগ গ্রামে এই জাতীয় আদর্শ অবস্থা নেই। কাজেই গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিয়মটা বর্তমানে চালু থাকতে বাধ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যাতে ক্রমশ ঐকমত্যের উদ্ভব হতে থাকে। এমন অনেক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, যে প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত জনকয়েক কায়েমী স্বার্থবাদীর আপত্তিতে গ্রামে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না, তা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার মারফৎ চালু করা সম্ভব হয়, এই জন্যও জনগণের সর্বভারতীয় সংহতির প্রতি নজর রাখা দরকার। প্রগতিশীল আইন আইনসভা থেকে বেশি চালু করা সম্ভব না গ্রামদেশেই নিজেদের মতৈক্য দিয়ে বেশি চালু করা সম্ভব—তা নির্ভর করে দেশের ও সমাজের রাজনৈতিক অবস্থার উপর। এমন হয়ত দেখা যাবে আইনসভায় কখনো কখনো প্রগতিশীলদের প্রভাব বেশি রয়েছে, আর গ্রামদেশে রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব। আবার কখনো কখনো দেখা যাবে তার উল্টো, অর্থাৎ গ্রামদেশ বেশি প্রগতিশীল আইনসভাগুলি থেকে। কাজেই কোনো একটা ধরাবাঁধা নিয়ম বলে দেওয়া সম্ভব নয়। কোনটা দিয়ে কখন বেশি কাজ হবে তা নির্ভর করে দেশের পরিস্থিতির উপরে।

সমাজে ভিন্নমত চিরকালই থাকা স্বাভাবিক। সব সময় সকলের মত এক হবে এ আশা করা অন্যায় এবং তা ঠিকও নয়। কেননা তাহলে সমাজের প্রগতিই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মতান্তর যাতে মনান্তরে পরিণত না হয়, যাতে পরমতসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, যাতে ধীর স্থির ভাবে সকল বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, এবং যাতে মতের পার্থক্য দাঁড়ালেও বেশির ভাগ লোকের মত লোকে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয় তা-ই দেখতে হবে। এরই নাম গণতন্ত্র। গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠতাতন্ত্র নয়, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্য নিতে হয়। সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ক্ষেত্র বেড়ে যাবে যদি সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও সমান অধিকারের কেন্দ্র বেড়ে যায়। সমাজে হিংসা, শোষণ, লোভ, ক্ষমতাপ্রিয়তা, অনাচার ও অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে বলেই মতভেদগুলি এত বেশি মারাত্মক, উত্তেজনাপূর্ণ ও জিঘাংসাপ্রবণ হয়, মতের মিল করা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু সমাজে সাম্য ও শান্তির ক্ষেত্র যত বাড়তে থাকবে তত মতভেদগুলি সহজে মীমাংসার পথ পাবে। অতএব কেবল গণতন্ত্রের আইনকানুনগুলির উপর নজর রাখলে চলবে না। গণতন্ত্রের যা প্রাণবস্তু তার প্রসারের উপর বেশি নজর রাখতে হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র না সৃষ্টি করলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র সফলতা প্রাপ্ত হয় না।

॥ ৬ ॥
দলাদলি

বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শ ও মতামত কি, তাদের বাস্তব শক্তি ও প্রয়োজন কোথা থেকে আসে, তারা কি কাজ করে, তাদের কার কি ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে কোনো বিস্তৃত আলোচনা আমরা এখানে করব না ; কেননা এটা কোনো রাজনৈতিক পুস্তিকা নয়। তবে রাজনীতির কতকগুলি সাধারণ সীমানা আমাদের লক্ষ্যে রাখতেই হবে। রাজনীতির ক্ষেত্র কতদূর, কতদূর পর্যন্ত তা হিতকর এবং কতটার পর তা অহিতকর তাও দু' এক কথায় বলতে হবে ; কেননা এ সব গুরুতর বিষয় অবজ্ঞা করে সত্যিকার কোনো আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সমাজ ও সভ্যতার গতি আমরা ধরে নিয়েছি যে আজ তা ক্রমশ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের শেষ স্তরে রাষ্ট্রের প্রয়োজন না থাকার কথা—শিক্ষিত লোকমতই মানুষের চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে, জোরজুলুম বা coercion এর প্রয়োজন ধীরে ধীরে কমে আসবে। পৃথিবীতে যদি দেশে দেশে লড়াই করার প্রয়োজন মিটে যায়, এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে দখল করার নীতি যদি অকেজো হয়ে যায়, যদি যুদ্ধের অবসান হয় তবে সৈন্য সামন্তের প্রযোজনও মিটে যাবে। আবার যদি শ্রেণী ও অন্যান্য শোষণ প্রথা উঠে যায় দেশের ভিতর থেকে, বেঁচে থাকবার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস যদি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় এবং মানুষ সমান অধিকার ও সুযোগ পেয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বেঁচে থাকবার সুবিধা পায় তবে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ও আদালতের প্রযোজন ক্রমশ চলে যেতে থাকবে। অর্থাৎ যদি আমরা ঠিকমত এই আদর্শের পথে অগ্রসর হতে পারি তবে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আদালত, জেল এগুলি ক্রমশ ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত আদর্শ সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীতে জোরজুলুমের সমস্ত হাতিয়ারের ঠাঁই একমাত্র মিউজিয়ামেই হবে। এটা হলো রাষ্ট্রহীন অবস্থা, কেননা রাষ্ট্রের প্রচলিত রূপ হলো এই সব জোর প্রকাশের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র শ্রেণী-শাসনেরই একটা বিকাশ। যে পরিমাণে সমাজ শ্রেণীহীন হবে, সেই পরিমাণে দেশ ও সমাজ শ্রেণীহীন হবে। পার্টিগুলিও শ্রেণীবিভক্ত ও শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত সমাজের হাতিয়ার বিশেষ। কাজেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পার্টিগুলিরও অবসান হতে থাকবে। তখন রাজনীতিই থাকবে না। সমাজের সাধারণ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য যে লোকমত ও লোকসংগঠনের প্রয়োজন থাকবে তা হবে লোকশক্তির মধ্য দিয়ে। রাজনীতি লোকনীতিতে পরিণত হবে।

এই চিত্রটা "হতে পারে"—এমন ধরনের একটি স্বপ্নমাত্র নয়। এই চিত্রটা বাস্তবে কায়েম করার জন্যই পৃথিবীতে এত আদর্শের লড়াই, এত প্রচেষ্টা। যুগে যুগে দেশে দেশে এই আদর্শকে সার্থক করার জন্যই, চোখের সামনে এই ছবিটা রেখেই যুগে যুগে শহীদরা প্রাণ দিয়ে গেছেন এবং এই আদর্শের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যদিও আজ পৃথিবীতে যুদ্ধসমারোহের ঘনঘটা সমস্ত দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করে তুলেছে, যদিও আজ পৃথিবী তৃতীয় এক মহাযুদ্ধের শঙ্কায় সশঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তথাপি এ বিশ্বাসও ক্রমশ বলবান হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সকল কোণ থেকে যে শান্তি, চিরশান্তি আসবেই এবং তা আনতেই হবে। যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রই যুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলছে। যুদ্ধ আজ কোনো জাতি চায় না। তবু যুদ্ধের প্রস্তুতি যে তাদের করতে হচ্ছে—সে কেবল ভয় থেকে, অপর দেশের যুদ্ধপ্রস্তুতির আয়োজন দেখে ভয় পেয়ে। এই পাপচক্র বা vicious circle একদিন ভেঙে যাবেই—পৃথিবী শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। বিভিন্ন জনশক্তি ও লোকমত আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মাথা তুলে

দাঁড়াচ্ছে। যুদ্ধ পৃথিবীতে সত্যি সত্যি বন্ধ হবে—নইলে মানুষেব অস্তিত্ব রক্ষা কবাই অসম্ভব। মানুষ সমগ্রভাবে আত্মহত্যা করবে, এমন ধরনের মূর্খ মানুষ, এ কথা মানা যায় না। আর যদি সত্যি সত্যিই যুদ্ধ হয এবং আমরা আত্মহত্যার পথই ধরি তবে এই রাষ্ট্রচিন্তা, রাষ্ট্রচেষ্টা, রাজনীতি, দল, উপদল এবং তাদের চেষ্টা, দেশের ভাল করা বা এ সব নিয়ে তর্ক করা—এর কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। যে ঘর পুড়বেই তার আর মেরামত কেন? (এ ক্ষেত্রেও একটা কথা মনে বাখলে ভাল যে সর্বধ্বংসী কোনো মহাযুদ্ধের হাত থেকে কিছু কিছু মানুষ যদি বেঁচেও যায়—সে মানুষ নিশ্চয়ই শহরের মানুষ নয়, দূরবর্তী গ্রামের হয়ত কিছু মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিও বেঁচে থাকতে পারবে না, যদি তাদের অন্নবস্ত্র সম্বন্ধীয মোটা প্রয়োজনগুলি গ্রামেই সংগ্রহ কবে নেবার ক্ষমতা হারিযে ফেলে। অতএব সে বকম একটা সাংঘাতিক পরিস্থিতিতেও মানুষের বেঁচে থাকবার ক্ষমতা নির্ভর করবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার উপর। বৃহত্তর পরিস্থিতির সে রকম দুর্যোগময সঙ্কটকালে আত্মরক্ষার পক্ষে সে হবে এক বকম দুর্গ)। যদি আমরা ধবে নেই যে, মানুষ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করবে না এবং মানুষ চিবকাল বাঁচবার পথই গ্রহণ করবে তবে আজকের বাঁচা শুধু যেমন তেমন করে বাঁচা সম্ভব নয়। যদি আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই—তবেই বাঁচতে পাবব। যদি সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, শোষণপ্রিয়তা, জাত্যাভিমান ইত্যাদি দুর্গুণগুলিকে আঁকড়ে থাকি, তবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ও মানুষের সমষ্টিগত মৃত্যুও অনিবার্য। এ এক অদ্ভুত বাধ্যবাধকতা বা compulsion আজ আমাদেব মৃত্যুদণ্ড সমুদ্যত খড়গের মতো উপস্থিত। এখানে বাছাই কবাব মতো তৃতীয কিছু নেই। মানুষ তাই জীবনকে বেছে নেবে অর্থাৎ মনুষ্যত্বকেই বেছে নেবে এবং ফেলে দেবে অতীতেব নোংবামি যাব অনিবার্য পবিণাম আজ এত ভয়াবহ। এই সমুদ্যত মৃত্যুদণ্ড উপস্থিত না হলে হয়ত সত্যি আমবা শেষ বাবেব মত নোংরামি ত্যাগ কবতে বাজি হতাম না। এদিক থেকে দেখতে গেলে আজ যে আণবিক মহাযুদ্ধ মহামবণের রূপে মানুষকে শাসন করবাব জন্য উদ্যত হয়েছে এব একটা সামাজিক প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, এত বড় একটা চাপ বা compulsion না থাকলে আমবা আমাদেব কুসংস্কাব ও নোংরামি ত্যাগ করতে রাজি হতুম না।

আর যদি আমরা আজ হাজার হাজাব বছর পরে যুদ্ধের পথ, অন্যাযেব পথ, নোংরামির পথ—অর্থাৎ, মৃত্যুব পথ ত্যাগ কবি, তবে আমবা হারাই কি? নিজেদের পায়ের শৃঙ্খল ছাড়া সত্যিই কিছু আজ হাবাব না—তার জন্য সত্যিকার কোনো শোক করা চলে না। বরং এমন বাঁচতে পাবব, এমন প্রাচুর্যের মধ্যে বাঁচতে পারব, এমন শান্তির মধ্যে বাঁচতে পাবব যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা কল্পনাও কবতে পাবেন নি। বিজ্ঞান ও তাব ব্যবহারজ্ঞান আজ আমাদের এত করায়ত্ত হয়েছে যে তার সাহায্যে এক শতাব্দীর কাজ দশটা বছরে অনায়াসে সম্পন্ন করা সম্ভব। যুদ্ধোদ্যমের জন্য যে অর্থ, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি আজ প্রযুক্ত হচ্ছে সেই শক্তি ও সামর্থ্য যদি তা পৃথিবীব গঠনমূলক উন্নতিব কাজে নিযুক্ত করা যায় তবে অচিরে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যকে চিরকালের জন্য নির্বাসন করা সম্ভব এবং দারিদ্র্য শব্দ অভিধান থেকে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। অনুন্নত বলে কেউ থাকবে না। আজ পৃথিবীতে শুধু বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়, এমন ভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব যা অতীতে কোনো যুগে কোনো-রাজার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এমন দিনে কি আমরা সত্যি মরতে পারি? জীবন-সংগ্রাম-সমুদ্রে বহুকাল লড়াই করে আজ তীরে এসে তবী ডোবাব কেন? এবং সত্যিই এ তরী ডুববে না। বরং জীবনতরীর অভিযান আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে সুদূর গগনচারী হতে চলেছে—মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রে মানুষের জয়যাত্রা শুরু হতে বেশি বাকি নেই।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো একখানা গ্রামে যখন আমরা গ্রামোন্নয়নের কাজে লাগব তখন সেখানেও যেন মনে না করি যে, কোনো মতে তাদের দু'টি ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারলেই হলো। এত কৃপণ দৃষ্টিতে চলবে না। এটা সামান্য পারিবারিক ব্যাপার বা মুদিখানার হিসাব নিকাশ নয়। মানুষের এই দুর্দান্ত অথচ শান্তিময় ভবিষ্যতের, নিকট ভবিষ্যতের বাণী সেখানেও পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের ভাগ্য আজ এত প্রশস্ত, এত বড় খবরটা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে ; এ স্বপ্ন তাদের প্রত্যেকের জীবনে কায়েম করবার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে তুলতে হবে। এই চিত্র থেকে, এই সৌভাগ্য থেকে, কেউ বাদ যাবে না। কাউকে বাদ দিলে আর-এ স্বপ্ন সার্থক হতে পারে না। যে সবার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতি নজর দিতে হবে সকলের আগে। এ যে সর্বোদয়ের যুগ। হয় সবাইকে উঠতে হবে, নইলে কেউ উঠতে পারবে না, আমেরিকানরাও না, রাশিয়ানরাও না, কলকাতাবাসীরাও না, গ্রামবাসীরাও না।

মহত্ত্বের ডাক, বৃহত্তরের ডাক, মনুষ্যত্বের ডাক আজ এমনি ব্যাপক ও এমনি অপরিহার্য (unavoidable)। এই বাস্তব আদর্শটি গ্রামের কর্মীদের সকলের সামনে জীবন্তরূপে ধরে রাখতে হবে—তবেই তো তাদের প্রাণে জাগরণের জোয়ার আসবে, তাদের প্রস্তরীভূত কঠিন হৃদয় নতুন প্রেরণায় গলে গিয়ে নতুন প্রাণের ধারা সৃষ্টি করবে। মানুষ আবার গান গেয়ে উঠবে।

আমরা সাধারণত ধরে নেই যে, গ্রামের (ও দেশের) উন্নতি করতে হলে চাই মূলধন, যন্ত্রপাতি, কারিগরি বিদ্যা, ভাল বীজ, সার ইত্যাদি। এই সমস্ত material ছাড়া বুঝি আর বিশেষ কিছুর দরকার নেই। এই সব ভৌতিক উপকরণ চাই বই কি, কিন্তু সবার উপরে চাই নৈতিক উপকরণ। যন্ত্রপাতির চেয়েও এই আদর্শবোধ বেশি মূল্যবান উপকরণ। কেননা এই আদর্শবোধ জাগরিত হলে যান্ত্রিক ও ভৌতিক উপকরণ ও মূলধনের অভাব দূর করা কঠিন নয়। চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, চাই শুভবুদ্ধি, চাই নতুন জীবনের ছবি ও প্রোগ্রাম, চাই মুক্ত জীবনের আবেগ। এই spirit বা প্রেরণা নিয়ে গ্রাম কর্মীকে হয়ত একদিন শুধু হাতেই কাজ শুরু করতে হবে। যদি এই প্রেরণা সবাইকে সে ধরিয়ে দিতে পারে তবে বাকিটা সংগ্রহ করা সহজ। অতএব এ কথা খুব ভাল করে মনে রাখা দরকার যে এই আদর্শ ও প্রেরণার মূলধন যেন কখনো কম না হয়। এই spirit বা প্রেরণা নিয়ে যদি আমরা কাজ শুরু করি তবে গ্রামে একতা সৃষ্টি করা সহজ হবে, দলাদলির আবর্জনা দূর করে ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে—দলবাজদের মারপ্যাঁচ ব্যর্থ করা সম্ভব হবে। এই আদর্শবোধ রাজনৈতিক দলবাজদের দলাদলি করা থেকে সংযত করবে, জাগ্রত জনমতের সামনে কারো দলগত ক্ষমতাপ্রিয়তা প্রকাশ পেতে লজ্জা পাবে।

রাজনৈতিক দলের দরকার নেই এমন কথা আজও বলা চলে না, বাস্তবতার দিক থেকে নয়, আদর্শের দিক থেকেও নয় ; কেননা যদি কোনো দলাদলি না থাকে, এবং কোনো দলই না থাকে, তবে আজকের ভারতবাসীরা আবার তেমনি বিপন্ন, তেমনি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে যখন তারা একদিন পরাধীন হয়ে পড়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরাধীনতার মধ্যে ডুবে ছিল। জনসাধারণকে একতাবদ্ধ রাখবে কে? জনসাধারণকে সতর্ক সজাগ রাখবে কে? আর কেই বা জনসাধারণকে আদর্শ দেখাবে, পথ দেখাবে এবং আত্মরক্ষা করতে শেখাবে? জন-চেতনার একটা প্রকাশই তাদের দলগুলি। অতএব দলগুলি মুছে যাক এ কথা আজও বলা যায় না। তত্ত্বগত বা theoretical তর্ক থেকে আমরা অবশ্য জানি একদিন শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন অবস্থায় রাজনীতিই থাকবে না। সে হিসাবে রাজনৈতিক দলও থাকবে না। কিন্তু মানুষেরা তো সংগঠনহীন হবে না। শ্রেণীহীন সমাজের, অহিংস সমাজের সেই সংগঠনগুলি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম কোনো না কোনো প্রকারের থাকবেই। এবং সেই অহিংস সর্বজনমান্য সমাজ সংগঠন

হবাব পব, জনসাধারণ যখন সত্যিই স্বয়ংচালিত হতে সক্ষম হবে, তখন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকবে না—তাব প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল তুলে দিলে সত্যিকাব নৈবাজ্যবাদ আসবে না—আসবে অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নতা ও অতি ক্ষতিকর অন্যরকম এক দলাদলি। দল উড়িয়ে দেওযা যায় না—দল নিষ্প্রয়োজন হলে ক্রমশ মরে যাবে, উবে যাবে। তাব মানে এই নয় যে, আপনা থেকেই উবে যাবে। আপনা থেকেই যেমন সমাজতন্ত্র আসবে না, আপনা থেকেই যেমন অহিংসা কায়েম হবে না, তেমনি আপনা থেকেই একদিন রাষ্ট্র ও পার্টি উবে যাবে না। তার জন্য সুচিন্তিত পন্থা অনুসরণ করা চাই, তার জন্য চেষ্টার ক্ষেত্র আজ একেবাবেই নেই—একথা বলা যায না। আজই কিছু কিছু এমন step বা কর্মধারা দেওয়া দরকার যাতে এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা ক্রমশ নিকটবর্তী হতে থাকে। তার জন্য চাই সচেতন প্রচেষ্টা, সচেতন পদক্ষেপ।

যে হাতিয়ারের সাহায্যে নিজের আত্মবক্ষা করা যায সেই হাতিযাব দিযেই আবার আত্মহত্যা করাও সম্ভব। রাজনীতি ও দলেব সাহায্যে আমরা এতদূর এগিয়েছি এবং আরও অগ্রসর হতে হবে ভবিষ্যতে এই হাতিয়ারেব সাহায্যেই ; কিন্তু রাজনীতি ও দলেব অপব্যবহার ও অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নিজেদের ক্ষতি, এমন কি সর্বনাশও করতে পাবি। ইতিহাসেও অনেক দেখা যায় যে, কোনো একটি দল কোনো একটি মহান্ কাজের জন্য তৈবি হয়েছিল, সে কাজ সম্পন্নও হয়েছিল, কিন্তু কালে কালে সেই দলটাই একটা কায়েমী স্বার্থ হযে দাঁড়াল—তাকে হটানোই তখন এক মহা হযরানির ব্যাপার। আজকের এই যুগে যে পার্টিগুলিকে আমরা আদর্শে ঝলমল্ দেখি, দেখা যাবে কালের অপরিহার্য গতিতে তাতে ছাতা পড়ে গেছে এবং বিবাট রাক্ষুসে একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মতো সমাজেব বুকে চেপে বসে আছে—কাযেমী স্বার্থকে দূর করবার অভিযানে শেষ পর্যন্ত নিজেই একটা কায়েমী স্বার্থ হয়ে দাঁড়িযেছে, নিজেদের মধ্যেই অহর্নিশি ক্ষমতার ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে। যে জিনিসেব যে প্রয়োজনে একদিন সৃষ্টি হয় সেই প্রয়োজন মিটে গেলেও তক্ষুনি তার মৃত্যু ঘটে না। যদি gracefully সরতে পায় তো তবে কত সুন্দরভাবেই সমাজের প্রগতি চালু থাকতে পারত। তাকে শেষ পর্যন্ত জোব-জবরদস্তির সাথে লোপ করতে হয়। কিন্তু এই জোর করে মুছে দেওয়া শান্তিপূর্ণ ও অহিংস সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে উচিত পন্থা হবে না—তাতে বরং উল্টো ফল ফলবে, হিংসার ক্ষেত্র বর্ধিত হতে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বলে রাখা দবকার। গ্রামদেশে পঞ্চায়েত চালনা করবাব সময় পঞ্চায়েতের ক্ষমতাটাকে জোর-জবরদস্তির সাথে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তাতে একতাও নষ্ট হবে, ঝগড়া বেড়ে যাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে গ্রামের রূপান্তর ঘটানো অসম্ভব হবে। কাউকে একঘবে করে রাখা, ধোপানাপিত বন্ধ করা, মারধোর করা, জবিমানা করা—এসব নীতির উপর কাজ চালাবাব উৎসাহ বেশি ভাল নয়। এ সবের পরিণাম ভাল হয না। জবরদস্তি বা শক্তির প্রয়োগ না করে, coercion না করে conversion ও persuasion-এর উপরই বেশি নির্ভর কবতে হবে। গ্রামের পঞ্চায়েত কোনো পুলিশপ্রথা চালু করবে না বা পারতপক্ষে পুলিশ ডাকবে না। শান্তিসেনার মত একটা সংগঠন থাকলেই হবে গ্রামে শান্তিরক্ষার জন্য। তাছাড়া, যেখানে নেহাৎ বেয়াড়া পরিস্থিতি ঘটে উঠছে, যখন মুষ্টিমেয় লোক নাছোড়বান্দার মতো জনমতের বিরুদ্ধে জেদ্ করে সকলেব কাজে ক্ষতি করছে সেখানে অহিংস সত্যাগ্রহ করা যেতে পারে যাতে সেই সত্যাগ্রহের পরে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয় এবং প্রতিবোধের মনোভাব জাগ্রত না হয়। গ্রামের পার্টিগুলি এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ নীতি আপসে তৈরি করে নিতে পারে।

যাক্ যে কথা আলোচনা হচ্ছিল তাতে ফিরে আসা যাক্। আজ রাজনৈতিক পার্টিগুলির বিরুদ্ধে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠছে জনসাধারণের মধ্য থেকে। দলগুলির অযথা দলাদলি ও ক্ষমতাপ্রিয়তা তারা পছন্দ করছে না। অনেক রকমের আদর্শচ্যুতি তারা দেখতে পায় এবং ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে পার্টিগুলির উপর জনতার বিশ্বাস ও উৎসাহ কমে আসছে। কোনো কোনো চিন্তানায়ক ও জননেতা পার্টিপ্রথা উঠিয়ে দেবার জন্য প্রচার করছেন ; কিন্তু আমাদের মতে পার্টিপ্রথার দুটো দিকই আছে—একটা হিতকর অপরটি অ-হিতকর। অহিতকর কয়েকটা লক্ষণ দেখে পার্টি প্রথাটাকেই অপাংক্তেয় করার কথায় একটা একপেশে চিন্তা বা ঝোঁক আছে। পার্টিগুলির হিতকর দিকটা ভুলে গেলে চলবে না। এদের প্রয়োজনীয়তা যে আজও শেষ হয় নি সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তিতে জনতার স্বার্থ রক্ষা করা, দেশের ঐক্য রক্ষা করা, আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা, দেশ বিদেশের নানা আদর্শকে জনতার সামনে তুলে ধরা, তাদের ঐক্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা—এ সব কাজ করার জন্য দল ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আবার দলের ভিতরের আদর্শহীনতা, চিন্তার দৈন্য, কাজের গাফিলতি, সুবিধাবাদী ধারা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ইত্যাদি যে সমস্ত কীট দেখা দিয়েছে তা চোখ বুজে অস্বীকার করাও অন্যায় হবে। দলগুলি আজ জনতার ঐক্য সৃষ্টি করছে না—ঐক্যের নামে অনৈক্য সৃষ্টি করে চলেছে ; শ্রেণীহীন সমাজের, সমাজতান্ত্রিক সমাজের আবহাওয়া সৃষ্টি করছে না, এমন কি নতুন নতুন উপশ্রেণী ও উপদলীয় স্বার্থ তারা সৃষ্টি করে চলেছে। এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হওয়াব সময় হয়েছে। কিন্তু দলের দোষগুলিকে দেখে দলটাকে মেরে ফেলার চেষ্টার ফল হবে উল্টো। দলগুলিকে বিদায় দেবার সময এখনও হয় নি। আমাদের মত এই যে, দলগুলিকে নিজেদের সংশোধন করতে জোর চাপ দেওয়া হোক, জনমত তৈরি করা হোক। তাদের অহিতকর দিকগুলি নষ্ট করে হিতকর দিকগুলিকে আরও শক্ত ও উন্নত করা হোক। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের পরিবর্তিত ও সংস্কৃত (reformed) করা দরকার। দলগুলিকে একমাত্র ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য না করে প্রধানত সেবার হাতিয়ারে পরিণত করা হোক। তাদের আদর্শগত চেহারাটা আবার পুনরুজ্জীবিত করা হোক। যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের পটভূমিকায় আজ আমরা এসে পড়েছি তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য তারা আবার বুঝে নিক্। Old politics এর যুগ শেষ হয়েছে। কূটনীতি বা real politik-এর যুগ যে শেষ হতে চলেছে এটা তারা আবার নতুন করে বুঝে নিক্ এবং সেটাকে একটা কথার কথা হিসাবে নেওয়া ফাঁকিবাজী ত্যাগ করুক। মহাত্মা গান্ধী তাঁর শেষ অনুজ্ঞা বা Last Will-এ বলে গেছেন যে, কংগ্রেসকে ভেঙে দিয়ে যেন অতি সত্বর একটি লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত করা হয়—তার গঠনতন্ত্রের খসড়া পর্যন্ত তিনি তৈরি করে গিয়েছিলেন। সেটাই তাঁর শেষ লেখা এবং শেষ উপদেশ। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর সে উপদেশ গ্রহণ করে নি বা করতে পারে নি বা করবার সাহস করতে পারে নি। কিন্তু এই উপদেশের যুক্তিযুক্ততা একেবারে কারো কানে যায় নি তা নয়। দেশে আজকাল এ জাতীয় কথার আওয়াজ উঠেছে। বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ তার নিদর্শন। বিনোবা তো এখনই রাজনীতির বদলে লোকনীতি গ্রহণ করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। এ জাতীয় চিন্তা ও আলোচনা আজ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিতেও উত্থাপিত হওয়া উচিত এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যথাসম্ভব গ্রহণ করে নিজেদের পার্টিগুলির সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নেওয়া উচিত। দলগুলি তুলে দেবার জন্য নয়, দলগুলির চিন্তা ও কাজের ধারাগুলিকে কালের প্রয়োজনে সংশোধিত করে নেবার জন্য, উত্তরোত্তর জনসেবা সঙ্ঘে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য, অহেতুকী দলাদলি পরিত্যাগ করার জন্য, দলগুলির মূল আদর্শের সঙ্গে তাদের কাজের ব্যবধানটাকে ক্রমশ সংক্ষেপে করার জন্য, রাজনীতিকে

উত্তরোত্তর লোকনীতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য, একটা সুস্থ, সুন্দর, বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি কবার জন্য।

যাই হোক্, এই লক্ষ্যে এগুতে হলে চাই প্রথমে রাজনীতিতে একটা বড় রকমের সংস্কার বা পবিবর্তন , দ্বিতীয়ত, ঐক্যেব উপর জোর দেওযা ; তৃতীয়ত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে (বিশেষ করে যাদের আদর্শ সমাজতন্ত্র) area of agreement or common programme বা সম্মিলিত কর্মপন্থা বা কর্মতালিকা তৈরি করা প্রতিটি গ্রামেব জন্য। এমন কি সমগ্র দেশের জন্যও নিম্নতর সাধারণ কর্মতালিকা বা প্রোগ্রাম বচনা কবা অসম্ভব নয়—যদি সত্যি সত্যি সদিচ্ছা থাকে। কেননা দলগুলির মধ্যে পার্থক্যেব চেয়ে আজ যে ঐক্যের ক্ষেত্রটাই দিন দিন বড় হয়ে চলেছে তা ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। এই ঐক্যের বিরাট ক্ষেত্রটাকে অস্বীকার করে কেবল পার্থক্যের উপর জোর দিয়েই ক্রমাগত দলাদলি করে যাওয়া সুস্থ লক্ষণ নয়—একেই sectarianism বলা হয় রাজনৈতিক শাস্ত্রে। সমাজতান্ত্রিক দলগুলি যে আজ আব sect বা সম্প্রদায় নয় এই জ্ঞান আসা দরকার। নইলে প্রকৃত গণ আন্দোলন ও গণ-জাগরণ আনয়ন করা তাদের সাধ্যেব অতীত হবে। গ্রামে এই ঐক্যেব ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে সাধাবণ প্রোগ্রাম তৈরি করে সব দল যদি কাজে অগ্রসব হয তবে গ্রামেব চেহাবা মুহূর্তে পাল্টে যাবে। সাধারণ মানুষের আত্মশক্তিতে প্রচুর বিশ্বাস জন্মাবে—দলগুলির চেহারাও সংস্কৃত ও সুন্দর হবে। প্রত্যেক দল এ থেকে উপকৃত হবে, লাভবান হবে—কেউ বঞ্চিত হবে না অথবা ধিকৃত হবে না। ববং মৃতপ্রায় দলগুলিও নতুন জীবন ও কাজ পাবে—বেঁচে উঠবে। আজ কাজের অভাবে দলগুলি প্রায় মৃত বা অর্ধমৃত। খাদ্য ছাড়া যেমন জীবন বাঁচে না, কর্ম ছাড়া তেমনি কর্মী বেঁচে থাকে না। কর্মেব অভাবে আজ কর্মীদের জীবন ক্ষয়ে যাচ্ছে—কত আদর্শ ধূলায় লুটাচ্ছে।

দলে দলে নিশ্চয়ই প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু যে প্রতিযোগিতা সহযোগিতার ক্ষেত্রকে অস্বীকার করবে না, এবং প্রতিযোগিতা যতটুকু আছে তা জনসেবার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। কোন দল কত কাজ ওঠাতে পাবে এই প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। দলগুলির মধ্যে দৈনন্দিন বাবহাবের ক্ষেত্রে বা etiquette-এর ক্ষেত্রে সুস্থ নীতি অবলম্বন করতে হবে। সুস্থ, সুন্দর, গণতান্ত্রিক ব্যবহার কবতে হবে। যেমন, কেউ অসৎ উপায় নেবে না, মিথ্যা প্রচার করবে না, অতিরঞ্জন করবে না, অন্যায় সুযোগ নেবে না, এক দল অপর দলের ধ্বংস বা অমঙ্গল কামনা করবে না, মুখে ও কাজে এক থাকবে, সত্য পথে চলবে, মিথ্যার আশ্রয় নেবে না, পরমতসহিষ্ণু হবে, শান্ত সুস্থ আলোচনা করবে ইত্যাদি। এগুলি হবে নূতন রাজনৈতিক জীবনের নিয়ম বা rules of conduct যেমন খেলায় থাকে Rules of games। খেলার মাঠে একদল অপর দলকে পরাজিত করে, সেখানেও তীব্র প্রতিযোগিতা আছে ; কিন্তু কেউ ফাউল (foul) করতে পাবে না—মাবামারি নিষেধ—করলে অন্যায় বলে ঘোষিত হয়, এবং তা সবাই মেনে নেয়। পরাজিত দল পরাজয় মেনে নেয় আর বিজয়ী দলও পরাজিত দলকে সম্মান করতে ভোলে না। তেমনি রাজনৈতিক দল থাকলেই, প্রতিযোগিতা থাকলেই তা কুৎসিত দলাদলি ও মারামারিতে পরিণত হবে, ফাউল পলিটিক্স করতে হবে, এমন কোনো মানে নাই। আজ মানুষ আর শিশু নেই। আমদের জ্ঞানগম্য হয়েছে বলে আমরা বড়াই করি, আমাদের maturity হয়েছে—আমরা অতি প্রাচীন জাতি, যার কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা গর্ব করি—কাজেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনও তেমনি উঁচুদরের হবে এ আশা কবা কি অন্যায়? কাজেই পার্টিগুলির মধ্যে একটা ব্যবহার নীতি বা code মেনে চলা অসম্ভব নয়।

যে গ্রামে একাধিক রাজনৈতিক দল আছে তাদের মধ্যে এই ধরনের একটা চুক্তি বা সমঝোতা থাকতে পারে যে, গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে তারা দলগত রাজনীতি চালাবে না—সবাই মিলে সকল দিক লক্ষ্য করে একটা সর্ববাদীসম্মত পঞ্চায়েত গঠন করবে যার পিছনে সবার না হোক বেশির ভাগ গ্রামবাসীর সমর্থন আছে। পঞ্চায়েতের পাঁচজনের একই মত থাকতে হবে সব বিষয়ে—এতটা আশা করার দরকার নেই—একটা দলের মধ্যেও সব বিষয়ে সবার একমত থাকে না। ভিন্নমত কোনো কোনো বিষয়ে থাকলেও অনেক বিষয়ে একমত আছে এবং নানা মতের সামঞ্জস্য করেও একত্র চলা সম্ভব হয়। তাছাড়া, ভোটাভুটির জনাই ভোটাভুটি করা হয় না—জনমত সত্যিকার কি তা জানবার জন্যই গণতান্ত্রিক ভোটাভুটির প্রযোজন হয়। জনমত কেবল তীব্র দলাদলি ও ভোটাভুটির সাহায্যেই বোঝা যায় না—বরং ভোটাভুটির উত্তেজনায় সত্যিকার মতামতটা চাপা পড়ে যায়—প্রতিবিম্বিত হয় একটা জেদ মাত্র। তাতে সুস্থ জনমত ও বিচার অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। গ্রামের উন্নতি নিয়ে ফুটবল খেলার বা ঘোড়দৌড়ের মাঠের excitement বা উত্তেজনা উপভোগ করা ও গ্রাম্যজীবন বিষাক্ত করে তোলা অত্যন্ত অন্যায়। শুধু পঞ্চায়েত নয়, সমস্ত গ্রাম সভাকেই যেখানে আমরা সক্রিয় সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাইছি সেখানে পাঁচটি আসনের জন্য একটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা সমস্ত কিছু পণ্ড করারই সামিল। মনে রাখতে হবে যে, আজ যেটা গ্রামদেশে সবচেয়ে বেশি দরকার সে হলো সহযোগিতা—প্রতিযোগিতা নয়। সহযোগিতা ভিন্ন গ্রামের কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়, সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা। সহযোগিতার অভাবেই গ্রামগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে আইনসভা, লোকসভা প্রভৃতির আসনের জন্য ভোটাভুটি ও প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। সেখানে গ্রামবাসীরা সবাই একজনকে ভোট দেবে এমন আশা করা যায় না, হয়ত উচিতও নয়। সেক্ষেত্রে সেই গ্রামের রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে নিজ নিজ পার্টির পক্ষে প্রচার করতে দিতেই হবে। কিন্তু এই প্রচারের সময় দেখতে হবে যেন এই election-এর ফলে গ্রামে কোনো স্থায়ী ঝগড়ার সূত্রপাত না হয়, গ্রামের দৈনন্দিন ঐক্য যেন নষ্ট না হয়। আমাদের দেশেই ভোটে এত অশোভন ও কুৎসিত প্রচার ও অপপ্রচার চলে, কিন্তু বিলেতে ভোটের ব্যাপারে এত কাদা ছোঁড়াছুড়ি হয় না—প্রচারের একটা dignified শালীনতার ধারা থাকে। পূর্বেই বলেছি কর্মীর পক্ষে গ্রামের লোকদের শিক্ষিত করে তোলাটাই মস্ত কাজ (to educate the people—not to make cheap propaganda)। সস্তা অপপ্রচারের বদলে সত্যিকার শিক্ষিত জনমত (Enlightened public opinion) সৃষ্টি করার কাজটা তার প্রতিদিন প্রতি রাত্রির কাজ—মাসের পর মাস, বছরের পর বছরের কাজ। তাদের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করতে পারলে নির্বাচনের সময় বাজে হল্লা আর ভলান্টিয়ারের চিৎকার দরকার হয় না। সারা বছর ধরে আমরা যে কাজ করতে অবহেলা করে থাকি সেই কাজটা হঠাৎ একদিন ভলান্টিয়ারের চিৎকারে সেরে নিতে চাই—ফলে বিচারের চেয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়।

যাহোক্, গ্রামের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এমন একটা চুক্তি বা বোঝাপড়া থাকা দরকার যে, আইনসভা, লোকসভা প্রভৃতির ভোটযুদ্ধের পরে আবার তারা গ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলিত কর্মতালিকা অনুযায়ী কাজ করতে থাকবে, কোনো পার্টির লোক লোকসভায় গেল তাই নিয়ে আর উত্তেজনার জের টেনে চলবে না—উত্তেজনা জিইয়ে রাখবে না। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইনসভা ও লোকসভায় তাদের কাজ করতে থাকুক—সেখানে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করুক ; কিন্তু কর্মীরা গ্রামে তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে—সেখানে একতাই একমাত্র শক্তি।

সর্বপ্রকার চুক্তি বা বোঝাপড়া হলো গ্রামে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে common programme বা সাধারণ কর্মসূচী রচনা ও তা কার্যকরী করার ব্যাপারে। আমরা পূর্বে যে গ্রামের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলেছি সেটাই হলো সাধারণ বা সর্ববাদী কর্মসূচী—সকলে মিলে বিচার বিশ্লেষণের পর তা মেনে নেওয়া হযেছে। দল বিশেষের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকলেও সাধারণ কর্মসূচী যা করা হয়েছে তা যখন সবাই মেনে নিয়েছে তখন তো সকল দলকে একত্র করাই হলো কার্যক্ষেত্রে। বাস্তবে সব দলকে মানাতে না পারলেও জাতীয় সামগ্রিক প্ল্যান করা বা কায়েম করার কথাই উঠে না। এভাবেও আমরা গ্রাম্য দলাদলি শান্ত করে রাখতে পারি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একত্র করার একটা বাস্তব চেষ্টা বা দৃষ্টান্ত পাই আমরা বিনোবাজীর গ্রামদান আন্দোলনেব ব্যাপারে। সম্প্রতি মহীশূরে ইউলাল সম্মেলনে সকল দল একত্র হয়ে গ্রামদান কাজে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। এ থেকেও আমরা একটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাই। এ জাতীয় ঐকমত্য গ্রামদেশে গঠন করা অনেক বেশি সহজ।

পার্টি ছাড়া জনসাধারণের অন্যান্য যে সমস্ত সংগঠন তার উপর বেশি নজর দিতে হবে। যেমন, নানা রকমের সমবায় সমিতি, যার মধ্য দিয়ে চাষবাস, শিল্প ইত্যাদি কাজ করা হবে। তাদের মর্যাদা ও কাজ পার্টির চেয়ে কম করে ধরলে চলবে না। কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ট্রেড ইউনিয়ন, স্কুলকমিটি, হাসপাতাল কমিটি, শিক্ষাকমিটি প্রভৃতি যে সমস্ত অবাজনৈতিক সংগঠন বা সাধারণের প্রতিষ্ঠান সেগুলিব ভিতর পার্টিগুলির ক্ষমতা আরও বাড়াবার উৎসাহে সেই সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নষ্ট করে ফেলা হয। কেননা দলগুলি মনে কবে যে, সবার উপরে দলই সত্য এবং যদি কোনো প্রতিষ্ঠান সেই দল দখল করতে না পারে—সে প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। দলগুলি জনসাধারণের মালিক নয়—সেবকমাত্র, এ কথা স্মবণ করতে হবে। আজকের পার্টিগুলির লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যে, জনসাধারণের এই সব সাধারণ সংগঠনগুলিকে এমন সুন্দর ও স্বয়ং সম্পূর্ণ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় কবানো যাতে একদিন দলগুলি উঠে গেলেও এই সব প্রতিষ্ঠান ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলিই জনসাধারণের জীবনযাত্রা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এইভাবে withering away of the state and parties সম্ভব হবে, অথচ জনতা সংগঠনহীন হয়ে পড়বে না।

আরও একটি উপায আছে দলগুলিকে সংযত করার। সে হলো জনসাধারণের চেতনাকে উন্নত করা, সত্যিকার শিক্ষিত enlightened জনমত তৈরি করা। জনসাধারণ যত সজাগ, শিক্ষিত, হুঁশিয়ার ও দায়িত্বশীল, চিন্তাশীল ও বিচারপরায়ণ হতে থাকবে তত দলগুলির কাবিকুরি ও দুষ্টমি করার ক্ষমতা কমতে থাকবে। ফলে দলাদলির standard বা মানদণ্ড উঁচু হতে থাকবে, তাদেব কর্মীদের যোগ্যতা, চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলীর উন্নতি করতে তাবা বাধ্য হবে। আমাদেব দেশের জনসাধারণ আজও অতিশয় অজ্ঞ বলে দলগুলির চেহারা সুন্দর হয় না—হরেক রকম হামবড়াই ভাব টিকে থাকার সুযোগ পায়। সচেতন ও সজাগ ও শিক্ষিত জনসাধারণ তাই দলগুলির উপর একটা মস্ত বড় check বা রাশ। এই রাশ টেনে ধরতে পারলে সৎপথে, একতার পথে চলতে বাধ্য করা যাবে। অযথা ঝগড়া, ঝুট্-ঝামেলা ও বিভেদ বাড়িয়ে তোলার সুবিধা পাবে না।

পরিশেষে একথাও স্মরণ করা দরকাব যে, যে সমস্ত কঠিন ও জটিল সমস্যার কথা উপরে আলোচনা করা হলো তাদের কোনো সহজ সমাধান করে দেবার একটি কোনো মন্ত্র বা formula নাই। এ জাতীয় সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা কোনো একটি যাদুকরী আঘাত বা

stroke এ নেই। চেষ্টার পর চেষ্টা থাকা দরকার। ধৈর্য থাকা দরকার। এর অনেকগুলি মানুষের চিরকালের দুর্বলতা, হঠাৎ চলে যাবার নয়। খেলায় যেমন এক আধটা ফাউল হলেই খেলা ভঙ্গ করে দেওয়া হয় না তেমনি এই নূতন সমাজ তৈরির পথে যদি কোনো দল বা ব্যক্তি কখনো ফাউল করে বসে তবে সব চেষ্টা পণ্ড হলো বা আর কিছু হবার নেই বলে হতাশ হলে চলবে না। ফাউল করবেই, বারে বারে ফাউল আমরা করে ফেলব ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক—কেননা আমরা যে ভাবে তৈরি হয়ে এসেছি তাতে আমাদের মধ্যে অনেক দুর্বলতা, অনেক শঠতা আরো অনেক দিন চলবে। কিন্তু কর্মী যদি গভীর অভিনিবেশ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সাথে এই নতুন সমাজ, সাম্যের সমাজ গঠনে লেগে যায় তবে অচিরেই গ্রামের মধ্য থেকেই চমৎকার চমৎকার লোক কিছু তৈরি করা যাবে। এবং, গ্রামের মধ্যেই যদি কয়েকটি আদর্শ লোকও তৈরি হয় তবে গ্রামের চেহারাই পাল্টে যাবে। এতৎসত্ত্বেও এই সত্যিকার মানুষ গড়ার কাজ কোনো দিন বন্ধ করা চলবে না—মানুষ হবার ও মানুষ থাকার সাধনা চিরকালই মানুষের থাকবে, সহজে মানুষ মানুষ হয়নি এবং খুব সহজে ও চিরকালের জন্য কোনো ব্যবস্থাই হয়তো টিকে থাকবে না। জন্মালেই মানুষ মানুষ হতে বাধ্য এমন ধরনের অবস্থা যদি হয় তবে মানুষের struggle-ই যাবে বন্ধ হয়ে এবং সেই মুহূর্ত থেকেই আবার মানুষের পতন শুরু হবে। এই কতকগুলি সমস্যা আছে মানুষের যা চিরকালের। মানুষের মহৎ হবার, বৃহৎ হবার পথটাই আমরা সোজা ও মুক্ত করে যেতে পারি—সে পথে আগামী যুগের মানুষেরা আমাদের চেয়ে অনেক সহজে এগুতে পারবে, কিন্তু পথ তাদেব নিজেদেরই অতিক্রম করতে হবে, তাদের চলার কাজটা আমরা নিশ্চয়ই সেরে দিয়ে যেতে পারি না।

॥ ৭ ॥
কাজের তালিকা

গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রমসভা প্রভৃতির কাজ বর্তমানে কি কি তাব একটা ফর্দ তৈরি করা যাক্। এই ফর্দের বাইরেও অনেক রকম কাজ দরকার হতে পারে। কাজ করতে করতেই নতুন কাজের প্রয়োজন ও তার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, একবার কাজে নামলে জনসাধারণের সৃজনী শক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি বেড়ে যাবে। এই ফর্দে দেওয়া অনেক রকম কাজ হয়তো কোনো কোনো গ্রামে প্রয়োজন নাও হতে পারে, কেননা সব গ্রামের প্রয়োজন একরকম নয়—সে কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। চাষীপ্রধান গ্রামের প্রোগ্রাম জেলেপ্রধান বা মুচিপ্রধান বা তাঁতীপ্রধান গ্রামের মতো হবে না। তাই প্রত্যেক গ্রামের প্রোগ্রাম আলাদা হতে বাধ্য এবং তা কখনো কলকাতা বা নয়া দিল্লীতে বসে রচনা হতে পারে না। তাহলেও কতকগুলি কাজের একটা ফর্দ দেবার চেষ্টা করা যাক্।

(১) দেশে জমি-সংস্কারের যে কাজ চলেছে তাতে পঞ্চায়েত ও গ্রামসভাকে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে হবে। ইতস্তত ছড়ানো জমিকে এক জমিতে আনা, জমির পুনর্বণ্টন, কো-অপারেটিভ চাষেব বিধি-ব্যবস্থা, জমির সর্বোচ্চ অধিকার সীমা নির্ধারণ (ceiling), পতিত জমির উদ্ধার ও তার ব্যবহার, ভূমিহীনদের জমিদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত আইন (Land reform legislations) তৈরি হচ্ছে তাতে সাহায্য করা, জনমত তৈরি করা ইত্যাদি ব্যাপারে পঞ্চায়েত ও গ্রামসভা কেবল নিরপেক্ষ থাকবে না—সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

(২) যে সমস্ত ক্ষেত্রে সমবায় চাষ ও ভূদান ও গ্রামদান ঘটছে সেখানে পঞ্চায়েত ও গ্রামসভার কাজ ও দায়িত্ব অনেক বেশি বেড়ে যাবে।

(৩) দেশে খাদ্যাভাব দূব কবাব দাযিত্ব পঞ্চাযেতকে নিতে হবে। সকল জমি উপযুক্তভাবে চাষ হচ্ছে কিনা তাব তদাবক কবা, উৎসাহ দেওযা, সাহায্য কবা আজকে পঞ্চায়েতেব প্রধান কাজ। দবিদ্র চাষীবা উপযুক্ত হাল, বলদ, লাঙল, বীজ, সাব ও কৃষিঋণ পাচ্ছে কি না এবং যাতে পায তাব জন্য সর্বদা চেষ্টা কববে পঞ্চাযেত।

(৪) প্রত্যেক গ্রামেব জন্য এক বৎসবেব মতো খাদ্য গ্রামে বাখতেই হবে অতিবিক্ত, যাতে অজন্মাব বছবে গ্রামে খাদ্যেব অভাব না হয। গ্রামেব খাদ্য শস্য চাষ না কবে, খাবাব মতো মজুত না কবে অন্য ফসল অর্থাৎ পাট ইত্যাদি কেউ লাগাতে উৎসাহ পাবে না এবং বাধা দেওযা হবে। দুই বৎসবেব মতো খাদ্য মজুত বাখাব taiget বা লক্ষ্য থাকলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওযা সম্ভব হয।

(৫) চাষেব জন্য জলেব ব্যবস্থা পাকা কবা। বাঁধ, কূপ, ফ্রেঞ্চ হুইল, পুকুব সংস্কাব ইত্যাদিব ব্যাপক ব্যবস্থা কবা, যেখানে নদীব জল পাবাব ব্যবস্থা নেই।

(৬) উন্নত ধবনেব চাষ ও ঘন চাষেব (intensive cultivation) আধুনিক শিক্ষাব জন্য নিকটবর্তী কৃষি বিদ্যালযে শিখে আসবাব জন্য উৎসাহী চাষীদেব পাঠানো। কাবিগবি বিদ্যা, কুটিবশিল্প, পশুপালন ইত্যাদিব জন্য ও বাইবে থেকে গ্রামেব উৎসাহী যুবকদেব শিখিযে আনাব ব্যবস্থা কবা।

(৭) বৃক্ষবোপণ ও বৃক্ষপালনেব ব্যবস্থা কবা। ফলেব চাষ ও জ্বালানি কাঠেব চাষ কবা ও তুলোব চাষ কবাব ব্যবস্থা কবা যাতে অম্বব চবকা ও অন্যান্য চবকাব জন্য তুলো গ্রামেই সংগ্রহ হয।

(৮) কুটিবশিল্পেব ব্যাপক ব্যবস্থা কবা। চবকা, অম্বব চবকা, পাপোস, সতবঞ্চি, মশাবি, দর্জি, সেলাইকল, জালবোনা, মেযেদেব সূচী শিল্প, কাঁথা, লেপ, কম্বল, সোযেটাব, জুতো, চপ্পল, ঝুড়ি, বিড়ি, চুরুট ঢেঁকি, ঘানি, মুড়ি, চিঁড়া, সাবান, ফিনাইল, বাজমিস্ত্রি, ছুতোব মিস্ত্রি, কামাবশাল, কুমোবশাল, ইঁট তৈবি, চুণ তৈবি, গৃহনির্মাণ কাজ, চাটনি, ক্ষীব, ছানা ও processing industries ইত্যাদি শিল্পেব উদ্যোগ কবা।

এ সব কাজে দক্ষতা অর্জন কবাব জন্য ও আধুনিক কৌশল সমূহ আযত্ত কবাব জন্য দবকাব হলে শহবে পাঠিযে কাবিগবদেব শিক্ষিত কবিযে আনা। দেখতে হবে যাতে এই সমস্ত শিল্প ক্রমশ গুণেব দিক থেকেও উৎকৃষ্ট হয, সহজসাধ্য হয, আধুনিক রুচিসম্মত হয় এবং তৈবি কবাব খবচও কমতে থাকে।

(৯) মাছেব চাষ ও পুষ্কবিণী সংস্কাব।

(১০) হাঁস মুবগীব চাষ, ছাগল ও শূকবেব চাষ।

(১১) কো-অপাবেটিভ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা কবা—

(ক) ঋণদান সমবায

(খ) কৃষিজাত জিনিসেব বিক্রয সমবায

(গ) শহবজাত জিনিসেব ক্রয সমবায

(ঘ) সমবায চাষ

(ঙ) কুটিবশিল্পেব সমবায

(চ) অথবা, বহুমুখী বা multipurpose (সর্বার্থসাধক) সমবায়

(ছ) শ্রম সমবায বা labour co-operative

(১২) সঞ্চয় আন্দোলন (small savings cheme)

(১৩) গ্রাম বীমা (rural insurance)

এগুলি সর্বভাবতীয় কাজ। তবে পঞ্চায়েতকে এ কাজে সাহায্য করতে হবে।

(১৪) শস্য বীমা (crop insurance)

(১৫) শ্রমদান—রাস্তাঘাট, স্কুল ইত্যাদি সাধারণ কাজের জন্য।

(১৬) যেখানে যেখানে সমষ্টি উন্নয়ন উদ্যোগ অথবা জাতীয় সম্প্রসারণ (Community Development Project এবং National Extension Service) সরকার থেকে চালু করা হয়েছে সেখানে তাদের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

(১৭) দেশের যেখানে যত বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে গ্রামের উন্নয়নের কাজে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, তাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া।

(১৮) 'ভারত ভ্রমণ' বা মাঝে মাঝে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষামূলক জ্ঞান জন্মে। এই জন্য উৎসাহী যুবক ছাত্র ও শিক্ষকদের দেশের যেখানে যেখানে ভাল কাজ হচ্ছে তা দেখিয়ে আনা।

(১৯) প্রত্যেক গ্রামে চাষ ও গ্রামশিল্প ও পশুপালন ইত্যাদি গবেষণার একটি কেন্দ্র খোলা।

(২০) স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাজ ঃ—

(ক) গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।

(খ) পায়খানার উন্নতি—নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা, স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। চাষের কাজে মলমূত্রের ব্যবহার।

(গ) গ্রামের যাবতীয় গোবর নির্দিষ্ট স্থানে জমা করার ব্যবস্থা করা, যাতে কেউ ঘরের কাছে গোবর না রাখতে পারে। গোবরের সম্বন্ধে একটা সমবায় ব্যবস্থা করা।

(ঘ) চিকিৎসা, ডাক্তার-কবিরাজ, ডিসপেন্সারি, হাসপাতাল, প্রসূতি আগার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

(ঙ) কলেরা, বসন্ত ইত্যাদির টিকার ব্যবস্থা করা।

(চ) উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা করা—টিউবওয়েল, ইঁদারা, রিজার্ভ পুকুর। ঘরে ঘরে জল ফিল্টার করার সহজ উপায় দেখিয়ে দেওয়া।

(ছ) ছেলেমেয়ে সকলের জন্য খেলাধূলা, ব্যায়াম, ব্যায়ামাগার, ও ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(জ) মশা, মাছি, ছারপোকার বিরুদ্ধে অভিযান। পানাপুকুর পরিষ্কার করা।

(ঝ) First Aid শিক্ষা দেওয়ানো ও তার ব্যবস্থা রাখা। রোগী সেবার জন্য ভলাণ্টিয়ার ও নার্স-এর ব্যবস্থা করা। আগুন নেভাবার জন্য ব্যবস্থা রাখা—গ্রামের শান্তিসেনাদের fire brigade-এর কাজ সম্বন্ধে কিছুটা শিক্ষিত করে রাখা।

(ঞ) স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত ধরনের ঘরবাড়ি তৈরি করানো যাতে আলো হাওয়ার যথেষ্ট প্রবেশ অধিকার থাকে। মশারি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

(২১) শিক্ষা সম্বন্ধীয় কাজ ঃ-—

(ক) প্রাথমিক ও বুনিয়াদী স্কুল—কারিগরি বিদ্যার শিক্ষা, চাষ শিক্ষার ব্যবস্থা। উন্নত বুনিয়াদী স্কুল বা Multipurpose High School—ছেলেদের ও মেয়েদের উভয়ের জন্যই।

(খ) ছেলেমেয়ে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(গ) বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা (adult education)। অক্ষরজ্ঞান তৈরি করাই এই শিক্ষার সমস্ত নয়, শুরু মাত্র। দেশ বিদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানো এই শিক্ষার কাজ, যাতে জনসাধারণকে সত্যিকার শিক্ষিত করা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট আয়োজন করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগের অধিকার থাকার কথা। কিন্তু সেটি প্রথমত

শিক্ষার ব্যাপারে সকল ছেলেমেয়ের সমান সুযোগ ও প্রচুর সুযোগের উপর নির্ভর করে। আয় ও ধনসম্পত্তির সমতা সৃষ্টি করা এক্ষুনি বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়—তা নির্ভর করে দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থলে জাতীয় সম্পত্তির প্রসারণের উপর। এবং সে ব্যবস্থা খুব দ্রুত হলেও অনেক বছর লাগবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যাতে সকল ছেলেমেয়েই শিক্ষার সমান সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা অসম্ভব নয়, এবং তা না করা হলে সমাজতন্ত্র কেবল মুখের কথা মাত্র। ছেলেমেয়েরা অন্তত শিক্ষিত হয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা দেখে নিতে পারে এতটা কিন্তু এক্ষুনি করা চাই। দরিদ্র ছেলেমেয়েরাও যাতে লেখাপড়ার ব্যাপারে সমান সুযোগ পায় এটা করতে পারলেও মস্ত কাজ হলো। এটা সম্ভব যদি শিক্ষার খরচ ও দায়িত্ব সমাজ ও সরকার গ্রহণ করে এবং শিশুদের পরিশ্রম (child labour) আইন করে এবং কার্যত বন্ধ করা হয়, যাতে ছেলেমেয়েরা পড়বার সুযোগ পায়। সরকার থেকে এই সর্বব্যাপক শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা করতে কত দেরি হবে! তার উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আদর্শ গ্রাম এখন থেকেই নিজেরাই তাদের গ্রামের সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হাতে নিতে পারে।

(২২) খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ

(ক) খেলার মাঠ—ছেলেদের ও মেয়েদের, পুরানো গ্রাম্য খেলা ও আধুনিক খেলা।

(খ) বার্ষিক স্পোর্টস্ ও পুরস্কার বিতরণ।

(গ) নাটমন্দির বা public hall.

(ঘ) যাত্রা, থিয়েটার, ট্যুরিং সিনেমা, ডকুমেণ্টারি ফিল্ম শো, ম্যাজিক লণ্ঠন।

(ঙ) গান-বাজনা—গ্রাম্য বাজনা ছাড়াও সেতার, এস্রাজ, গিটার ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা। লোকনৃত্য, কীর্তন, বাউল, কবিগান ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, গানবাজনা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যেন শহর জীবনের decadent বা পচনশীল দিকটা আস্কারা না পায়। এ বিষয়ে শহরের অনুকরণ অন্যায় হবে। এমন কি, সেগুলিকে আলস্য বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে যেন না নেওয়া হয়। গ্রামজীবনে আমরা আনন্দ আনতে চাই। সে আনন্দ হবে সুন্দর, সুস্থ ও বলিষ্ঠ জাতির আনন্দ—ক্ষয়িষ্ণু কাল্‌চার নয়, বর্ধিষ্ণু কাল্‌চার। মনে রাখতে হবে আমরা নতুন সভ্যতা গড়তে চাইছি। তাই গানবাজনা, লোকসঙ্গীত, যাত্রা-নাটক, সাহিত্য সব কিছুর মধ্য দিয়ে জাতির জাগরণের সুরটাই সৃষ্টি হয়ে ওঠা চাই—বস্তুত এই সব কৃষ্টি ও কলাকে আমাদের মানুষ হবার উৎসাহ ব্যঞ্জক করে তুলতে হবে।

(চ) সর্বসাধারণের রেডিও।

(ছ) লাইব্রেরি, খবরের কাগজ—হাতে লেখা পত্রিকা।

(জ) কলা-শিল্পের শিক্ষা—চিত্রবিদ্যা, সুন্দর গৃহনির্মাণ, মাটির কাজ, মূর্তি গঠন ইত্যাদি।

(ঝ) গ্রামকে সুন্দর করে তোলা, রাস্তাঘাট পাকা করা, গ্রামের মধ্যে ছোটোখাটো পার্ক করা, ফুল লাগানো, বাড়ি-ঘর সুন্দর করা, রং করা, অতিথিশালা নির্মাণ—যেখানে বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী লোকেদের নিমন্ত্রণ করে এনে রাখা যায় এবং সময় সময় তাঁদের সাহচর্য গ্রামের লোকেরাও পায়।

(ঞ) পল্লী গবেষণাগার—বিশেষ করে যেখানে বিজ্ঞান সেবকেরা গবেষণার কাজ করতে পারেন। পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোকেরা কোনো কালেই গ্রামে ফিরে আসবে না অথবা গ্রামদেশে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ করবে না, এমন অবস্থা চিরদিন থাকবে না।

(ট) বাৎসবিক মেলা ও উৎসব। বছরের একটা সময় প্রচুর জাঁকজমক করে এই উৎসব পালন করা। বাইরে থেকে গাইয়ে বাজিয়ে ও অন্য রকমের গুণী লোকদের নিমন্ত্রণ কবে আনা। গ্রামেব যারা বাইরে থাকে তাদেব ঐ সময়ে গ্রামে আসতে বাধ্য করা—নচেৎ যাবতীয় গ্রাম্য অধিকাব থেকে বঞ্চিত করা। এই উৎসবকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় করে তোলা এবং এই সময়ে গ্রামের কাজের বার্ষিক রিপোর্ট সকলের কাছে উপস্থিত করা।

(২৩) আশেপাশে যে সব গ্রামে এই জাতীয় গ্রামোন্নয়নের কাজ চলছে তাদের মধ্যে সমবেত প্রতিযোগিতা বা collective competition-এর উৎসাহ দেওয়া, অর্থাৎ কোনো্ গ্রাম কি কি বিষয়ে কত বেশি অগ্রগামী হতে পারে তার প্রতিযোগিতা। চাষবাস, কুটিরশিল্প, গ্রাম-স্বাস্থ্য, শবীর গঠন, খেলাধূলা, গানবাজনা, শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুর প্রদর্শনী ও বিচার করা। এই বিচারে যারা সার্থক প্রতিযোগী হলো তাদের পুরস্কার বিতরণেব ব্যবস্থা করা। এই বিচার ও পুরস্কার বিতরণের কাজে দেশের বিশিষ্ট নেতা ও কর্তাব্যক্তিদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি কামনা করা। গোটা একটা গ্রামকে পুরস্কার দেবার মতো উপযুক্ত সামগ্রী এই জাতীয়, যথা ঃ

(ক) থিযেটার হল সাজসরঞ্জাম সহ।
(খ) ট্র্যাক্টর।
(গ) মোটব ট্রাক্।
(ঘ) ঠাণ্ডা ঘব (cold storage)।
(ঙ) বেডিও, টাওযাব ক্লক যা গ্রামেব মধ্যস্থানে বসানো সম্ভব।
(চ) বিশ্বকোষ (encyclopoedia)।
(ছ) খেলাব মাঠ ও খেলার সবঞ্জাম।

এই জাতীয় পুরস্কার গ্রামেব সকলের উপভোগে ও কাজে লাগে এবং এর দ্বারা সত্যিকার সমবেত সহযোগিতা ও উৎসাহ, উদ্যম সৃষ্টি কবা সম্ভব। এ ছাড়া ব্যক্তিগত কৃতিত্বেব জন্য আলাদা পুবস্কাবের ব্যবস্থা কবা।

(২৪) উপরোক্ত কাজগুলিকে একত্র করে সুচিন্তিতভাবে গ্রামের জন্য পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান বলা হয়েছে। পাঁচ বছরেব কাজ প্রতি বছবে কতটা পড়বে তা নির্দিষ্ট করে নিয়ে দাঁড়াবে বার্ষিক প্ল্যান। এই প্ল্যান রচনা করার দায়িত্ব সমগ্র গ্রামসভার।

॥ ৮ ॥

বাজার সমস্যা

এখনও পর্যন্ত আমরা একটা অর্থনৈতিক গুরুতর সমস্যার কথা তুলি নি—সে সমস্যার কথা না তুললে, তার সমাধানের ইঙ্গিত না করলে আমাদের বক্তব্যের একটা ত্রুটি থেকে যাবে। এক কথায় বলতে গেলে তা হলো বাজার সমস্যা। আমরা জানি আজ ভারতের এবং বিশেষ করে গ্রামদেশের যেটা ভয়ানক সমস্যা তা হলো তাব বেকার ও অর্ধবেকার সমস্যা। বৎসরের প্রায় অর্ধেকটা সময চাষীদের বসে থাকতে হয়। কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক আছে যাদের বৎসরে প্রায় কোনো সময়ই সত্যিকার কাজ থাকে না। ভূমিহীন মজুরশ্রেণীর লোকেদের কোনো নির্দিষ্ট কাজ থাকে না। কুটিরশিল্প যাদের আছে তাদেরও মাল বিক্রি হয় না বলে অনেক সময়ই বসে থাকতে হয়। তা ছাড়া, কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য ও অন্যান্য অনেক বৃত্তি নষ্ট হয়ে যাবার জন্য গ্রামের প্রায় সকলকেই চাষের উপর নির্ভব করতে হয়। ফলে জমির ভাগ মাথাপিছু ক্রমশ কমতে থাকে এবং তাতে সারা বছরের কাজ থাকে না। লক্ষ লক্ষ শ্রমদিবস এ ভাবে নষ্ট

হতে থাকে। যেটুকু বা শ্রম ব্যবহৃত হয় তা অতি সেকেলে ধরনের, অর্থাৎ তা আধুনিক যন্ত্র ও কারিগরি বিদ্যার শ্রম নয়। ফলে গ্রাম্য শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি অতি নগণ্য। ফলে শহরে তৈরি জিনিসের সাথে যখন তাদের চাষজাত ও গ্রামজাত জিনিসের বিনিময় হয় তখন শ্রম হিসাবে গ্রামবাসীদের ভীষণ ঠকতে হয়। কেননা যন্ত্রপাতিচালিত শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি আর সেকেলে হস্তশিল্পের উৎপাদিকা শক্তি এদের তুলনাই হয় না। ফলে গ্রামের চার ঘণ্টার শ্রমের সাথে কার্যক্ষেত্রে শহরের এক ঘণ্টা শ্রমের বিনিময় হয়। এর নাম অর্থশাস্ত্রে কাঁচিশোষণ বা scissors। উন্নত ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মুলুকেও এই জাতীয় কাঁচিশোষণ ঘটে থাকে—তাদের শহর ও গ্রামের মধ্যেও। কিন্তু সেখানে গ্রামের চাষবাসের কাজে ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার ফলে তা আমাদের দেশের মতো এত নির্মম হয় না। কিন্তু এ দেশের শহরে ক্রমাগত উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার হচ্ছে যার ফলে তাদের উৎপাদিকা শক্তি বেড়েই চলেছে, অথচ, গ্রামের চাষী, কামার, কুমোর, তাঁতী এরা সবাই সেই মান্ধাতা আমলের উৎপাদিকা শক্তিকে উন্নত করা তো দূরের কথা ররং দক্ষতা হারিয়ে ফেলার দরুন তাদের উৎপাদিকা শক্তি আরো কমে গেছে। এই কাঁচিকলের শোষণের ফলে গ্রামবাসীরা শহরবাসীদের সঙ্গে পেরে উঠে না—কেবল মার খেতে থাকে এবং ধ্বংস হতে থাকে। এর প্রধান আঘাতটা পড়ে কুটিরশিল্পের উপর। তাই আজ কুটিরশিল্প বলতে বিশেষ কিছু নেই। চাষের উপরেও এর আঘাত কম নয়, কিন্তু চাষ যেহেতু থাকতেই হবে নইলে শহরের লোক বা দেশের লোক খাবে কি—তাই চাষী মরি মরি করেও মরে না।

এখন আমরা চাই কি? আমরা চাই সকলের জন্য পুরো কাজ বা full employment সমর্থ নরনারী মাত্রেই কাজ পাবে, এমন কি অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধবৃদ্ধারাও কাজ কিছু করবে। গ্রামদেশে কাজের এই মহা সমারোহ সৃষ্টি না করতে পারলে আধুনিক যন্ত্রপাতিবহুল ধনতান্ত্রিক মালিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় গ্রাম টিকে থাকতে পারবে না। দেশের যাবতীয় কল কারখানা, খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি যদি সরকার এক্ষুনি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারত, অর্থাৎ সরকারি ক্ষেত্র (public sector) যদি আজ দেশের যাবতীয় শিল্পবাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত সর্বসাধারণের স্বার্থে—তবে এতটা অত্যাচার গ্রামবাসীদের উপর পড়ত না। কিন্তু নানা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কারণে জাতীয়করণের গতি বিশেষভাবে মন্থরই রয়ে গেছে—ফলে আজ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ২০% সরকারের হাতে, আর বাকি ৮০ ভাগ ধনীদের হাতে। এ অবস্থার যেদিন উল্টোটি হবে সেদিন বলা যায় সত্যিকার সমাজতন্ত্র এলো। কিন্তু এইভাবে এবং এই গতিতে সমাজতন্ত্র আসতে বহু দেরি লাগবে—অর্থাৎ একমাত্র সরকারি নীতি ও তার কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে থাকলে সমাজতন্ত্র চোখে দেখা তো দূরের কথা, এমন কি চাষী বা শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তদের বেঁচে থাকাই প্রাণান্তকর হয়ে উঠবে, আর সবাইকে কাজ দেওয়া তো অসম্ভব কথা। আমরা এই অধ্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করব সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়াও জনসাধারণ নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের কাজ জুটিয়ে নিতে পারে এবং তারা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পক্ষেও নীচ থেকে, মানে গ্রাম থেকে একটা ক্রমবর্ধমান গতি সৃষ্টি করতে পারে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারার আয়োজন আছে—অর্থাৎ full employment বা সকলের জন্য পুরো কাজও মিলবে অথচ সমাজতন্ত্রও ত্বরান্বিত হয়ে আসবে। তার ফলে সমস্ত দেশের ও রাষ্ট্রের পক্ষেও সমাজতান্ত্রিক গঠনের অনুকূলে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হবে, এবং রাষ্ট্রের পক্ষেও সেই পথে অগ্রসর হতে বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে। দেখা যাক্ আমরা কিভাবে এত বড় দাবি করছি।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা চাষবাস ছাড়া অন্যান্য কাজের একটা লম্বা ফর্দ দিয়েছি যার মধ্য দিয়ে গ্রামের সকল লোককে কাজে লাগানো যায় এবং পূর্ণোদ্যমে গ্রামদেশে কাজ শুরু করা যায়। দা, কাস্তে, কোদাল, বেল্চা, লাঙল, হাঁপর, চরকা, তাঁত, এটা সেটা যে সমস্ত হাতিয়ার (tools) গ্রামবাসীরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকে তাদের ফেলে না দিয়ে তাদের পূর্ণ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। যার যে বিদ্যা জানা আছে এবং আরো জানা সম্ভব তা সব প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া, আধুনিক যন্ত্রপাতি, এমন কি বিদ্যুৎ শক্তি যদি পাওয়া যায় তাও ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, এবং পরিকল্পিত উপায়ে rationalised way-তে অগ্রসর হতে বলা হয়েছে, কাজের দক্ষতা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে, এক ফসলী জমিকে দো-ফসলী জমিতে পরিণত করতে বলা হয়েছে। মোট কথা একটা অর্থনৈতিক জাগরণের (economic upsurge) বিরাট কর্মযোজনার কথা বলা হয়েছে। যদি তাই হয় তবে তার অনিবার্য ফল হবে প্রচুর উৎপাদন। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে এত উৎপাদিত মালের তখন হবে কি? এত মাল বিকোবে কোথায়? কে কিনবে? অথচ, কেনা-বেচা ছাড়া আমরা উৎপাদিত জিনিসের বণ্টন বা distribution-এর আর কোনো রাস্তা দেখি না। একমাত্র বাজারই হলো বণ্টনের উপায়, এবং বাজারটি হলো ধনতান্ত্রিক। সেখানে যে কোনো পরিমাণ মাল নিয়ে ওঠালেই হলো না—ক্রেতা থাকা চাই। এই বিক্রির সময়ই বিরাট গোলমাল। প্রথমত, জনসাধারণের বা দেশের লোকের যদি ক্রয়ক্ষমতা না বাড়ে তবে মালের কাট্‌তি হবে না। দ্বিতীয়ত, মালের গুণগত বিচার হবে, রুচিতে না ধরলে কিনবে না। তৃতীয়ত, মালের উৎপাদন খরচ (cost of production) যদি বেশি হয় তবে দাম বেশি হবে, বিকোবে না। চতুর্থত, মেশিনে তৈরি জিনিসের তুলনায় হাতে তৈরি জিনিসের দাম বেশি হবেই, ফলে হস্তশিল্পের জিনিস চালানো কষ্ট। পঞ্চমত, ব্যবসায়ীরা ও মহাজনেরা একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে মালপত্রের দামে ওঠানামা করিয়ে গ্রামবাসীদের হয়রান করতে ছাড়ে না, এবং এমন জলের দরে বিক্রি করতে বাধ্য করায় যাতে পরে গ্রামবাসীরা সে জাতীয় জিনিস উৎপাদনে উৎসাহ পায় না।

এ কেবল কুটিরশিল্পজাত জিনিসের বাজার সম্বন্ধে প্রযোজ্য, চাষজাত জিনিস সম্বন্ধে নয়, এমন কথা বলা যায় না। আজ হয়তো চাষজাত খাদ্যশস্যের চাহিদা খুব হয়েছে কেননা দেশে খাদ্যাভাব ঘটেছে, অজন্মা হয়েছে, এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজের ফলে consumer's goods বা ভোগ্যপণ্যের চাহিদা সাধারণভাবে একটু বেড়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যি দেশে যদি চাষের উপর উপযুক্ত নজর দেওয়া হয়, দোফসলের উৎপাদন বাড়ানো হয়, জলাভাব দূর করা হয়, intensive বা ঘন চাষ করা হয় তবে খাদ্যশস্য সম্বন্ধেও এই সঙ্কট উপস্থিত হবে। তরি-তরকারি, ধান, চাল, গম, ভুট্টা, পাট, তুলা, আখের দাম পড়ে যেতে থাকবে। তখন চাষজাত জিনিসের নিম্নতম দর বেঁধে দাও বলে চাষীদের আর্তনাদ শোনা যাবে। তাছাড়া, পৃথিবীর বাজারেও কখনো কখনো এমন অর্থনৈতিক মন্দা ও সঙ্কট আসে যার হাত থেকে বর্তমান ধনতান্ত্রিক বাজারের যুগে ভারতীয় গ্রামবাসীদেরও রেহাই থাকবে না। তখন চাষবাস লাটে উঠে যায়। কাজেই কেবল অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল উৎপাদন করলেই সব সমস্যা দূর হয় না, বাজারের সমস্যাটা চূড়ান্ত সমস্যা। যতদিন ধনতন্ত্র থাকবে ততদিন পর্যন্ত বাজার ছাড়া বণ্টনের দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। এই বাজার জটিল অর্থনৈতিক শক্তি সমূহের ক্রিয়াকেন্দ্র। এই বাজার কোনো একটা হাট বা গঞ্জের উপরেও প্রতিষ্ঠিত নয়, এই বাজার সমগ্র দেশের এমন কি সমগ্র পৃথিবীর বাজারের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই ধনতান্ত্রিক বাজারের উপর বর্তমান রাষ্ট্রের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কোনো রাজা ক্যানিউটের হুকুমের অপেক্ষা রাখে না এই বাজার। তাইতো দেখি কণ্ট্রোল করলে তা কার্যকরী হয় না, দর বেঁধে দিলে চোরা

কারবার চলতে থাকে, দুর্নীতি হুহু করে বাড়তে থাকে। এই দুর্নীতি ও কালোবাজার আমাদের চরিত্রদোষের জন্যই ঘটে না—চরিত্রদোষটা এখানে cause বা কারণ না হয়ে ফল (effect) মাত্র। অবশ্য চরিত্রদোষ ও সীমাহীন লোভও এই সঙ্কটকে বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু প্রচলিত বাজারের অন্তর্নিহিত নিয়মই মানুষকে এমন বে-কায়দায় ফেলে দেয় যে ভালমানুষ মন্দ হতে বাধ্য হয়, বে-আইনী কাজ করতে বাধ্য হয়—আর দুষ্ট লোকের তো কথাই নেই! তাছাড়া, ধনতান্ত্রিক বাজার প্রথার একটা মূল উদ্দেশ্য হলো মূলধনীয় মূলধন ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা এবং উচ্চতম লাভ উঠিয়ে নেওয়া—নইলে, ধনতন্ত্রই সম্ভব নয। অতএব ধনতন্ত্র যতদিন আছে, ধনতন্ত্র যতদিন প্রধান শক্তি হিসাবে থাকছে আমাদের দেশে, ততদিন কুটির শিল্পী, ক্ষুদে শিল্পী, মধ্যবিত্ত ও চাষী সম্প্রদায়ের অনেক কিছু আশা করা দূরের কথা, তাদের বেঁচে থাকার সাধারণ ব্যাপারটাই প্রাণান্তকর হতে বাধ্য।

(এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা মনে করিয়ে যাই যে, কুটিরশিল্পের শত্রু হলো ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতা। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা ও সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন কুটিরশিল্পের শত্রু নয়। ধনতান্ত্রিক ও সম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতাতেই কুটির শিল্প ধ্বংস হয়েছে। সমাজতন্ত্র বরং জনসাধারণের স্বার্থে কুটিরশিল্পকে রক্ষা করে যেতে পারে এবং তাদের উন্নত ও আধুনিক উপায়ে আরও বেশি উৎপাদনশীল করে নিতে পারে। সমবায় পদ্ধতিতে কুটিরশিল্পকে সমস্ত দেশ জুড়ে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলা, তাদের technical উন্নতি ঘটানো, সমগ্র জাতির পরিকল্পনার মধ্যে তার নির্দিষ্ট স্থান সংরক্ষিত করে রাখা সমাজতন্ত্রের পক্ষেই সম্ভব—ধনতন্ত্রের সে ক্ষমতা বা ইচ্ছা থাকতে পারে না।)

এখন আমরা আমাদের গ্রামে ফিরে যাই। এই যে বাজার সমস্যা এ সম্বন্ধে আমরা কী সমাধান ভাবতে পারি? আজ যা উৎপাদন হচ্ছে তা না হয কোনো মতে কেটে যাচ্ছে—মায় ক্ষতি স্বীকার করেও। গ্রামের চাষ ও শিল্প যা আছে এক রকম ভাবে চলছে প্রচলিত বাজার দিয়েই। কিন্তু আমাদের কল্পিত Economic Upsurge-এর, বিরাট উৎপাদনের কি অবস্থা হবে? এর উত্তরটা সহজ। এতদিন আমরা বাজার নামক এক নামহীন ক্রেতার জন্য তৈরি করতাম, এখন আমরা প্রধানত নিজেদের ভোগের জন্যই তৈরি করব (produce for our own use first)। যা কিছু তৈরি হবে অতিরিক্ত শ্রম, বুদ্ধি ও উপাদান খাটিয়ে, অতিরিক্ত চাষ করে ফল-ফসল, তরি-তরকারি ইত্যাদি, অতিরিক্ত ডিম, মাছ, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি—তা নিজেদের ভোগের জন্য ব্যবহার হবে না কেন? আমরা কি খুব বেশি খাচ্ছি, পরছি না কি? আমরা যে এতকাল না খেয়ে না পরে বাজারকে খাইয়েছি, পরিয়েছি। অবশ্য বাজারের চাহিদাও আমরা মেটাব এত শস্য আমাদের চাই বা দেশের খাদ্য গ্রামকেই যোগাতে হবে। তাছাড়া, শহরজাত জিনিস, লোহা-লক্কর, যন্ত্রপাতি, সেলাইকল, বইপত্র, কাগজ, সিমেণ্ট, ঔষধ ইত্যাদি আমাদের শহর থেকেই পেতে হবে, বাজার থেকেই পেতে হবে, এবং তা পেতে হবে চাষজাত, গ্রামজাত মাল দিয়েই। কাজেই বাজার আমরা বয়কট করছি না, এমন কি যত পারি বাজারেও চালান দেব, কিন্তু যে জিনিস বাজারে চলবে না, যার চাহিদা বাজারে মন্দা হয়েছে বা নেই সেই সব জিনিস নিজেদের মধ্যেই বিলি-বিনিময়ের মারফৎ বণ্টন করে ভোগ করব। আজ এমন জিনিসও আমরা বাজার থেকে, শহর থেকে কিনছি যা অতি সহজে গ্রামেই হতে পারে। কাপড়-চোপড় থেকে মায় সরষের তেলটা পর্যন্ত শহর থেকে আনছে হবে, অথচ তুলো ও সরষে আমরা গ্রামেই চাষ করি—শহর থেকে তা কাপড় ও তেল হয়ে আসতে এবং ঘুরে আসার পথেই গ্রামবাসীরা মার খেয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে।

বাস্তব দৃষ্টির বিচারে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বাজারকে বয়কট করার কথা কার্যকরী নয় এবং দরকারও নয়, (অবশ্য বাজারের উপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ দিনকে দিন বাড়ানো চাই)। বাজার প্রথার মারফৎ যার যা বেচাকেনা আছে, যার যা আয় হচ্ছে, রুজি রোজগার আছে তা আমরা বন্ধ করতে চাই না। কিন্তু চাষ ও কুটিরশিল্পজাত জিনিস যা আমরা পরিকল্পিত উপায়ে দুর্দান্ত পরিমাণে তৈরি করতে চাইছি তার চাহিদা যখন প্রচলিত বাজারে সীমাবদ্ধ, তখন সেগুলিকে নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে নেওয়া যায়। এমন কি তৈরি হবার পূর্বে হিসাব করে নেওয়া সম্ভব যে গ্রামে সত্যিকার আমাদের কি কি জিনিস কতটা দরকার। প্ল্যান কেবল তৈরি করারই হিসাব নয়, কি কি প্রয়োজন তার হিসাবও প্ল্যানের অন্তর্গত বিষয়। অতিরিক্ত ফলমূল, খাদ্যদ্রব্য, তেল, ঘি, গুড়, ডিম, মাছ, কাপড়, জামা, চাদর, জুতো, মশারি ইত্যাদি যা কিছু তৈরি হবে তা হিসাব করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এ ভাবে বহুকাল পর্যন্ত বহু মালের বিলি-বিনিময় চলতে পারে। আমাদের মত দরিদ্র, আধপেটা, নেংটা জাতির প্রয়োজন মেটাতে গ্রামদেশে স্বয়ং বিশ্বকর্মাকে অনেকদিন পর্যন্ত হিম্‌সিম্ খেতে হবে। কাজেই এখানে মাল পড়ে থাকার অবস্থা আসতে অনেক বাকি, যদি মাল পয়সা দিয়ে কেনা ছাড়াও অন্য উপায়ে পাওয়ার পথ করা যায়।

কেনাবেচার পথে, প্রতিযোগিতার বাজারে যে যন্ত্রদানবের সস্তা মাল বাজার ছেয়ে ফেলেছে, সেখানে প্রতিযোগিতা করে আজ কুটিরশিল্প দাঁড়াবে এ হয় না আজ। অতীতেও হয় নি। একদিন তো আমাদের দেশে, গ্রামে গ্রামে, কতই না কুটিরশিল্প ছিল—এই কুটিরশিল্পের মাল তখন পৃথিবীর বাজারে বিক্রি হতো। কুটিরশিল্পের শক্তি একদিন এত ছিল যে, ইংলণ্ডের শিল্পকে রক্ষা করতে ভারতীয় জিনিসের বিরুদ্ধে শুল্কের দেওয়াল দিতে হয়েছিল। সেই শক্তিমান কুটির শিল্প তো বেঁচে থাকল না—ইউরোপের যন্ত্র শিল্পের এবং ধনতন্ত্রের প্রতিযোগিতায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমরা উল্টে ওদের তৈরি কাপড় পরে লজ্জা নিবারণ করতে বাধ্য হলাম, ওদের তৈরি ঔষধ খেয়ে রোগ সারাতে লাগলাম, জলটা খেতে হলেও ওদের তৈরি গ্লাসটা পর্যন্ত নিতে হলো। অতএব সেই মৃতপ্রায় কুটিরশিল্পকে ও হস্তশিল্পকে আবার আমরা দেশবিদেশের যন্ত্রদানবচালিত ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী বাজারে প্রতিযোগিতা করে দাঁড়াতে পারি এটা শুধু স্বপ্ন নয়—দিবা স্বপ্ন। অর্থাৎ, কুটিরশিল্প যে পথে মানে ধনতন্ত্রের পথে ধ্বংস হয়ে গেছে ; পুনরায় সেই পথই অনুসরণ করে আমরা তাকে জাগাতে পারি এ হয় না, হতে পারে না। বাজারের পথ, ধনতন্ত্রের পথ, ব্যক্তিগত মুনাফার পথ কুটিরশিল্পকে ত্যাগ করতে হবে এবং নতুন পথে চলতে হবে। সে হলো সমাজতন্ত্রের পথে।

অথচ, কুটিরশিল্পকে বাদ দিয়ে আজ আমাদের দেশে সকলের জন্য কাজ দেওয়া অসম্ভব এ কথা দেশের সকল চিন্তাশীল ও অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে দ্রুত ভারী শিল্পায়নের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে—সেখানে স্বীকার করা হয়েছে যে, কুটিরশিল্প ছাড়া বেকার সমস্যা দূর করার কোনো উপায় নেই। দেশে আজ যত জোরেই কেন না শিল্পায়ন (industrialisation) করা হোক, সরকারি শিল্প যতই বাড়ানো হোক এই ক্রমবর্ধমান বেকার, দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার সমুদ্রে থৈ পাবার সাধ্য নেই যন্ত্রদানবের। এই দানব আজো আমাদের সমস্যার কাছে শিশুমাত্র।

বর্তমান রাষ্ট্রের কুটিরশিল্পের পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনায় অনেক গোঁজামিল ও অন্তর্বিরোধ আছে। এক তাঁত ছাড়া অন্য কোনো কুটিরশিল্প তেমন দাঁড়াতেই পারছে না, যদিও তাঁতই আজ চাষের পরে সবচেয়ে বড় কর্মদাতা। কিন্তু যেহেতু তাঁতীদের জন্য কোনো সমবায় সুতোকল করা হয় নি সেহেতু তাঁতীর সুতো কেনার সময় মস্ত লাভটা সুতোকলের মালিকেরাই লুফে

নেয়। অম্বব চরকার বিরুদ্ধে মিলমালিকদেব প্রচাবও বাধা পদে পদে। এবং সরকাব সে বিষয়ে শক্ত হতে ভয় পায়। কুটিবশিল্প ও চাষকে সমবায় ভিত্তিতে দাঁড় কবাবাব ইচ্ছা রাষ্ট্র প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাতেই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে আরম্ভ করা হয নি। এমন কি সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারের মধ্যেই নানা শক্তি বাধা দিয়ে চলেছে। তাছাড়া কুটিরশিল্পজাত জিনিসকে বাজারের প্রতিযোগিতায় বিক্রি করা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তাই তাবা ভাবতে পাবে না এবং বাজারের বর্তমান ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া শক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির কোনো সত্যিকাব হস্তক্ষেপ আজও হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের ব্যাপাবে সরকারি হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে বাজাবকে সমাজতান্ত্রিক বাজারে পরিণত করা—এ সব বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে দ্বিধার অন্ত নেই। ফলে কুটিরশিল্প দাঁড়াতেই পাবছে না। তাকে দাঁড় কবিয়ে রাখবাব জন্য সরকার থেকে প্রচুব টাকা ঢালা ছাড়া সত্যিকাব বিশেষ কিছু কাজ হয় নি। এই subsidy বা সাহায্য দিতে গিয়ে জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে। এই বোঝা বইলেই যদি কুটিবশিল্প আপন পায়ে দাঁড়াতে পারত তবে একটা সান্ত্বনাব কথা ছিল। ফলে জনসাধাবণেব মধ্যেও একটা গুঞ্জন শোনা যায যে, অতিবিক্ত ট্যাক্স দিতেও হবে অথচ কুটিবশিল্পের জিনিস বেশি দাম দিযে কিনতে হবে—দুদিক থেকেই লোকসান দিতে হবে কেন? এই সমস্ত জটিল পবিস্থিতি থেকে বেরিযে আসতে হলে রাষ্ট্রেব পক্ষে সাহস ও শক্তি না দেখালে চলবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশ জাতীযকবণ করতে হবে—অর্থাৎ, বাজারটি ধনীদেব কাছ থেকে নিজেদেব হাতে নিতে হবে। সমস্ত কুটিবশিল্পকে, গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমবায়েব উপর দাঁড় কবাতে হবে এবং চাষজাত জিনিসেব কেনাবেচা সমবায়েব হাতে নেওয়ার বাবস্থা কবাতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদেব বাতিল করে দিতে হবে শস্য কেনাবেচার বাজার থেকে। যাই হোক, এগুলো হলো রাষ্ট্রেব কর্তব্য। কিন্তু গ্রামবাসীবা এতদিন অপেক্ষা না কবে, নিজেরাই যথাসম্ভব এগিযে যেতে পাবেন এবং অতিরিক্ত মাল নিজেদের মধ্যেই বণ্টন কবে নিতে পাবেন এবং জীবনেব মান উন্নত করে নিতে পারেন।

ফালতু বা অতিবিক্ত শ্রম, ফালতু বুদ্ধি ও শিক্ষা, ফালতু জমি, ফালতু এটা, সেটা যা আজো গ্রামে এদিকে সেদিকে অকেজো হয়ে পড়ে আছে, যা কিছু বিক্ষিপ্ত সম্পত্তি বা scattered resources আছে সবকিছু—এমন কি ঝরা পাতাটাও যে সারের কাজ দেয—আজ কাজে লাগাতে হবে। মানুযেব যাবতীয় অবসর, মায ছেলেমেযে বুড়োবুড়ি সবার, যার যা গুণ আছে—কারো শক্তি আছে, কারো বুদ্ধি আছে, কারো এক ফালি জমি পড়ে আছে, কারো অন্য কিছু অভিজ্ঞতা আছে—সব কিছুকে সংহত বা mobilise করতে হবে গ্রামের সামগ্রিক উন্নতির কর্মযোজনায। যত পারো তৈরি কবো, যত পাবো চাষ করো, যত পারো মাছ, ডিম, মাংস, দুধ, ঘি, তেল, জামাকামড়, চাদর, মশারি, লেপ, কাঁথা, সতরঞ্চি, চেয়াব, টেবিল, মাটির পাত্র, বাসন, সাবান, জুতো, খড়ম, বেঞ্চি, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু গ্রামবাসীদেব দরকার তৈরি করো, কোনো বাধা নেই—এর জন্য যা কিছু কাঁচামাল দরকার যোগাড় করো, সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার কবো, বুদ্ধি খাটাও, সহযোগিতা করো, ইঁট করো, চূণ করো, বাড়ি কবো সবার জন্য, হৈ হৈ করে কাজে লেগে যাও,—এই হবে আন্দোলনের আওয়াজ। সমস্ত জিনিস গ্রামের সমবায় স্টোরে মজুত কবো, শ্রমের অনুপাতে সব কিছুর একটা দাম নির্ধারণ কবো, সবাই বসে সেই অনুযায়ী যার যা দবকার নিয়ে যাও আবাব যার যেমন কাজ তাকে সেই অনুপাতে পুরস্কৃত করো (to each according to his ability or labour)। সমস্ত কিছুর নিসাব নিকাশ রাখুক গ্রামের Audit Committee বা হিসাব কমিটি। বিলিবণ্টনের পরেও যদি অতিরিক্ত কিছু মাল

থাকে তা ভিন্ন গ্রামে চালান করো—নয়ত বাজারে অর্ধেক দামে ছেড়ে দাও, মরুক গিয়ে ব্যাপারীর দল তাদের শহরে জিনিস নিয়ে।

এখানে স্বদেশীব প্রেরণাটা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা আগে আমাদের গ্রামের জিনিস ব্যবহার করব, পরে বাইরের কথা। গ্রামের তৈরি কাপড়, শাড়ি, জামা, টেবিল, বেঞ্চি ইত্যাদি যদি মোটা ধরনেরও হয় তবু তাই ব্যবহার করতে হবে। গ্রামের নাপিত যদি ভাল চুল কাটতে না পারে তবু তাকে দিয়েই চুল কাটাতে হবে। দরকার হয় তাকে শহরে পাঠিয়ে এক মাস রেখে ভাল ছাঁটাই শিখিয়ে আনতে হবে। গ্রামের তৈরি জুতো যদি সুন্দর না হয় তবু তাই পরতে হবে। গ্রামের জুতো-শিল্পীকে বাইরে পাঠিয়ে ওস্তাদ করে আনতে হবে। এমনি ভাবে কুটিরশিল্পীদের শিক্ষিত ও দক্ষ করিয়ে নিতে হবে, সরকাবকে তাদেব জন্য নানা শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে হবে—নইলে সরকারের কাজ কি? শুধু ট্যাক্স আদায় করা? বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে ও টেক্‌নিক্যাল স্কুলে এ সমস্ত শিল্প শেখানো হবে, চাষের বিদ্যালয়ে চাষ শেখানো হবে। তার উল্লেখ পূর্বেই কবা হয়েছে। এইরূপে শিক্ষা আমাদের হাতের কাজের উন্নতি করবে, তাঁতেও সুন্দর সুন্দর জিনিস হবে, চিরকাল মোটা, ধ্যাবড়া জিনিস নিযে পড়ে থাকতে হবে না।

গ্রামের লোকের আয় ও উন্নতি কোনো একটি কাজের উপর নির্ভর করলে চলবে না। প্রত্যেককে পাঁচরকম দিক থেকে নিজের আয় পরিপূর্ণ কবতে হবে বর্তমান অবস্থায়। কোনো একটি বিশেয পেশা হয়ত প্রত্যেকেরই থাকবে। এবং, তাতে তার পূর্ণ দক্ষতা থাকা চাই। কিন্তু, তাছাড়াও, পাঁচ রকমেব উপরি আয়ের ও কাজের (subsidiary occupations) ব্যবস্থা প্রত্যেকের থাকা চাই, নইলে কারো অবস্থা স্বচ্ছল করা সম্ভব নয় বর্তমান উৎপাদিকা শক্তির low level বা স্বল্পতার জন্য। শুধু চাষেই কাবো চলবে না, শুধু তাঁত চালিয়েই কারো চলবে না, কেবল চরকা কেটেই কারো চলবে না—পাঁচ রকম আয় থেকে সংসার চালিয়ে নিতে হবে। সব রকম কাজ করতে রাজি থাকতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। শহরে এসেও সবাই সব রকম কাজ করতে বাধ্য হয়, জাতপাতের বিচার থাকে না। কাজেই ঘরে বসে যদি আমার বা আমার মা বোনের জন্য পাকা চামড়ায় চটিজুতো বানাই, যদি কাঠের কাজ নিজের ও অপরের বা সকলের জন্য করি তবে লজ্জা কি? শ্রমের মর্যাদা আজ সবার উপর দিতে হবে—কোনো কাজে লজ্জা নেই বরং গৌরব আছে। কোনো কাজ না জানাটাই আজ প্রধান লজ্জার কারণ। পুরানো যুগে জাতিভেদ ছিল বৃত্তির বা কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন সে সব কাজের ভাগ আর নেই। কোনো কাজের কি মর্যাদা তার মানদণ্ডও বদলে গেছে। আজ সবাইকে সব রকম কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, জন হিসাবে দক্ষতা বাড়িয়ে নিতে হবে। শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত লোকেদেরও কোনো না কোনো কায়িক শ্রম কিছু না কিছু করতে হবে, মাথার সঙ্গে হাতের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে, বুদ্ধিজীবীদের সাথে শ্রমজীবীদের পার্থক্য ও বিভেদ দূর করে দিতে হবে। নইলে গ্রামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এ বিষয়ে শিক্ষিত লোকেদেব এগিয়ে এসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া, কঠিন বাস্তব অবস্থার চাপে লোকের কুসংস্কার ও আভিজাত্য ও অহঙ্কার চুরমার হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ রকম কাজে নিযুক্ত হলে এবং সেভাবে সংসারের আয় সঙ্কুলান কবতে হলে কর্মভেদে যে জাতিভেদের প্রভাব তা দুর্বল হতে থাকবে। জাতিভেদ প্রথার দূরীকরণে এটাও একটা পথ। তাছাড়া আরো একটা সুফল এতে আছে। একঘেয়ে একই কাজ জীবনভর করে গেলে জীবনে বৈচিত্র্য থাকে না, শ্রমবিভাগ মানুষের জীবনে একটা খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়। পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে, জীবনের সমগ্র স্বাদ পেতে হলে প্রত্যেক মানুষের একাধিক গুণ ও বৃত্তিতে দক্ষতা থাকা দরকার। তাতেই মানুষের পরিপূর্ণ

ব্যক্তিত্ব বা integrated personality খোলে। খাপছাড়া, বিকৃত ও খণ্ডদৃষ্টির মানুষ নয়, গোটা গোটা মানুষ তৈরি করাই হলো সভ্যতার চবম লক্ষ্য।

এই যে দ্রব্য ও শ্রম বিনিময়ের মারফৎ গ্রামদেশে নূতন ধরনের এক বাজার তৈরি করার কথা বলা হলো তাতে জিনিসপত্র ও শ্রমের আদান প্রদান কেবল এক গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। অন্যান্য আশপাশ গ্রামের সাথেও এই বিনিময় ক্ষেত্র ও ব্যবস্থা চলতে পারে। তাতে এই প্রকাব বাজারের ক্ষেত্র বেড়ে যাবে। তাছাড়া শহরবাসীদের সমবায়ের সাথে গ্রামবাসীদের জিনিসের আদান প্রদান সম্ভব। শহরের যে সমস্ত জিনিস গ্রামে দরকার সে সব জিনিস যারা তৈরি করে সেই শ্রমিকদের সমবায় যদি থাকে তবে তাদের সাথে সোজা বিনিময় ব্যবস্থা রচনা করা সম্ভব হতে পারে। যেমন, বই, রামায়ণ, মহাভারত, নাটক-নভেল, বিজ্ঞান, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি যা শহরে তৈরি হয়—তার গ্রামদেশে চাহিদার অন্ত নেই যদি তা পয়সার বদলে (যা তাদের নেই বা খুব কমই আছে) অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া সম্ভব করে দেওয়া যায়। ছাপাখানার শ্রমিকদের ইউনিয়ন তাদের মালিকদের সাথে চুক্তি কবে অতিবিক্ত সময় খেটে অতিরিক্ত মাল তৈরি করে তাদের ইউনিযনের বা সমবায়ের স্টোরে মজুত রাখতে পারে। মালিকেরা যদি দেখে যে তাদেব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার দরুন তারা আরও একটি আয় পাচ্ছে এবং যদি দেখে যে, তাতে তাদের বাজার নষ্ট হচ্ছে না, যদি কাঁচা মালের খরচ মজুরেবাই দেয়, তবে অবসর সময়ে বসে থাকা মেশিনপত্র চালিয়ে অতিরিক্ত মাল তৈরির চুক্তিতে তাদেব রাজি করানো অসম্ভব নয়। ঔষধের কারখানায় অতিবিক্ত ঔষধ এভাবে মজুত করা যায়। প্রত্যেক কারখানায় এ জাতীয় অবস্থা করা সম্ভব। লোহা-লক্করেব ক্ষুদে মালিকেরা, যারা তাদেব কারখানা স্বাভাবিক অবস্থাযও চালাতে বেগ পায়, তারা গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিস, যথা—হাল, লাঙল, চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতি, কড়াই ইত্যাদি মজুরদের সহযোগিতায় একটা সমবায়ে stock কবতে পারে। এ সব মাল প্রচলিত বাজারের পথে কেনাবেচা হবে না—যাবে শহরের সমবায় মারফৎ সোজা চাষী সমবায়ে এবং চাষীরা তা শোধ দেবে তাদের অতিবিক্ত খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে, যা তারা গ্রামের সমবায়ে মজুত করেছে। এ কেবল সংগঠনেব কথা। একদিকে গ্রামবাসীদের সংগঠন, অপর দিকে শহরবাসী মেহনতী জনতাব সংগঠন। এভাবে মজুর, চাষী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে একটা ঐক্যের নূতন সূত্রও তৈরি হবে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে সৌহার্দ্যের রাস্তাও তৈরি হবে। শহরেব Trade union সঙ্ঘগুলি এবং Consumer's Society-গুলি এ ধরনেব কাজে হাত দিলে তাদের সঙ্গতি (resources) কত বাড়িয়ে নিতে পারে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি যাদের গ্রাম ও শহরে উভয় স্থানেই কাজ আছে তারা অগ্রসর হলে এ কাজ আবও কত সহজ হয়। তাছাড়া, সরকার যদি সাহায্য করে তবে তো কথাই নেই। এ ভাবে বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত সঙ্গতিগুলিকে গুছিয়ে অগ্রসর বলে উৎপাদন ও বণ্টনের একটা নতুন রাস্তা তৈরি করা সম্ভব। তাব মধ্য দিয়ে জনসংগঠন ও ঐক্যও কত বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

দ্রব্য বিনিময়, শ্রম বিনিময় ইত্যাদি কথা শুনে কারও আঁৎকে ওঠার কারণ নেই যে, এ বুঝি অতীত যুগে ফিরে যাওয়া হচ্ছে—barter এর যুগে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু তা নয়। বরং ভবিষ্যৎ যুগের দিকে অগ্রসর হতে বলা হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে যাদের লেখাপড়া আছে তারা জানেন যে, সমাজতন্ত্রে Commodity Production ও তার বণ্টন ব্যবস্থা থাকবে না—বস্তুবিনিময় বা Exchange of Goods between Cities and Villages, between Country and Country—গ্রামে ও শহরে, এক দেশের সাথে অপর দেশের মালের চলাচল হবে এই বস্তু বিনিময়ের মানদণ্ডে।

আজকে যে কয়টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে সে সব দেশের অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ এই পথে চালিত হয়,—বাইরের টাকা পয়সার মূল্যামূল্য নির্ধারণ পরিকল্পনা এই বিচার থেকে ঘটে থাকে। শ্রমের অনুপাতে মজুরি ও দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ। তাছাড়া, যে কোনো দেশের, তা সমাজতান্ত্রিক হোক্ বা ধনতান্ত্রিক হোক্, বহির্বাণিজ্যটা আসলে Export এবং Import এর মাধ্যমে বস্তু বিনিময়ই। এ ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিনিময়ের অসুবিধা এড়াবার জন্য পশ্চিম ইউরোপে European Exchange System বলে বিরাট স্বয়ংচালিত বে-সরকারি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যেখানে বস্তুই মাত্র লেনদেনের উপায়।

যাহোক, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বস্তুবিনিময়ের যে পরিকল্পনা করা হলো তা যে এক্ষুনি প্রথমেই শুরু করতে হবে এমন নয়। দেখানো হলো এইজন্য—এর ভবিষ্যৎ কত বড় করা যায়। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সংগঠনের উপরে সব কিছু নির্ভর করে। ধীরে ধীরে ছোট ছোট প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে নিতে হবে, ভয় ও সংকোচ দূর করতে হবে এবং ক্রমশ বড় বড় কাজে হাত দিতে হবে এবং একদিন শহর ও গ্রাম সমবায়ের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের রাস্তাও খুলতে হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতা ছাড়া কারো কথায় তারা সহসা মস্ত ঝুঁকি নিতে যাবে না। কেবল প্ল্যান বা idea দিলেই হলো না—কার্যকরী ক্ষমতা, গঠনশিলতা, সংগঠনশক্তি, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, able management, অপচয়ের সুড়ঙ্গ দূর করা, সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সতর্কতা, আত্মসমালোচনা ইত্যাদির উপরে সমস্ত আদর্শ প্ল্যান কায়েম হওয়া নির্ভর করে। এজন্য কর্মীদের যোগ্যতার উপর খেয়াল রেখে কাজের গতিবেগ বাড়াতে কমাতে হয়। মানুষের কত শক্তি আজ বসে বসে নষ্ট হচ্ছে, কত উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তির বিকাশই করা হচ্ছে না, কত সদবুদ্ধি ও সৎ প্রেরণা কেবলমাত্র ক্ষেত্রের অভাবে, কাজের অভাবে সফল হতে পারছে না। এ সব গুছিয়ে একত্র করে কাজে সংযোজিত করতে পারলে কত বড় বড় কাজে না হাত দেওয়া যায়।

॥ ৯ ॥

সমাজের রূপান্তর

সমস্ত ভারতবর্ষে আজ জাতীয় সম্পত্তি (Public Sector) আর ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য (Private Sector) এর দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠছে। কার স্থান কতটুকু তা নিয়ে প্রবল বিতণ্ডা, সংগ্রাম ও রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি তাও বুঝে নিতে হবে এবং গ্রামদেশেও এর কোনো তাৎপর্য আছে কিনা তা দেখতে হবে। Private Sector বা ব্যক্তিগত মালিকানার চেয়ে সরকারি সাধারণ বা জাতীয় মালিকানার ক্ষেত্র যদি বড় না হয় তবে সমাজতন্ত্র হতে পারে না, আয়ের ক্রমবর্ধমান দূরত্ব দূর করা যায় না, সমাজতান্ত্রিক সমানাধিকাবের সুযোগ সবাইকে দেওয়া সম্ভব হয় না। যে পরিমাণে জাতীয় সম্পত্তির ক্ষেত্র বেড়ে যাবে সেই পরিমাণে সমাজতন্ত্র অগ্রগামী হবে। কাজেই ধনতন্ত্রবাদীরা পদে পদে তাতে বাধা দেবেই। এটাই হলো আজ ভারতের অন্তর্নিহিত ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এই লড়াই গ্রামদেশে কি ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, গ্রামদেশে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে কি কি শক্তি কাজ করবে আর তার বাধাই বা কতটুকু? গ্রামদেশে সম্পত্তির লড়াই কি রূপ গ্রহণ করছে নতুন সমাজগঠনের পথে?

গ্রামদেশে আমবা তিন বকমেব সম্পত্তি প্রথা লক্ষ্য কবি। যথা ঃ—

(১) সমষ্টিগত ক্ষেত্র বা collective sector।

(২) সমবায ক্ষেত্র বা co operative sector।

(৩) ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বা private sector।

গ্রামে সমষ্টিগত সম্পত্তি আজ বেশি কিছু নেই। তাহলেও গ্রামেব স্কুল, ডিস্‌পেন্‌সাবি বাস্তা, গোচাবণভূমি এগুলি সমস্ত গ্রামেব সমষ্টিগত সম্পত্তি। এই সমষ্টিগত সম্পত্তিব ক্ষেত্র বাডাতে হবে সাক্ষাৎ উৎপাদনেব ক্ষেত্রে। নতুন নতুন শিল্প বা আধুনিক শিল্প যাতে নতুন জ্ঞান, অনেক লোক ও বিস্তব মূলধনেব প্রযোজন সেগুলিকে প্রথম থেকেই সমষ্টিগত গ্রামসম্পত্তি হিসাবে দাঁড কবাতে হবে—যেমন, ইঁট তৈবি ও পোডানো, বিদ্যুৎশক্তি যেখানে পাওযা যায সেখানে তাব সাহায্যে ছোট গ্রাম্য কাবখানা—যথা, শক্তিচালিত তাঁত (Power loom) ছোটো সুতো কল, ঠাণ্ডা ঘব (Cold storage), মোটব ট্রাক, ট্রাক্টব, বেডিও, অম্বব চবকাব পবিশ্রমালয, সাবানেব কাবখানা ইত্যাদি সমষ্টিগত গ্রামসম্পত্তি হিসাবে দাঁড কবানো যায। বলা বাহুল্য, এই গ্রাম সম্পত্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক—ধনতন্ত্র এখানে নেই, আব নেই শোষণেব কোনো ক্ষেত্র।

গ্রামেব সমবায ক্ষেত্র, Co operative sector এব ভবিষ্যৎ খুব। প্রত্যেকেব ব্যক্তিগত বৃত্তি ও সম্পত্তিকে সমবাযেব মধ্যে সংযোজিত কবে সমবেত প্রচেষ্টা বা service এব সাহায্য প্রত্যেকে নিতে পাবে। এখানকাব সম্পত্তিব ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত, অথচ তাব ব্যবহাব হল সমবেত (Individual property but its collective use)। সমবায আন্দোলনেব সুবিধা এই যে, সকল সম্পত্তি এক কবে ফেলতে অনেকেবই আপত্তি থাকতে পাবে এবং হঠাৎ তা কবতে গেলে বিপদও আছে। এমনও হয—যেমন ভাগেব মা গঙ্গা পায না—সম্পত্তি সবাব কবতে গিযে তা কাবোবই যেন সম্পত্তি নয, এমনি ধবনেব দাযিত্বহীনতাব ভযও থাকে। কাজেই দাযিত্বশীলতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি না কবিযে সকল সম্পত্তি এক কবাব অতিবিক্ত ঝোঁকটা ভাল ফল দেয না। অভিজ্ঞতাব মধ্য দিযে ও শিক্ষাব মধ্য দিযে মানুষেব নতুন সামাজিকবোধ, সমষ্টি চেতনা বাডিযে নিতে হবে। সমবায প্রথা হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তিব সমষ্টিগত সাহায্যগ্রহণ। সম্পূর্ণ সমষ্টিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দুইযেব মাঝামাঝি একটা অবস্থা হলো—সমবায সম্পত্তি ও সমবায যোজনা। ব্যক্তিগত সম্পত্তিব interest ও initiative এব মধ্যে বইল, আবাব স্বার্থপবতা ও কূপমণ্ডুকতা কিছুটা খর্ব কবে সমবেত সাহায্যেব, পবস্পব সাহায্যেব বা mutual aid এব সুবিধাও বইল। এ একটা মধ্যবর্তী অবস্থা ও পবিবর্তনশীল অবস্থা (transitional stage)। এখানে collective বা সমবেত ক্ষেত্রটা আছে বলে এই ক্ষেত্রটাও আধা সমাজতান্ত্রিক বা semi-socialist। আব এব মধ্যেও কোনো শোষণেব ক্ষেত্র বাখতে নেই, কেননা শোষণ যেখানে আছে সেখানে সহযোগিতা বা সমবায সার্থক হতেই পাবে না। এই সমবায ক্ষেত্র অনেক বকমেব, যথা ঃ

(১) সমবায চাষ।

(২) সমবায কুটিব শিল্প।

(৩) সমবায ক্রয বিক্রয সমিতি।

(৪) সমবায ব্যাঙ্ক।

(৫) সমবায গোপালন।

(৬) শ্রম সমবায়—গ্রাম্য মজুবদেব সংগঠন, বা কন্‌ট্রাক্টবকে বাদ দিযে, সোজা বাস্তাঘাট তৈবি কবাব চুক্তি নেবে সবকাব বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে।

(৭) পরস্পর শ্রম সাহায্য বিনিময় ও শ্রমদান অবশ্য প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে—অর্থাৎ, সমষ্টিগত ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং গ্রাম-সম্পত্তি গঠনের মস্ত মূলধন বা হাতিয়ার।

আরো একটি সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে গ্রামদানী গ্রামগুলিতে। সেখানে সকল জমি গ্রামীকরণের ফলে সমবেত প্রচেষ্টা ও সমষ্টিজীবন গঠনের অনুকূলে বিরাট সুবিধা দেখা দিয়েছে। জমির ক্ষেত্রেই এই নূতন জীবন সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, শিল্প-বাণিজ্য যা কিছু গড়ে উঠবে সেইসব গ্রামদানী গ্রাম, তাতেও শোষণহীনতা ও স্বার্থহীনতা মস্ত প্রেরণা হয়ে দাঁড়াবে। সেখানে সমাজতান্ত্রিক কেন, তার অগ্রবর্তী সাম্যতন্ত্র বা সর্বোদয়ী সমাজ গড়ে তোলাও সম্ভব, যার দৃষ্টান্ত ও উদার আহ্বান আশেপাশের সমস্ত গ্রামকেই আকর্ষণ করতে থাকবে: জমির গ্রামীকরণ হলেই চলবে না, দেখতে হবে কার্যক্ষেত্রে এই নতুন ব্যবস্থার ফলে সকলের খাওয়া-পবা ও জীবনযাত্রাব মান বেড়ে গেছে, নতুন সভ্যতার স্বাদ সবাই পেয়েছে। যাহোক, গ্রামদান জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিকতার একটা শক্তি এবং তা গ্রামদেশে কোথাও কোথাও চালু হয়েছে।

যাক্ উপরে তিন বকমের সমাজতান্ত্রিক শক্তির যোজনা দেখতে পেলাম গ্রামদেশে। বাকি রইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি যোজনার ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটা সবচেয়ে বড়। গ্রামের বর্তমান চেহারা এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারই উপর। এর তুলনায় সমষ্টিগত ও সমবায় ক্ষেত্র অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সবেচেয়ে বড হলেও সবচেয়ে শক্তিমান নয়, বরং অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে খুব শক্তিমান সেখানে তারা কোটিপতি, লক্ষপতি—বিস্তর লোকের শ্রম নিয়োগ ও শোষণ করে তা চালু আছে। গ্রামদেশে এ জাতীয় সম্পত্তি নেই। তাছাড়া জামিদারী প্রথা উঠে যাওয়ার ফলে জমিদারবর্গের ক্ষমতা আজ লুপ্ত। জোতদার শ্রেণীর জুলুমটা আছে, কিন্তু তাকে ceiling-এ (ঊর্ধ্বতম জমির পরিমাণ নির্দেশ) বাঁধবার চেষ্টা সমগ্র দেশ থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকবে। কায়দা কৌশল করে সম্পত্তি হস্তচ্যুত করার চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। মহাজন শ্রেণীর ক্ষমতা যদি সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নিতে পারে তবে মহাজনদের ক্ষমতাও গ্রামদেশে লুপ্ত হবে। আর আড়তদার ও ব্যবসাদারদের ব্যবসায় যদি গ্রামের সমবায়গুলি নিয়ে নিতে পারে তবে এই শ্রেণীর শোষণকারীদেরও গ্রামদেশ থেকে উচ্ছেদ করা সহজ হবে। অথচ এই কয়েকটি ক্ষুদে ধনতন্ত্রবাদীদের (জোতদার, মহাজন আর ব্যবসায়ী) দিন ফুরিয়ে এসেছে এবং এদেরকে হঠানো আজ গ্রামবাসীদের আয়ত্তাধীন। এ কাজ করা মোটেই শক্ত হবে না আজকের পরিস্থিতিতে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগবার মতো শক্তি গ্রামদেশে যা কিছু আছে তা এই তিনটি শ্রেণী, যাদের শক্তি অন্যান্য সকলের তুলনায় কিছুই নয়।

আর বাকি যে সব সাধারণ গৃহস্থ সম্পত্তি আছে তাতে মারাত্মক কোনো শোষণের ক্ষেত্র নেই। দু'একটা মজুর যা তারা লাগায় সেই শোষণের ক্ষেত্র দিয়ে তাদের পক্ষে ধনী হবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। বস্তুত তাদের সম্পত্তি ক্রমশ ক্ষয়ের পথে চলেছে। তাই তারাও যদি ক্রমশ সমবায় সংগঠনের মধ্যে না আসে তবে তাদের সম্পত্তি উঠে যাবে। এই অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গ্রামবাসীদের তো আমরা উপরোক্ত নানা সমবায়ের মধ্যে এনে ফেলতে চাইছি—ফলে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকছে না, ক্রমশ তারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও জমিগুলিকে সমবায়ের মধ্যে এনে সর্বসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন করবে। বস্তুত এই কাজ করার জন্যই সমবায় প্রথা অর্ধ সমাজতান্ত্রিক এবং ক্রমশ তা পূর্ণ সমাজতন্ত্রের পথেই অগ্রসর হতে বাধ্য ইতিহাস, বাস্তব অবস্থার চাপ ও যোগ্য নেতৃত্বের ফলে।

যারা দরিদ্র চাষী আর ভূমিহীন তাদের কথা তো ধনতন্ত্রের সহায় রূপে ওঠেই না। তারা সকল প্রকার সমাজতান্ত্রিক সংযোজনায় সবার আগে এগিয়ে আসবে। গ্রামকর্মীদের সবার

প্রথমে তাদেরই প্রতি নজর দিতে হবে। বিশেষ প্ল্যান, বিশেষ সাহায্য ও চেষ্টা দ্বারা তাদেব দুরবস্থা দূব করার দায়িত্ব সবার আগে। তাদের জাগাতে না পারলে সমগ্র গ্রামকে জাগানো সম্ভব নয়, সকল কাজের গোড়া আজও তারাই। তাঁদের সংশয়, তাদের সন্দেহ যদি দূর করতে না পারা যায় তবে বুঝতে হবে কর্মীর সৎ উদ্দেশ্যের কোনো প্রমাণই হলো না। এই প্রমাণ না হলে কর্মী হিসাবে তার দান এবং সকল চেষ্টা বৃথা।

জোতদাব, মহাজন ও আড়তদার বা ব্যবসাদার ছাড়া আজ গ্রামদেশের অন্যান্য সম্পত্তি যদিও তা ব্যক্তিগত—সমাজতন্ত্রের পথে বাধা হবে না। গ্রামদেশে সমাজতন্ত্রের পক্ষে আরো একটা অনুকূল শক্তি অতি শীঘ্রই মুক্ত করা যায়—সে হলো সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ ও সে বিষয়ে সমানাধিকার সৃষ্টি করা। সমাজতন্ত্রের পথে শিক্ষার কি ভূমিকা সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব গ্রামদেশে নীচে থেকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত ও অনেক সহজ। সেখানে একটা ব্যাপক ও শক্তিশালী নবজীবনের আন্দোলন ও কার্যকলাপ আজই সৃষ্টি করা যায়, রাষ্ট্রের হুকুমের অপেক্ষা না করেও। বরং শহর ও বড় বড় নগরেও সমগ্র দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনতন্ত্রের, সাম্রাজ্যবাদের ও কায়েমী স্বার্থের শক্তি আজও অটুট ও ভয়ঙ্কর।

সরকারের উর্ধ্বতম মহলে আমলাতান্ত্রিক ব্যুরোক্রেসির দুর্গ ভেদ করে সমাজতান্ত্রিক ধঁচে দেশগঠনের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন বোধ হচ্ছে। তাই ভারতের সমাজতান্ত্রিক গঠনের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যম জনসাধারণের মনে কোনো দাগ কাটছে না। কেননা তা এতই ক্ষীণ ও এতই শম্বুকগতিসম্পন্ন যে দেশ এগুচ্ছে না, পেছুচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথে তা জনসাধারণ বুঝতেই পারে না। কাজেই শহরে, নগরে, বন্দরের, রাজধানীতে আজ ধনতন্ত্রের প্রধান শক্তি। গ্রামদেশে ধনতন্ত্র আজ দুর্বল। গ্রামদেশে জনসাধারণ সমাজতন্ত্র গঠনে অগ্রসর হতে পারে। এ কাজ আজই গ্রহণ করা সম্ভব। তার মানে এই নয় যে, সর্বভারতীয় যোজনায় ভারত রাষ্ট্রের আইন কানুনেব কোনো দরকাব নেই। লোকসভা ও অন্যান্য আইন সভায় যে সমস্ত প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি আছে তারা সর্বভারতীয় বাধাগুলি দূর করুক, তারা সমাজতান্ত্রিক আইন-কানুন চালু করুক, তারা ভারী ভারী শিল্পের যোজনা ও শিল্পায়ন করুক। তাবা আরও সচেতন ও সাহসী হোক, দৃঢ় হোক। এ সবই দরকার। কিন্তু ওদের ভরসায় যদি গ্রামবাসীদের বসে থাকতে হয় তবে তাদের এ জীবনে সমাজতন্ত্র দেখে যেতে হবে না। নিজেদের প্রত্যক্ষ ও আশু শক্তিটাকে তাদের আপন গ্রামেই প্রয়োগ হবে তাদের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দ্বারা—যারা পার্লামেণ্ট দখল করে উপর থেকে সমাজতন্ত্রের পথ খোলসা করবে। তারা তাদের কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করি। তাদের কাজ ও আমাদের কাজে কোনো বিরোধিতা নেই। আমাদের কাজ তাদের শক্তিকেই বাড়াবে, এবং তাদের কাজ আমাদের কাজকেই সাহায্য করবে। দু'য়ের কাজ মিলিত হয়ে নতুন ভারতবর্ষের নতুন রাষ্ট্র গড়া ও গঠনতান্ত্রিক বিপ্লব দুর্দান্ত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

নৌ-বিদ্রোহ

পরিশিষ্ট

নামকরণ

এই ছোট পুস্তকটির লেখক শ্রী বি. সি. দত্তের পুরো নাম, শ্রীবলাই চন্দ্র দত্ত। বর্ধমান জেলার কোনো এক গণ্ডগ্রামে এঁর জন্ম। নৌবিদ্রোহের সময় এঁর বয়স ছিল মাত্র ২০ বৎসর। ইনিই সর্বপ্রথম "জয়হিন্দ" ধ্বনি তোলেন বলে অভিযুক্ত হন—২রা ফেব্রুয়ারি বন্দী হন। এঁকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিক্ষোভ ধীরে ধীরে মূর্তিমান হয়ে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। টেলিগ্রাফিস্ট আর কে. সিংয়ের সত্যাগ্রহকেই প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। সিংহ ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হন। একথা স্মরণে রাখা দরকার বিদ্রোহীদের নেতা বলে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন, বা কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটির সদস্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কারুর বয়সই ২৩/২৪-এর বেশি ছিলনা। এই বৃহৎ ব্যাপারটি রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ যুবকদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল।

লেখক শ্রীদত্ত সুন্দর ইংরাজিতে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। সেই পাণ্ডুলিপির ইংরাজি শিরোনামা হল, রিভোল্ট অব দি ইনোসেন্টস্, (Revolt of the Innocents)। এই সুন্দর নামকরণটির সুষ্ঠু বঙ্গানুবাদ করা সম্ভব হয়নি বলে আমরা নামকরণ করেছি 'নৌ-বিদ্রোহ'। নাবিকেরা যা করেছিলেন, তাকে ঠিক মিউটিনি (Mutiny) বা বিদ্রোহ বলা যায় কি-না, এ তর্ক আছে।

ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনীতে ধর্মঘটের অধিকার কখনই স্বীকার করতে পারে না এবং ধর্মঘট যদি সৃষ্টি হয়ও তাকে Mutiny বলে আখ্যায়িত করে দমন করার চেষ্টা করবেই। প্রকৃত ঐতিহাসিক বিচারে এই ঘটনাটি ধর্মঘট হিসাবেই গৃহীত হবে, যদিও সশস্ত্র নাবিকদের ধর্মঘট। একথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে এই ধর্মঘট প্রথমেই অস্ত্রহাতে বিদ্রোহের আকার ধারণ করেনি। বরং সশস্ত্র নাবিকেরা অস্ত্র ত্যাগ করে অনশন দিয়ে ধর্মঘট শুরু করেন। সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের পক্ষে নিজেদের স্বেচ্ছায় নিরস্ত্র করে অনশন ধর্মঘট করা—এই চরম গান্ধীবাদী দৃষ্টান্তটি মহাত্মা গান্ধীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি দেখে আজ আশ্চর্য বোধ করা যায়। এটা ইতিহাসের একটি নিষ্ঠুর পরিহাসও বটে! মহাত্মা গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন যে ধর্মঘটী নাবিকেরা অহিংসার পথ নেয়নি. যদি নিত, এবং যদি তাদের প্রতি ব্যবহার তাদের ও দেশের আত্ম সম্মান বোধের হানিকর হয়ে থাকে, তবে তাদের কাজে ইস্তফা দেওয়াই উচিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীর একথা স্মরণ করা উচিত ছিল যে সৈন্যবাহিনীতে বা নৌ-বাহিনীতে কারও পদত্যাগ বা কাজে ইস্তফা দেওয়ার অধিকার থাকে না।

যাই হোক, এই অনশনব্রতী নৌ-বাহিনীর রেটিংরা শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়তে বাধ্য হন, কিন্তু অস্ত্রশক্তির সুবিধাগুলি তখন তাঁদের হস্তচ্যুত। আর প্রতিপক্ষ প্রতি আক্রমণে সমুদ্যত ও অনেকটা প্রস্তুত। কেমন করে একটি নিরীহ অনশন শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের আকার নিল? এবং সেই বিদ্রোহ কেমন করে তার রাজনৈতিক চেহারা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে অসমর্থ হল, তার বর্ণনা এই অনভিজ্ঞ বিদ্রোহী যুবক বলাই দত্তের চোখে যতটুকু ধরা পড়েছে তার সমর্থনে আমরা এই পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে বিভিন্ন নেতা. দল, উপদলের কার্যকলাপ ও বিবৃতির ঐতিহাসিক রেকর্ড তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম।

এই ধর্মঘট নেহাৎ সাধারণ ধর্মঘট নয়, সেদিনের সেই সর্বভারতীয় বিপ্লবের বাতাবরণে নৌ-বাহিনীর রেটিংদের অনশন ধর্মঘটটা তো দূরের কথা, ভারতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনজাগরণের প্রতিটি পদক্ষেপ বৈপ্লবিক আগ্নেয়গিরির দ্যোতক হতে বাধ্য। সামান্য ঘটনাটিও অসামান্য তাৎপর্যবহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রিভোল্ট অব দি ইনোসেন্টস (Revolt of the Innocents)-এর বাংলা অনুবাদটির নামকরণ হয়তো 'অবোধ বিদ্রোহ' বললে খুব অন্যায় হতো না। তবু পাঠক-পাঠিকারা হয়তো অবোধ ও নির্বোধের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না-ও পারতেন, এবং ভারতের ইতিহাসের গর্ভে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ শৈশবকালীন অবোধ আকুতির তাৎপর্য না-ও ধরতে পারেন, —পণ্ডিত নেহরুর মতো সবটাকেই অর্বাচীন শিশু-রোগ বলে আখ্যায়িত করতে পারেন, সেজন্যই আমরা 'অবোধ বিদ্রোহ' কথাটি ব্যবহার না করে বহু প্রচলিত 'নৌ-বিদ্রোহ' কথাটিই ব্যবহার করলাম।

মিউটিনি

রেটিং-রা বিদ্রোহ করেছে কি-না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু ২৭শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) বোম্বেতে বলেছিলেন,—

"আমি জানি সশস্ত্র বাহিনীতে ধর্মঘট বলে কোন শব্দ নেই। সেখানে হয় সব কিছুই ডিসিপ্লিন (Discipline), নয়তো মিউটিনি (Mutiny)। যদি সেখানে দুটি ব্যক্তিও একটি যুক্ত দরখাস্ত করেন, তবে সেটাকে মিউটিনি বলে ধরা হয়। যে কোনো প্রতিবাদপত্র অথবা সম্মিলিত চিঠি এ জগতে মিউটিনি বলেই আখ্যাত হয়। যাঁরা ইংরিজি জানেন, তাঁরাই বলুন এই ঘটনার জন্য কোন শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। আমার কাছে ঘটনার প্রতিশব্দ কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি করছে না। কিন্তু, একথা অত্যন্ত সহজবোধ্য যে যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা এত কঠোর যে অত্যন্ত ভদ্রভাবে লিখিত একটি যুক্তি-আবেদনও নিয়মভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্তি হয়, সেখানে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অগ্রসর হওয়ার কোনো পথ থাকে না। সেখানে হয়তো তথাকথিত 'মিউটিন' করা ছাড়া পথও কিছু থাকে না। হয় সেখানে কিছুই করার উপায় নেই, নয়তো, অফিসিয়াল ভাষায় যাকে মিউটিনি বলে তাই-ই করতে হয়।"

সীমাবদ্ধ পরিস্থিতি

শ্রী দত্ত তাঁর নিজের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই যতটা দেখতে পেয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। নৌ বিদ্রোহের সর্বভারতীয় সব তথ্যের আনুপূর্বিক বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে নৌ বিদ্রোহ অবসান হবার সাথে সাথে তাঁকে অন্যান্যদের সাথে অন্তরীণাবদ্ধ হতে হয়—তাই ঘটনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করার সুযোগও থাকে না -তাছাড়া সেই পরিপূর্ণ হতাশার মধ্যে নিজেদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের মূলেও আঘাত করে—সমস্ত ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন মনে করে সবাই ভুলবার চেষ্টা করেন।

রুশ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে

"রুশ বিপ্লবের ইতিহাস" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে ট্রটস্কী একখানে লিখেছেন, যুদ্ধের পূর্বে (১৯১৪-১৮) রাশিয়াতে শ্রমিক-চাষী আন্দোলন বিস্তৃত ও তীব্র হয়, বলশেভিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ও খুবই বাড়ে, ধর্মঘট প্রায়ই দেখা দেয়, কিন্তু যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে সব সংগ্রাম বন্ধ হয়ে যায় বলা যায়, সংগ্রামী কর্মীদের অনেকেই যেন যুদ্ধের ডামাডোলে

কোথায় হারিয়ে গেল ; ধর্মঘটের হার দ্রুত কমে যেতে থাকল, পার্টির কাজকর্মও যেন শিথিল হয়ে গেল, জনসাধারণের চেতনা যুদ্ধের উত্তেজনা, স্বদেশপ্রেম ও দেশরক্ষার আওয়াজে যেন বিলীন ও নিস্তব্ধ। তবে কি যা কিছু রাজনীতি, শ্রেণী-সংগ্রাম সবই ফাঁকা কথা, জনচিত্তে তার কি কোনোই স্থায়ী মূল্য নেই, নির্ভরযোগ্য মূল্য নেই? ১৯১৭ সাল যেই এল, যুদ্ধক্লান্ত চাষী ও মজুরেরা যারাই যুক্তফ্রন্ট সৈনিক, নাবিক হিসাবে লড়ছিল—লক্ষে লক্ষে দেখা গেল তারা কিছুই ভোলেনি। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের শিক্ষাদীক্ষাও ভোলেনি, আব ভোলেনি তার পরের নিত্যদিনের সমগ্রামের কথা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বলশেভিক পার্টির কথাও ভোলেনি। 'যুদ্ধ চাইনা—শান্তি চাই—জমি চাই'—ইত্যাদি বাণীর মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় যে বিপ্লব শুরু হলো—তা দেখা দিল সমস্ত সীমান্তেও। সীমান্ত ছেড়ে হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে দেশের ভিতর পানে অস্ত্র হাতে ছুটছে বিদ্রোহী নাবিক ও সৈনিকেরা।

তাদের বিপ্লবী পদধ্বনির ক্রমবর্ধমান আওয়াজ আসছে পেট্রোগ্রাদ ও মস্কোর দিকে। ট্রটস্কী তাঁর অনবদ্য অননুকরণীয় ভাষায় সীমান্ত ফেরৎ বিদ্রোহী সৈনিকদের সেই দৃপ্ত পদধ্বনি অপূর্ব ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন। আব কেমন করে জীবনের কঠিন সংগ্রামে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলিকে, অতীত সংগ্রামেব যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেরাই সর্বত্র সোভিয়েত বা বিপ্লবেব হাতিয়াব ও পাল্টা সবকাবের বুনিয়াদ রচনা কবে যাচ্ছে —বলশেভিক পার্টির হুকুমের অপেক্ষা রাখছে না—সে চিত্রও ফুটিয়ে তোলেন।

নৌ-বিদ্রোহের তাৎপর্য

ভাবতের নৌ-বিদ্রোহেবও সেই তাৎপর্যই ছিল, যুদ্ধ শেষে নাবিক, সৈনিক, শ্রমিক, বৈমানিক সবারই মধ্যে বিদ্রোহ প্রবণতা জেগে উঠেছিল ; হারিয়ে যাওয়া জাতীয় সম্বিৎ ও শ্রেণীচেতনা মাথা তুলে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কার্যকলাপের ইতিহাস যখন প্রকাশ হযে পড়ল তখন এদের চেতনায় আগুন ধবে গেল, ১৯৪২ সালের পরাজিত সংগ্রামের প্রতিশোধ নিতে দেশের সর্বত্র একটা জাগরণ দেখা দিল। যুদ্ধের দ্বারা—সে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই হোক আব জনযুদ্ধ'ই হোক—তারা যে কত প্রতারিত হয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল। নেতাজী সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিসন্ধিটা যে কত জঘন্য ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রজাত ছিল সে প্রত্যয়ও তাদের হলো।

সীমান্ত-ফেরৎ রুশ-নাবিক ও সৈনিকদের বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত হলো, অথচ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি কারণ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী চেতনা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে পরিণত তো হলোই না, উল্টে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে দেশ ভাগ হয়ে গেল ; রক্ত দিল, প্রাণ দিল, গৃহহারা হল লক্ষ লক্ষ লোক, কিন্তু স্বাধীনতা ও বিপ্লবের জন্য নয়, দেশ ভাগ কবার জন্য। আমাদের দু'শো বছরের বিদেশীদের দ্বারা পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে বিপ্লবের যুক্তিযুক্ততা নিশ্চয়ই রুশদেশের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুশীয়দেরই বিদ্রোহের যুক্তিযুক্ততার চেয়ে দশ গুণ বেশি। তবু এমনটা হলো কেন? আমাদের স্বাধীনতার চেতনা কম ছিল? আমাদের দুঃখের পাত্র, বঞ্চনার সঞ্চয় কিছু কম ছিল? একেবারেই নয়। তবে?

রাশিয়া ও ভারত-নেতৃত্বের পার্থক্য

রাশিয়া ও ভারত—এই দুই দেশের রাজনীতিতে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। সে হলো অভিজ্ঞতার পার্থক্য, নেতৃত্বের পার্থক্য। ১৯১৭ সালে সেখানকার জনগণ যখন আবার জাগতে

শুরু করল, তখন ১৯০৫ সালের অনেক অভিজ্ঞতা তাদের তহবিলে ছিল। তাই গ্রামে গ্রামে, শহরে বন্দরে, কলেকারখানায়, সৈন্যব্যারাকে নৌবহরে সর্বত্র রাতারাতি গড়ে উঠল সোভিয়েত বা বিপ্লবী পঞ্চায়েত—আর তাদের চোখের সামনে বিচার বিতর্ক চলতে থাকল। বলশেভিক, মেনশেভিক, স্যোশ্যাল রেভলিউশনারি, ক্যাডেট প্রভৃতি পার্টিগুলির জাঁদরেল নেতৃত্বের তর্কাতর্কি পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর। আর আমাদের দেশের জনগণের চিত্তেও একটা দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে, কিন্তু সে প্রধানত হরতাল, ধর্মঘট, আর কিছু কিছু বোমার ও বারুদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের ইতিহাস। আর যে অভিজ্ঞতাটা, বিপ্লবী সব প্রচেষ্টাকে চাপা দিয়ে, ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তা অহিংসা সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, ধর্মঘট ও হরতাল পর্যন্তই—বড় জোর ১৯৪২ সালে কিছু অগ্নিসংযোগ ও রেল লাইন উৎপাটন পর্যন্ত। আর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সচেতন সশস্ত্র সংগ্রামের খবর পৌঁছেছিল মাত্র, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল ইত্যাদির কোনো বিচারই হয়নি। আজও হয় না। আজও নেতাজী একটা ভাবাবেগের আধার মাত্র বহু জনমনে। সেটা যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের রণ-কৌশল জাতীয় কোনো নেতৃত্ব সেকথা ক'টা লোক বিচার করেন? আর ১৯৪৬ সালে তো তার কিছুই বোধগম্য ছিলনা—জনমনে।

চল্লিশ হাজার নাবিকের বিদ্রোহ

প্রায় ৪০,০০০ নাবিক যখন বিদ্রোহ করে বসল —হাতে তাদের এত অস্ত্রশস্ত্র যে দু'বছর পর্যন্ত লড়তে পারে, এত গুলিগোলা যখন হাতে (ক্যাসেল ব্যারাকে বিদ্রোহী নাবিকদের নির্বাচিত নেতা সিনিয়র পোর্ট ও পেটী অফিসার শেখ শাহাদত আলীর বই 'নৌ বিদ্রোহ' দেখুন, যে বইয়ের থেকেও তথ্য নিয়েছেন উৎপল দত্ত তাঁর কল্লোল সৃষ্টিতে), তখন তাদের বিদ্রোহটা পুরোপুরি বিপ্লব তো দূরের কথা, একটা সশস্ত্র ধর্মঘটের ঊর্ধ্বে তা উঠতে পারল না। হরতাল ও ধর্মঘটের ওপরে রাস্তায় রাস্তায় কিছু মারপিট করার বাইরে ধর্মঘটী বোম্বাইয়ের লক্ষ লক্ষ মজুর ও সাধারণ জনতা বেশি কিছু করতে পারল না। অবশ্য শ'চারেক গোরা সৈনিক, শ'তিনেক নাগরিক প্রাণ দেয়। অতবড় শক্তি মাত্র তিন দিনেই অমন ভাবে পরাজিত হলো কী করে?

কেউই নেতৃত্ব দিল না

কেউ নেতৃত্ব দিল না। কংগ্রেস নেতৃত্ব দিল না—বিশ্বাসঘাতকতা করল। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব দিল না—বিশ্বাসঘাতকতা করল —বিপ্লবীদের এই যে অভিযোগ এবং উৎপল দত্তদের এই যে ক্রোধ, এটা এত হাস্যকর ও লজ্জাকর যে বলার নয়। বল্লভভাই ও এস, কে পাতিল বিপ্লবের নেতৃত্ব করবেন? ননসেন্স। অথচ এই ননসেন্স দিয়েই আমরা আমাদের নিজেদের দোষ ঢাকতে চাই। করে গান্ধী, বল্লভভাই, নেহরু বা কংগ্রেস বলেছেন যে চরম বা পরম সঙ্কটের দিনে তাঁরাই সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন? এঁরা আর যাই ধোঁকা দিয়ে থাকুন দেশকে—সশস্ত্র বিপ্লব করবেন এমন ধোঁকা কোনো দিনই দেননি। তবু বারে বারে ওঁদের কাছে বিপ্লবী নেতৃত্ব চাইতে যাচ্ছি কোন লজ্জায়?

বিপ্লববাদীদের শেষ সুযোগ

যাঁরা বিপ্লববাদী তাঁদেরই সে দায়িত্ব। এবং সে দায়িত্ব পালন করার অপূর্ব সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ—প্রায় শেষ সুযোগ দেখা দিয়েছিল নৌবিদ্রোহে। বিদ্রোহী নাবিকদের বল্লভভাই

প্যাটেল, মুসলিম লীগের কাছে যেতে বলেছিল কে? এই লালপতাকাধারী তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টিই নয় কি? নাটকের মধ্যে, সূত্রধারের মুখ দিয়ে ও নাটক সম্বন্ধে পুস্তিকার মধ্য দিয়ে কল্লোলের উদ্যোক্তারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই বিদ্রোহী নাবিকদের সাথে সহযোগিতা করেছিল, তাদের দাবির সমর্থনে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, কিছু খাদ্য খাবার ও মিষ্টিজল সরবরাহ করেছিল। আর ভারতের অন্যান্য শহরেও নাবিকদের দাবিদাওয়ার উপর সভা-সমিতি করেছিল।—হ্যাঁ, করেছিল। আরও কিছু কিছু ছোট-বড় দলও করেছিল—আর বোম্বের জনসাধারণ কারো কোনো নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেও ধর্মঘট করেছিল, ধর্মঘট আর হরতাল করার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাদের বহুদিনের—খাদ্য খাবার দিয়েছিল ঐ উপলক্ষে গোরাদের ধরে ঠেঙিয়ে ছিল এবং প্রাণও দিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো পার্টির লোক ছিল বলে এখনও পর্যন্ত কেউ দাবি করে নি।

লাল পতাকা ও বিপ্লব

কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্রোহী নাবিকদের অভিনন্দন করলেন, তাঁদের সমর্থনে ধর্মঘটও ডাকলেন এবং এমন ভাবে এখন কথা বলতে চাইছেন যেন বিদ্রোহটাই তাদের প্রেরণাজাত! অথচ কোথাও একটিও কমিউনিস্ট নাবিক ছিলেন, বা নাবিক বা সৈনিকদের মধ্যে কোনো কমিউনিস্ট কর্মী আগে থেকেই ঢুকেছিলেন, ঠিক সময়ে বিদ্রোহের পরিচালনা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে? আর দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা যুদ্ধটাকে 'জনযুদ্ধ' বলে প্রচার করেছেন, তার পক্ষে কাজ করেছেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনী বা নৌবাহিনীতে কোথাও ঢোকার প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ আশা করছেন, আনকোরা ও রাজনীতিতে অজ্ঞ ধর্মঘটী নাবিকরা বিপ্লব করে দেবেন আর তাঁদের সমর্থনে বাইরে থেকে হরতাল পালন আর লালপতাকা দেখালেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া হয়ে যায়।

অগস্ট বিপ্লবীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়

বিশখানা যুদ্ধ জাহাজের ও ব্যারাকের পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র নাবিক চাইছে স্বাধীনতা, বিপ্লব ও তার নেতৃত্ব ; আর আমরা বলছি, হুররে, এই দিচ্ছি তোমাদের রুটি, মাখন মিষ্টিজল, আর দেখাচ্ছি—দেখছো তো কংগ্রেস ও লীগ নেতারা কিছু করল না, করবেনা? এই ভাবের ঘরে চুরি আর প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণা দিয়ে বিপ্লব হবে? বিদ্রোহী নাবিকরা সেদিন সব পার্টির কাছে গিয়েছিল বুদ্ধি নিতে, নেতৃত্ব নিতে। তারা তো রাজনীতি জানেনা, বিদ্রোহ করতেই জানে, বিপ্লব করতে জানেনা। কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস, লীগ, সবারই দুয়ারে দুয়ারে তারা ঘুরেছিল। ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব যে কংগ্রেস সোসালিস্ট ও বামপন্থী কংগ্রেসীদের হাতে এসে গিয়েছিল সেই "অগস্টারস্", অর্থাৎ অরুণা আসফ আলী, অচ্যুৎ পটবর্ধনদের কাছেও তারা আবেদন করেছিল—তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য। তাঁরা ত থতমত খেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কোনো নির্দেশই দিতে পারলেন না—প্যাটেলের কাছে যেতে বলা ছাড়া। কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও দেশের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবার অপূর্ব সুযোগ সেদিন অরুণা আসফ আলীরা হারিয়ে ফেলেন—যা তাঁদের জীবনে আর কোনোদিন আসবেনা।

সত্যনিষ্ঠা ও বিনয় দরকার

কমিউনিস্ট পার্টি তখনও জনযুদ্ধের ঘোর থেকে নিজেদের কাটিয়ে উঠতে পারেনি, যদিও তাদের মুখপত্র তখন "পিপলস ওয়ার" থেকে "পিপলস্-এজ"-এ এসে গেছে। কিন্তু পিপলস্

এজে এসে পিপলস্ বিভোল্টেব প্রোগ্রাম ১৯৪৮ সালেব আগে তাদেব দেওযা সম্ভব হয নি। এ ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত, একে হোযাইট ওযাস কবা কি সম্ভব? বাস্তবিক ইতিহাসকে কখনও ফাঁকি দেওযা যায না। ইতিহাসেব অলিখিত দপ্তবে সব কথা বেঁচে থাকে—অন্তুত তাব বেঁচে থাকবাব পথ। কংগ্রেস যেমন তাকে ফাঁকি দিতে পাবেনি—আজ অনেক অপবাধ ধবা পডছে, লীগ যেমন পাবেনি—তাব অনেক অপবাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উঠেছে পাকিস্তানেও, কংগ্রেস সোসালিস্টবা যেমন পাবেনি, কমিউনিস্টবাও পাববেনা—সব কথা উঠবে, তবই একটা নমুনা এই দক্ষিণ ও বামপন্থী কমিউনিস্ট সংকটেব মধ্যে নেই কি? অতএব অযথা আমবা যেন কেউ বেশি বীব সাজতে না চাই—একটু সত্যনিষ্ঠা ও তাব জন্য কিঞ্চিৎ বিনযেব দবকাব—আত্মসমালোচনাব দবকাব।

সারা দেশে বিদ্রোহপ্রবণতা

সাবা ভাবতব্যাপী একটা প্রচণ্ড অসন্তোষ ও বিদ্রোহপ্রবণতাব মধ্যে সেদিনকাব পঞ্চাশ হাজাব সশস্ত্র নাবিকদেব দ্বাবা বিপ্লব শুরু হতে পাবত কি? তাহলে তাদেব কোনো পথ নেওযা উচিত ছিল? এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা হয তো আজ বিচাব কবা চলে। খুব সংক্ষেপে এক-আধটা কথা বললেই আমাদেব তথাকথিত বিপ্লবীপনাব ফাঁকটা কোথায চট কবে ধবা পডে যাবে। কি উচিত ছিল, কি সম্ভব ছিল। তাব সঙ্গে কি কবা হয নি, অথচ হতে পাবত, তা পবিষ্কাব হযে যাবে।

পঞ্চাশ হাজাব বিদ্রোহী নাবিকেব তাদেব জাহাজে থাকা একদম উচিত হযনি। দলে দলে এসে লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটী বোম্বাইযেব মজুবদেব মধ্যে যোগ দেওযা উচিত ছিল। জাহাজ দখল কবে থাকা নয, বোম্বাই দখল কবাই তকন একমাত্র কাজ ছিল। এমন যে হতে পাবে এই ভযেই বোম্বেব লাটসাহেব পর্যন্ত সেদিন পুনাতে পালিযে গিযেছিল। এবং জেনাবেল লকহার্টেব? উপব নগবীব দাযিত্ব অর্পণ কবা হয। মাবাঠী সৈন্যেবা যখন গুলী গোলা চালানোব হুকুম শুনলনা, আব সর্বভাবতে যখন ভাবতীয সৈন্যবা—মায গুর্খাবা পর্যন্ত হুকুম মানতে বাজি নয, নৌ-বিদ্রোহেব দু'একদিন পূর্ব থেকেই যখন ভাবতীয বিমান বহবেব সব লোকেবা ধর্মঘট কবে আছে, সর্বত্র যেখানে মজুবেবা ধর্মঘট কবে চলেছে, আজাদ হিন্দ বাহিনীব লোকেদেব মুক্তিব জন্য যখন কলকাতা ফেটে পডছে—বোম্বাই, কবাচী কলকাতাব মতন প্রধান তিনটি শহব যেখানে প্রায বিদ্রোহী—সে অবস্থায বোম্বাই শহব দখল কবা দিযে সর্বভাবতে বিপ্লব শুরু কবে দেওযা অত্যন্ত সহজ ছিল। অতবড সুযোগ ১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহেও দেখা দেযনি, আব অতবড সংগ্রামেব পবিধি ১৯২১, ১৯৩০-৩২, ১৯৪২ সালেব সংগ্রামগুলিকে অনাযাসে ম্লান কবে দিত, এমন কি আজাদ হিন্দ বাহিনীব সংগ্রামটাব ভবিষ্যৎও তাব তুলনায কিছু নয—হযে যেত।

যদি বিপ্লবী নেতৃত্ব থাকত

জলেব মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজে অবস্থান কবা মানে নিজেদেব হাত-পা বেঁধে মৃত্যুব জন্য অপেক্ষা কবা। জাহাজে না আছে খাদ্য না আছে যথেষ্ট মিষ্টি জল। আব বৃটিশ নৌবহবেব বৃহৎ দূবপাল্লাব কামান আব বযেল এযাবফোর্সেব বমবাবি থেকে কতদিন তাবা আত্মবক্ষা কবতে পাবে? ভাবতীয বিপ্লব তো ২০ খানা ফ্রিগেটেব মধ্যে নেই, আছে ভাবতেব বিশাল ভূমিখণ্ডে—তাব চল্লিশ কোটি জনগণেব মধ্যে। সেখানে না এসে, তাদেরকে সংগঠিত

না করে গুটি কয়েক পম পম গান, অবলিকান গান, আর চার ইঞ্চি ব্যাসের কামানের সাহায্যে জলেই বিপ্লব হবে কী করে? সে দিন দেশে যদি কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠাবান বিপ্লবী নেতৃত্ব থাকত, তবে সেই নেতৃত্ব নাবিকদের দৃঢ়ভাবে হুকুম দিত—"তোমরা এক্ষুনি জল থেকে নেবে এস, বোম্বাই দখল করো, জনগণকে সংগঠিত করো, তাদেরকে সশস্ত্র হতে সাহায্য করো, দেশকে ডাক দাও 'আবার দিল্লী চলো' ইত্যাদি।" এর নাম বিপ্লবী নেতৃত্ব। এখন তুলনা করে দেখুন—আমরা যত সব বিপ্লবী দল ছিলুম তখন, কী বলেছিলুম এবং কতটুকু ভাবতে পেরেছিলুম!! আর বেশি কথা বলে লাভ কি?

পথ কোথায়?

কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহীদের মধ্যে কারো মাথাতেই সে চেতনা এল না কেন? 'পথ কোথায়, কি করি' বলে যখন তারা হয়রান, হাতের কাছেই অমন সহজ পথটা ধরা পড়ছে না কেন? শাহাদত আলী তাঁর বইতে একস্থানে লিখেছেন যে তাদের বোধ হয় গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। তিনি সামরিক অফিসার হয়েও বলছেন গেরিলা যুদ্ধ! গেবিলা যুদ্ধ কি জলে হয়? না, বোম্বাই শহবে হয়? গোটা বোম্বাই শহর যখন তাদের অনুসরণ করতে প্রস্তুত, তখন ওখানে আবার গেরিলা যুদ্ধ কি? গেরিলা যুদ্ধ যদি করতেই হয় সে হবে গ্রামে গ্রামে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে। তারও দরকার হতে পাবে হয় তো, কিন্তু বোম্বাই, করাচী, কলকাতা যদি দখল হয়ে যায়, তবে গেরিলা যুদ্ধেরও অত দরকার হতো না—যা চীনারা বিশ বছর ধরে লড়েছিল। সে সংগ্রাম হয় তো অনেকটা রুশ ঢং-এই চলে যেত, যদিও সে জাতীয় প্রোগ্রাম বণদিভের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে নাকি তাঁরা ভেবেছিলেন—অর্থাৎ শহর থেকে বিপ্লব শুরুর প্রোগ্রাম—যদিও বাস্তব পরিস্থিতি তখন শহর থেকে বিপ্লবকে হটিয়ে দিয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে তেলেঙ্গানার গ্রামে গ্রামে। আবার তেলেঙ্গানার গ্রামে জঙ্গলে লড়াই করছে যখন—তখন ভাবতে পারছে না চীনের মত গেরিলা রেড আর্মি গঠন কবার প্রযোজনের কথা—তখন মশগুল অক্টোবর বিপ্লবের পুনরাভিনয় করার স্বপ্নে!

বিপ্লব আর বিপ্লবী আন্দোলনের চেহারা

"বিপ্লব" বলে একটা শব্দ আমাদের দেশে খুবই ব্যবহার হয়, অথচ বিপ্লবের বিজ্ঞান নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা-চেতনা কোনো কালেই হয় নি। বিপ্লবী অনেক হয়েছেন, অনেকে অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে প্রাণ দিযে গেছেন, কিন্তু বিপ্লব শাস্ত্রটির কখনও গবেষণা করা হতো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা ইতিহাসই দিই। বিখ্যাত বিপ্লবী সূর্য সেনেব কথাই ধরা যাক্। বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ ও চরম নিদর্শন বলে যাঁকে অনেকেই বলে থাকেন। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার ও অন্যান্য ঘাঁটি আক্রমণ করে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে বসলেন। কিন্তু তার পর কী হবে, তা ভাবেন নি। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অস্ত্রেরই জন্য যদি হয়, তবে দখল করার পর যখন দেখা গেল সাতশো রাইফেল (মাস্কেট) বহু গুলি-বারুদ সহ মজুত আছে, তখন ঐ ডজন দুই বিপ্লবী সৈনিকরা প্রত্যেকে দুটো করে রাইফেল নেবার পর বাকিগুলি দিয়ে কী হবে, ভেবে না পেয়ে পেট্রল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন! যে গাড়িটা গিয়েছিল তাতে পেট্রল লাগাতে গিয়ে দগ্ধ ছেলেটিকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অনন্ত সিং চলে গেলেন! মানে, অস্ত্র ব্যবহার করার মতো কোনো প্ল্যানই ছিল না! আর যে ৩০/৪০টা রাইফেল বিপ্লবীরা নিয়ে গেলেন, তার ব্যবহার একবারই মাত্র হলো—জালালাবাদ পাহাড়ে,

যেখানে তা দিয়ে সাক্ষাৎ সংগ্রামের পর অনেকেই মারা গেলেন, বাকিরা সরে পড়লেন, রাইফেল ওখানে পড়ে রইল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা আর কোথাও রাইফেল ব্যবহার করার সুযোগ পান নি—হাতবোমা ও পিস্তল—যা তাঁদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্বেও ছিল তাই দিয়েই লড়তে হয়। তার মানে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কোনো সুবিধাই নেওয়া সম্ভব হলো না। এভাবে জয়টাও পরাজয়ে দাঁড়িয়ে যাবার কারণ পূর্বে থেকে পরিকল্পনার অভাব ছাড়া আর কি হতে পারে?

কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দখলীকৃত শহরটা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা অজানা একটা পাহাড়ে উঠে বসলেন এবং ভাবতে শুরু করলেন, এখন কী করা যায়। সেখানে না আছে খাদ্য, না আছে কোথাও সরে যাবার পথ। এদিকে ব্রিটিশ সরকারও ভয়ে ভয়ে ঢুকছে শহরে—কি জানি, কোথায় বিপ্লবীরা ওৎ পেতে আছে। এসে দেখে শহরে কেউ নেই, গেল কোথায়? একটু খুঁজতেই বুঝে নিল, নিকটবর্তী পাহাড়েই আছে। জালালাবাদ পাহাড়ের চেয়েও উঁচু একটা টিলায় মেশিনগান বসিয়ে বৃষ্টির ধারায় গুলি চালিয়ে বিপ্লবীদের রক্তস্নাত করে দিল, মাস্কেটের গুলির প্রত্যুত্তর শিক্ষিত গুর্খাদের কাছেও পৌঁছতে পারল না। রাত্রির অন্ধকারে মৃত শহীদদের ফেলে দিয়ে বাকিরা অন্যত্র সরে পড়লেন। তার পরও তিন বছর ধরে সূর্য সেন মাঝে মাঝে সন্ত্রাসবাদী আঘাত কিছু কিছু হানতে লাগলেন। কিন্তু সে কতদিন? তারপর একদিন এই বীর ধরা পড়লেন এবং জীবন দিলেন ফাঁসিকাঠে। কিন্তু সেদিন কি তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু করার ছিল না? সেদিন কি সেই ১৯৩০-৩২ সালের ভারতব্যাপী গণসংগ্রামের দিনে উপযুক্ত সমর্থনের বিশাল ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল না? কেন সে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল না এত সমর্থন চারিদিকে থাকা সত্ত্বেও? কেন পার্শ্ববর্তী পাহাড় পর্বত ও পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে সে সংগ্রাম গেরিলা যুদ্ধে দীর্ঘায়ত করে নেওয়া হলো না? আরাকান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপারেই যে তখন ব্রহ্মে সায়াসেনদের বিদ্রোহ চলেছে একই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গেই বা চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সহযোগ হলো না কেন?

বিপ্লবী যুগে এভাবে অনেক বিপ্লবী প্রাণ দিয়েছেন, তা দেবার দরকারও ছিল, কিন্তু তা ই সব নয়। তার মধ্য দিয়ে সার্থক বিপ্লবের পথ যদি তৈরি করতে না পারা যায় - যা পারা যায় নি—তবে বিপ্লবের পথেও জনগণ আসতে পারে না। এভাবে ভাবতে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর সেপথে কেউ হাঁটতে চায় না।

গণ বিপ্লবের যুগে

এর পরের যুগে গণ বিপ্লবের নাম করে যাঁরা নতুন ধরনের বিপ্লবের কথা বলেছেন, তাঁদের কার্য কলাপও নৌবিদ্রোহের সময় ধরা পড়ে যায়। নৌবিদ্রোহ যত না কংগ্রেস ও লীগকে expose করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি expose করেছিল কমিউনিস্ট, সোশালিস্ট, অগাস্টার — এঁদের। আর প্রথম থেকেই ভাবতে যদি একটা সত্যিকার বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা-গবেষণা থাকত, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে, তবে সাধারণভাবে সে সব ভাবধারা সাধারণ মজুর, চাষী, নাবিক, সৈনিক—এদের মধ্যেও ছড়িয়ে যেত। তখন তারা নিজেরাও, "কি করিতে হইবে" তার পক্ষে হাতের কাছেই অভিজ্ঞতাজাত অনেক মত পথ ও বুদ্ধি কৌশলাদি পেয়ে যেত, যা বশ দেশে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও নাবিকদের অভাব হয় নি।

স্বাধীন ভারত সরকারের অনীহা

আজ যাঁরা সেদিনকার সেই ঘটনাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণ করতে চান তবে হারিয়ে যাওয়া সে সব তথ্যাবলীকে প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো অন্বেষণ করে তাদের সবটা সাজিয়ে তুলতে হবে—

পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হবে—স্থান ও কালের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। ভারত সরকার শ্রীটেকচাঁদের সভাপতিত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটিও বসিয়েছিলেন—এই কমিটিতে শ্রীটেকচাঁদ ছাড়াও, কুনুয়ার দুলিন সিং, মিঃ জয়াকার, বিচারপতি জাফরুল্লাহ, কে বেঙ্কটেরাম শাস্ত্রী ও বিচারপতি বিশ্বাস ও সাব আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার সদস্য হিসাবে ছিলেন। কিন্তু প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার সেই রিপোর্টটি কখনো পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে উপস্থিত করেন নি—স্বাধীন সরকারও সে রিপোর্টটি নিষিদ্ধ বস্তু করে রেখেছেন। কেন রেখেছেন, এ প্রশ্ন আজ ওঠা উচিত। শ্রীবলাই দত্ত বলেন সেই রিপোর্ট যাতে জনসমক্ষে উপস্থিত করা হয় তার জন্য চাপ সৃষ্টি করার স্বার্থেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই লেখাটি প্রকাশিত করেছেন। আমরা সেই রিপোর্ট চেয়েও সংগ্রহ করতে পারিনি—কোনো একদিন হয়তো তা প্রকাশিত হবে। তার পূর্বে আমরা যতটুকু সম্ভব তৎকালীন সংবাদ সংবাদপত্র থেকে যথাযথ অনুবাদ করে এই পরিশিষ্ট রচনা করে দিলাম। মনে হয় এতে অনুসন্ধিৎসা বাড়বে, এবং উৎসাহী গবেষকদের সাহায্য করবে। মাত্র কয়েকটি দিনের ঘটনা—এই নৌবিদ্রোহ মাত্র চার দিনের ঘটনা, কিন্তু দুশ বছরের পরাধীনতার ইতিহাসের অন্ধকার রাজ্যে সহসা বিদ্যুৎ-এর ঝলসান-আলোকে অনেক তথ্য সেদিনকার সেই অবোধ বিদ্রোহটি দেশবাসীর দৃষ্টিতে এনে দেয়। আবার তেমনি তাড়াতেই সেই দৃশ্যকে আবার ঢেকে দেওয়া। রাজনৈতিক দল ও নেতারাই সেই দৃশ্যকে আবার ঢেকে দিতে ব্যস্ত হন—কেন ব্যস্ত হন—কী তাঁদের বক্তব্য ও দুর্বলতা ছিল?

আত্মসমালোচনার অভাব

আজ আবার কোনো কোনো মহলে নৌ-বিদ্রোহের প্রায়-লুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়—যদিও সংশ্লিষ্ট মহলের রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে। অথচ নৌবিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য ও শিক্ষা গ্রহণে প্রচুর দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়—সত্যনিষ্ঠাজাত আত্মসমালোচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে যে প্রশ্নটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে যুগে যুগে মাথা তুলবে সেটি হলো স্বাধীনতার নাম করে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে খণ্ডিত না করে স্বাধীন করার কোনো উপায় ছিল কিনা। প্রশ্নটি সংক্ষিপ্তভাবে বলাইবাবুও রেখেছেন। ঐতিহাসিকেরা যা ঘটে তার বর্ণনা দিয়েই খালাস, যা ঘটতে পারত, অন্যরকম কিছু ঘটতে পারত কিনা সে জাতীয় গবেষণার মধ্যে যান না। সে কাজ রাজনীতিবিদদের। স্বাধীনতা পেয়েই যে সব ভারতীয় ও পাকিস্তানী নেতারা আত্মসন্তোষে বিভোর হয়ে ছিলেন তাঁদের পক্ষে ভারত-বিভাগকে একটা অনিবার্য বিকল্পহীন ঘটনা বলেই সাফাই করার চেষ্টা ছিল এবং আজও থাকবে। তাঁদের apologist হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যাঁরা বিপ্লববাদী বলে নিজেদের জাহির করতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের একথা স্বীকার করতে হবে যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করে সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ সুযোগটা বোধ হয় নৌবিদ্রোহকে অস্বীকার করেই হারিয়ে যায়। সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবের শেষ পদধ্বনি ঐ নৌবিদ্রোহের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল, সে বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য, বাণী ও আদেশ সেদিনকার কি বাম কি দক্ষিণ কোনো দলই অনুভব করতে পারে নি—এমন কি অরুণা আসফ আলীরাও। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর অথচ সত্যনিষ্ঠ বিচারের রায় থেকে কারো নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। সে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ব্যর্থ ও পরাস্ত করার দায়িত্ব কেবল কংগ্রেস নেতৃত্বেরই নয়—কংগ্রেসবিরোধী তথাকথিত বিপ্লবীদের দায়িত্ব ও অংশও কম নয়।

নৌবিদ্রোহ সম্বন্ধে মহাত্মাজী

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী পুনার নেচারকিওর হাসপাতাল থেকে যে বিবৃতি দেন সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দুটি জিনিস এর ভিতর প্রকাশ পায় (১) নৌ-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর ধারণা, (২) ১৯৪২ সালে আগস্ট বিদ্রোহের সময় কংগ্রেসের মধ্যেই যে নবীন নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়—অরুণা আসফ-আলী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অশোক মেহতা—এঁরা যার প্রবক্তা রূপে প্রতিভাত হয়ে আসছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ও গান্ধী-নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায় সে সম্বন্ধেও গান্ধীর বিচারের কিছু ইঙ্গিত এ বিবৃতিতে আছে। বলা বাহুল্য, এঁদের মধ্যে সেই সময়ে বিদ্রোহী নেতা হিসাবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অরুণা আসফ আলী। নৌবিদ্রোহীরা তাই অনেকটা বেশি আশা করেছিলেন অরুণা আস ফ আলী নেতৃত্বের কাছ থেকে। যাই হোক মহাত্মা গান্ধী এ বিবৃতির মধ্যে অরুণা আসফ আলীকে জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন বিদ্রোহী বিকল্প নেতৃত্ব সম্বন্ধেই পরোক্ষভাবে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এই ঃ—

"সম্প্রতি বম্বের ঘটনার উপরে আমার বিবৃতির বিরোধিতা করে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। নিজের ঔরসজাত না হলেও, আমি তাঁকে আমার কন্যা বলে মনে করি যদিও সে কন্যা বিদ্রোহী। সাধারণ অবস্থায় তাঁর প্রতিবাদে আমি কোনো প্রতিবাদই করতাম না। কিন্তু তিনি নিজেকে ছাড়াও, যেহেতু আত্মগোপনকারী সংগ্রামীদের প্রতিনিধি স্থানীয়া, সেহেতু আমাকে প্রকাশ্যে এই বিবৃতি দিতে হল।

'সত্যিকার বিপ্লব'

"তাঁর আত্মগোপনকারী অবস্থায় কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি তাঁর সাহসিকতা, বুদ্ধিসত্তা ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রশংসা করি, কিন্তু প্রশংসা সে পর্যন্তই। তাঁর আত্মগোপনকারী জীবন আমি পছন্দ করি না। আত্মগোপনকারী কার্যকলাপও আমি পছন্দ করি না।

"আমি জানি, লক্ষ লক্ষ লোক আত্মগোপন করতে পারে না। লক্ষ কোটি লোকের আত্মগোপনের প্রয়োজনও হয় না। কিছু কিছু লোক আত্মগোপন করে গোপন নির্দেশের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের স্বরাজ আনয়ন করে দিতে পারেন এমন ধরনের আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু একি ঝিনুক দিয়ে খাওয়াবার মত নয়? খোলা চ্যালেঞ্জ, প্রকাশ্য কার্যকলাপই সকলে অনুসরণ করতে পারে। সত্যিকার স্বরাজ—সকলকেই অনুভব করতে হবে—পুরুষ, নারী ও শিশু—সকলকে। সে জাতীয় সার্থকতার জন্য পরিশ্রম করাই হল সত্যিকার বিপ্লব।

পৃথিবীর সকল নির্যাতিত জাতিদের সামনে ভারতবর্ষ একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত। কেননা, এই ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছে এক উন্মুক্ত অস্ত্রহীন, অহিংস ব্যাপক প্রচেষ্টা যা সকলের কাছেই আত্মদান দাবি করে, অথচ, যারা ক্ষমতাশীল তাদের অনিষ্টকর এমন কিছু দাবি করে না। ভারতের লক্ষকোটি লোকের আজ এমন ধরনের জাগরণ হতো না যদি না এই ধরনের উন্মুক্ত অস্ত্রহীন সংগ্রাম প্রচলন করা যেত। এই পথে যেখানেই এবং যখনই বিচ্যুত ঘটেছে তখনই এই ক্রমবিকাশী বিপ্লবের (Evolutionary Revolution) গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়েছে।

'৪২ এর কার্যকলাপ'

"১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর পাঠ এ বীরাঙ্গনা মহিলা যে ভাবে নেন আমি সেভাবে নিইনা। স্বতস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ সে আন্দোলনে অভ্যুত্থান করেছিল এ সংবাদ শুভ সন্দেহ নেই।

কিন্তু কেউ কেউ অথবা অনেকেই হিংসার পথ নিয়েছিল এটা ভাল সংবাদ নয়। শ্রীকিশোরীলাল মসরুওয়ালা, কাকাসাহেব এবং আরও কেউ কেউ সাময়িক অধৈর্য উৎসাহে অহিংসার ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতেও কোনো ভিন্ন যুক্তি সৃষ্টি করেনা। তাঁরা যে এধরনের ভুল ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতে একথাই প্রমাণ হয় যে অহিংসা একটি অত্যন্ত লাজুক বা Delicate হাতিয়ার। কারও উপরে কোনো অপ্রীতিকর মন্তব্য করার উদ্দেশ্যে আমি এই উপমাটি দিইনি—যে যা ভাল বুঝেছেন সে অনুযায়ী কাজ করেছেন। সংঘবদ্ধ হিংসার তাণ্ডবমূর্তির সামনে মাথানত করে চলা কাপুরুষতারই নামান্তর। আবার ১৯৪২ সালের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার বিচার ও বিশ্লেষণ প্রকাশে দ্বিধা করাও দুর্বলতা ও অন্যায়।

'দূরদৃষ্টির অভাব'

"অরুণা হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়মতান্ত্রিক মোর্চায় মিলিত করার চেয়ে লড়াই এর ব্যারিকেডে মিলিত করার পক্ষপাতী। সহিংস সংগ্রামের শাস্ত্রেও এ ধরনের চিন্তা ভুল। ব্যারিকেডে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন সত্যনিষ্ঠ হলেও নিয়মতান্ত্রিক বা Constitutional মোর্চায়ও-এ মিলনের প্রয়োজন আছে। সংগ্রামী সৈনিকেরা সব সময়ই ব্যারিকেডে বাস করে না। তারা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেনা। ব্যারিকেড জীবনের পরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক মোর্চাযও উপস্থিত হতে হয়, এই মোর্চাটিও তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু নয়।

"বৃটিশের বর্তমান ঘোষণাগুলিকে অবিশ্বাস করা এবং আগে থেকেই ঝগড়া সৃষ্টি করা মোটেই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। তাঁদের তরফ থেকে যে সবকারি ডেপুটেশন আসছে, তা কি ভারতের মতো একটি বৃহৎ দেশকে প্রতারিত করার জন্য—এইরূপ চিন্তা বীরোচিত ও বীরাঙ্গনাচিত নয়।

"একটু অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হত ; যে সরকারি প্রতিনিধিদল আসছেন তাতে বৃটিশ ঘোষণার উপর বিশ্বাসযোগ্য কিছু তাঁরা দিতে পাচ্ছেন না সেটা শেষ বারের মতো প্রমাণিতই হোক না। আমাদের দেশ ওদেরকে বিশ্বাস করে লাভবান হবে। প্রতারিতের নির্ভুল সারাতে শেষপর্যন্ত প্রতারকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

"ঘটনার মুখোমুখি হইনা কেন? যে মিশনটি আসছেন তারা নিজেদের ভারতের বন্ধু বলেই ঘোষণা করেছেন, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারটি তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পথেই বের করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। সমস্যাটি সত্যিই জটিল, হয়ত যে কোনো রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের পক্ষে জটিলতম। এমনও হতে পারে মিশন হয় তো এসে এই জটিল সমস্যাটিকে একটি সমাধানহীন ধাঁধাঁতে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাতে তাঁদের পক্ষে ক্ষতিই হবে। যদি তাঁদের উদ্দেশ্য সৎ হয়ে থাকে এবং তাঁদেরই তৈরি সমস্যাজাল থেকে তাঁরা নিজেরা মুক্ত হতে চান তবে সে পথ মিলবে বলে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশকেও তো এই খেলাতে ন্যায্য অংশ নিতে হবে। যদি তা করে তবে তাঁকে কোনোকালের জন্য হলেও ব্যারিকেড ফেলে আসতে হবে। আমি অরুণা ও তাঁর বন্ধুদের কাছে আবেদন করি তাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আত্মদানের ভিতর দিয়ে যে শক্তি সঞ্চয় করেছেন তা যেন বিজ্ঞজনোচিতভাবে ব্যবহার করেন।

'কে কাকে হতাশ করল'

"সর্দার প্যাটেলের উপদেশ মতো রেটিংরা যে আত্মসমর্পণ করেছেন এ একটি বড় স্বস্তির খবর। এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের আত্মসম্মান বিসর্জন করেন নি। যতদূর আমি দেখতে পাই

বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হওয়ার উপদেশটি কখনই সদুপদেশ হয়নি। যদি কল্পিত অথবা সত্য নালিশের প্রতিবাদে সে বিদ্রোহ ঘটে থাকে, তার পূর্বে তাঁদেরই পছন্দমত রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।

"যদি তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করে থাকেন তবে তাঁদের ভুলটাও আরও বেশি বা দ্বিগুণ। একটি সুসংগঠিত বৈপ্লবিক দলের নেতৃত্ব ও ডাক ছাড়া তাঁদের তা করা উচিত হয় নি। যদি তাঁরা মনে করে থাকেন যে একমাত্র তাঁদের শক্তির জোরেই তাঁরা ভারতবর্ষকে বৈদেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে দিতে পারবেন তবে তাতে তাঁদের চিন্তাহীনতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

'আত্মঘাতী'

অরুণা ঠিকই বলেছেন যে এই সংগ্রামী নাবিকেরা যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব। কিন্তু এ সাহস নির্বোধ দুঃসাহসে পরিণত হয় যদি তা সময়োচিত না হয় এবং এর পরিণাম আত্মঘাতী হয়ে থাকে।

"অরুণা দাবি করতে পারেন যে, জনসাধারণ হিংসা ও অহিংসার তাত্ত্বিক যুক্তিযুক্ততায় আগ্রহী নয়, কিন্তু আমি বলি মুক্তির পথ হিংসা অথবা অহিংসার পথে আছে কিনা সে প্রশ্ন জনসাধারণের আছে। জনসাধারণ অবশ্য এযাবৎ অহিংসার পথেই অগ্রসর হয়েছে যদিও অসম্পূর্ণভাবে আংশিক বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে। অরুণা ও তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের বারে বারে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, যুগ যুগান্তের নিদ্রা থেকে ভারতবর্ষকে জাগরণের পথে আনতে, অস্পষ্ট হলেও স্বরাজের জন্য একটি ব্যাপকতম আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করতে অহিংসার পথ তাঁদের কতটা কি করেছে। আমার মতে সেখানে প্রশ্নের উত্তর মিলবে।"

এ পথ স্বরাজের নয়—গান্ধীজী

পুণা থেকে মহাত্মা গান্ধী ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি নৌবাহিনীতে বর্তমানে এই যে বিদ্রোহ চলেছে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যত্র যে সব ঘটনা ঘটছে, তাকে কোনোমতেই অহিংস বলা যায় না। যখনই কাউকে জোর করে 'জয় হিন্দ' বলানো হয়,অথবা অন্য যে কোনো জনপ্রিয় শ্লোগান বলতে বাধ্য করা হয়, লক্ষকোটি জনসাধারণের স্বরাজ বলতে যা বোঝায় তার কবর সৃষ্টি করার পক্ষে সেগুলি সবই মর্মান্তিক আঘাত হয়ে ওঠে। গীর্জা ধ্বংস করা অথবা ঐ জাতীয় কোনো কাজই কংগ্রেস সমর্থিত স্বরাজের পথ নয়। ট্রামকার জ্বালানো, সম্পত্তি ধ্বংস করা, ইউরোপীয়দের অপমানিত অথবা আহত করা, আমার সমর্থিত অহিংসা তো দূরের কথা কংগ্রেস সমর্থিত অহিংসাও সেটা নয়। এই সংগ্রামের সকল পরিচিত ও অপরিচিত নেতাদের কাছে এই বিবেচনাহীন হিংসার উন্মাদনার পরিণাম সম্বন্ধে আমি ভাবতে অনুরোধ করি এবং এই পথ থেকে বিরত হতে বলি। পৃথিবীর লোকেরা যেন একথা না বোঝেন যে কংগ্রেসের ভারতবর্ষ মুখে অহিংসার পথে স্বরাজ সাধনার কথা বলে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষ করে চরম পরীক্ষার সময়ে তারা অন্য পথ নেয়। আমি ইচ্ছা করে বিবেচনাহীন কথাটি ব্যবহার করেছি। কেননা বিচার ও বিবেচনা সম্মত সহিংস পথও একটা আছে।

আমি আজ যে সহিংস কার্যকলাপ দেখছি তা সত্যিই বিচার বিবেচনাহীন। যদি নৌবাহিনীর সৈনিকেরা অহিংসার তাৎপর্য বোঝেন তো অহিংস প্রতিরোধের পথ গৌরবময়,

পুরুষোচিত ও সমবেত ভাবে প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হতে পারে। ব্যক্তির পক্ষে এ পথ সবসময়ই প্রযোজ্য। যদি কারও মনে হয় যে চাকরির অবস্থা ও ব্যবস্থা কারও পক্ষে অথবা ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানজনক তবে তিনি সে কাজে ইস্তফা দেবেন না কেন? এজাতীয় কর্মপন্থাকে আমি নাম দিয়েছি অহিংস অসহযোগিতা। কিন্তু নাবিকেরা তাঁদের কাজের বর্তমান বিদ্রোহাত্মক কাজের দ্বারা ভারতের পক্ষে একটি খারাপ ও অযোগ্য দৃষ্টান্ত বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করছেন।

"হিন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসামূলক কার্যকলাপের জন্য এই যে 'মিলন' তা অশুভ এবং হয় তো ঐ পথের ভবিষ্যৎ নিজেদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য প্রস্তুতি বলে পরিণতি লাভ করতে পারে—দেশ এবং পৃথিবীর পক্ষে যা হবে খুবই ক্ষতিকারক।

"ইংরেজ শাসকেরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণের হৃদয়ে লুক্কায়িত তিক্ত অসন্তোষের বিক্ষুব্ধ প্রকাশ যেন সেই ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তটিকে কোনো কারণে বিলম্বিত না করে। এ বিক্ষোভের শক্তি সীমাহীন সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ব্যবহাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে দেওয়া ঠিক নয়। এমন কি তা দুষ্টবুদ্ধিজাত হয়েও যেতে পারে, যদি দেশকে অথবা তার একটি বৃহৎ অংশকে আবার দাবিয়ে দেওয়ার পক্ষে একটা অছিলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কাবণ এই দেশ বা জনসাধারণ আজ বহুদিন পর পদানত।"

অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য নেহরুর কাছে তার

শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী নৌ-ধর্মঘটের বিস্ফোরক পরিণতির মুখে বম্বে থেকে দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরুব কাছে নিম্নোক্ত জরুরী তারবার্তা পাঠান,—"নৌধর্মঘট চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, অবস্থা ভয়ানক পরিণামের দিকে, চূড়ান্ত হেস্তনেস্তের দিকে অগ্রসর, একমাত্র আপনিই অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারেন এবং আসন্ন ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা করতে পারেন ; এই মুহূর্তে আপনার বম্বেতে উপস্থিতির জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করি।"

নেহরুর ভূমিকা—জনসমাবেশে

"India today is a volcano of 400 million human beings, who refused to be ignored in the world—Pt. Nehru at Chowpatty meeting."

২৬ তারিখে পণ্ডিত নেহরু বোম্বাই আসেন, চৌপাট্টিতে প্রায় দু'লক্ষ লোকের জনসমাবেশে পণ্ডিত নেহরু একই সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও তার নির্মম শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করেন ও অপরদিকে ধর্মঘটী নাবিকদেরও নানা ধরনের ধমক দেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বরাবরই বম্বেতে ছিলেন, তিনি প্রথম থেকে সব ব্যাপার জানতেন, বিদ্রোহী নাবিকেরা বিভিন্ন সূত্রে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টাও করেন, সর্দার প্যাটেল বরাবরই এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিলেন। নাবিকদের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের উপদেশ তিনি বরাবরই দিয়েছেন, বিদ্রোহী নাবিকদের পক্ষে বোম্বাই শহরের শ্রমিক ও জনসাধারণের হরতাল বিক্ষোভাদি ব্যাপার তিনি নিঃসঙ্কোচে নিন্দা করেছেন, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোনো কিন্তু বা দ্বিধা ছিল না। পণ্ডিত নেহরু একই সঙ্গে ঠাণ্ডা ও গরম বাণীর প্রবাহ ছাড়তে অভিজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু ১৯৪২ সালের আন্দোলনকে অস্বীকার করেন নি—নিন্দাবাদও করেন নি, যদিও স্বয়ং গান্ধীজী ১৯৪২ সালের

দায়িত্ব অস্বীকার করেন। এই সব কারণে পণ্ডিত নেহরু সেদিনকার ভারতে সবচেয়ে বীর বলে বন্দিত ছিলেন। তা ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাপতিদের ডিফেন্সের জন্য পণ্ডিতজীব ব্যারিস্টারের পোশাক পরে কোর্টে উপস্থিতি ইত্যাদি কার্যকলাপও অতীতে সুভাষচন্দ্র বসুব সঙ্গে তাঁব যে বিরোধিতা ছিল সেই তিক্ত ইতিহাসটুকু পণ্ডিত নেহেরুর অনুকূলে ও মহিমায় মুছে যায। অতএব ইতিহাসেব সেই চরম বৈপ্লবিক মুহূর্তে পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকা কি ছিল সে কথার পুনর্বিচার একদিন ঐতিহাসিকেবা কববেনই কববেন। আমরা ঐদিন চৌপাট্টি সমূদ্রসৈকতে তিনি যে ভাষণ দেন তাঁর কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে রাখি। ঐ সভায় বল্লভভাই প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন এবং ভাষণও দিয়েছিলেন—অবশ্য তাঁর নিজের স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীল সুরে। সর্দাব প্যাটেল সে সময় খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না, সেজন্যেই বম্বের সেই উত্তেজিত মুহূর্তে নিজে থেকে তিনি কোনো সভা ডাকেন নি। বম্বের বীর বিপ্লবী জনতাকে শান্ত করার মতো কোনো ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। পণ্ডিত নেহরুরও বোধ হয় ছিল না। পণ্ডিত নেহরু যখন বম্বেতে আসেন নৌবিদ্রোহের তখন অবসান হয়ে গিয়েছে, বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেছেন, জনসাধারণ স্তব্ধ অথচ বিক্ষুব্ধ। পণ্ডিত নেহরুর সেদিনকার ভাষণ তাই একজন ব্যারিস্টার রাজনৈতিকেব অগ্নিবর্ষী ভাষণের অতিরিক্ত কিছু নয—যা উভয় দিকেই কাটে।

সৈন্যবাহিনী রাজনীতি সচেতন হওয়া চাই

"ভাবতেব স্বাধীনতার জন্য আমাদেব সশস্ত্র বাহিনীব বিদ্রোহ কবার অধিকাব আছে, কম্যাণ্ডার ইন চীফ তাঁর বেতার ভাষণে ঘোষণা কবেছেন যে সশস্ত্র বাহিনীতে তিনি বাজনীতিব অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবেন না এবং ডিসিপ্লিনই সেখানকার প্রথম ও শেষ কথা। আমি তাঁব সঙ্গে এ বিষয়ে একমত কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনীকে একটি স্বাধীন দেশের সৈন্যবাহিনী হতে হবে।

"আমাদের সৈনিকেরা রাজনীতি ও তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে একটা বিবোধ টেনে বিদেশী সরকাবেব আজ্ঞাবাহী ভাড়াটিয়া সৈনিকের কাজ কবে যেতে পারেন না। আমার মতে আমাদের আর্মি ও নেভিকে সম্পূর্ণ রাজনীতি-সচেতন হওয়া চাই, কেননা তাঁরা কেবল সৈনিকই নন তাঁরা সচেতন নাগরিকও বটে, এবং সচেতন নাগরিক হিসাবে দেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করতে হবে। বর্তমানে আমাদেব সৈনিকেবা তাঁদের দেশের প্রতি কর্তব্য ও সৈন্যানুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা এই দুই প্রেরণার বিপরীত-গামী সংকটের শিকার হয়ে পড়েছেন।

বিদ্রোহ করার নৈতিক অধিকার

"শ্রীভুলাভাই দেশাই প্রথম আই-এন-এ বন্দীদের বিচারেব সময় অনবদ্য ভাষায় পরাধীন সৈন্যবাহিনীর বিদেশী শাসনেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার সুন্দর ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী তাই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সকল নৈতিক অধিকার রাখে।

"সুভাষচন্দ্রেব নেতৃত্বে আই-এন-এর ঘটনাবলী, সাম্প্রতিক আর, আই, এ, এফ, ও আব, আই, এন্-এর ধর্মঘট দেশের স্বার্থে বা মুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ কবেছে। জনসাধারণের ও সশস্ত্র-বাহিনীর মধ্যে যে দুরন্ত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তা এই সব অভিযান দূর করে দিযেছে। আজ জনতা ও সৈন্যেবা পরস্পরের নিকটে এসে গেছে।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমযে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় যুবক আর্মি-নেভি ও এয়ারফোর্সে যোগ দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, কেউ কেউ

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেছেন। যুদ্ধের সময়ে সকল প্রকার নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহু ধরনের অপমান, জাতিগত বৈষম্য ও অত্যাচার ভোগ করেছেন ; যুদ্ধের অবসানে এঁদেব মধ্যে কেউ কেউ এই অপমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন যা নানা ধরনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে।

কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধতা ঠিক হয় নি

"এঁদের প্রতি আমার সকল সহানুভূতি আছে কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের অস্ত্রধারণ করা ঠিক হয় নি। এই ছেলেরা (boys) জানত যে তারা কত বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে। তাদের হাতে যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না, সামান্যই গুলি বারুদ ছিল অথচ প্রতিপক্ষের/হাতে অস্ত্রশস্ত্র অন্যান্য শক্তি কতই না বিপুল। এই যুবকদের বিদ্রোহের প্রেরণা প্রতিপক্ষ সামরিক প্ররোচনা দিয়ে এই যুবকদের শত্রুর ফাঁদে পা দিতে বাধ্য করেছিল।

"সাম্প্রতিক আর-আই-এন ধর্মঘটে এই বীর নাবিক যুবকেরা একটা ভুল করে বটে কিন্তু তাদের ক্ষমা করা আমাদের কর্তব্য। এবং এদের প্রতি যাতে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তা দেখা কর্তব্য। কোনো কোনো সংবাদ পত্রে দেখলাম সর্দার প্যাটেল নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এদের প্রতি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবে না। মৌলানা আজাদও নাকি ঐরূপ গ্যারাণ্টি দিয়েছেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদের পক্ষে ঐরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। একমাত্র গভর্নমেণ্টই সেই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিতে এবং রক্ষা করতে পারে।

তবে ঘটনার তদন্ত চাই

"কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র আর, আই, এন এর ছেলেদের ব্যাপারে নয়, কেবল বম্বের ব্যাপারে নয়, সমস্ত ভারতে এজাতীয় বিদ্রোহ বিক্ষোভ প্রভৃতি ঘটনাগুলির প্রকাশ্য তদন্ত করা দরকার। অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আত্মসমর্থন করার সুবন্দোবস্ত করতে হবে—যেমন আই, এন, এব অভিযুক্ত সৈন্যদের ও অফিসারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।...

"সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা আজ এ ধরনের ব্যবহার করছে কেন? কালের পরিবর্তন ঘটেছে। শাসকবর্গের জানা উচিত যে অতীতে যেভাবে এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে, সৈন্য বাহিনীকে জনসাধারণেব বিরুদ্ধে লাগিয়ে যেভাবে শাসন চলত, আজকের দিনে তা হবার উপায় নেই। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা আজ তাদের দেশের ও জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য বুঝতে পারছেন।..

বিপ্লব সম্পর্কে নেহরু

"বিপ্লব ও গুণ্ডামী (rowdysm) এক জিনিস নয়। বস্তুত এই ধরনের বিপ্লবী কার্যকলাপ সামাজিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় না, তাকে প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ বলা যেতে পারে। এ হলো একধরনের বিপদজনক অ্যাডভেঞ্চার যাতে জনসাধারণের নৈতিক বুদ্ধি ও সংগঠনকেই দুর্বল করে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট নীতি বা স্ট্রাটেজি থাকে এবং সুপরিকল্পিত প্রচার থাকে। এসব ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই যে ধরনের বিপ্লবের মধ্যেই আমরা প্রবেশ করিনা কেন, আমাদের দেখতে হবে ডিসিপ্লিন রক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং সমস্ত কার্যকলাপ সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হবে।"

বিদেশীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের নিন্দা

শহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অরাজকতার উল্লেখ করে পণ্ডিতজী বলেন, "একদিকে সরকারের তরফ থেকে নির্বিচারে গুলিগোলার প্রয়োগ, শত শত ব্যক্তির মৃত্যু, অপর দিকে শহরের নানা সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি মর্মাহত। জনসাধারণের কিছু কিছু অংশ যে ভাবে অনাচারী ব্যবহার করেছে, বিশেষত বিদেশীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে, তাঁদের টাই, টুপির ধ্বংসসাধন করে তাঁদের অপমান করেছে, তীব্র ভাষায় আমি তার নিন্দা করি।"

সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা

সর্দার প্যাটেল জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের অপব্যবহার করে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি জনসাধারণকে বিপথে চালিত করেছেন তাদের সম্বন্ধে ভারতবাসীদের সচেতন করে দেন। প্যাটেলই এই সভার সভাপতি ছিলেন।

কংগ্রেস বিদ্রোহের ডাক দেয় নি

সর্দার বলেন, "কংগ্রেস যেখানে কোনো প্রকার বিদ্রোহের ডাক দেয় নি, উপরন্তু জনসাধারণকে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছে, সেখানে কেন জনসাধারণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।' তিনি আরও বলেন ঃ

"কংগ্রেসের নাম করেই যে সমস্ত কংগ্রেসের লোক জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিচ্ছেন আমি তাঁদের সম্বন্ধেও দেশবাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। জনসাধারণ একমাত্র কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের কথাই শুনবেন, আমি এটাই আশা করি। যদি আপনারা মনে করেন যে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভুল করছেন, তাহলে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করুন। কিন্তু যদি কংগ্রেস নেতৃত্বই মানেন, তবে কংগ্রেসের আদেশ আপনাদের শুনতেই হবে।"

কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে

তিনি আরও বলেন যে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছে ও তাদের স্বদেশপ্রেমকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। গত কয়েক বছরে তাদের মর্যাদা যে ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি এ ধরনের উস্কানি দিয়ে চলেছে বলে তিনি ঘোষণা করেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন, সেই গ্লানি ও অপরাধকে মুছে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের এই বিপ্লবীয়ানা।

"এই পার্টি এখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কথা বলছেন, কিন্তু কে আজ তাদের বিশ্বাস করবে বা করতে পারে? তাদের এই উস্কানি বেশিক্ষণ কার্যকর হতে পারে না, অচিরেই তাদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হতে বাধ্য।"

ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতার অভাব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। যদি তারা, তাঁর মতে, কিছু ভাল কাজ করতে চান তবে তারা যেন কংগ্রেসের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানেন।

সর্বাত্মক হরতালের ঘোষণায় প্যাটেলের উষ্মা

নৌবিদ্রোহের ফলে দেশে যে একটা ভয়ানক বিপদজনক পরিস্থিতি হয়েছে সেকথা প্যাটেল সভায় বলেন, এবং এই নৌবিদ্রোহের সমর্থনে শুক্রবার দিন শহরে যে সর্বাত্মক হরতালের ঘোষণা করা হয়েছে তার বিপদজনক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন। এই ধর্মঘট যাঁরা ঘোষণা করেছেন তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন বলে সর্দার অভিযোগ করেন, যেহেতু তাঁরা সর্বাঙ্গীন অবস্থার গুরুত্ব অনুভবই করতে পারছেন না। এ সমস্ত তথাকথিত জনদরদী নেতারা নিজেদের যেমন আত্মপ্রতারিত করছেন তেমনি জনসাধারণকে বিপথগামী করে জনসাধারণের ও শহরের প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে নেহরুর নরম গরম বাণী

চৌপাট্টিতে আগের দিনের বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের বক্তৃতাতে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি বলেই হয় তো পরের দিন পণ্ডিত নেহরু আবার একটি প্রেস কনফারেন্সে তাঁর বক্তব্য দু'ঘণ্টা ধরে পেশ করেন। উপরন্তু, ধর্মঘটী নাবিকদের কোনো সাজা দেওয়া হবে না (No victimisation) এ রকম ধরনের প্রতিশ্রুতি ভারতের ব্রিটিশ সরকার রাখবার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছিলেন না। ফলে পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে বোম্বাইয়ের জনসাধারণের সন্তুষ্ট রাখা সহজ হচ্ছিল না। এই প্রেস কনফারেন্সে আবার তাঁকে তাঁর স্বাভাবিক নরম গরম বাণীর বাক্য বিন্যাস করতে দেখা যায়। তিনি বলেন,—"আমি জানতে পেরেছি কমাণ্ডার-ইন-চীফের বেতার বার্তার ঘোষণা সত্ত্বেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুকুম চালু হয়েছে। কেবল আক্ষরিক অর্থেই নয়, তাদের সাজা সত্যি সত্যিই এমন ধরনের দেওয়া হচ্ছে যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বলা চলে (Terrorisation, not merely victimisation)। কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে সহকারী যুদ্ধসেক্রেটারী মিঃ ম্যাসন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিরও কোনো মূল্য দেওয়া হচ্ছে না।"

ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও লীগের একই ভূমিকা

এখানে বলা উচিত হাজার হাজার রেটিং-কে তাঁদের কর্মস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আটক রাখা হয়—কয়েক বছর ধরে। এই পুস্তকের লেখক শ্রীবলাই চন্দ্র দত্ত বা শ্রী বি, সি, দত্ত তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম ভুক্তভোগী একজন। ইনি কয়েক বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে বন্দী শিবিরে ছিলেন। এঁদের ঘটনার অনতিকাল পরেই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। এই পণ্ডিত নেহরুই প্রধানমন্ত্রী হন, সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন, জিন্না সাহেবের দলও ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু ধর্মঘটী নাবিকদের সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার পালন করে নি, কংগ্রেস এবং লীগ সরকারও তা পালন করে নি।

আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেন্ট সম্পর্কে

উক্ত প্রেস কন্‌ফারেন্সে ১৯৪২ সালের আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেন্ট সম্বন্ধে, অর্থাৎ—অরুণা আসফ আলীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁর মতামত কী—এ প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন,—

"যেখানে খোলাখুলি ভাবে কাজ করা সম্ভব, সেখানে অন্য কোনো ভাবে বা গোপন ভাবে কাজ করার চেষ্টা ফলপ্রসূ ত নযই, ববং অর্থহীন বলা যায। গত দু তিন বৎসব যখন অবস্থা সেবকম ছিল না, তখন ভিন্ন ধবনেব কাজেব কথা ভাবা যেতে পাবে। এ বিষযে কেউ একমত হতে পাবেন না ও পাবেন। কিন্তু যখন খোলাখুলিভাবে কাজ কবাব অনেক ক্ষেত্র ও সুযোগ বযেছে, সেখানে গোপনভাবে চলাব কোনো অর্থ হয না। সেক্ষেত্রে জনসাধাবণকেই গোপন কবে চলাব বেওযাজ গড়ে ওঠে এবং সত্যিকাব কোনো গণ- আন্দোলন গোপনীযতাব পথে গড়ে উঠতে পাবে না।"

অরুণার কার্যকলাপ সমর্থন করি না

অরুণা আসফ আলীব গত কযেক বছবেব কার্যকলাপ তিনি পছন্দ কবেন কি-না এই প্রশ্নেব উত্তবে তিনি বলেন,—"আমি সব কার্যকলাপ সমর্থন কবি না।"

হিংসা-অহিংসা প্রসঙ্গে

হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে প্রশ্নেব উত্তবে তিনি বলেন,—"আমি আমাব নিজেব কথাই বলতে পাবি। হয তো আবও অনেকে এ বিষযে একমত হবেন। আমি মনে কবি আমাদেব স্বাধীনতাব সংগ্রামে আজ এবং অতীতেও অহিংসা ও তাব বীতিনীতি উপযুক্ত– বর্তমান ভাবতেব ও পৃথিবীব পবিস্থিতিব বিবেচনায। যদি আমবা হিংসা নীতিব কথাই ভাবি তবে আমাদেব অধিকতব যোগ্য সহিংস উপাযেব কথা ভাবতে হবে। শত্রুপক্ষেব সশস্ত্র শক্তিব তুলনায অপেক্ষাকৃত যোগ্যতব হিংসাব বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতব হিংসাব কথা ভাবা বোকামি মাত্র। কোনো সশস্ত্র বাহিনীব সেনাপতি সেভাবে ভাবতে পাবেন না।"

এদেশে অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ

তবে কেন তিনি আই এন্, এ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা কবে থাকেন এই প্রশ্নেব উত্তবে পণ্ডিত নেহব বলেন, "আই, এন, এব শিক্ষা থেকেই আমি ববং একথা বলি যে এদেশে অহিংসাব পথই শ্রেষ্ঠ পথ। ভাবতেব স্বাধীনতাব জন্য যাঁবা সশস্ত্র বা নিবস্ত্র যে ভাবেই হোক লড়েছেন, সে এক কথা, কিন্তু বর্তমান পবিস্থিতিতে ভাবতেব সমস্যা সমাধানেব উপায নির্ধাবণেব ব্যাপাব সম্পূর্ণ আলাদা কথা বা প্রশ্ন। আই, এন্, এ, সশস্ত্র পথ নিযেছিলেন এবং তাঁবা ব্যর্থ হন। আই, এন্, এ, যদি সার্থক হতো, তবে প্রশ্নকর্তা হয তো বলতে পাবতেন যে সহিংস সংগ্রাম সার্থক হযেছে। আই, এন্, এ, ব্যর্থ হযেছে সশস্ত্র অথবা অহিংস সংগ্রামেব জন্য নয। ব্যর্থ হযেছে বাহ্যিক পবিস্থিতিব প্রতিকূলতাব জন্য। পৃথিবীব বাস্তব অবস্থাব বৃহত্তব শক্তিগুলি তাদেব প্রতিকূলে ছিল বলেই তাঁবা ব্যর্থ হযেছিলেন।

"আই, এন্, এব, সঙ্গে বর্তমান ভাবতেব পবিস্থিতিব তুলনা চলে না। কেন না, আই, এন, এ' কে কাজ কবতে হযেছে দেশেব বাইবে থেকে এবং সেক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেব কোনো ক্ষেত্রই ছিল না। আপনাবা আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমাব মনে হয যখনই আমাদেব দেশে হিংসা ও অহিংসাব কথা ওঠে, তখনই আমবা স্থান কাল নির্বিশেষে শিশুসুলভ কথাবার্তা বলে থাকি। অষ্টাদশ শতাব্দীব পবিপ্রেক্ষিতে তর্ক বিতর্ক কবি। লোকে ভুলে যায যে আমবা বিংশ শতাব্দীব মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। যখনই আপনাবা কোনো দেশেব মুক্তি বৈপ্লবিক সহিংস পথে আনবাব কথা ভাবেন, তখন সে অভ্যন্তবীণ বিপ্লবী শক্তিকে

বিনষ্ট করে দেবার জন্য রাষ্ট্রের হাতে কী রকম নিষ্ঠুর সহিংস শক্তি আছে, সেকথা আপনারা ভাবেন না। গত ৫০ বছরে রাষ্ট্রের Violence-এর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে শক্তি আজ রাষ্ট্রের এত বেশি যে জনগণের সাধারণ সহিংস শক্তি তার তুলনায় অতি নগণ্য। যাঁরা ব্যারিকেডের কথা বলেন, তাঁরা আজ ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলেন। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি ও বিদ্রোহী জনসাধারণের শক্তির মধ্যে পার্থক্যটা সত্যিই খুব বেশি ছিল না। এমন কি আজকের দিনে সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিক ও নাবিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা, বিমান, ট্যাঙ্ক, ও বোমা প্রভৃতি অতি আধুনিক মারণাস্ত্র সাধারণত সাধারণ সৈনিকের হাতের বাইরে।"

হিংসার পথ বৃথা হতে বাধ্য

তিনি আরও বলেন, "আজকের দিনে হিংসা ও অহিংসার নৈতিক তাৎপর্য নিয়ে তর্কের অবসর তত নেই, যত আছে তাদের বাস্তব ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়ে। হিংসার পথ সম্বন্ধে আলোচনাই বৃথা হতে বাধ্য—যদি না সৈন্যবাহিনীর হিংসাত্মক ক্ষমতার কথা আলোচ্য বিষয় না হয়। সামান্য ধরনের বা petty রকমের সশস্ত্র সংঘাত হয় তো সাময়িকভাবে একটা ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিল অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যাবে অধিকতর যোগ্য Violence এর ক্ষমতা কোথায় এবং কার। তাছাড়া এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহিংস প্রচেষ্টা বা সংঘর্ষ একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত একটা ভারসাম্য স্থির করতে অসমর্থ হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত একটি বিকল্প স্থায়ী সর্বজন স্বীকৃত শক্তির বা authority-র জন্ম দিয়েছে, যে শক্তি বা authority র সাহায্যে আমাদের ঈপ্সিত সমাজ ব্যবস্থা আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ ফেলা চলে। কিন্তু যদি বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা চলতেই থাকে, একটা স্থায়ী ভারসাম্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়।

ভুল ধারণা থেকেই সংঘর্ষ ঘটে

"আজকের দিনে ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষের প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকেই সম্ভবপর। আমরা কোনো দুর্বল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতি নই, আমরা শক্তিধর আন্দোলনের সন্তান, আমাদের পক্ষে ছোটখাটো violence-এর চক্র সৃষ্টি করে চলা উচিত নয়। ভারতের প্রায় অনেক স্থানেই আমি আজ যা দেখতে পাচ্ছি ছোটখাটো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হয়ে অনেকেই ভাবেন যেন তাঁরা বিপ্লব ত্বরান্বিত করছেন। আমি বলি তাঁরা তা করছেন না, বরং তার বাধাই সৃষ্টি করছেন। যদি সত্যি সত্যিই সহিংস পথ ধরতে হয়, তবে তাকে বৃহৎ ও ব্যাপক আকারে সংগঠিত করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি করতে হবে। ক্ষুদ্রাকারের violence কেবলমাত্র অহিংসার পক্ষেই বাধা নয়, সত্যিকার বৃহৎ violence-এরও অন্তরায়। এতে প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় মাত্র, প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে জাগানো হয় মাত্র।"

কমিউনিস্টরা বিপ্লবী নয়

বোম্বাই-এর সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু বলেন,—

"বোম্বাই-এর 'রেটিং'-দের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি যে প্রচুর, সে কথা সহজবোধ্য। কামান ব্যবহারের ফলেই জনসাধারণের উত্তেজনা এত উচ্চ পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল যদিও এই

সমস্ত কামানের গুলি কোনো ক্ষতিকারক হয় নি, তবু জনসাধারণ মনে করেছিল বুঝিবা দুই পক্ষের মধ্যে একটা ভয়ানক লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কার্যত লড়াইটা কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে অতটা কিছু ঘটে নি।

"শহরে নানা ধরনের নানা দল ও উপদল আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বিপ্লবী মনে করেন, অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর রণকৌশলের উপরে যেতে রাজি নন। কমিউনিস্টরা নিজেদের ভয়ানক বিপ্লবী বলে মনে করেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রতিবিপ্লবী মনে করি। তাঁরা বিপ্লবী তো নয়ই, বরং কার্যত ভয়ানক রক্ষণশীল।"

হরতালের প্রশ্নে নেহরুর রাগ

বোম্বাই শহরে আর, আই, এন, রেটিংদের প্রতি সহানুভূতির জন্য হরতাল করা উচিত কি না, এই প্রশ্ন শুনে পণ্ডিত নেহরু হঠাৎ রেগে জ্বলে উঠে বলেন,-

"আর, আই, এন,-এর সেণ্ট্রাল স্টাইক কমিটির এ ধরনের ধর্মঘট করার পক্ষে আবেদন করার কোনো অধিকার নেই। আমি এ ধরনের কার্যকলাপ সহ্য করব না। এই ১৫টি লোক তাদের আমি যতই পছন্দ করিনা কেন, তারা বোম্বাই অথবা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে কী জানে, বোম্বাই-এর সকলের মাথার ওপর দিয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে অগ্রাহ্য করে, কোন অধিকারে তারা এই হরতালের আবেদন জানাল? তাদের উচিত ছিল, এই ৩০ লক্ষ নাগরিকদের ডাকার আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে ডাকা এবং নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করা। একমাত্র কংগ্রেস অথবা লীগ এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।"

কেউই কিছু করেন নি

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সেদিনকার ভারতবর্ষের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষগুলিকে পণ্ডিত নেহরু শান্ত বা দমিত করার জন্যই বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণগুলি দিচ্ছিলেন। সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অভাবে নৌবিদ্রোহ ও অন্যান্য সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পারে, একথা যদি সত্যি হয়, তবে পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে নিজেকেই সেই নেতৃত্ব সৃষ্টি করা অথবা দেওয়ার কী অন্তরায় ছিল? অন্যান্য তথাকথিত বিপ্লবীদের অপরিপক্কতা ও চিন্তার স্থবিরতা নিয়ে ঠাট্টা করা চলে তাঁরই, যিনি বিকল্প সত্যিকার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ভাবেন। কাজে কাজেই সহিংস ও অহিংস উভয় দিক থেকেই তৎকালীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার জন্য কী মহাত্মা গান্ধী, কী পণ্ডিত নেহরু—কেউই কিছু করেন নি। জনসাধারণের প্রতি যত সহানুভূতি ও দরদই দেখানো হোক্ না কেন, উত্তেজিত ধর্মঘটি নাবিকদের অথবা সহানুভূতিশীল বিদ্রোহী বোম্বাই-এর নাগরিকদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সেদিন পণ্ডিত নেহরু অথবা মহাত্মা গান্ধী পথে এসে জনতার সঙ্গে দাঁড়াননি—বা তাঁদের পরিচালিত করেন নি।

নেহরু ও প্যাটেল—দৃষ্টিকোণ একই ছিল

ফলাফলের দৃষ্টি থেকে দেখলে, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো পার্থক্য আবিষ্কার করা যায় না। সর্দার প্যাটেল যে কথা রূঢ় ভাষায় জনসাধারণকে বোঝাতে সক্ষম হন নি, সে কথাই পণ্ডিত নেহরু তাদের আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে বুঝিয়েছিলেন মাত্র।

গণআন্দোলনে শ্রীমুন্সীর আতঙ্ক

বোম্বের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী কে, এম, মুন্সী সর্দার প্যাটেলের শক্ত নীতির সমর্থনে এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"নাবিকদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে সর্দার প্যাটেল বোম্বের মতো মহান শহর ও ভারতবর্ষকে এক বৃহৎ সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছেন। কংগ্রেসের নির্দেশ ও ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করার দিন আসেনি। তথাকথিত দাঙ্গার প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রাম কেমন করে করতে হয়, তার সুচিন্তিত ট্রেনিং দেওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কংগ্রেসের হাত থেকে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার মতলব প্রকাশ পায়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য করার চেষ্টাটা আপনা আপনি জনতার মধ্য থেকে আসেনি এবং রেটিং-দের নালিশ দূর করার উদ্দেশ্য থেকেও সৃষ্টি হয় নি। বোম্বের পুলিশ সমাজবিরোধীদের সঙ্গে সহজে যুঝে উঠতে পারছে না। বোম্বের পুলিশের কর্মনিপুণতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারছি না বোম্বের পুলিশ এ্যাক্ট অনুযায়ী কেন আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয় নি।"

মিঃ জিন্না—আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে

অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট এম. এ, জিন্না ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) কলকাতায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন ঃ

"খবরের কাগজে প্রকাশ যে আর, আই, এন, ধর্মঘট বোম্বেতে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কলকাতা ও করাচীর রেটিংরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিয়ে অবস্থার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। বোম্বে, করাচী ও কলকাতার সংবাদপত্রগুলি পাঠে বোঝা যায় যে নাবিকদের ন্যায়সঙ্গত নালিশ রয়েছে এবং দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কোনো সভ্য সরকারের পক্ষেই তাদের এই মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা চলে না। আর. আই, এন, রেটিং-দের ন্যায়সঙ্গত নালিশ দূর করার কাজে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহায্য করতে প্রস্তুত, যদি নাবিকেরা নিয়মতান্ত্রিক, আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে নিজেদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেন এবং আমাকে সমস্ত তথ্য জানান তাহলে আমি তাঁদের নালিশ দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

মিঃ জিন্না আরও জানান যে ৮ই মার্চ তারিখে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন এবং তখন ভাইসরয়ের সঙ্গে নাবিকদের নালিশ নিয়ে তদবির করবেন। (ফ্রি প্রেস জার্নাল, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)।

সেদিন কোন পক্ষে কত লোক ছিল

মনু সুবাদারের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় এসেম্বলিতে যুদ্ধ সেক্রেটারি মিঃ পি ম্যাসন বলেন ঃ

"গত ছয় বৎসরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে নিম্নলিখিত সংখ্যক ভারতীয় ছিলেন ঃ

স্থল বাহিনীতে ভারতীয়দের সর্বোচ্চ সংখ্যা—২০ লক্ষ ৫৩ হাজার

আর-আই-এন এ ৩২ হাজার ৯ শত ১৭

আর-আই-এ-এফ-এ ২৯ হাজার ৮ শত ২০

বলাবাহুল্য যে ভারতীয় রাজকীয় বিমান বাহিনীতেই প্রথমে ধর্মঘট শুরু হয়। তার পূর্বে ব্রিটিশের খাস রয়েল এয়ারফোর্সেও ধর্মঘট হয়। একথাও ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করেন যে ভারতীয় নৌবহরে ধর্মঘটের প্রেরণা আর এ-এফ ও আর-আই-এ-এফ থেকেই এসেছিল। এ স্বীকৃতির তাৎপর্য ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব কত সুদূর প্রসারী হতে পারত যদি এই ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত আপসহীন বিপ্লবের পথেই অগ্রসর হতো। ভারতীয় বিপ্লব আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আবদ্ধ ধারাকেই হয়তো মুক্ত করে দিতে পারত—এবং ব্রিটিশবাহিনীর কাছ থেকেও প্রতিবন্ধক কিছু দুরূহ হতো না—ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সৈনিকেরা তো নৌবিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীলই হয়ে পড়েছিল। এমন কি গোর্খা বাহিনীতে স্থানে স্থানে ধর্মঘট দেখা দেয়।

তা ছাড়া বোম্বে, কলকাতা, করাচী, প্রভৃতি নগরগুলিতে নৌ বিদ্রোহীদের সমর্থনে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন ও আহত ও নিহত হয়েছিলেন শত শত লোক।

এই পরিপূর্ণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মুখে উপস্থিত হয়েই ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী এটিলী সাহেব তো পার্লামেণ্টে ঘোষণাই করে দেন যে ভারতকে পরাধীন রাখতে হলে বৃটিশ বাহিনীকে নতুন করে ভারতকে দখল করতে হবে—এবং লক্ষ লক্ষ বৃটিশ নওজোয়ানের দরকার হবে আজকের ব্রিটিশ নওজোয়ান আর সে ধরনের অভিযানে যোগ দেবে না।

বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য

ব্রিটেনের ৮টি জাতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে ৭টি আর, আই, এন নৌবিদ্রোহের সংবাদের প্রাধান্য দিয়ে খবর পরিবেশন করে। আর লেবার পার্টির মুখপত্র "ডেলি হেরাল্ড" খবরটিকে দ্বিতীয় স্থান দেয়—তাঁদের বোম্বের সংবাদদাতার সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে।

রক্ষণশীল দলের কাগজ "ডেলি এক্সপ্রেস" এ চমকপ্রদ হেড লাইন হল- Mob out of hand (জনতা হাতছাড়া), 'পুলিশের গুলিবর্ষণ'। ডেলি মিরর-এর হেড লাইন – "বিদ্রোহীদের আসন্ন সর্বনাশ" (Doom threat to mutineers)। 'ডেলি হেরাল্ড'-এর হেড লাইন - A peace man' told—Stop navy Strike !

'ডেলি হেরাল্ড'-এর সংবাদদাতা সাদার্ন কমাণ্ডের কমাণ্ডার ইন্ চীফ জেনারেল লকহার্ট-এর বোম্বে উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন —নৌবিদ্রোহ দমন করার জন্য নৌ সেনাধ্যক্ষের পরিবর্তে একজন আর্মি অফিসারকে ডাকা বিশেষ ইঙ্গিত ও গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনটি কাগজ সম্পাদকীর মন্তব্য করে। তাঁদের মধ্যে 'ডেলি এক্সপ্রেস' ও ডেলি মেল' ধীরতার সঙ্গে নৌবিদ্রোহ দমন করার সুপারিশ করেন। তৃতীয় কাগজটি, কমিউনিস্ট পার্টির 'ডেলি ওয়ার্কার' বলে, "ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের তরঙ্গের শীর্ষতম তুঙ্গ উপস্থিত।"

নিউইয়র্ক টাইমস্-এর সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখের 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'—'প্রাচ্য দেশে বিদ্রোহ' (Revolt in the east) শিরোনামায় এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখে। তাতে বলে, "মিঃ এটিলীর স্বাধীনতা ও ন্যায়ের উপর প্রতিশ্রুত সরকার ভারতে বিশৃঙ্খলা দমন করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন বলে জয়ী অথবা আত্মসন্তুষ্ট হবার কারণ নেই। বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের কারণগুলি দূর করতে হবে। সমস্ত পৃথিবীতেই অশ্বেতকায় জাতিসমূহ গভীর ও বিস্তৃত

অসন্তোষের সমুদ্রে বিক্ষোভের তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে। এবং তাদের সংখ্যা সমস্ত মানব জাতির কম নয়।

আজ আমাদের এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হতে হবে যে অশ্বেতকায়দের ওপরে শ্বেতকায়দের সাম্রাজ্য শাসনের অবসান হতে চলেছে।

"আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা" ও "মানবাধিকারেব সনদ" (Bill of Rights) এখনও তার কাজ করে চলেছে। পরাধীন জাতিসমূহ আজ তাদের সাবালকত্ব অর্জন করতে চলেছে—এ কথা স্পষ্ট। এই সত্যকে প্রাক্তন মনিব জাতিদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার। ফিলিপাইনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই সত্যকে স্বীকার করে সকলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন।"

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার'

ডেলি ওয়ার্কার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আর, আই, এন্ ধর্মঘট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখা যায় ঃ

"ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের চাপ ও বিক্ষোভের তরঙ্গগুলি 'নৌবিদ্রোহ' তুঙ্গতম পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।"

"ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সে সম্বন্ধে এযাবৎ যা কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুচতুর ভেদ নীতি তাঁরা লক্ষ্য কবেন। ভেদ নীতিব মধ্য দিযে সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত কৌশলই তাঁরা দেখতে পান।

"ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিকা এ সময়ে মনে রাখা দবকার।

"এহেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা ভারতে যাচ্ছেন।

"এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত নয় যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সম্প্রতি ঘোষিত নীতির যদি পরিবর্তন করা না হয়, তবে তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

"ভারতীয় জনমত কখনই এমন ধবনের সংবিধান বচয়িতা সংস্থাতে বাজি হতে পারে না, যা ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা দিয়ে ভারাক্রান্ত থাকবে—বিশেষ করে যদি সে সংস্থায় সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গ দ্বারা অতিবিক্ত ভারাক্রান্ত করে তোলা হয়।

"ভারতীয় জনসাধারণ ভাবতীয় সংবিধান রচনায় জনসাধাবণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ছাড়া আর কারও হস্তক্ষেপ আজ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।"

(রয়টার, ২২শে ফেব্রুযারি, ১৯৪৬)

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কার্যকলাপ

২৩শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) তারিখে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্য ডঃ জি. অধিকারী নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন ঃ

বোম্বের শ্রমিক ও নাগরিকেরা আব, আই, এন্-এর নাবিকদের প্রতি ও তাঁদের দেশাত্মবোধক দাবিসমূহের প্রতি সহানুভূতি ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

"উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ আব, আই, এন্, ধর্মঘটীদের বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত কবতে দ্বিধা করে নি এবং তাদের নৌবাহিনীসহ ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে। গতকাল ধর্মঘটীদের সমর্থক হাজার হাজার নাবিকের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে দ্বিধা কবে নি —সেই একই সাম্রাজ্যবাদ।

"ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আর্মার্ড কার-এ রাস্তায় রাস্তায় টহল দেয় এবং জনতার ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। জনতা যেখানে ঘনসন্নিবদ্ধ হয়, কোনো প্রকার হুঁশিয়ারী না দিয়েই গোরা সৈন্যরা সেখানে বেশি গুলিবর্ষণ করে। প্যারেলের শ্রমিকাঞ্চলে মেয়ে ও পুরুষের ওপরে এভাবেই গুলি করা হয়। প্যারেল মহিলা সংঘের কমরেড কমলা ডোণ্ডে নিহতদের মধ্যে একজন।

"ব্রেন গান, ট্যাঙ্ক ও বম্বার এর সাহায্যে ভারতীয়দের ভয় দেখাবার দিন চলে গেছে। আমাদের এই শহরে যদি শক্তিমদমত্ত সাম্রাজ্যবাদ মনে করে যে সপ্তাহব্যাপী 'জালিয়ানওয়ালা-বাগ' সৃষ্টি করে নাগরিকদের দমন করা যাবে, তবে তাঁরা ভুল করবেন। এই রক্তস্নান আমাদের মধ্যে ঐক্যের সিমেন্টকে আরও শক্ত করবে এবং এই সন্ত্রাসের রাজ্যকে দূর করার প্রতিজ্ঞাকে আরও দৃঢ়তর করবে।

শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব প্রতিবাদের আহ্বান

"শুক্রবারের গণ নরহত্যার শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব প্রতিবাদে আমি সকল রাজনৈতিক দলকে একটি সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল ডাকতে আহ্বান করি। আহত ও নিহতদের পরিবারদের সাহায্য করার জন্য অবিলম্বে নাগরিকদের শান্তিরক্ষা ও বন্দীমুক্তি কমিটি (Peace and Release Committee) গঠন করা হোক।

কংগ্রেসের কাছে কমিউনিস্ট নেতার অনুরোধ

"কংগ্রেস নেতাদের প্রতি বিশেষ করে আমার এই অনুরোধ যে তাঁরা যেন বোম্বে ও ভারতের অন্যত্র ধর্মঘটী নাবিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেটাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেননা, আর, আই, এন্ ধর্মঘটীদের ব্যাপারটি আজাদ হিন্দ ফৌজের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্বের আকার গ্রহণ করেছে এবং জাতিগত সুবিধার ঊর্ধ্বে ন্যায়সঙ্গত সন্তোষজনক মীমাংসার চেষ্টা করা হোক।"

ধর্মঘট সম্বন্ধে সোভিয়েট মতামত

মস্কো, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ঃ

"রেডফ্লিট" নামক কাগজে ভারতের নৌবিদ্রোহ সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রথম মন্তব্য করা হয়।

এম, মিখিলভ ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এক প্রবন্ধে বলেন ঃ "নাবিকদের বিদ্রোহ জনসমর্থিত। বর্তমান ভারতে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, নৌবিদ্রোহ তার একটি প্রকাশ। অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ— জনসাধারণ নিদারুণ দারিদ্র-পীড়িত। কৃষিতে চরম সংকট দেখা দিয়েছে, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুতহারে হ্রাস পাচ্ছে।

"ভারতের সর্বত্র যে অনির্বাণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাতে জনগণের স্বাধীনতা স্পৃহা কতটা তীব্র হয়েছে তাই বোঝা যায়"—রয়টার।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর-আই-এন

২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট শ্রী আর-এস-রুইকর সংবাদপত্রে নৌধর্মঘটীদের সমর্থন করে এক বিবৃতি দেন। রেটিংদের প্রতি জাতিপক্ষপাতহীন

ব্যবহার, ন্যায়সঙ্গত নালিশের সন্তোষজনক মীমাংসা দাবি করেন এবং নাবিকদের দাবিসমূহ যে ন্যায্য ও মডারেট সে কথাও বলেন।

৪ঠা মার্চ তারিখে আর-এস রুইকর বোম্বাই যান, সেখানে তাঁকে কংগ্রেস কর্মীরা বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দেন। উত্তরে রুইকর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসের শিক্ষার বর্ণনা করেন। নৌবিদ্রোহীদের তিনি সমর্থন করেন। অমান্য ও উন্মুক্ত কিছু করার জন্য তিনি রেটিংদের উপর দোষ দেন না, তাঁদের সমর্থন করেই, প্ররোচনা দিয়েই বিদ্রোহী করে তোলা হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। শহরে নানা ধরনের উৎপাতের জন্য দায়ী গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে রুইকর বলেন যে প্রত্যেক বিপ্লবেই নিম্নস্তরের জনগণই প্রধানত অংশ নিয়ে থাকেন, আর উচ্চশ্রেণীর প্রবক্তারা আরামকেদারায় বসে বড় বড় নৈতিক বুলি আউড়িয়ে থাকেন। যাঁরা 'হয় করবো নয় মরবো' বলে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের সমালোচনা করা এই সব আরামকেদারার রাজনৈতিকদের মুখে সাজে না। পেথিক লরেন্সের মিশন ভারতীয় জনগণের এই নবজাগরণকে ক্লান্ত ও বিপথগামী করার জন্যই প্রেরিত হয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

আর, আই, এন, তদন্ত কমিশনে শ্রীবলাই চন্দ্র দত্তের সাক্ষ্য

বম্বে ১৬ই মে ১৯৪৭--

আজকের আর, আই, এন, তদন্ত কমিশনের সামনে শ্রীবলাই চন্দ্র দত্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করা হয়। শ্রীদত্ত এইচ, এম, আই. এস, 'তলোয়ার' এর টেলিগ্রাফ বিভাগের শীর্ষকর্মী, গত ফেব্রুয়ারি মাসে ধৃত হন ; তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি বিভাগীয় গৃহে আপত্তিকর স্লোগান লিখেছিলেন এবং পদচ্যুত হয়েছিলেন।

২রা ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে গ্রেপ্তারের সময় তলোয়ারে অবস্থানকালীন তাঁর বাসকক্ষ থেকে প্রাপ্ত কিছু জিনিসপত্র কমিশনের সামনে প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে ছিল—অশোক মেহতা লিখিত '১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহ', শ্রীদত্তের দুটি নিজস্ব ডায়েরি, একটি ২০৫ টাকার আই, এন, এ, রিলিফ ফাণ্ডের রসিদ বই, আজাদ হিন্দ প্রতিজ্ঞাপত্রের একটি কপি, একটি পোস্টকার্ড—এক্সসার্ভিস, অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মিঃ ওয়াই, কে, মেননের লেখা, একটি প্রচার পত্র শিরোনামা 'আজকের চিন্তা', এবং বন্ধুবান্ধবকে দত্তের লেখা ও দত্তকে লেখা কয়েকটি চিঠি।

কানে কানে প্রচার

শ্রীদত্তের নিজস্ব ডায়েরিতে ৬ই জানুয়ারি তারিখে লেখা আছে ঃ

It will be a great blow to our 'whis. Camp'। পাওয়ারের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদত্ত স্বীকার করেন ঐ শব্দটির পুরো কথা-- 'Whispering campaign' (কানে কানে প্রচার)।

শ্রীদত্ত whispering campaign কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন এর দ্বারা তিনি আর, আই, এন, এর আগ্রহী রেটিংদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস এবং ঐ দেশের বিষয়গুলি আলোচনা করতেন। এ সমস্ত বিষয় প্রকাশ্যে বলার সুযোগ তাঁর না থাকাতে তাঁকে ঐ পন্থা নিতে হয়েছিল।

লেঃ পাওয়ার ঃ আমি বলছি যে আপনার এই 'whiscamp' ব্যবহৃত হয়েছিল এঁদের বিদ্রোহে উৎসাহ দেবার জন্য।

শ্রীদত্ত ঃ আমি অস্বীকার করছি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদত্ত বলেন যে যখন আগস্ট বিপ্লব শুরু হয় তখন তিনি ভাবতে ছিলেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে পড়েছিলেন এবং তার খুবই ভাল লেগেছিল।

লেঃ পাওয়ার ঃ আমি বলছি যে আপনি খুবই খুশি হতেন যদি সৈন্যবাহিনী ঐ আন্দোলনে যোগ দিত।

শ্রীদত্ত ঃ কে না খুশি হত।

লেঃ পাওয়ার ঃ আপনি কি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতেন যদি তখন আপনি সিঙ্গাপুরে থাকতেন?

শ্রীদত্ত ঃ নিশ্চয়ই। যোগ দিতে না পারলে দুঃখিত হতাম।

রাজনৈতিক স্লোগান

সাক্ষী বলেন যে বোম্বাই শহরে নৌ দিবসে সমগ্র তলোয়ার প্রতিষ্ঠানটি লিখিত স্লোগানে ভরে গিয়েছিল। স্লোগানগুলি ছিল, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'ভারত ছাড়' এবং 'সমস্ত সাদা কুকুরদের হত্যা কর'। শ্রীদত্ত বলেন ১লা ফেব্রুয়ারিতে তিনি প্ল্যাটফর্মে দুটি স্লোগান লিখেছিলেন—যেখানে যে (আর আই, এন, এর ফ্ল্যাগ অফিসারের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল।

লেঃ পাওয়ার ঃ আপনাদের অভিযোগগুলি যখন রাজনৈতিক ছিল না তখন আপনারা কেন বিশেষ করে রাজনৈতিক স্লোগানগুলি বেছে নিলেন?

শ্রীদত্ত ঃ আমরা ঐরকমই অনুভব করেছিলাম।

লেঃ পাওয়ার ঃ আপনি নিজে কি মনে করেন যে খাদ্য, পরিবহন ব্যবস্থা ও অন্যান্য অভিযোগগুলির গুরুত্ব কম ছিল?

শ্রীদত্ত ঃ ওগুলি খুব তুচ্ছ ব্যাপার।

শ্রীদত্ত বলেন যে তাঁর ডায়েরির এক জায়গায় "H Q' অক্ষর দুটি কমিউনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টার রূপেই উল্লিখিত ছিল। তিনি আরও বলেন যে তিনি নিজে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ পছন্দ করেন না, তাঁর মনে হয় কমিউনিস্টরা "দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা" করেছে এবং তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর সহকর্মীদের কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে অন্য আদর্শে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

শ্রীদত্ত কমিশনের কাছে অভিযোগ করেন যে এখানে পুলিশ তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছে এবং বাঙলাদেশে তাঁর পরিবারবর্গকে হয়রানি করছে।

(বিদ্রোহের রিপোর্ট ঃ অমৃতবাজার পত্রিকা ২০শে থেকে ২২শে জানুয়ারি)

জেলের চিঠি

প্রথম পত্র

আজকের দিনে বিপ্লবের প্রধান সমস্যাগুলি সমাধান করতে হলে আমাদের কতিপয় বিষয়ে চিন্তা করতে হবে এবং আত্মসমালোচনা করতে হবে।

পার্টির যে সমস্ত কর্মীরা জনগণের মধ্যে কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজকাল কিছুটা পরিমাণে অধৈর্য হয়ে উঠছেন, পার্টি তাড়াতাড়ি বিরাট হয়ে উঠছে না, পার্টি দৈনন্দিন সাধারণ খুঁটিনাটি কাজকে ছাপিয়ে বর্মা ও চীনের কমরেডদের মত পুরোপুরি সশস্ত্র লড়াইয়ে নেমে পড়তে পারছে না এটাই তাদের অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হওয়ার কারণ।

এই ধরনের মনোভাবে দুটি পৃথক ফল দেখা যাচ্ছে—অনেকে আরো উৎসাহী, আরো সক্রিয়, আরো চিন্তাশীল হয়ে উঠছেন এবং প্রস্তুতির দিক থেকে আরো ভালোভাবে তৈরি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন, আবার অনেকে হতাশ হয়ে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে চিন্তাশীলতার অভাব প্রকাশ করছেন—যার ফলে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। পার্টির ভেতরের কিছু কিছু কর্মী এবং জনসাধারণের কিছু কিছু অংশের মধ্যেও এই ধরনের হতাশা এবং নিরুৎসাহের ভাব প্রায়ই প্রকাশ পাচ্ছে। কয়েকজন পার্টিনেতা আমার কাছে জানিয়েছেন যদি আমরা শীঘ্রই একটা আক্রমণ শুরু না করি তা হলে কর্মীদের মনোবল ঠিক রাখা যাবে না এবং পার্টির শক্তির উপর তাঁদের আস্থা বজায় থাকবে না।

এই ধারণা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পার্টির কর্মীদের সামনে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে অসহিষ্ণুতার ভাব—এটা কিসের জন্য? আমাদের সমাজ যে বিপ্লবের জন্য উন্মুখ এবং কেবলমাত্র একটা বড় রকমের আঘাত মাত্র প্রয়োজন এই প্রয়োজনীয়তা বোধই কী অসহিষ্ণুতার কারণ? আমরা কি প্রত্যেকে ইতিহাসের নির্দিষ্ট গতি বুঝে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি এবং তার দায়িত্ব পালন করছি? আমার মনে হয় আমরা তা পারিনি অন্তত সঠিকভাবে ততখানি তৈরি হতে পারিনি। যদি সত্যই তা পারতুম তা হলে আমাদের এই অসহিষ্ণুতা আমাদের লড়াইয়ের বহুমুখী এবং জটিল সমস্যাগুলির সঠিক সমাধান করার মধ্যেই প্রকাশ পেত। বিপ্লবের জন্য আমাদের এখনই কি করতে হবে এবং কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে চিন্তার সঙ্গে কাজের মিল রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি অনুভব করি তাহলে আমাদের আরো বেশি সক্রিয়, আরো বেশি চিন্তাশীল এবং নাছোড়বান্দা হতে হবে। আমাদের কোন প্রকার কষ্টকেই কষ্ট মনে করলে চলবে না। কোন রকম হতাশাকে মনে স্থান দেওয়া চলবে না, আজকের যুগের ঝরঝরে পচা সমাজব্যবস্থার এই সব রোগ থেকে আমাদের মুক্ত রাখতে হবে।

পার্টির মধ্যে এমন অনেক কর্মীকে দেখা যাবে যারা কাজ খুঁজে পান না। যাদের নিজস্ব কোন প্রচেষ্টা নেই, যারা ম্যালেরিয়াকে ভয় পান, যাঁরা জনতার সঙ্গে মিশতে পারেন না, বই পড়বেন না, নিজেদের উন্নত করবেন না বা কোন কিছু শিক্ষার কষ্টটাও সহ্য করবেন না অথচ তারা অভিযোগ করবেন তাদের কোন নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হচ্ছে না বা কোন প্রকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না বলে। তাদের কথা শুনে মনে হয় তাদের হাতে একটা রাইফেল আর একটা পরিকল্পনা দিয়ে দেওয়া হবে তখনই তারা কাজে লেগে যাবেন। এই সব কর্মীদের কাছে তাঁদের

জীবনটা চিরকালই অসার মনে হবে, জীবনে পরিবর্তন আসার সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধ করবেন না, মনে মনে পরিবর্তনের কল্পনাই করে চলবেন। এই যে মনোভাব এটা সামাজিক অসহিষ্ণুতা নয়, এটা একটা মানসিক রোগ, এটা সচেতনতা নয় বরং তার উল্টোটা। এই শ্রেণীর অধৈর্য কর্মীদের শুধু সন্তুষ্ট করবার জন্যই আমাদের নেতারা কোন সংঘাত করবেন না। মাত্র এঁদের উপর নির্ভর করেই লড়াইয়ের কোন পরিকল্পনা হয় না। যে সমস্ত কর্মী কেবলই নানারকমের অসুবিধায় পড়েন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন তাঁরা এ কাজের মোটেই যোগ্য নন। সেই সব কর্মীই এই সব কাজে যোগ্য যাঁরা সমস্ত সময়েই সুস্থ মস্তিষ্কে স্থিরভাবে কাজ করে চলেন। যাঁদের উৎসাহ অদম্য হঠাৎ বেড়েও যায় না বা হঠাৎ কমেও যায় না— যাঁরা ক্ষণিকের উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে হৃদয়াবেগে কাজ করেন না, কাজ করে চলেন অন্তর্নিহিত মনের ইঙ্গিতে। যোগ্য কর্মীর থাকে নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস, পার্টির শক্তির উপর বিশ্বাস, ইতিহাসের উপর বিশ্বাস, সমস্ত অবস্থাতেই দৈনন্দিন কাজে সক্রিয়। যত কঠিন দায়িত্বই তাঁর উপর পড়ুক না কেন যোগ্য কর্মী কখনই আপত্তি করেন না। কাজের অভাব তাঁর কখনও হয় না, নিজেই কাজ সংগ্রহ করে নেন।

তবে এটা অত্যন্ত সত্য যে আক্রমণ শুরু করতে না পারলে জনসাধারণ বা কর্মীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন। কারণ আক্রমণ ছাড়া আজ শক্তি বৃদ্ধি করা অসম্ভব। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা আজ এমন যে শত্রুর ক্রমবর্ধমান চাপ এবং অবিশ্রান্ত আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে এমন বিরাট করে পার্টি গড়ে তোলা, গণসংগঠন তৈরি করা, কর্মীদের বা জনসাধারণকে যোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা কিংবা জনগণকে সশস্ত্র করে তোলা কোনটাই আজকে আর গোপনে চুপি চুপি করা সম্ভব নয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের একটা নিজস্ব এলাকা গড়ে তুলতে পারছি, যেখান থেকে আমরা আক্রমণ বা প্রতিরোধ চালাতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এর কোনটাই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। পার্টি বা জনসাধারণের পক্ষে আজ বাঁচতে হলে, শক্তি বৃদ্ধি করে জয়লাভ করতে হলে বৈপ্লবিক সংঘর্ষ শুরু করতেই হবে, এ ছাড়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে না, কারণ জাতীয় ক্ষেত্রে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বা সন্ধি আজ আর নেই।

কিন্তু আজকে আমাদের প্রত্যেকে কি এই সংঘর্ষের পথ এবং সমস্ত দিক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করে নিতে পেরেছি, পার্টির বীরভূম সম্মেলনে গৃহীত থিসিস সব দিক থেকে বুঝে কি আমরা এই বিপদজনক পথে এগিয়েছি? দমদম সংঘাতের সমুদয় অভিজ্ঞতা কি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি? এই সংঘাত কি কর্মীদের আরো সক্রিয়, আরো বুদ্ধিমান, আরো সাহসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভব করাচ্ছে না? আমাদের লক্ষ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে আরো পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করবার তাগিদ দিচ্ছে? কর্মীদের অভিজ্ঞতা কি তাঁদের নির্ভীক করতে পেরেছে বা আরো অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রেরণা দিতে পেরেছে? অর্ধপ্রস্তুত যোদ্ধা যে-যুদ্ধ ঘোষণা করে কিন্তু যুদ্ধের সময় ইতস্তত করে বা যে যুদ্ধ করতে চায় না তার মত হাস্যকর ব্যক্তি দুনিয়ায় আর কেউ আছে কি?

আজ নিয়মতান্ত্রিকতা বা সাধারণ কোন উপায়ে শত্রুকে একটুও আঘাত দেওয়া যাবে না। শত্রুকে আঘাতের মত আঘাত দেওয়া যাবে তখনই যদি আমরা আমাদের সমস্ত প্রকার শক্তি দিয়ে সর্বস্ব পণ করে মরিয়া হয়ে সংঘাত শুরু করি। তবে এটা যেন কেউ না ভাবে যে একবার কোন রকমের আক্রমণ শুরু করতে পারলেই আমরা শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছাব বরং লড়াইয়ের উচ্চতর ধাপে পৌঁছাবার এটা কেবলমাত্র শুরু।

একটি মাত্র সোজা ধাক্কা দিয়েই আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈরি করতে পারব বা জয়লাভ করতে পারব এ ধরনের কল্পনা করা অত্যন্ত বোকামী। শত্রুর সঙ্গে বৈপ্লবিক সংঘর্ষ শুরু করার পর আমাদের বেশ কিছুদিন সংঘর্ষের মধ্যেই কাটাতে হবে এটা নিশ্চিত এবং সেই জন্যই আগে থেকে আমাদের সমস্ত দিক থেকে তৈরি হয়েই নামতে হবে। এখন আমরা যত বেশি খেটে তৈরি হব আসল লড়াইয়ের সময় আমাদের তত বেশি সুবিধা হবে। এখন যত বেশি চিন্তা করে কাজ গুছিয়ে রাখতে পারব পরে তত কম রক্তপাত এবং কম সময়ের মধ্যেই কাজ হাসিল করতে পারব। সেই জন্য এখন আমাদের প্রত্যেককে অত্যন্ত সাবধানে প্রত্যেকটি কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হবে, সমস্ত রকম ছেলেমানুষী বর্জন করতে হবে—এক কথায় সংঘাত বা অভ্যুত্থানকে নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক হবে না।

সমস্ত রকম দুর্বলতাকে কাটিয়ে যাঁরা মনোবল বজায় রাখতে পারবেন কেবলমাত্র তাঁদেরই অধিকার আছে পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় যোগদান করার—যেখানে আলোচনা করা হবে সংঘাত ও সংগঠন করার ব্যবহারিক নীতি সম্পর্কে। যাঁরা মন থেকে দুর্বলতা কাটাতে পারেন নি তাঁদের পক্ষে বিপ্লব পরিচালনা সম্পর্কে চিন্তা করাও দুঃসাহসের কাজ। ইতি—

৪/১১/৪৯

দ্বিতীয় পত্র

সমস্যাটা বুঝতে হলে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ প্রয়োজন, তা না হলে কোন সমাধানেই আমরা পৌঁছাতে পারব না এবং আমাদের কার্যকলাপকে কখনও গুছিয়ে নিতে পারব না, ক্রমাগতই বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও অনন্ত ধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়াতে হবে। প্রকৃত পথ সম্পর্কে আমাদের যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে কোন্‌টা প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টা প্রয়োজনীয় নয় বা কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রয়োজন এবং ক্রমপর্যায় ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির স্থান নির্ণয় করার স্বাভাবিক জ্ঞান যা আমাদের মধ্যে কম বেশি সকলেরই আছে, তাকে উন্নত ও পুনর্বিচার করবে আমাদের দৈনন্দিন কাজে তার অনুশীলন করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি কার্যক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়।

উচ্চতম কমিটির সদস্য থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক সেলগুলির সদস্যদের প্রায়ই নিজেদের সাধারণ এবং বিশেষ দায়িত্ব নির্ণয় সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। এই দ্বিধা সাংগঠনিক দৃঢ়তা নষ্ট করে, তার ফলে আমাদের চোখের সামনে লড়াই-এর কোন একটা স্পষ্ট চেহারা কদাচিৎ প্রস্ফুটিত হয়। আমাদের কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করে, প্রচার ও উত্তেজনা সৃষ্টিও বিস্তৃত হয় কিন্তু সংগঠকদের উদ্দেশ্যাতে নির্দিষ্টতার অভাবে এই সমস্ত কার্যকলাপ, প্রচার ও উত্তেজনা সৃষ্টি নির্দিষ্ট কোন সংঘাতে পরিণত হয়ে লড়াইকে উন্নততর ধাপে নিয়ে যেতে পারে না। তখন এই সমস্ত কার্যকলাপ শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যায় বা অবসাদে নিষ্পন্ন হয় এবং অল্প দিনের মধ্যে সমস্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে। আরও সাধারণ ভাবে বলা যায়—স্থানে যেটা লাভ করা গেল সময়ের মধ্যে সেটা ধ্বংস হল এবং সময়ে যেটা তৈরি হল স্থানে সেটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ঐ সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে, স্পষ্ট ভাবে, এবং গুরুত্বে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। সংগঠকদের অনন্ত অস্থিরতার মধ্যে সর্বদাই বিচরণ করলে চলবে না। তাছাড়া আজ যখন আমরা শীঘ্রই সংঘাতে অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তা করছি, আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি তখন

আমাদের কথা এখনও কত অস্পষ্ট, মতান্তর কত অনন্ত, আমাদের শক্তি নির্ধারণে কত বিভিন্নতা, আচরণ কত অদ্ভুত। যেন আক্রমণের সাধারণ পরিকল্পনা, সংগঠনের ভিত্তি এবং তার উদ্দেশ্য পার্টির সাংগঠনিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর না করে নির্ভর করছে কেবলমাত্র সাধারণের মনোভাবের উপর।

আমাদের সংগ্রামের সাধারণ চিত্রটিকে আর একবার পর্যবেক্ষণ করা যাক। বীরভূম থিসিসে সংগ্রামের ভিন্ন পথ নির্ধারণ করার পর আমাদের অবস্থা বিচারের চেষ্টা করা যাক। সেই থিসিসে আমরা আমাদের শক্তি দুর্বল ও সামর্থ সামান্য থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সাধারণ পথ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় যুদ্ধের পথ গ্রহণ করেছি। বাস্তবে তাকে কিভাবে রূপ দিতে হবে তাও আমাদের আগে থেকে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। ইতিহাস যে বৈপ্লবিক পথের নির্দেশ করে দিল তাতে সমর্থন জানাবার সাহস কেবল আমাদেরই ছিল। আমাদের এই সমর্থন বহু খাজা রাজনীতিকদের কাছে অদ্ভুত এবং বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ বলে মনে হয়েছে। সংঘাত বলতে আমরা ঠিক কি বলতে চাইছি এবং তার রূপটা কি এই প্রশ্ন আমাদের অনেকেই করেছেন, যেমন আমরাও আমাদের এই প্রশ্ন করছি। আমরা তাদের কাছে এর ব্যাখ্যা পরিষ্কারভাবে করিনি এবং করতে পারি নি, কিন্তু আমাদের কর্তৃত্বে শক্তির হিসাব অবিরতই করে চলেছিলাম। একটি বিষয়ে আমরা সকলের অগ্রগামী ছিলাম সেটা হচ্ছে রাশিয়ার বিপ্লবই সমস্ত দেশে সমস্ত সময়ে প্রযোজ্য এবং একমাত্র নিদর্শন— এই জড় ধারণা থেকে আমরা মুক্ত ছিলাম কারণ আমরা নিশ্চিত যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক এই পথে অগ্রসর হতে দেবে না। এই জন্যই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অন্য উপায় এবং অন্যপথ অন্বেষণ করার প্রেরণা আমরা পেয়েছিলাম। লালচীন যেখানে নূতন আলোক সম্পাত করেছিল কিন্তু তখনও তারা এখনকার মত এত শক্তিশালী এবং ব্যাপক হতে পারে নি। তা সত্ত্বেও আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে নেবার চিন্তা করতে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এমন কি মালয়ও বিপ্লব প্রচেষ্টায় আমাদের সমস্ত অচল গোঁড়ামী ত্যাগ করতে আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের থিসিস গ্রহণ করার অল্প কয়েক মাস পরেই পৃথিবীর পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে সংঘাতের পথে আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করল এবং পৃথিবীর অধিকাংশ কমিউনিস্ট আমাদের প্রধান নীতিকে কমবেশি গ্রহণ করেছে।

বৈপ্লবিক সংঘাতই পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের একমাত্র উন্মুক্ত পথ। তারই জন্য আজ আন্তর্জাতিক কমিউনিজম-এর আক্রমণ গোটা পৃথিবীর ধনতন্ত্রবাদীদের সম্মুখে এখন একমাত্র রাজনৈতিক সমস্যা। এই শ্রেণীযুদ্ধ এখন আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করেছে এবং আজ এই সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছেনা এমন একটা নিরেট লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিভিন্ন দেশে আজ এই শ্রেণী সংঘর্ষের অবস্থা এবং তীব্রতা এখন প্রধানত নির্ভর করছে প্রত্যেক দেশের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্বের যোগ্যতা ও পুনর্নির্ধারিত আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক নেতৃত্বের সম্পূর্ণতা এবং গ্রহণ করবার ক্ষমতার উপর। সেই জন্যই পৃথিবীর বৈপ্লবিক শিবিরের মধ্যে আজ অন্তর্বিরোধ চলেছে। মতবাদের এই সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সাধারণ গতিপথে বাধা সৃষ্টি করছে না এবং করতে পারে না যেমন বাতাসের প্রতিরোধে সৃষ্ট নদীর উপরের তরঙ্গ নদীকে গতিপথচ্যুত করতে পারে না।

এই থিসিসে এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে,—আজ উন্নত, অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে বর্তমানের বৈপ্লবিক সংঘাতের লক্ষ্য একই অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—গণতন্ত্র কিংবা নয়াগণতন্ত্র নয়। পরিবর্তনের বাধা সমস্ত

প্রকারের ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ব্যাপক এবং আসন্ন বিকাশ, দৃষ্টি শক্তির অস্পষ্টতা মুক্ত করেছে ; তাব লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র এবং সমস্ত দেশ, জাতি, বর্ণের এক ঐকতানপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক মানবত্বের মধ্যে সম্পূর্ণতা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

আজকের পৃথিবীর ঘটনাচক্র থেকে আমরা এই দুটো দিকে কি দেখতে পাই? যাবা একদিন নয়াগণতন্ত্রের মধ্যে বেহেস্তের আলো দেখতে পেয়েছিল তারা কি মার্ক্স এঙ্গেলস্ ও লেনিনের দেখানো সামাজিক রূপ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মতবাদ নিয়ে আগের চেয়ে কম মাতামাতি কবছে? পাশ্চাত্যেব নয়া গণতন্ত্রী দেশগুলি এবং চীন কি এখন নয়াগণতন্ত্র পেয়েই খুশি? নয়াগণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী নয়াগণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সমাধান করা যায় না এ বকম সমস্ত কঠিন সমস্যা (যেমন টিটোইজম্) কি ওদের সামনে দেখা দেয় নি? এদের আগেকার মতবাদের সঙ্গে খাপ খায় না কিন্তু তবু কি ওরা সোসালিস্ট ব্যবস্থা অবলম্বন কবতে বাধ্য হচ্ছে না? ওদের মতবাদ কি কাজেব তুলনায় পেছিয়ে পড়ে নেই? ওরা কি এখন বুঝতে পারছে না যে কৃষি সমস্যাগুলিরও সমাধান সোসালিস্ট অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ছাড়া সম্ভব নয়? আমরা জানি ওদেব ধাবণা খুব পরিষ্কার নয় এবং ঝাপ্সা আছে অনেকখানি তবু অন্তত এইটুকু আমরা দেখছি যে ওবা একমুখে নানা কথা বলছে। তার মানে, ওদের মনেব বরফেব চাপ ভাঙতে শুরু কবেছে এবং যতই ইতিহাস এগিয়ে যাবে, জনতার কঠিন আঘাতে আরো ভেঙে চুবমার হবে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত জমাট ববফ গলে তীব্র তরল স্রোতে বইবে।

সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে লড়াইয়েব কায়দা যা বিশ্ববিপ্লব অনুষ্ঠানের পথেও অনেক বিঘ্ন। লড়াইয়ের জন্য দরকারী হাতিয়ার জনতার নেই, পেছিয়ে পড়া এশিয়ার কিষানের সহায়তায় একনায়কত্ব কায়েম করার মত সংঘবদ্ধ মজুর নেই, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দরুন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তনেব পক্ষে প্রয়োজনীয় মালমশলা পাওয়া মুস্কিল এবং বিশ্ব সাম্যবাদেব সংঘবদ্ধ শক্তি বিভিন্ন দেশেব সংগ্রামী কমিউনিস্টদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি আঁকে না। বাধা বিস্তর, পথ দুর্গম ও বন্ধুর এবং কখনো কখনো হতাশার সৃষ্টি করে। ঝড়েব মুখে লাল চীন প্রতিক্রিয়াকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে সেটাই তো একমাত্র ছবি নয়—পরাজিত গ্রীক গেরিলাদল, বক্তে ভেজা বর্মার জঙ্গল এবং মালয়ে নরহত্যার বীভৎসতা এসবও দুর্বল কমিউনিস্টদের ওপর প্রভাব বিস্তর করে। সেদিকে তাকিয়ে ওদের ইচ্ছা জাগে দূবে বসে কেবল দেখবার কিন্তু তবুও অনুভব করে যে ইস্তাহার ছড়ানো ছাড়া আবো বাস্তব কঠিন উপায়ে দেশান্তরের লড়িয়ে কমরেডদের সাহায্য করার দরকার আছে। ওরা কি কল্পনা করে না, পৃথিবীর কোন দিক থেকে হঠাৎ এক বিরাট বাহিনী যারা সংগ্রাম শুরু করেছে তাদের হয়ে লড়তে শুরু কববে? কিন্তু এই ফৌজও আকাশ থেকে নামবে না, বিশ্ব বিপ্লবের শিবির থেকে কেবল আসতে পাবে। এই শিবিরের নেতা কারা? মজুরশ্রেণী, এবং মজুব শ্রেণী সবচেয়ে শক্তিমান রাশিয়ায় যেখানে মজুর একনায়কত্ব পুরো কায়েম হয়েছে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়াই নেতৃস্থান অধিকার করে আছে। মুক্তদেশগুলিতে সারা দুনিয়ার মজুরশ্রেণীর মধ্যে ও শোষিত জনসাধারণের ভিতরে সর্বত্রই তার মিত্রশক্তি।

সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই শিবিরের কেন্দ্র হিসাবে স্টালিনের প্রতিষ্ঠা এত সুদৃঢ় যে একেবারে গণ্ডী পার না হয়ে গেলে তার পতন অসম্ভব। তাই দেখি যেখানে কমিউনিস্টরা বিভক্ত এবং পরস্পর বিনাশের উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করতেও দ্বিধা বোধ করে না (যেমন বর্মার) সেখানেও কেউ স্টালিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে না এবং দু'তরফাই স্টালিনের কাছে আত্মনিবেদন করে পাল্লা দিয়ে। সে জনাই ভিসিনিস্কি যখন স্টালিনের হয়ে বলেন যে রাশিয়া

ইউ-এন-ও মারফৎ শান্তিতে বিশ্বাসী তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে স্টালিনবাদীরা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে থাকে যদিও ওরা মুখে যা বলে, কাজে যা করে তার উদ্দেশ্য গৃহযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ, ইউ-এন-ও মারফৎ শান্তি নয়, বিশ্ব বিপ্লবের পথে শান্তি। তা হলে এই বিরাট স্টালিন ও স্টালিনবাদ সম্বন্ধে কি হবে? এটা নিশ্চয়ই একটা গোলমেলে ব্যাপার এবং আমাদের কমরেডরা হয়ত ভাবতে ভাবতে বিরক্ত হয়ে যান যে এত সূক্ষ্ম ভেদাভেদের মধ্যেও কোথায় সহযোগিতা করতে হবে, কোথায় প্রতিরোধ করতে হবে এবং কোথায় বা লড়তে হবে। কমিউনিস্টদের প্রায় সব বিপ্লবাত্মক, আইনানুগ এবং সুবিধাবাদী কাজই স্টালিনবাদের দোহাই দিয়ে চলেছে, শেষ অবধি বিশ্ববিপ্লবের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? ভালই হোক আর মন্দই হোক বিপ্লব শিবিরে ট্রটস্কীপন্থী কোন বিরুদ্ধ শক্তি নেই। সকলের মুখ হাসিয়ে ওরা হয় সুবিধাবাদের দলে ভিড়েছে অথবা পরিষ্কার উবে গেছে। একটা মহান আদর্শ কি করে অনুচরদের দোষে কলঙ্কিত হয়ে ওঠে —এই তার একটা উদাহরণ। এক হিসাবে এদিক থেকে স্টালিনের বিপ্লবী নেতা হিসাবে নিজের নাম রক্ষা করতে সুবিধা হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও যদি ট্রটস্কীবাদের আদর্শে লড়াই চলত তাহলে স্টালিনবাদ খারিজ করে একটা সম্পূর্ণ আলাদা নেতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হলেও হতে পারত। যারা তোতাপাখির বাঁধা বুলিতে বিশ্বাস করে এবং ইতিহাসের দিকে তাকায় না ভারতবর্ষে তাদের পক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলশেভিক লেনিনিস্টদের মত ট্রটস্কীপন্থী ও ঠাকুরপন্থীদের মত আধা ট্রটস্কীপন্থীদের হাস্যকর অবস্থা। ট্রটস্কীপন্থীদের অনেক অস্ত্র স্টালিনবাদীরা তাদের হাতে নিয়ে নিয়েছে এবং বাকি যা আছে সে কেবল সুবিধাবাদ ও মিথ্যা বাগাড়ম্বর। মনে হয় টিটোইজম মার্কা প্রতিরোধও এক ভয়ানক ক্ষতিকর বস্তু, কারণ বিশ বছরের ভুল স্টালিনপন্থা থেকে জন্ম নিয়েছে টিটোইজম এবং স্টালিনিস্টরা নিজেরাই আজকাল তাদের এই শিশু সন্তানের দিকে তাকাতে আঁৎকে ওঠে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাইরের থেকে একটা প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চলছিল কিন্তু সে সবই প্রায় গেছে। কিন্তু তাই বলে স্টালিনবাদ যা খুশি তাই করতে পারেনা। তার নিজের ভিতরই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে এবং বেড়েও চলবে। ভারতবর্ষে, বর্মায় কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে সে কথা বোঝা যায়। দলের ভাঙন, সদস্য বিতাড়ন ও বিতাড়িত সদস্য কর্তৃক পাল্টা বিতাড়ন এই সব হচ্ছে ঘটনাচক্রের এক দিক এবং অন্য দিক হচ্ছে পার্টির নীতি। বছর দশেক পরে আবার স্টাডি সার্কলে মার্কস্ লেনিনের কথা আলোচনা শুরু হয়েছে এবং শ্রেণী সংগ্রামের কথা শোনা যাচ্ছে। আশা করা যায় নীতি ভালর দিকে মোড় ঘুরবে। কিন্তু স্টালিনপন্থী নেতৃত্ব একটু নড়েচড়ে বসলেই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনিনপন্থী কথা ও কাজ ফিরে আসবে না। সামাজিক ক্ষেত্রে অনেকখানি পরিবর্তন প্রয়োজন এবং স্টালিনবাদকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কেউ জানে না সে পরীক্ষার ফল কি দাঁড়াবে।

আমাদের দেশে সংগ্রামের ব্যাপারে স্টালিন বা রাশিয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর তেমন প্রয়োজন নেই কিন্তু স্টালিনবাদের কথার দরকার আছে। স্টালিনের সঙ্গে আমাদের দেখাও হয় না বা মস্কো থেকে আমরা টাকা পয়সা বা অস্ত্রশস্ত্রও পাই না। স্টালিনপন্থীরাও স্টালিনের দর্শন পায়না, তার থেকে সোজাসুজি কাজের হুকুমও পায়না। তবু স্টালিনবাদ আমাদের কাছে এক বিরাট প্রতিবন্ধক এবং ওদের কাছে এক ভুল পথ প্রদর্শক। অনেক সময় ওরা যেখানে স্টালিনবাদ বলে কিছুই নেই, সেখানে তাকে মন থেকে বানায় এবং অন্ধ বিশ্বাস ও তোতাপাখির মত বুলি-মুখস্থ করা ওদের এতদূর গিয়েছে যে নেহাৎ দরকারেও ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব হয় না। ওদের এই সংকীর্ণ চিন্তাধারার গণ্ডী যতদিন না কাটছে ততদিন সহযোগিতা

অসম্ভব। আমাদের মতবাদ অনুসরণ করে যতদিন না আমরা কিছু সত্যি ফল লাভ করছি ততদিন সমালোচনা করেও আমরা কোন সুফল পাব না। কারো জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং পৃথিবীর যে কোন এক জায়গায় আমাদের মতবাদকে বাস্তব শক্ত মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা হলেই বিশ্ববিপ্লবী নেতৃত্বের মোড় ফিরবে। কেবল পুরানো কথা তুলে আমরা ঠাকুরপন্থীদের সমালোচনা করতে চাই না, বরং বিচার করলে তাদের বর্তমান চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালী থেকে পরস্পব আলাদা চলবার যুক্তি হিসাবে ওদের আর আমাদের মধ্যে চিন্তা ও ঘটনা বিচারে পার্থক্য অনেক।

মনে হচ্ছে যে স্টালিন এবং রাশিয়া বিশ্ববিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে না, ঠিক পথে চালনা না করে অনেক সময় ভুল পথে নিয়ে যায়। জঙ্গী জনতার থেকে আলাদা হয়ে আজ তারা দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে ওবা এখনো কি করে বিপ্লবী শিবিরের ভিতরে আছে? এ রকম প্রশ্ন উঠতে পারে। স্টালিন এবং রাশিয়া আমাদের দিক, বিশ্ববিপ্লবের দিকে—দাঁড়িয়ে আছে কারণ বাস্তব পরিস্থিতির ফলে ওরা উল্টোদিকে যেতে পারে না। প্রথম মজুর সরকারের পুরোনো ঐতিহ্য শুধু নয়, বর্তমানেরও রায় তাই। ভুল যতই হোক, ছক কাটা সাম্যবাদের উপর যতই ছাতলা পড়ুক সোভিয়েট রাশিয়া হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়াই, মজুর শ্রেণীর ভিত্তির ওপর অর্থনৈতিক বাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্র, ধনতন্ত্রবাদ তাকে ধ্বংস না করে দিলে সে আর ফিরে যেতে পারে না। আত্মরক্ষার খাতিরে সোভিয়েট রাশিয়া চুপ করে বসে থাকলেও বিরুদ্ধপন্থীদের কাছে সেটা হয়ে দাঁড়ায় একটা আশঙ্কার কারণ এবং তাব থেকে অনেক সুবিধা বিপ্লবীদেব, পেছনে সোভিয়েট রাশিয়া দাঁড়িয়ে না থাকলে মাও-সে-তুঙ-এর অগ্রগতির ফলে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ছিল অনিবার্য এবং হয়ত যুদ্ধ বেধে যেত মাও-সে-তুঙ-এর এতখানি এগিয়ে আসার অনেক আগেই।

কিন্তু আমরা স্টালিনেব কাছ থেকে আরও কিছু চাই। আমরা নীরব নিশ্চলতায় সন্তুষ্ট নই, আমবা চাই সোজা বিপ্লবী নেতৃত্ব। কখন তারা অভিযান শুরু করবে? সেটাও কিন্তু স্টালিনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ নয়। স্টালিনবাদীরা হযত চায় যে রাশিয়ার লালফৌজ আমাদের দেশে এগিয়ে আসুক কিন্তু আমরা তা চাই না, মস্কো থেকে টাকাও আমরা চাই না। আমরা চাই স্টালিন তার ভুল শুধরে নিক। স্টালিনবাদ হাতে তুলে নিক খাঁটি বিপ্লবের হাতিয়ার। তার অনুসরণকারীরা শত্রুনিপাত করবার উদ্দেশ্যে শান দিক লেনিনবাদের ফলায়। সব দেশের কমিউনিস্টদের কাছে সব চেয়ে আগে প্রয়োজন সঠিক বিপ্লবী রাস্তার নিশানা। অন্য সব সাহায্যই তার তুলনায় নগণ্য। লেনিনবাদের অস্ত্র হাতে থাকলে এর মধ্যেই পৃথিবীর ইতিহাস হতো অন্যরকম—অ্যাটম্ বোমা বা লালফৌজের শক্তির সামান্যতা নিয়ে হিসাব কষতে হতো না এবং এখনো লালফৌজ বা অ্যাটম বোমা বিপ্লব এনে দেবে না। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যখন হবে সেই পুবানো মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী ধারা সেই আনবে বিপ্লব। এই বিপ্লবের হাতিয়ারকে বর্তমানের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে একবার ঠিক করে নিলে কার সাধ্য ঠেকায়? অ্যাটম্ বোমা থাক বা নাই থাক কিছু এসে যায় না। ইতি—

৬/১১/৪৯

তৃতীয় পত্র

আজকের দিনের বিস্তৃত কাজের আলোচনা করার আগে আবার আমরা আগের চিঠিগুলিতে লিখিত আমাদের কাজের পুনরালোচনা করব। একমাত্র দেশ বিভাগহীন ঐক্যবদ্ধ পৃথিবীতেই

যেমন শ্রেণীভেদ লুপ্ত সমাজের কল্পনা সম্ভব, বিপ্লবী জনতার সম্মুখে "এক পৃথিবী—একজাতি সে হলো মানুষ জাতি" এই মূল স্লোগানকে কাজে পরিণত করতে হলে তেমনি রণনীতিরও ঐক্যবিধান করতে হবে। দেশে দেশে এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে বিভিন্নকালে অবশ্য রণকৌশলের ধাপগুলি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এর অর্থ—সংগ্রাম একটাই, যুদ্ধক্ষেত্র অনেক, যুদ্ধ অনেক—কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোন বিশেষ যুদ্ধে সাফল্য অথবা অসাফল্যের পরিমাপ সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশেষ যুদ্ধটি দিয়ে করা যাবে না। এর পরিমাণ স্থির করা যাবে ধনতন্ত্রকে শেষ করার আন্তর্জাতিক মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য অথবা অসাফল্যের তুলনামূলক মাপকাঠিতে। সুতরাং আমরা যা করেছি অথবা করতে যাচ্ছি তা হল আমাদের অঞ্চলে ইতিহাস নির্দিষ্ট প্রধান রণনীতি অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ মাত্র। এই সব সংগ্রাম সম্পূর্ণ অথবা খণ্ডভাবে অঞ্চল নিয়ে, স্থানীয় ভিত্তিতে, এমন কি জাতীয় গণ্ডীর মধ্যেও সম্পূর্ণ হবে—এই জাতীয় কোন মিথ্যা ধারণা যেন পোষণ না করি।

এবার আমাদের অঞ্চলের দিকে দৃষ্টিনিবেশ করি। সেখানে যে সব শক্তি ক্রিয়া করছে তার দিকে দৃষ্টি ফেরাই। 'ক'-এর দিকে তাকানো যাক। এখানে কোন যুদ্ধ ঘটছে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সংগ্রাম রয়েছে, মাঝে মাঝে শ্রেণী সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ফেটে পড়ছে। সেখানে আমরা ছাই চাপা ধূমায়িত সংগ্রামকে যুদ্ধের উন্মুক্ত শিখায় পরিণত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। বিশ্বসংগ্রামের রণনীতির স্বার্থে শত্রুর বিরুদ্ধে আরেকটি ফ্রন্ট গড়ে তোলবার প্রয়োজনে এটা দরকার, কিন্তু আমরা প্রস্তুত নই। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব রয়েছে, সংগঠনের অভাব আছে, নেতৃত্বের অভাব আছে, এর অভাব ওর অভাব এমনি অনেক কিছুরই অভাব রয়েছে। অপরিপক্ক অবস্থার জন্য যে ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তা এড়িয়ে যাবার জন্য কি আমাদের আরও প্রস্তুতি, প্রস্তুতির জন্য আরো সময় চাই? আমরা কি এত সব জেনে শুনেও বিশ্ববিপ্লবের সাধারণ স্বার্থে আমাদের এই কৌশল অবলম্বনের ঘাঁটি (tactical base) এই ছোট যুদ্ধ বিসর্জন দিতে পারি? ভুল রণকৌশল কি কখনো রণনীতি সফল করে তুলতে সাহায্য করতে পারে? সমগ্র সংগ্রামে জয়লাভ করার জন্য ছোট যুদ্ধে পরাজয় বরণ করা যেতে পারে কি? এটা হল ভুল দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়বদ্ধ প্রকোষ্ঠে কৃত্রিম উপায়ে বিভাগ করে দেখা। এভাবে দেখলে প্রতিক্রিয়ার বিকশিত ঐক্যকে অস্বীকার করা হয়। এভাবে বোঝা ভুল—সমগ্র সংগ্রামও ছোট ছোট এক একটা যুদ্ধ। রণনীতি ও রণকৌশল এক নয় ঠিকই কিন্তু দুটোতেই এক অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। যার জন্য রণকৌশলে মূলত যা ভুল রণনীতিতেও মূলত তা এটা ঠিক নয়, যার জন্য সংগ্রামের স্বার্থ আর সেই সংগ্রামের অঙ্গীভূত ছোট ছোট যুদ্ধগুলির স্বার্থ অভিন্ন নয়। রণনীতিতে যা শ্রেয় ব্যবহারিক রণকৌশলেও তা শ্রেয়, কেননা এই ছোট ছোট যুদ্ধ নিয়েই মূল সংগ্রাম। তবে গুরুত্বের তারতম্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি অবস্থার আনুকূল্যে কোন এলাকা দখল করে তা রক্ষা করার জন্য এবং আরো অগ্রগমনের জন্য শক্তি সংঘবদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকা যায় এবং সংবাদ পাওয়া যায় যে শত্রুসেনা রেলযোগে আসছে, তাহলে যথাযথরূপে তাদের সম্মুখীন হতে গেলে যে সময় পাওয়া দরকার তার জন্য একটি ছোট দল আগেই পাঠিয়ে দিতে হবে কোথাও রেলওয়ের কোনো সেতু উড়িয়ে দেবার জন্য। তখন এই দলটি এমন অবস্থায় পড়তে পারে যে নির্দিষ্ট কাজটি ঠিকমতো করতে গেলে তাদের সর্বপ্রকার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাদের তখন কাজটি অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসা অপেক্ষা মৃত্যুই বরণ করে নিতে হবে। তাদের এই আত্মত্যাগ লালফৌজের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য এক নিষ্ঠুর প্রয়োজন। সেনাপতি কখনও তার সেনাদলের প্রত্যেকটি সৈনিককে রক্ষা

করতে পারেন না, অন্যান্যদের স্বার্থে তাকে প্রায়ই একটিকে হারাতে হয়। এটা একটা সরল সত্য।

তাহলে কি সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে জনযুদ্ধ ঘোষণা করে স্টালিনপন্থীরা ঠিকই করেছিল? ভারত শুধু রণ-কৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, রাশিয়ার গুরুত্ব রণনীতির দিক থেকে—এই জন্যই কি রাশিয়ার তথাকথিত কল্পিত স্বার্থে ভারতে বিপ্লবের স্বার্থবিলি দেওয়া তাদের পক্ষে সঙ্গত হয়েছিল?—না, কারণ বিশ্ববিপ্লবই সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষা করার সবচেয়ে বড় গ্যারাণ্টি, আর ধনতন্ত্র, ফ্যাসিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিকে ধ্বংস করে ভারতের মাটিতে বিপ্লব ঘটানোর মধ্য দিয়েই ভারতের জনসাধারণ সোভিয়েট রাশিয়াকে সাহায্য করতে পারে। ফ্যাসিস্ট এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে ঘরোয়া যুদ্ধের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর জনতাকে সহযোগিতায় আহ্বান করার পরিবর্তে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে অবস্থায় রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়েছিল সেই অবস্থাই দেখিয়ে দিয়েছে স্টালিনের ক্রমাগত ভুল নীতি—যার ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হবার মতো শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হল। রাশিয়া আজ এক চুলের জন্য কোনক্রমে মহাযুদ্ধে জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে বলে একথা প্রমাণ করা যায় না যে রাশিয়ার পক্ষে এইটেই ছিল ইতিহাস নির্দিষ্ট একমাত্র পথ। এটা অবশ্য আলাদা করে বিশদরূপে আলোচনা করার স্থান নয়, এখানে আমরা রণনীতি ও রণকৌশলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব। পৃথিবীব্যাপী কম্যুনিস্টদের মূল উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য রাশিয়া নয়, বিশ্ববিপ্লব। এরই জন্য রাশিয়া হচ্ছে বিশ্বের শ্রমিক ও নিপীড়িত জনতার কাছে, রাশিয়া সহ সমগ্র পৃথিবীর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের একটি অঙ্গ মাত্র। শেষ পর্যন্ত তাই নিজের লাভের আশায় ভারতের বুকে কম্যুনিজমের অবমাননা রাশিয়ার পক্ষেও সহায়ক নয়। সেই জন্যই ভারতের কম্যুনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ভারতীয়দের পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করে রাশিয়ার পক্ষে ভালোর চেয়ে ক্ষতি করেছিল বেশি। তারা নিজেরাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত ত্রুটির জন্য এরূপ আজব পরিস্থিতিতে পড়েছিল যে একই সঙ্গে ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ করার বাস্তব পথ তারা দেখতে পায়নি। এমন কি মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির ফলে যখন ফ্যাসিজমের পতন শুরু হল তখনও তারা নিকটবর্তী সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে আঘাত হানার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি। অথচ জনতা সে সময়ে অত্যন্ত মারমুখী হয়ে পড়েছিল। এর প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়েছে আর-আই-এন-এর বিদ্রোহ এবং মজুর ধর্মঘটের সাধারণ ঢেউ ও ছাত্রদের সহিংস ও বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রার ভিতর দিয়ে। নির্বুদ্ধিতার পাঁকে তারা এমনই নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের জন্য কয়েক বছর সময় লেগেছিল।

এইবার তাহলে রণনীতির পক্ষে যা শ্রেয় রণকৌশলের দিক থেকেও তাই শ্রেয় এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য আমাদের এই অঞ্চলের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। এই কমরেডরা কেবল সাধারণভাবে বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থেই নয়—এই স্বার্থ অবশ্য অনেকের কাছেই খুব স্পষ্ট এবং স্থায়ী নয়—তাঁদের কাজের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের খাতিরে তাঁরা প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হ্যাঁ অনেক কিছুর অভাব তাঁদের আছে—অস্ত্রশস্ত্র, সংগঠন, গণ-চেতনা সম্পূর্ণ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা যদি আরো শক্তিশালী, আরো প্রস্তুত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহলে তাঁরা অনুভব করবেন বর্তমান অবস্থায় তা আর সম্ভব নয়, কারণ তাঁদের আর নূতন করে সৃষ্টি করার সুযোগ দিতে, বাড়তে দিতে সরকার আজ নারাজ। খোলাখুলিভাবে অফিস চালাতে, প্রেস চালাতে, কাগজ বার করতে আজ আর আমরা পারি না।

আইন ভঙ্গ কবাব ঝুঁকি মাথায না নিয়ে আমবা গণ সংগঠন গড়ে তুলতে পাবিনা—আবাব সামান্য আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গ কঠিনতম পুলিশী নির্যাতন ডেকে নিয়ে আসে। আইন এবং বাস্তবেব দিক থেকে সবকাব আজ সম্পূর্ণরূপে সশস্ত্র। জননেতাবা আব বক্তৃতা কবতে পাবেন না, জনসাধাবণেব সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে চলাফেবা কবতে পাবেন না, জনতাব সামনে উপস্থিত হলেই নিবাপত্তাবিধানেব জোবে তাদেব জেলে আটক কবা হয। গুপ্ত পুলিশ দাযিত্বশীল কর্মীদেব অত্যন্ত সহজেই ধবে ফেলে এবং ফলে পবিপক্ক অবস্থায পবিণত হবাব আগেই অনেক কর্মক্ষেত্র বা প্রচেষ্টা অঙ্কুবেই বিনাশ পায। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পার্টি এবং গণ সংগঠন গড়ে তুলবাব সমস্ত স্বাভাবিক পথ আজ বন্ধ। অথচ পার্টিকে প্রস্তুত কবা, নূতন কর্মীদেব শিক্ষিত কবে তোলা, জনগণকে বোঝানো ইত্যাদি কাজেব জন্য প্রভূত প্রচেষ্টা, যথেষ্ট কষ্টসাধ্য পবিশ্রম এবং প্রাথমিক স্তব থেকে শুরু কবে ক্রমবর্ধিত মাত্রায ও তীব্র বৃদ্ধিব ব্যাপাবে বাস্তব সংগ্রামেব প্রচুব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। গোপনে এসব কবা সম্ভব নয, আব বিপ্লবও কর্তৃপক্ষেব বশ্যতা স্বীকাব কবে অথবা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র কবে কবা যায না। জনগণকে আত্মবক্ষাব কলাকৌশলে শিক্ষিত হতে হবে, সম্ভাব্য সকল বকমেব লড়াইযেব ভিতব দিয়ে তাদেব জঙ্গী কবে তুলতে হবে। তাদেব একতা পবীক্ষিত হওযা চাই। নিষ্ক্রিযতা বা বশ্যতা স্বীকাবেব মধ্য দিয়ে নয ববং কর্মক্ষেত্রে নিজেদেব অভিজ্ঞতা দিয়েই তাবা শিক্ষালাভ কববে। কিন্তু বর্তমানে আমবা কি নিযমমাফিক পাঠচক্র, শিক্ষাশিবিব, আইনসঙ্গত ধর্মঘট, আইনসঙ্গত কাগজ, অফিস, কৃষক আন্দোলন ইত্যাদি সংগঠিত কবতে পাবি? না, নীতি পবিত্যাগ কবে বাষ্ট্রেব আপসকাবী ও সংস্কাবপন্থী এবং নির্বাচনশিকাবী না হলে আমবা তা পাবি না। এবং বিপ্লবী কম্যুনিস্ট হয়ে তো দূবেব কথা, এমন কি যে কোন ধবনেব কম্যুনিস্ট হলেও এটা নিশ্চিত যে আমবা নতি স্বীকাবে অক্ষম।

গণতান্ত্রিক আবহাওযায পার্টি এবং জনগণকে প্রস্তুত কবে তুলবাব সুযোগ আমবা যে পাচ্ছিনা তাব ফল কি দাঁড়িয়েছে? দেখছি যে কঠোব পবিশ্রম কবেও আমবা বাড়তে পাবছি না। সত্যি কথা আজকেব দিনেব পার্টি কর্মীব আগেকাব চেযে অনেক বেশি নির্দিষ্ট, কঠোব পবিশ্রমকাবী এবং স্বার্থত্যাগী, ম্যালেবিযা, কাদা, জল, গ্রাম, জঙ্গল, নিকৃষ্টতম খাদ্য এমন কি অনাহাব, কোন কিছুতেই তাবা ভয পায না। অথচ শেষ পর্যন্ত যে ফল দাঁড়াচ্ছে তা সন্তোষজনক নয, আব সংগঠনেব তীক্ষ্ণতা এবং প্রস্তুতিতেও মনে হয কল্পনা। এটা আব স্পষ্ট হবে শহবাঞ্চলে যেখানে আমবা পুলিশী গুপ্ত তৎপবতা ব্যর্থ কবতে না পেবে নিজেবা প্রকৃত শক্তি অর্জনে ব্যর্থ হযেছি। এব ফল হযেছে এই—আমাদেব সংগৃহীত নূতন কর্মীবা আধা প্রস্তুত, আমাদেব প্রভাবাধীন জনগণ মনেব দিক থেকে অনিশ্চিত। জনগণ নিশ্চযই এগিয়ে আসতে চায। কিন্তু তাতে সম্মতি দেওযাব অর্থ বাষ্ট্রেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। অথচ বাষ্ট্রক্ষমতা অধিকাবেব জন্য প্রত্যক্ষ সংঘর্ষেব আগে অন্য কোন সংগ্রামেব ভিতব দিয়ে প্রস্তুতিব পবিচিত এবং অনুমোদিত কোন পবীক্ষা সম্ভব নয। এব ফলে লড়াইযেব সর্ব প্রাথমিক আকাব আব বাজনৈতিক সর্বোচ্চ রূপেব মধ্যে ব্যবধান থাকতে বাধ্য। জনগণকে যেন আহ্বান জানানো হচ্ছে যুগব্যাপী নিদ্রা থেকে অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠতে অথবা একেবাবে অচল অসাড় হযে থাকতে।

আমাদেব সংগ্রামেব বিলম্বিত প্রকৃতিব জন্য গণতান্ত্রিক আবহাওযা অথবা আবো কম শত্রু ভাবাপন্ন শ্রেণী সম্পর্কেব পাবিপার্শ্বিকতায সম্ভবপব লড়াইযেব প্রয়োজনীয স্তব ও অন্তর্বর্তীরূপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না— পাওয়া যেতেও পাবে না। এই বিলম্বিত প্রকৃতি এশিযাব পেছিয়ে পড়া জনসাধাবণেব উপব লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলাব এক অদ্ভুত প্রয়োজনীযতা ঘাড়ে চাপিয়ে

দিয়েছে। অন্যথায় তারা এগোতেই পারবে না। যদি তারা জাগে তবে জাগবে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। ব্রহ্ম, ইন্দোচীন, মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় তাই ঘটেছে। এটা হচ্ছে সংগ্রামের রূপ সম্বন্ধে। আর এই সব সংগ্রামের উদ্দেশ্যের রাজনৈতিক ভিত্তিতেও এব সমান্তরালভাবে যা লক্ষ্য করি তা হল উল্লম্ফনের সাহায্যে অগ্রগমন অর্থাৎ কিনা অন্তর্বর্তী অনেক অভিজ্ঞতা লাফিয়ে পার হয়ে গিয়ে অথবা এমন দ্রুত গতিতে সেই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যে যথাযথরূপে তার কোন চিহ্নই লক্ষ্য করা যায় না---এমনি ভাবে প্রাথমিকতম এবং আদিম রাজনৈতিক অবস্থা থেকে সরাসরি সাম্যবাদে পৌছানো। সুতরাং মার্কসীয় মতবাদের এক মৌলিক তত্ত্ব উল্লম্ফনের সাহায্যে অগ্রগমনের নিয়ম এখানে পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হল— রাজনীতিক, সাংগঠনিক এবং সংগ্রামের জন্য ---সর্ব বিষয়ে।

কেমন করে তাহলে সংগ্রামে টেনে না নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় গণচেতনা ও জনতাকে সংগঠিত করা যাবে? শাসনতন্ত্রের চতুঃসীমায় যদি লড়াই করবার কোন আইনসম্মত সুযোগ না থাকে তাহলে আমাদের কর্তব্য কি? এদিকে আবার ইউনিয়ন না থাকলেও এবং যেখানে ইউনিয়ন আছে সেখানে ইউনিয়নের অনুমোদন ছাড়াও কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট হচ্ছে। এই অবস্থায় সংগঠন প্রায়ই লড়াই শুরু হবার পর গড়ে উঠেছে। পঞ্চায়েত বা কৃষক সভার অস্তিত্ব না থাকলেও চাষীরা বিদ্রোহ করে বসতে পারে। এমন কি লাল চীনেও পঞ্চায়েত গড়ে উঠছে লাল ফৌজকে অনুসরণ করে—বিপরীত ভাবে নয়। আর যে অঞ্চল মুক্ত হয়নি পঞ্চায়েত সেখানে জন্মাতে পারছে না বা জনমত সেখানে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারছে না তীব্র ফ্যাসিস্ট উৎপীড়নের ফলে। ক্ষমতা দখলের আওয়াজ তুলবার আগে পঞ্চায়েত গড়বার এবং রাশিয়ার মাত্রায় তা শক্তিশালী করে তুলবার অপেক্ষায় বসে থাকা কি চীনা কমিউনিস্টদের উচিত? তাহলে আমরা আজকের লালচীনকে দেখতে পেতাম না। তাই প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, আর আজকের দিনে সংগ্রামের অর্থই হল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আক্রমণ। এমন কি অঞ্চল হিসাবেও যদি আমরা ক্ষমতা দখল করতে পারি তাহলে ইতস্ততই বা করব কেন? রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করা যদি মনস্থ না করি তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর কোন অর্থ বা আকর্ষণ থাকতে পারে না। এখন সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যাবে যে আমাদের দখলে যদি এমন কতকগুলি অঞ্চল না থাকে—যেখানে গুপ্ত পুলিশ ও নজর রক্ষীদল তাদের খুশিমাফিক আমাদের কার্যকলাপ নষ্ট করে দেবার জন্য আমাদের খুঁজে বেড়াতে পারবে না, যেখানে আমরা খোলাখুলিভাবে প্রচার ও শিক্ষা দেবার কাজ চালাতে পারব, যেখানে আমরা আমাদের লালফৌজ সংগঠিত করে তুলতে পারব, যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের প্রেস, বক্তৃতামঞ্চ ব্যবহার করার পূর্ণ সুযোগ পাব, যেখানে আমরা জনগণের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারব—এমন কোন অঞ্চল যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমরা কল্পিত বৈপ্লবিক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরিপক্ক অবস্থার জন্য সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রস্তুতি গড়ে তুলতে পারব না, পারব না, পারব না। প্রতিরোধের এই মুক্ত অঞ্চলগুলি আমাদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক অভিযানের দুর্গ এবং আরো বিরাট আরো শক্তিশালী অভিযানের জন্য নূতন কর্মী, পার্টি এবং জনগণের সম্ভাব্য শিক্ষাক্ষেত্র। এই সংগ্রামগুলি তাই আপনি নিজেদের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে না—এগুলি সব প্রস্তুতির উপায় মাত্র। বিশ্ববিপ্লবের বিশাল পটভূমিকায় রাশিয়ার পঞ্চায়েত রাষ্ট্র এবং চীনের গণরাষ্ট্রও হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের প্রস্তুতিরই উপায় বা ক্ষেত্র। বিশ্বের জনগণ আত্মরক্ষার সশস্ত্র ব্যূহের আশ্রয়ে তাদের লালফৌজ গড়ে তুলেছে এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আবশ্যকীয় সাম্যবাদী চেতনা সৃষ্টি করছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে "ক" এবং ভারতের যেখানেই আমরা আছি সর্বত্র আমাদের পার্টির প্রয়োজন সংগ্রামে নামা। এটা আমাদের বৃদ্ধি এবং প্রস্তুতির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং তাছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। এই ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিশ্ববিপ্লবের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন পৃথিবীর সকল অংশে আমাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছে অভিযান শুরু করে দেবার জন্য—সেই প্রয়োজন আর আমাদের নিজেদের প্রয়োজন একই সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সুতরাং নীতির দিক থেকে যা শ্রেয়, কৌশলের দিক থেকেও তাই শ্রেয়।

এই পরিচ্ছেদ শেষ হবার আগে বিশ্ববিপ্লবের ধারায় এক অতি আশ্চর্য সম্ভাব্য বিকাশের প্রতি একবার আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। কৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, সুন্দররূপে সংগঠিত ছোট সংগ্রাম অনুকূল পরিস্থিতিতে পরিচালিত হতে থাকলে রণনীতির পূর্বকল্পিত ধারণাবলী অপসারিত করে অপ্রত্যাশিতরূপে বিস্তৃত এক জ্বলন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিতে পরিণত হতে পারে। বর্তমানে "ক"-এর অবস্থান—কথাটির সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও যদি কোন সফল আক্রমণ হয় এবং ক্রমেই যদি একের পর এক আরো ব্যাপক সংগ্রাম হতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে। একথা ভারতের যে কোন অঞ্চল সম্বন্ধে প্রযোজ্য, এমন কি "ক"-এর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ও সমগ্র "ক"ও এই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পরে আবার "ক" ও "খ"-এর অবশিষ্টাংশের পক্ষে একই ভূমিকা গ্রহণ করবে।

চীন বিপ্লবের পরিণতি এমনও হতে পারে যে অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া কর্তৃক পরিচালিত হবার পরিবর্তে লালচীন এই অনিচ্ছুক রাশিয়াকেই পথ নির্দেশ অথবা নেতৃত্ব দিতে পারে। আকর্ষণীয় এই সমস্যাগুলি কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। ইতি—

৭/১১/৪৯

চতুর্থ পত্র

এবার তাহলে আমরা আমাদের কাজের একটা হিসাব করি। এই কাজকর্ম থেকে আমরা আমাদের রণনীতি ও রণকৌশলের নূতন উপলব্ধির আলোকে সমগ্র সংগ্রামকে মোটামুটি একটা চিত্র কল্পনায় তুলে ধরতে পারব। চোখের সামনে এবং কল্পনায় মোটামুটি একটা ছবি পাওয়া, কোথায় এর শক্তি, কোথায়ই বা এর দুর্বলতা সেটা পরীক্ষা করে দেখা সহজ হবে। এবং এই ভাবেই এই সংগ্রামের ছবি ক্রমশই আরো ভালো ও স্পষ্ট হবে , আর আমাদের রাজনীতিক কাজ দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে আরো অনেক সংগ্রামের কায়দা আবিষ্কারে আমাদের চিন্তাশক্তিও খুলে যাবে।

এখন "ক"-এর ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কার্যকলাপ সংযোজিত করবার সমস্যার কথা ভাবা যাক—আক্রমণ করবার নির্দেশ দেওয়া মাত্রই যাতে আমাদের রণনীতি ও রণকৌশলগুলি সহজেই কার্যকরী হতে পারে, প্রত্যেক কমরেডকেই এভাবে ভাববার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে সে কখনই বিপ্লবী আখ্যা পেতে পারে না। নিজের কাজের এলাকায় অথবা বিশেষ যে কাজে সে নিযুক্ত তাতে ভালো কাজ দেখানোই যথেষ্ট নয়, তাকে এমন ভাবে সবার কাজের সঙ্গে নিজের কাজকে সংযোজিত করতে হবে যেন ব্যক্তিগত, ক্ষুদ্র দলীয় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাসমূহ এক সর্বব্যাপক উদ্দেশ্যের পিছনে সংগ্রথিত হয় বিপ্লবের শিখা জ্বেলে ধরবার জন্য।

আঞ্চলিক কমিটি ও সেলগুলির কাছে এ সম্পর্কে তাদের ধারণা পাঠাতে বললে কেন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই রাশি রাশি খসড়া পরিকল্পনা এসে হাজির হবে—অবশ্য যদি আমাদের দল সত্যসত্যই এক শ্রেণী সচেতন প্রাণবন্ত বিপ্লবী পার্টি হয়। আর যদি তা না আসে তাহলে বুঝতে হবে পার্টি নেতৃত্ব কমরেডদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে পারেনি এবং তা স্বয়ংক্রিয় চিন্তাধারার বিকাশ করাতে অসমর্থ হয়েছে। নীচ থেকে এই স্বয়ংক্রিয়তা আমাদের প্রস্তুতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পবিমাপ ; কারণ এটাই সংগ্রামে জনতাকে নেতৃত্ব দেবাব সামর্থ্য আনে, আর বিপ্লবে আধুনিক সৈন্যদলের কেন্দ্রগত যুদ্ধে না হলেও বিপ্লবে জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎরূপে যুক্ত কমরেডদের স্বেচ্ছা, স্বয়ংক্রিয়তা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং চিন্তা করার মানসিক উৎস অতি প্রয়োজনীয়। পরিকল্পনা স্থির করার এবং ঘটনাস্থলেই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সামান্য কযেকজন নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ আলাদা কাজ নয়, ববং এই অভ্যাস এবং জ্ঞান ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়া উচিত। পার্টি এবং সংগ্রামরত বিপুল জনতাকে নিয়ে পার্টির চাবপাশে যে সব সংগঠন আছে সেগুলির সর্বত্র।

এবার "ক"-এতে আমাদের কাজের এলাকা চিহ্নিত একখানি ছক নেওযা যাক। কতকগুলি স্থানে আমাদেব কাজ বেশ একটানা ও বিস্তৃত এলাকা নিয়ে, কোথাও আবার তেমন একটানা বা ব্যাপক নয়, কোথাও বা সবেমাত্র কাজ আবম্ভ হয়েছে, নূতন ও পরিচিত ব্যক্তি আছে শুধু। এবার আলাদা আলাদা ভাবে উপজীবিকা অনুসারে জনতাকে ভাগ করা যাক,—যেমন চাষী ও মজুব। এরপর দেখি পাহাড়, উপত্যকা, জলা ইত্যাদি নিযে দেশটির ভূ-প্রকৃতি। এইবার বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যের অবস্থা ও তার চলাচলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য নেওয়া যাক। বাইরের এবং শহরগুলো থেকে আমদানি জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক অন্যান্য সামগ্রীব কথা এরপর অনুসন্ধান করে দেখি। অবশেষে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প এবং শত্রুঘাঁটির অবস্থানগুলি, তাদের শক্তি সামর্থ্য ও আত্মরক্ষার প্রণালী বিবেচনা করে দেখতে হবে।

এই ছবির ওপর নির্ভর করে সংগ্রামের এমন এক কর্মতালিকা বা প্রোগ্রাম আমাদের লক্ষ্যে নিযে আসতে হবে যা অবস্থানুযায়ী নিম্নোক্ত আবশ্যকীয়গুলি পূরণ করবে। সংগ্রামের এলাকা হবে এমন যে এলাকার ভিতরে শত্রুকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে আমবা স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে এবং সেই এলাকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শত্রুকে দুর্বল করে দিতে পারব। আমাদের কাজ অনুযায়ী ও গণভিত্তি অনুযায়ী এই বিশেষ অঞ্চল এক-দুই বা আরো বেশি হতে পারে, তবে সেই অঞ্চল বা অঞ্চলগুলি অধিকার বা মুক্ত করা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। তারপর আমাদের সংগঠিত অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং বাইরের অমুক্ত এলাকায় আমাদের দ্বারাই সংগঠিত পার্টির অন্যান্য গেরিলা ইউনিট বা স্কোয়াড দিয়ে মূল আঞ্চলিক ঘাঁটিকে রক্ষা করাই হল আমাদেব কাছে বিপ্লবের সাধারণ রণনীতি।

ভিতর থেকে এবং বাইবের থেকে সকল শক্তি দিয়ে সেই অঞ্চলকে রক্ষা কবাই হল সবচেয়ে জরুরী কাজ। এই অঞ্চলেব বাইরে যেসব কমরেড আছেন তাদের অপরাপর কার্যাবলীর উদ্দেশ্য এমন কি বাইরে থেকেও একটিই। তাহলে কী করে সেই অঞ্চলকে শক্তিশালী ও অধিক বিস্তৃত হতে সাহায্য করা যায় এবং সেই জন্য কেমন করে বাইরেই শত্রুকে দুর্বল করে দেওয়া যায় শত্রু যাতে সেই অঞ্চলকে ধ্বংস কিংবা অধিকার করে না নিতে পারে।

এখন প্রত্যেকের উপর কাজের যে গুরুভার এসে গেল তা তিনি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ বা ক্ষুদ্র দলভুক্ত অথবা আরো জোরদার সংগঠনে যুক্ত হন না কেন, গ্রামে কিংবা শহরে অথবা

পাহাডাঞ্চলে যেখানেই থাকুন না কেন, সেই অঞ্চলেব বাইবে তাব কাজেব পবিমাণ হবে উক্ত অঞ্চল বা অঞ্চল সমূহ বক্ষা অথবা বিস্তৃত কবাব মৌলিক উদ্দেশ্যেব তুলনামূলক বিচাবে। মৃত্যুববণকাবী স্কোযাড, শত্রুব যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকাবী নাশকতামূলক কাজেব স্কোযাড, পিছন থেকে শত্রুকে উৎপীড়নকাবী বা মুক্ত অঞ্চলেব ঠিক বাইবে অদৃশ্যভাবে পাহাবাদাব গেবিলাদল মুক্ত অঞ্চলেব বাণী ও সংবাদ প্রচাব, শত্রু সেনাব গতিবিধিব গুপ্ত সংবাদ পবিবেশন, শত্রুব সশস্ত্র বাহিনীতে দলত্যাগ বা বিদ্রোহ ঘটানোব কাজ, মুক্ত অঞ্চল এবং বাইবেব জগতেব মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ইত্যাদি যে কোনটা তাকে সংগঠিত কবতে হতে পাবে।

তাহলে আমবা সেই মুক্ত অঞ্চল বা অঞ্চল সমূহ বক্ষা কবব কেমন কবে? কী কবে সেই অঞ্চল সৃষ্টি কবব তা আমবা আলোচনা কবিনি , সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্য আব একটি চিঠিতে কবা যাবে। সাধাবণভাবে বলতে গেলে অঞ্চলটিকে বক্ষা কববো "ক"-এব আঞ্চলিক জনগণেব সশস্ত্র এবং সক্রিয প্রতিবোধ এবং জনসাধাবণেব অসহযোগিতা এ নিষ্ক্রিয প্রতিবোধেব দ্বাবা। এই দুই উপাদানই বর্তমান থাকা চাই, অস্ত্রসজ্জিত বা নিবস্ত্র জনতাব সাধ্যমতো প্রতিবোধ-সংগ্রামেব প্রযোজনীয কাঠামো গড়ে তুলবাব জন্য এই দুই উপাদানকেই কাজে লাগাতে হবে। জনসাধাবণেব মধ্যে প্রতিবোধেব আকাঙক্ষা, শত্রুপক্ষীয সবকাবেব সঙ্গে অসহযোগিতাব মনোভাব আমাদেব সাফল্যেব পক্ষে একটি অতি প্রযোজনীয শর্ত। সর্ব উপাযে এই মনোভাব, এই আকাঙক্ষাকে উৎসাহিত ও তীব্র কবে তুলতে হবে।

আবো বাস্তবতাপূর্ণভাবে বলতে গেলে সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক মুক্ত ও এবং খোলাখুলি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাৰূপে বক্ষিত অঞ্চলেব বাইবে প্রভাবান্বিত কিন্তু প্রকৃত মুক্ত নয এমন এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অথবা এলাকা কিংবা বেষ্টনী থাকা দবকাব। মুক্ত অঞ্চলকে সাহায্য কবাব জন্য এই এলাকা গেবিলা কর্মতৎপবতাব দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পাববে। এক বাহিনী বা সেনাদলও থাকা চাই। জনতাব প্রতিবোধেব মনোভাব জন্মানো এবং তাকে প্রসাবিত কবাব জন্য মুক্ত অঞ্চলকে বেষ্টন কবে, এইৰূপে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে মুক্ত অঞ্চলে আমাদেব সেনাদল থাকবে (অস্ত্রশস্ত্র সামান্য থাকলেও), আব প্রভাবাধীন এলাকাব সেনাদলকে সাহায্য কবাব জন্য থাকবে গেবিলাদল এবং গেবিলা ও সেনাবাহিনী উভযকেই সাহায্য কবাব জন্য থাকবে শত্রুপক্ষেব যোগাযোগ ছিন্নকাবী ও এই ধবনেব ফলপ্রদ নানা কাজে নিযুক্ত বহু বিস্তৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাশক দল। এই সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীব পিছনে গেবিলা ও নাশকদলকে সাহায্য কবাব জন্য অটুট থাকবে জনতাব সাধাবণ দৃঢ় প্রতিবোধ, যাব ফলে মুক্তি সেনাব অগ্রগতি সহজ হযে উঠবে, শত্রুব অগ্রগমন বা পশ্চাদ্ধাবনে কষ্টকব হবে, যাতে কবে প্রভাবাধীন এলাকাটাই মুক্ত অঞ্চলে পবিণত হতে পাবে এবং মুক্ত হবাব সঙ্গে সঙ্গেই আবাব চাবপাশেব প্রভাবাধীন এলাকাও উত্তবোত্তব বিস্তৃতি ও প্রসাবতা লাভ কবে। আমাদেব মুক্ত লাল অঞ্চলগুলিব কোন সুনির্দিষ্ট এবং বক্ষীদুর্গ বিশিষ্ট সীমান্ত থাকতে পাবে না। এই অঞ্চল ঘিবে যে গেবিলা বাহিনী এবং জনতাব প্রতিবোধ থাকবে তাই হবে আমাদেব ম্যাজিনো এবং সিগফ্রিড্ দুর্গমালা। আব মৃত্যুববণকাবী স্কোযাড এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাশক দলগুলি আমাদেব দূবপাল্লাব কামান। এবই আড়ালে আমাদেব সেনাদল নিপুণভাবে এগিযে যাবে।

এটা হচ্ছে সংগ্রামেব আদর্শ অবস্থাব মোটামুটি একটা খসড়া চিত্র। এইবাব তাহলে বিচাব কবে দেখা যাক আমাদেব সামর্থ্য শক্তিব উৎস, আমাদেব নেতৃত্বের গুণাগুণ এবং এইবকম সচেতন বিকাশেব ব্যবহাবিক সম্ভাব্যতা এবং এইসব ব্যাপাব সম্পর্কে কমবেডদেব সাধাবণ জ্ঞান। যদি আমবা প্রকৃতই দাযিত্বপালনে স্থিব থাকি—তাহলে এই চিত্রটি যাতে সত্যিই

ব্যবহারিক সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তার জন্য এক্ষুনি আমাদের অবস্থান বা কার্যকলাপ সঠিক ও যথাযথরূপে নির্ধারিত করতে লেগে যেতে হবে—যেন তারা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সত্যিই সচেতন হয়ে এইসব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লেগে যায়। সংগ্রাম শুরু হবার অপেক্ষায় শিক্ষা ও চিন্তাকে ফেলে রাখা পার্টির নেতাদের পক্ষে উচিত হবে না। সেটা হবে মারাত্মক ভুল, ঘটনাস্থলে গভীর সংকটের সামনে উচ্চতর নির্দেশ সম্বন্ধে সংযোগ শূন্য হবার ফলে জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাহলে সব কিছু গোলমাল করে ফেলবে—পর পর কি কি করা প্রয়োজন তা স্থির করতে পারবে না। সংগ্রামী জনতার অগ্রগামী অংশ এবং পার্টি কর্মীদের সকল স্তরে যথাযথ এবং বিস্তৃত রূপে বৈপ্লবিক উপকরণ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে আমাদের সাফল্যের সবচেয়ে বড় গ্যারাণ্টি।

এই বিষয় এখানেই শেষ করি। এই ব্যাপারে যে সমস্ত বিষয় জড়িত সে সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞানলাভের জন্য সংগ্রামের যে লক্ষ্যের অবতারণা এখানে করেছি তার আলোকে অন্যান্য যেসব বিষয় ভালো করে আমাদের ধারণায় স্পষ্ট হবে সেগুলো শীগগিরই আলোচনা শুরু করব। ইতি—

৮/১১/৪৯

পঞ্চম পত্র

কি ভাবে শুরু করতে হবে?

এটা একটা প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে রাখা হল কারণ ষড়যন্ত্রকারীদের মত গোপনে এবং শান্তিপূর্ণ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে হঠাৎ আমরা কোন কিছু শুরু করি না। বিপ্লব ষড়যন্ত্র নয়—যদিও খুঁটিনাটি, অস্ত্রশস্ত্র এবং পরিকল্পনা (plan) সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছুটা ষড়যন্ত্র, কিছুটা গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে। বিপ্লব হচ্ছে অত্যন্ত প্রকাশ্য ঘটনা যাতে জনসাধারণের বেশির ভাগ অংশ সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়।

যদি কারও মনে ধারণা থাকে যে দমদম-বসিরহাটে সংঘাতের সমস্তটাই প্রধানত পরিকল্পিত হয়েছিল কয়েকজন সংগঠক দ্বারা—গণসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন বাছাই করা কতকগুলি সাহসী যুবকদের উপর নির্ভর করে, তাহলে তিনি অত্যন্ত ভুল করবেন। এই ভুল ধারণাটা সাধারণ লোকের মধ্যেও আছে। কৃষক-মজুর আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এর প্রয়োজনীয়তা এবং এই লড়াই-এর সমগ্র চিত্রটা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হতে পারেনি কারণ আমাদের করণীয় সমস্ত কাজগুলি আমরা শেষ করে উঠতে পারিনি। সে কাজগুলি কি—সেগুলি আমাদের ভালভাবে খেয়াল রাখা দরকার। আমাদের দোষগুলি সম্পর্কে পক্ষপাতশূন্য হয়ে আত্মসমালোচনা করতে হবে। এর থেকে যে শিক্ষা আমরা পাব তার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সেগুলিকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই উচিত হবে না। বিপ্লবের নীতি এবং কৌশল সম্পর্কে বিশেষভাবে ও সাধারণভাবে মূল্যবান শিক্ষা এর থেকে আমরা পেতে পারি। আমাদের পরবর্তী আক্রমণের পক্ষে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিভাবে আক্রমণ শুরু করতে হবে সেই সম্পর্কে এই লড়াই-এর শিক্ষা নিয়ে সংক্ষেপে এখানে তার আলোচনা করব।

দমদমের জেসপ্ কারখানার চার হাজার শ্রমিক এবং বসিরহাট সাবডিভিসন-এর কৃষকদের এই সংঘাতে আসল অংশগ্রহণকারী হিসাবে ধরা হয়েছিল। তাদের উপর ভিত্তি করেই পার্টির

এই সংঘাতের পরিকল্পনা। চাষী ও মজুরের সাধারণ শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ মিলমালিক ও গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে মজুরের এবং জমিদার মহাজন শ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধে চাষীর যে সাধারণ সংগ্রাম চলে আসছিল তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এবং প্রয়োজনে এই বিপ্লবী সংঘাত। আমাদের নেতৃত্বে ঐ কারখানার শ্রমিকদের ইউনিয়ন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ভিতরে শ্রমিকদের যে কারখানা পঞ্চায়েত তৈরি হয়েছিল তার শক্তি ইউনিয়নের চেয়েও বেশি ছিল। তাছাড়া শ্রমিকদের মধ্য থেকে বাছাই করা জঙ্গী শ্রমিকদের ছোট ছোট দল তৈরি করে অস্ত্র শস্ত্র চালনা এবং সশস্ত্র যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল—যাদের গণ-বাহিনী বলা যেতে পারে। এই ছোট ছোট দলগুলিই ছিল গণ-বাহিনীর ভিত্তি। চাষী এলাকাতে গণ-বাহিনী তৈরি করে অস্ত্র-শস্ত্র চালনায় শিক্ষিত করা হয়েছিল। আগামী ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ গণ-সংগঠনকে কেন্দ্রীভূত করা এবং উত্তেজনাকে জোরদার করার জন্য তখন সব খেতের পাকা ফসল সাধারণের হস্তগত করার প্রচার সমানে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জেসপ্ কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের একচেটিয়া দখল তো ছিলই তাছাড়া ঐ এলাকার সর্বত্রই আমাদের পার্টির পরিচিতি ছিল, বিশেষ করে ঐ এলাকার অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে। এলাকায় যে যে কারখানায় আমাদের পার্টির লোক ছিল তাদের গোপনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে জেসপ্ শ্রমিকদের বিক্ষোভের ফলে ঐ এলাকার সমস্ত স্থানেই আগুন জ্বলে যেতে পারে, তার জন্যও যেন তারা তৈরি থাকে এবং অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করে। চাষী এলাকার নেতাদেরও প্রস্তুত থাকবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গোপনে সংঘাতের তারিখ তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে সেদিন তারা চাষীদের শোভাযাত্রা নিয়ে বসিরহাট শহরে উপস্থিত থাকতে পারে।

জেসপ্ শ্রমিকরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিল যে কোম্পানীর এই নিশ্চিত শ্রমিক ছাঁটাই এবং গভর্নমেণ্ট ও মালিকের কারখানা বন্ধ রাখার ষড়যন্ত্র থেকে মামুলী ধর্মঘট বা কিছুটা কড়া ধর্মঘট তাদের রক্ষা করতে পারবে না। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন কারখানায় সরকার এবং মালিকের এই ধরনের জঘন্য ষড়যন্ত্র তারা বারবার দেখেছে, তাই তারা নূতন ধরনের লড়াই-এর একটা পথ খুঁজছিল, সে লড়াই হবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক যাতো কিছুটা ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর মতো। কিন্তু এই ধরনের লড়াই-এর চিত্র ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব, তাই তাদের মনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না। লড়াই-এর নূতন কায়দার প্রয়োজনীয়তা তারা ভীষণভাবে অনুভব করছিল। কারখানার সর্বত্র মুখে মুখে আলোচনা চলছিল এবং শ্রমিকরা আশাও করছিল যে তাদের ইউনিয়ন এবং পঞ্চায়েত নেতারা বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটা বিরাট কিছু করবে। কারখানা কর্তৃপক্ষও আশংকা করছিল যদি তারা ছাঁটাই-এর নোটিশ দেয় তাহলে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যাবে। তাই তারা ক্রমাগত ইতস্তত করে একমাসের উপর সময় কাটিয়ে দিল। যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে ছাঁটাই-এর সমর্থন এবং সব রকমের সাহায্য পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয় ততক্ষণ ঐ নোটিশ বার করতে সাহস করছিল না। তখন এক প্রকার নীরব-যুদ্ধ চলছিল, উভয় পক্ষের—কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষের শক্তি সংগ্রহ চলছিল এবং সাধারণ মনস্তত্ত্ব দেখা যাচ্ছিল, দ্বিধা ও সাহসের একটা সংঘাত চলছে।

গ্রামের চাষীদের মধ্যে এই ধরনের একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। গভর্ণমেণ্ট এবং জমিদার মহাজন শ্রেণীর জঘন্য কাজ তারা প্রত্যেক বছরই দেখে আসছে। বিভিন্ন নেতৃত্বে তারা বহু লড়াই করেছে, অসংগঠিত অবস্থায় অবৈপ্লবিক লড়াই তারা চালিয়ে এসেছে, সে সমস্ত লড়াই-

এর অভিজ্ঞতা তাদের কাছে তিক্ত। তাছাড়া শহরের মজুর শ্রেণীর তুলনায় তারা কিছুটা পিছনে পড়ে আছে। গ্রামের চাষীরা এক মুহূর্তের জন্যও কখনো শোষণ থেকে কিছুমাত্র মুক্ত হয়নি সেজন্য তারা গভর্নমেন্টের মোহ থেকে শ্রমিক শ্রেণী অপেক্ষাও মুক্ত। গ্রাম্য জীবনের স্বাভাবিক গতি হল কিছুটা শ্লথ এবং আলগা তাই নিজেদের চেষ্টাতে বড় রকমের বিস্তৃত বিক্ষোভ ঘটতে দেখা যায় না, যেটা দেখা যায় সেটা ছোটখাটো বিক্ষোভ স্থানীয় ছোট এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। শহরের মজুরদের চেয়ে গ্রামের চাষীরা ক্ষমতা দখলের কথা এবং পঞ্চায়েতী সরকার গঠনের কথা তাড়াতাড়ি নিজস্ব কায়দায় সাদাসিধে ভাবে বুঝে নেয় এবং তাতে সম্মতি জানায়। বর্তমান ধনতান্ত্রিক শহরগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিরাট জটিল চিত্রকে পরিষ্কার বুঝতে না পারার জন্য শহরের মজুরদের কাছে নিজেদের পঞ্চায়েতী সরকার গঠন বা পরিচালনার কথা গোলমেলে লাগে। তাদের জ্ঞানের এই অভাবের কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলি তাদের কাছে দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের কথা না বলে কেবল আংশিক দাবির ভিত্তিতে লড়াই করে নিজেদের অবস্থা উন্নত করে নেওয়ার কথা বলেছে।

ক্ষমতা দখলের সামগ্রিক লড়াইয়ের জনগণকে পরিচালনা করার জন্য আমাদের পার্টির করণীয় কি কি?

১। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে চাষী ও মজুরের বৈপ্লবিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে জনগণের লড়াইকে উচ্চতর পর্যায়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পর্যায়ে দাঁড় করাতে হবে।

২। আক্রমণ শুরু করার আগেকার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সুষ্ঠুভাবে করতে হবে।

৩। উপযুক্ত প্রচার এবং শিক্ষা দ্বারা এই সংঘাতের উপযোগী রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

৪। অগ্রগামী জঙ্গী যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র চালনায় এবং তার আধুনিক প্রয়োগ কৌশলে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৫। জনগণের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে তাদের সশস্ত্র করতে হবে।

৬। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই-এর নেতৃত্ব এবং পরিচালনা করতে হবে।

সমস্ত সময় খেয়াল রাখতে হবে এ যুদ্ধের আসল যোদ্ধা কয়েকজন পৃথক ভাবে বাছাই করা পার্টি কর্মী নয়। আসল যোদ্ধা হল দেশের অগণিত চাষী-মজুর। পার্টির কাজ জনগণকে শিক্ষিত করা, পরিকল্পনা করা, সাহায্য করা, নেতৃত্ব করা—জনগণ যখন সত্য সত্যই লড়াই-এর মধ্যে তখনই এ কাজগুলি সুষ্ঠু ভাবে করা সম্ভব। পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লড়াই করতে পারে না, জনগণের সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করে চলবে—পার্টি জনগণের অগ্রগামী বাহিনী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দমদম সংঘাত যখন ঘটল তখন প্রকৃতভাবে দেখা গেল যে সমস্ত বাছাই করা পার্টি কর্মীদের বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য আনা হয়েছিল তারা বেশ সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করল ; কিন্তু কারখানার সাধারণ শ্রমিকদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা তারা পালন করল না। তার ফলে যে অবস্থা প্রকাশ পেল তা পার্টির চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রমিকদের দায়িত্ব ছিল যে মুহূর্তে সংকেত করা হবে সে মুহূর্তে শ্রমিকরা হাজারে হাজারে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে—এক অংশ যাবে জেলখানার দিকে, সেটা ভেঙে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করবার জন্য। প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক এবং যন্ত্রপাতি আগে থেকে শ্রমিকদের সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছিল। এক অংশ বেরিয়ে পড়বে কারখানা থেকে

বোড় বোলার নিয়ে শত্রু আসার রাস্তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, এক অংশ ছুটে যাবে শত শত শ্রমিকদের লরি করে নিয়ে বিমানক্ষেত্রে উড়োজাহাজগুলি এবং অবতরণ ক্ষেত্র অকেজো করে দেবার জন্য, কিছু অংশ যাবে ঐ এলাকার অন্যান্য ছোটখাটো আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর দিকে। তাছাড়া কথা ছিল গোলাগুলির কারখানা থেকে সকলেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেবে। আমাদের অগ্রগামী সৈনিকরা সর্বপ্রথমেই সেটা দখল করে ফেলেছিল কিন্তু শ্রমিকরা নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্বই পালন করল না। তারা যে একেবারেই কিছু করেনি তা নয়, যা করেছে তা কারখানার মধ্যেই। ভিতরে তারা সাহেবদের খুন করে জ্বলন্ত চুল্লিতে পুড়িয়ে দিয়েছে, তারপর বিশৃংখলভাবে বিভিন্ন দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিভিন্ন অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছে। এদিকে আমাদের কমরেডরা সরকারের কয়েকটি ঘাঁটি অধিকার করে শ্রমিকদের জন্য অপেক্ষাই করেছে , প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে অপেক্ষা করার পর যখন গভর্নমেন্টের সশস্ত্র বাহিনী পৌঁছুতে শুরু করেছে তখন তাদের সে সমস্ত ছেড়ে আসতে হয়েছে। সেই অবস্থাতেই আমাদের কমরেডদের অর্ধসংখ্যা মত বসিরহাটের দিকে রওনা হয়েছে, বাকি অংশ হতাশ হয়ে ইতি-করণীয় ঠিক করতে না পেরে কলকাতার দিকে ফিরে গিয়েছে। প্রারম্ভের এই গোলমালের পরেও কমরেডদের মধ্যে যে অর্ধাংশ বসিরহাটের দিকে গিয়েছিল তারা অত্যন্ত বীরত্ব দেখিয়েছে। রাস্তাতে কয়েকটি পুলিশ ফাঁড়ি তারা আক্রমণ করেছে, কংগ্রেস অফিস ধ্বংস করেছে, সারা রাস্তায় প্রচার করতে করতে এগিয়েছে, বসিরহাট সাব ডিভিসন-এর এস ডি ও'কে বন্দী করেছে, বসিরহাট শহরের পুলিশ থানা অধিকার করে পুড়িয়ে দিয়েছে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে, সরকারের একখানি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ভর্তি গাড়িকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে, সরকারের ট্রেজারি আক্রমণ করেছে। কিন্তু এত ঘটনার মধ্যে কিভাবে গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়াতে হবে সে সম্পর্কে তারা সব গোলমাল করে ফেলছিল। নির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তনে সেই অবস্থায় করণীয় কাজ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত করতে না পেরে পশ্চাদপসরণের জন্য তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তো উঠল, তার ফলে যে ধরনের পশ্চাদপসরণ হয়েছিল তা মারাত্মক—বহু অস্ত্র-শস্ত্র ছেড়ে, আহতদের ছেড়ে, তাড়াতাড়ি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কোনো প্রকার চিন্তা না করেই।

এখন আমাদের ভাবতে হবে আক্রমণ এইভাবে হঠাৎ ভেঙে পড়ার আসল কারণটা কি? আসল কারণ হচ্ছে গণসংঘাতের অভাব। যদি শ্রমিকরা তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করত তাহলে সংঘাতের চিত্র হতো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তাহলে আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিবর্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য এমন লড়াই চালিয়ে যেতে পারতাম, যে ধরনের লড়াই-এর চিত্র ৪নং চিঠিতে দেখানো হয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে সেই অবস্থার উপযোগী আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির মস্তিস্কে পুনর্বিবেচনা করে গুছিয়ে নেবার জন্য যদি একটা দিন কিংবা কয়েক ঘণ্টার জন্যেও মিলিত হতে পারতাম তাহলে তখনও ইতিহাস অন্য রকম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে জগতের লোকের কাছে যে চিত্র ফুটে উঠল তার থেকে তাদের ধারণা হল মাত্র কয়েকজন যুবক এই সংঘর্ষ ঘটিয়েছে—জনগণ নয়, কারখানার শ্রমিক বা বসিরহাটের কৃষকদের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। চাষীদের কোনো দোষ ছিল না। ঘটনার আগের দিন বেশ কিছু চাষী বসিরহাট শহরে উপস্থিত ছিল কিন্তু সংঘাতের দিন তাদের কাছে কোনো সংবাদই পৌঁছায়নি। এমন কি সংঘাতের সময়ও আমাদের কমরেডরা চাষীদের যোগ দিতে ডেকে আনার জন্য তাদের কাছে যায়নি ; শেষে অবশ্য তাদের কাছে কয়েকজন পৌঁছেছিলেন, তবে লড়াই-এ যোগ দেওয়ার জন্য নয়, আশ্রয়ের জন্য। যা বিপদ্জনক এলাকা থেকে বাইরে বার

হয়ে আসার পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করার জন্য। সে সমস্ত কাজ চাষীরা নিপুণভাবে করেছে, কেউই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যে সামান্য অস্ত্র শস্ত্র চাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল তা তারা অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রীর মতো রেখে দিয়েছে। পুলিস বারবার খানাতল্লাস এবং নেতৃস্থানীয় চাষীদের গ্রেপ্তার করার পরও তারা সেগুলি নষ্ট করে ফেলেনি। যদি কৃষক এবং শ্রমিকদের এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করানো যেত তাহলে পার্টির পরিকল্পনার বা সংগঠনের সমস্ত গলদ মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যেত, সংঘাতের আসল উদ্দেশ্যও সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পেত, ঝুটা বিপ্লবীরা তাহলে আর বিদ্রূপ করার কিছুমাত্র সুযোগ পেত না।

জেসপ শ্রমিকরা এক নতুন কায়দায় লড়াই-এর জন্য আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছিল—তার ফলে তাদের প্রস্তুতির যথাযথ পরিমাপ করে নেবার সময়ও আমরা পাইনি। যেখানে কাজ হচ্ছে জনগণকে নিয়ে, সেখানে এ ধরনের জরুরী তাগিদ বা চাপ আসবেই, আমাদের প্রস্তুতি এবং আমাদের হিসাবমত জনতাকে অপেক্ষা করানো যায় না। এইরূপ সংকটজনক অবস্থাতেও পার্টিকে লড়াই-এ নামতেই হয়। তা না হলে পার্টির শক্তির উপর জনগণের আস্থা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পার্টির তখন ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার মধ্যেই সমস্ত রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করে নিতে হয়. পার্টি যদি তার প্রস্তুতির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য শক্তির সম্পূর্ণ মিলের জন্য অপেক্ষাই করতে থাকে তাহলে আঘাত করবার সুযোগ একেবারেই না মিলতেও পারে।

সংঘাতের পূর্বে দুটো ব্যাপার আমাদের অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলেছিল। একটা হচ্ছে পরিকল্পনাটা গোপন রাখা সম্পর্কে, যাতে গভর্নমেন্টের কাছে খবরটা না পৌঁছায়, তা হলে সংঘাত শুরু হওয়ার আগেই সমস্ত পণ্ড হয়ে যায়, তার জন্য আমরা অত্যন্ত সতর্ক হয়েছিলাম, সংঘাত শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা আগেও সমস্ত পরিকল্পনাটা মাত্র কয়েকজন ছাড়া কেউই জানত না। প্রত্যেককেই কিছুনা কিছু বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আসল পরিকল্পনাটা জানতে দেওয়া হয়নি। আমাদের দ্বিতীয় ইচ্ছা ছিল শত্রুকে সম্পূর্ণ অতর্কিতে আক্রমণ করা, যাতে আমাদের প্রথম জয়টা বিপুলভাবে হয় এবং শত্রুদের মধ্যে একটা বিরাট আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের এই উভয় উদ্দেশ্যই সফল হল কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে পড়তে হল। কমরেডরা ভালভাবেই নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে গেল বটে কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় নিজের থেকে চিন্তা করে অবস্থা হিসেবে ব্যবস্থা করা—যেটা প্রত্যেক সচেতন বিপ্লবীদের করা উচিত – সেই চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে পারল না। যখন বসিরহাট শহর তাদের দখলে, অবস্থাও এমন কিছু হতাশাজনক ছিল না তখন অবস্থা ঠিকমত বুঝতে না পেরে নিজেদের শক্তিকে কাজে লাগাল না, জয় করা অধিকার ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি পশ্চাদপসরণ করে বসল। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়—অধিকাংশ কমরেড এমন কাজ করে বসল, যেন তারা চিন্তা করতে বা চিন্তা করে কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। এর থেকে এইটাই বুঝা যাচ্ছে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সঙ্গে তারা ঠিকমত পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করতে তারা অক্ষম। দ্বিতীয়ত এই সমস্ত গুণগুলির অত্যন্ত অভাব থাকার জন্যই শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করার যে সাফল্য তাকে তারা কাজে লাগাতে পারে নি।

গোপনতা রক্ষা করার জন্য জেসপ্ কারখানার সমস্ত শ্রমিকদেরও পার্টি পরিকল্পনা জানতে দেওয়া হয়নি। সংঘাত শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে কয়েকজনকে মাত্র বিশ্বাস করে পরিকল্পনা জানানো হয়েছিল, তারাই পরিকল্পনামত শ্রমিকদের হাজির করাবার দায়িত্ব নিয়েছিল এবং কথা

দিয়েছিল যে কাজগুলি তারা ঠিকমত করবে। সারা কারখানায় তারা অস্পষ্টভাবে গোপনে প্রচার করেছিল যে একটা বিরাট কিছু করা হবে, জানি না তাদের প্রচার থেকে সাধারণ শ্রমিকরা কি ধরনের ধারণা করেছিল। হয়ত তারা তা থেকে ধারণা করেছিল যে কারখানা কর্তৃপক্ষের এতদিনের অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার সুযোগ তারা পাবে। সাহেবদের পুড়িয়ে মেরে উপযুক্ত প্রতিশোধ তারা নিয়েছিল, যদিও পার্টির পরিকল্পনায় এটা ছিল না। সংঘাত শুরুর সংকেত করার পর নেতারা আসল পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের কাজ করাতে পারল না।

এখন স্বভাবত একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যদি আমরা আরো বেশি সংখ্যক শ্রমিকদের সমস্ত পরিকল্পনাটা জানিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতাম তাহলে হয়ত আমরা ভুল বোঝা বা অসাফল্য এড়াতে পারতাম এবং কাজও হয়ত সম্পূর্ণভাবে হতো। অস্পষ্টতা তাহলে হয়ত পরিষ্কার হয়ে যেত এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থাতে সঠিক করণীয় কাজগুলি রক্ষা করতে গিয়ে, হঠাৎ ভেঙে পড়ার চেয়ে পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কম ভীত হওয়া উচিত ছিল। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যদি আমরা আরো বেশি শ্রমিককে জানাতাম, তাদের পরিকল্পনাটা ভালভাবে বুঝিয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্য আরও বেশি সময় নিতাম আর তার ফলে যদি পুলিশের কাছে পরিকল্পনাটা প্রকাশ হয়ে পড়ত তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমাল হয়ে যেত, ঘটনা আমরা হয়ত একেবারেই ঘটাতে পারত না, সেটা কোনক্রমেই হতে দিতে পারিনা।

আর একটা যুক্তি উঠতে পারে যে প্রথমেই শ্রমিকদের লড়াইয়ে নামানো উচিত ছিল এবং যখন দেখা যেত তারা সত্যসত্যই লড়াই করছে, অস্ত্র শস্ত্রের দাবি করছে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে বা শত্রুর আসার পথ বন্ধ করার সমস্ত ব্যবস্থা করছে তখন আমাদের বাছাই করা সৈনিকদের নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল গোলাগুলির কারখানা, বিমানক্ষেত্র, জেলখানা প্রভৃতি অধিকার করে শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র শস্ত্র দিতে এবং লড়াই চালিয়ে যেতে। সত্য কথা বলতে কি কার্যক্ষেত্রে এভাবে লড়াই শুরু করে পরপর পরিকল্পনার সমস্ত কাজগুলি করা অত্যন্ত কঠিন এটা কেবল কল্পনা করাই সম্ভব। সাংগঠনিক অসুবিধার দিকে তাকিয়ে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা শৃঙ্খলা, শত্রুর সতর্কতা প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে আমাদের খুশিমত ঐভাবে সাজিয়ে ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া সংঘাত ঐভাবে শুরু করলে শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করা যেত না এবং আমাদের এই শক্তিতে লড়াই চালিয়ে যেতে হলে প্রথমেই বিপুলভাবে জয়লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ঘটনাটা যেভাবে ঘটে গেল তা কি অন্য রকম ঘটতে পারত না? যেভাবে লড়াই শুরু হয়েছিল তাতে এইভাবে শেষ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই কথা বলে নিজেদের দোষ ঢেকে গেলে চলবেনা বা সোজাসুজি একথা বললেও হবেনা যে ভবিষ্যতে জয়লাভ করার জন্য আমাদের এই অসাফল্যের প্রয়োজন ছিল। আমাদের স্পষ্ট করে স্বীকার করতেই হবে যে আমরা গোড়াতেই একটা বড় ভুল করেছিলাম। সে ভুলের মূল হচ্ছে নেতৃত্বে, যে নেতৃত্বের হাতে পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক প্রস্তুতি তৈরি করার দায়িত্ব ছিল। সেই গোড়াকার ভুলের জন্যই পার্টির কর্মীরা এবং শ্রমিকরা বড় রকমের ভুল করেছে। সেই ভুল সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যাক।

পরিকল্পনাটা আরো বেশি সংখ্যক লোককে না জানা বা সেটা নিয়ে খোলাখুলিভাবে সমস্ত পার্টি কর্মী বা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা না করা এই ভুলটার কারণ হচ্ছে পার্টি কর্মী এবং শ্রমিকদের ঠিকমত রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করা। যদি কমরেডদের এবং শ্রমিকদের

বিপ্লবের কায়দা ও কৌশল সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকত, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার সাফল্য এবং অসাফল্য সম্পর্কে যদি তাদের জানাশোনা থাকত, যদি যে কোনো অবস্থায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে কাজ করবার মতো ক্ষমতা তাদের অর্জন করা থাকত, তাহলে তারা যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও ভাল ভাবে কাজ গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারত। সুষ্ঠভাবে কাজ করবার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা জানার কিছুমাত্র প্রয়োজন তাদের ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সাবধানতা সত্ত্বেও অনেকেই খবরাখবর এবং পরিকল্পনাটা মোটামুটি জেনে ফেলেছিল, কিন্তু বিপ্লবের রীতিনীতি এবং কৌশল সম্পর্কে রাজনৈতিক জ্ঞান না থাকায় তারা যে সমস্ত সুযোগ পেয়েছিল তা মোটেই কাজে লাগাতে পারেনি বা সম্পূর্ণ নষ্ট করেছে।

যদি তারা সকলেই আগে থেকে পরিকল্পনার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর জানত তাহলেও, যেহেতু তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করবার নিজস্ব বুদ্ধি ও সতর্কতা ছিল না সেই জন্যই ঘটনা অন্যভাবে ঘটতে পারত না। তা না হলে যাদের পরিকল্পনাটা পুরোপুরিই জানা ছিল তারাও সঠিকভাবে কাজ করতে পারল না কেন? অবস্থা পরিষ্কারভাবে বোঝার অক্ষমতা, আড়ষ্টতা, অসাবধানতা এবং অমনোযোগিতার জন্যই তারা দায়িত্বের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারেনি। আমরা জনগণের নেতৃত্ব করতে পারব তখনই যখন আমাদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের বৈপ্লবিক স্পৃহা জন্মাবে। আমরা তখন যে কোনো সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারব বা যে কোনো অবস্থাতেই নিজস্ব ক্ষমতায় কর্তব্য ঠিক করে নিতে পারব। তাই আমরা যদি সত্যিকারের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করি তাহলে পরিকল্পনা বা তার খবরাখবর সকলকে জানানোর যে বিপদ এবং অসুবিধার সম্ভাবনা থাকে তা থেকে মুক্ত হতে পারব। এ ব্যবস্থা আমাদের আগেই সম্পূর্ণভাবে করা উচিত ছিল। কিন্তু করিনি। এখন থেকে যাতে করা হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কমরেডদের জ্ঞান স্পৃহা বাড়ানো এবং তাদের মানসিক আড়ষ্টতা কাটানো বিশেষ প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের উচিত বার্মা, চীন ইন্দোচীন, গ্রীস, রাশিয়া এমন কি তেলেঙ্গানা ও দমদম প্রভৃতির শত শত পরিকল্পনা এবং তার ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা। যদি কমরেডরা এই সমস্ত পরিকল্পনা সত্য সত্যই বিচার করে এবং তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে পার্টির উচ্চতর কমিটির কোনো পরিকল্পনাই আগে থেকে সকলকে জানানো প্রয়োজন হবে না, কাজের সময় সেটা তাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে পড়বে না এবং সঠিকভাবে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে যেতে পারবে।

সুতরাং যখনই আমরা প্রস্তুতি এবং সৈনিকদের শিক্ষার কথা বলি তখন কেবলমাত্র রাইফেল চালনায় শিক্ষিত বা সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েছে কিনা দেখলেই চলবে না, বিপ্লবের রীতিনীতি এবং তার কায়দা কৌশল সম্পর্কে তারা জ্ঞানার্জন করেছে কিনা বা পরিষ্কারভাবে বুঝেছে কিনা তা দেখতে হবে। লড়াই জোরদার করতে হলে অস্ত্রশস্ত্র চালনা এবং সশস্ত্র লড়াই এর কৌশল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের কায়দা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সৈনিকরা সত্যিকারের শিক্ষিত হয়ে উঠবে তখনই যখন এই সমস্ত শিক্ষাগুলিই তাদের দেওয়া হবে। যদি আমরা এই সমস্ত কাজ আগে থেকে না করি তাহলে জনগণের হাতে অস্ত্র দিলে তারা তা গ্রহণ করবে না। তাদের সশস্ত্রভাবে রক্ষা করলেও তারা কাজে নামবে না, বা যদি তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই আরম্ভ করে তাহলেও সঠিক পথে চলতে পারবে না। উচ্চতর কমিটির পরিকল্পনার সঙ্গে নীচেকার প্রস্তুতির সম্পূর্ণ মিল থাকা চাই, কারও কাজ কারও কাছে বিস্ময়ের বস্তু হলে চলবে না। এই সমস্ত কাজ যদি করা থাকে তাহলে

কিভাবে আক্রমণ শুরু করতে হবে তা নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। তখন উপর থেকে পরিকল্পনা মত চমৎকার ভাবে শত্রুকে হঠাৎ কয়েকটি কঠিন আঘাত দিয়েও শুরু করা যেতে পারে অথবা জনগণের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট ঘটনা উপলক্ষে শুরু করে ক্রমেই বিরাট হল্‌কার মত সংঘর্ষ বিস্তৃত আকার ধারণ করতে পারে। ঘটনা আমরাই পুরোপুরি তৈরি করে শুরু করি না, লড়াই অবিরাম চলে আসছে। আমাদের কাজ হলো জনগণকে সংগঠিত করে শিক্ষিত করে জোরদার করা এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা। তখনই সেটা দাঁড়ায় পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা রাজনৈতিক সংঘাতের অভিযান। ইতি—

১৯/৯/৪৯

ষষ্ঠ চিঠি

বিপ্লব প্রচেষ্টার সমস্ত দিক না বুঝে, গণসংগ্রামের সমস্ত অবস্থা না বিচার করে এবং সংঘাত সাফল্যলাভ করানোর জন্য সাধারণ রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা না বুঝে যদি কেউ ধারণা করে নেন, ভবিষ্যতে সমস্ত সংঘাতই দমদম বসিরহাট সংঘাতের মতো করে শুরু হবে, তাহলে তিনি ভুল করবেন। এই সংঘাতটাকে ওপর ওপর ভাবে দেখলে এর পরিকল্পনা এর প্রস্তুতি এবং এর জঙ্গী সৈনিকদের নৈপুণ্যটাই কেবল দেখা হবে। যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত গণসংগ্রাম এবং সংঘর্ষগুলি চিন্তাশূন্য এবং লক্ষ্যহীনতার জন্য উদ্দীপনাহীন তখন স্বভাবত দমদম সংঘাত একটা নূতন ধরনের ঘটনা বা নূতন ধরনের আঘাত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটাকে এরকম উপর উপর ভাবে দেখলে ভুল হবে কারণ তাহলে গণসংগ্রামের বর্তমান অবস্থায় এই সংঘাতের প্রয়োজনীয়তাকে বোঝা যাবে না। এই সংঘাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—এতে কি সাফল্য লাভ করা গেছে বা কি ধরনের অসাফল্য হয়েছে এবং কেন —এর থেকে এই উভয় শিক্ষাই নিতে হবে। শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করা, প্রথমেই তাকে সাংঘাতিক আঘাত দেওয়ার জন্য সাবধানে এবং ধৈর্য করে প্রস্তুতি গড়ে তোলা, সঠিকভাবে জঙ্গী সৈনিকদের শিক্ষিত করা, পরিকল্পনা তৈরি করার জ্ঞানকে বর্ধিত করা, যাতায়াতের আধুনিক ব্যবস্থাগুলির সুবিধা কাজে লাগানো, জনগণের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা—দমদমের এই সমস্ত শিক্ষাগুলি ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রেরণা। এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিপ্লবীদের ভাল ভাবে জেনে রাখতে হবে কেন জনগণ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারে নি। সুন্দর সুশৃঙ্খল বৈপ্লবিক আক্রমণ যাতে ধাপে ধাপে উন্নত হতে পারে, যাতে সংঘাতের পর সংঘাত এবং জয়ের পর জয়ের দিকে জনতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রতি-আক্রমণ রোখার মতো ক্ষমতাও জনগণ অর্জন করতে পারে, তার জন্য পার্টির নেতৃত্বের সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় জনগণের প্রস্তুতির সম্পূর্ণ মিল রাখার সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

তুলনা করে বলতে গেলে বলতে হয় সংগ্রাম, গণসংগঠন, গণচেতনা এবং জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষামান সঠিকভাবে উন্নত করা অপেক্ষা সংঘাত প্রস্তুতির উপরকার অংশটা অর্থাৎ পরিকল্পনা তৈরি করা, আঘাত দেওয়ার স্থানগুলি নির্ধারণ করা, সংগ্রামী জনতাকে সাহায্য করার জন্য বাছাই করা জঙ্গী সৈনিকদের শিক্ষিত করা, সংঘাত শুরু করার জন্য প্রথমেই যে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন তা জোগাড় করা প্রভৃতি কাজগুলি অনেক সোজা। জনগণকে তৈরি যারা করবে তাদের কঠিন পরিশ্রম করা প্রয়োজন , ছোট ছোট সংগ্রামগুলি পরিচালনায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দরকার এবং রাজনীতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে যারা আগামী

সংঘাতের জন্য জনগণকে তৈরি করা এবং সংগঠিত করার কাজে নিযুক্ত তাদের কেবল ছোট ছোট সংগ্রামগুলি জোরদার করার চেষ্টা করলেই চলবে না— সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে, সশস্ত্র লড়াই-এর কৌশল শেখাতে হবে, বিপ্লবের নীতি এবং কৌশল সম্পর্কে গভীর চিন্তা করার অভ্যাস করাতে হবে, শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে বৈপ্লবিক ঐক্য তৈরি করা এবং বজায় রাখার কৌশল শেখাতে হবে এবং জনগণ যে ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তার বিভিন্ন উন্নত অবস্থায় কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। এই সমস্ত কাজগুলি করার সঙ্গে সঙ্গে সংঘাতের গোপন প্রস্তুতিগুলি অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা, তৈরি করা প্রভৃতি কাজগুলি করার জন্য অগ্রগামী এবং বেপরোয়া কর্মী বাছাই করে নিতে হবে। সমস্ত কাজগুলিই একই সঙ্গে করে যেতে হবে, কোনো কাজই অগ্রাহ্য করলে চলবে না। এই সমস্ত কর্তব্য কাজগুলি সম্পূর্ণ করা হলে, তারপর প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা এবং কিভাবে বৈপ্লবিক আক্রমণ শুরু করতে হবে তা নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। সংগ্রামের গতি এবং প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রেখে যে কোনো সংযোগ রক্ষায় সম্পূর্ণ পার্টিকেন্দ্র অল্প পরিশ্রমেই পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলতে পারে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে বর্তমানে দেশের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা দমদম সংঘাতের সময়ের দেশের বিশেষ অবস্থা থেকে ভিন্ন, আবার পার্টি যখন বীরভূম থিসিস গ্রহণ করেছিল তখনকার দেশের বিশেষ অবস্থাও পৃথক। সাধারণভাবে বলা যায় দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বর্তমান, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রবাদের পতনোন্মুখ অবস্থা দিনের পর দিন ক্রমেই বিপ্লবের পক্ষে আমাদের দেশকে আরও উপযুক্ত করে দিচ্ছে। কেবল মাত্র এই সাধারণ অবস্থা বিচার করলেই আমাদের চলবে না।

বিপ্লবের পক্ষে দেশের বিশেষ সুবিধা অসুবিধা এবং সংঘাতের বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ আমাদের করতে হবে। কারণ দেশের বিশেষ অবস্থা এবং সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের নীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সঠিক কায়দা বেছে নিতে হবে। দেশের সাধারণ অবস্থা অনুযায়ী নীতি এবং বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী আমাদের কৌশল ঠিক করতে হয়। তবে নীতি এবং কৌশলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে, উভয়ের মধ্যে মিল রাখা চাই এবং লক্ষ্য একই থাকা চাই।

দু'বছর হয়ে গেল আমরা বীরভূম থিসিস গ্রহণ করেছি কিন্তু থিসিস্ গ্রহণ করার এক বছরের মধ্যেও আমরা দমদম সংঘাত করতে পারিনি। ইতিমধ্যে পরিবর্তন অনুযায়ী এই সমাজ আমাদের প্রস্তুতি এবং লড়াই এর বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে শত্রুকে আঘাত করবার বিভিন্ন প্রকার সুযোগ আমাদের দিয়েছিল। সম্মেলন থেকে চলে আসার সময় সংঘাত সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ধারণা আমাদের হয়েছিল, তার পর এই ক' বছরের কঠিনতম রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে তার পরীক্ষা হয়েছে। যাই হোক এখন আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয় বিচার করতে হবে।

যে সময় আমরা পার্টির বর্তমান থিসিস বিচার করার জন্য বীরভূম সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলাম তখন বর্তমান দিনের চেয়ে জনগণ অনেক বেশি সংগঠিত ছিল, তখন ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস, কিষান সভা, ছাত্রদের সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টি, এবং আমাদের পার্টি সংগঠন হিসাবে আজকের চেয়ে অনেক বড় ছিল। বিভিন্ন কারখানার সংগঠিত শ্রমিকরা বহুদিন ধরে ক্রমাগত বড় বড় ধর্মঘট চালাতে পারত, বিরাট বিরাট সম্মেলন ও সাধারণ সভা হতে

পারত এবং পার্টিগুলিরও আত্মগোপন করার প্রয়োজন হয়নি, তাদের অফিস ছিল, পত্রিকা ছিল বিরাটভাবে খোলাখুলি প্রচারও তারা করতে পারত। তখন জনগণকে অনেক বেশি সংখ্যায় সমবেত করা সহজ ছিল। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিরাট সংঘাত সৃষ্টি করাও অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এই সময়ের এক বছর পরে দমদমে যা করা সম্ভব হল, তার চেয়ে অনেক বড় সংঘাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা আমাদের দ্বারাই সম্ভব হতো এবং সেটাকে কার্যকরীও আমরা করতে পারতাম যদি সেই ভাবে অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও রাজনীতির দিক থেকে আমরা প্রস্তুত থাকতাম। গভর্নমেণ্ট তখন অপেক্ষাকৃত কম সতর্ক, কম প্রস্তুত, কম সচেতন, অস্ত্রশস্ত্র বা অন্যান্য ব্যবস্থায় কম সজ্জিত এবং অত্যন্ত কম অভিজ্ঞ ছিল। সম্পূর্ণ অসতর্ক মুহূর্তে আমরা তখন তাদের আক্রমণ করে বিরাটভাবে জয়লাভ করতে পারতাম।

যেহেতু আমরা দেশের সেই অবস্থাকে ব্যবহার করতে পারিনি সেইহেতু প্রতিবিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত ও লক্ষ্যহীন ধর্মঘটগুলির এবং জনতার বিচ্ছিন্ন লড়াইগুলির সুযোগ নিয়ে আক্রমণ শুরু করে দিল। জনতাকে সংগঠনের দিক থেকে পরাজিত করবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ক গ্রেস, কিষান সভা, ছাত্রসংগঠনগুলি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং আমাদের পার্টি চুরমার করে দিল। আমাদের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে গেল এবং প্রায় সকলকেই আত্মগোপন করতে হল। সেই সময় আসামে সংঘাত শুরু করবার চেষ্টা আমাদের বিফল হল, ছোটনাগপুর এবং কয়লাখনি অঞ্চলে আমাদের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলনা, সম্পূর্ণ অকৃতকার্যই হলাম , কলকাতা এবং অন্যান্য চাষী এলাকাগুলিতেও আমাদের তখনকার প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে সংঘাত শুরু করার সম্ভাবনা ছিল না।

এই রকম একটা অবস্থায় আমরা দমদমের পরিস্থিতি আঁকড়ে ধরলাম। তখন দমদম হচ্ছে আমাদের শেষ সংগঠিত মজুর এলাকা এবং বসিরহাট হচ্ছে আমাদের অবশিষ্ট কয়েকটি চাষী এলাকার মধ্যে একটি। যদি আমরা সে সময়েও কিছু না করতাম তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে আমরা যে সুযোগও একবারে হারাতাম, বিপ্লবের এই ধাপকে আমরা তাহলে কোনো কিছুই দান করতে পারতাম না যা আমরা দমদমের অসাফল্যমণ্ডিত চেষ্টাতেও করতে পেরেছি। এটা অসাফল্যমণ্ডিত চেষ্টা হলেও সাধারণভাবে তা জনসাধারণের সচেতনতাকে সাহায্য করতে এবং আমাদেরও অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। যদি আমরা তখন তথাকথিত বিজ্ঞের মতো নারব থাকতাম তাহলে এটুকুও লাভ হতো না। আজ আমরা আহত, শত্রুর দ্বারা ভীষণভাবে অনুসন্ধিত হচ্ছি। সংগঠনের ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত দুর্বল সন্দেহ নেই, তা সত্ত্বেও বিপ্লব প্রচেষ্টায় আমাদের দান অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে। এই দান আমাদের পুনরায় সুসংগঠিত হতে এবং শত্রুকে পুনর্বার আক্রমণ করতে সুযোগ স্বর সময়ই তৈরি করে দেবে।

আজ কেবল মাত্র "ক" প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও আমাদের সংগঠিত শক্তি নেই বা বিরাট জনশক্তি আমাদের পিছনে নেই। পার্টির কাজকর্ম "খ" এবং 'গ''-তে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কারণ সেখানকার প্রায় সকল কর্মীই আজ জেলের মধ্যে। "ঘ" এবং "ঙ"-র যে সমস্ত স্থানে আমরা একদিন ছিলাম আজ আর আমরা সেখানে নেই। আমাদের "চ" এর সংগঠন আজ সম্পূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত এবং বিচ্ছিন্ন, "ছ"-এ আমাদের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির আজ আর ইউনিয়ন হিসাবে কোনো অস্তিত্ব নেই, বাংলাদেশের অভিজ্ঞ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই এখন জেলের বাইরে, জেলা সংগঠনগুলিতে যে কয়জন কর্মী আজ আছে তারাও বিচ্ছিন্ন এবং মাত্র কয়েকটি চাষী এলাকাতে আজ আমাদের কাজ চলেছে, বাকিগুলিতে অভিজ্ঞ কর্মীর অভাবে কাজ একপ্রকার বন্ধই। "ক"-এর শহরগুলিতে বিশেষ কিছু শক্তি আর নেই, কারখানায়

শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের শক্তি সেদিনকার চেয়ে আজ অনেক কম অবশ্য চাষীদের মধ্যে আমাদের শক্তি এখন আগের যে কোনো সময়ের অপেক্ষা অনেক বেশি।

সংগঠনের বিচ্ছিন্নতার এই চিত্র আজ সকলেরই—কেবলমাত্র আমাদের পার্টিরই নয়। কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থাও তাই, পার্টির মধ্যে অসম্ভব মতভেদ, এমন কি তাদের বিভিন্ন প্রাদেশিক শাখাই আজ পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তাদের সংগঠনের অবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, তাদের রেলশ্রমিক সংগঠন, তাদের অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তাদের অফিস প্রেস, প্রচারযন্ত্রের সংগঠনগুলি, কিষান সভা প্রভৃতির দিকে তাকান। তাদের ক্ষতির সঙ্গে তুলনা করলে আপনারা আপনাদের ক্ষতির জন্য নিজেদের আর এতটুকু দোষ দিতে পারবেন না। সাধারণভাবে বলা যায় আগেকার যে কোনো সময়ের চেয়ে আজ জনতা অনেক বেশি অসংগঠিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্তমানের মতো সংগঠনের দিক থেকে জনগণ এত দরিদ্র আর কখনও হয় নি।

কিন্তু বর্তমানে সচেতনতার দিক থেকে জনতার অগ্রগতি আগের চেয়ে অনেক বেশি। আজ জনগণের মনে কংগ্রেস সম্পর্কে, সুবিধাবাদী পার্টিগুলি সম্পর্কে এবং ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মোহও নেই। তারা সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করবার জন্য মনের দিক থেকে এই মুহূর্তেই প্রস্তুত যদি তা' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত। তারা উৎসুক হয়ে লালচীনের দিকে তাকিয়ে আছে—পণ্ডিত নেহেরুর মধ্যে আজ তারা চিয়াং-কাই শেককে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু মাও-সে-তুং আর লালফৌজকে তারা ভারতবর্ষে খুঁজে পাচ্ছেনা। তারা আজ ভীষণভাবে গভর্নমেণ্ট বিরোধী কিন্তু মুক্তির পথ পরিষ্কার ভাবে দেখতে না পাওয়ার জন্য এবং শুধু শুধু রক্তপাত না ঘটিয়ে সাফল্যের দিকে তাদের পরিচালিত করতে পারে এমন একটি সক্ষম পার্টি পিছনে দেখতে না পাওয়ার জন্য বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। আমরা, বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি বিশেষ করে সংগঠনের দিক থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে আজ আমরা সর্বত্র পরিচিত—আজ সকলেই স্বীকার করে যে ঐ হচ্ছে এখন আক্রমণের একমাত্র পথ। কমিউনিস্ট পার্টিও আজ অন্ধভাবে এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাদের অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে যদিও সংকীর্ণ পার্টি স্বার্থের জন্য তারা প্রকাশ্যে আমাদের নিন্দা করছে। যখন জনগণ আমাদের এত নিকটে তখন সংগঠনের ক্ষেত্রে আমরা এত দুর্বল এটা কি রকম? কি ধরনের কাজ জনসাধারণের এই সচেতনতা এবং সংগঠনের মিলন ঘটাতে পারবে? বর্তমানে এই বিচ্ছিন্ন জনতাকে কি করে পুনরায় সুসংগঠিত করা যাবে? যদি আমরা কিছুটা সংগঠিত না করতে পারি তাহলে সংঘাত শুরুই বা করি কি করে? আক্রমণ করবার শক্তিটা নির্ভর করে শুরু করবার পূর্বে জনতাকে যতটা সমবেত করা যায় তার উপর। যতবেশি আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব আমাদের আক্রমণ করবার শক্তি ততই কমে যাবে—শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষকে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ করা ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব বলেই মনে হবে না। আজ হয়ত মনে হচ্ছে সেটুকু প্রস্তুতিও নেই। তাহলে সর্ব নিম্ন প্রস্তুতি কি—যার দ্বারা সংঘাত শুরু করা সম্ভব হয়? এটাই হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। কারণ দু'বছর আগে যতটা জোর আঘাত করা সম্ভব ছিল, তার একবছর পরে দমদমে তা' করা গেল না এবং দমদমে যা করা সম্ভব হল এখন আজ আর ততটা করা সম্ভব নয়। তাহলে কি আমাদের উচিত যত সামান্য আঘাত দিতে পারিনা কেন, তা শুরু করা? আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে কেন আজই একটা মহা শক্তিশালী বিপ্লব আরম্ভ হবে না, আর কেনই বা একটা বিরাট সংঘাত এখনই শুরু হবে না অথবা শুরু করা যাবে না, যখন জনসাধারণের অসন্তোষ এত বিস্তৃত এবং এত সাংঘাতিক, সরকারের প্রতি মোহ যখন এতটুকু নেই, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা

যখন এত খারাপ, শাসকশ্রেণী যখন এত অপ্রকৃতিস্থ বা আতংকিত এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন এত উপযুক্ত? এইটাই হচ্ছে আজকের সমস্যা। আমাদের এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে হবে এবং পরিকল্পনা করে সেই মতো কাজ করতে হবে।

ভারতবর্ষে বিরাট এবং অপরাজেয় বিপ্লব ঘটানোর জন্য জনগণের সচেতনতা, মোহমুক্তি, জঙ্গী মনোভাবের এই বর্তমান অবস্থায় তাদের সংগঠনের মধ্যে পুনরায় সংগঠিত করাই হচ্ছে আজকের মৌলিক সমস্যা। কিন্তু কি করে সেটা করা যাবে? সামনে লাফিয়ে পড়ার জন্য আজ এক পা পিছিয়ে আসা না এক পা এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, এই উভয় সংকট আজ সমস্ত কমিউনিস্টদের সামনে উপস্থিত। এই চিন্তা তাদের মনে আসবেই যদি না এখনও এসে থাকে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিক তাকিয়ে এবং চিন্তা করে এই সংকটজনক অবস্থাটি বিচার করতে হবে। পিছনকার দিনের মতো প্রকাশ্যে কাজ করবার জন্য, নিজেদের সংঘবদ্ধ করার জন্য এবং এখন আমরা যে ধরনের কাজে নিযুক্ত সে পথ ত্যাগ করে সন্ধি ঘোষণা করে বা আপসের পথ নিয়ে জনতাকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আমরা এক পা পিছিয়ে যাব কী? আমরা কি আইনসঙ্গত হওয়া এবং ঐ ধরনের অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বণিকশ্রেণী প্রদর্শিত নিয়মতান্ত্রিকতার পথে গিয়ে ভোট দ্বন্দ্বে হাজির হব? এখন এই ধরনের কাজ করলে আমরা কি পুনরায় সংগঠন করার সময় এবং সুযোগ পাব? এই সমস্ত চিন্তা আমাদের মনে না উঠতে পারে, যেহেতু আমরা অতীতে কখনও পিছু হটতে প্রস্তুত হইনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে কমিউনিস্টরা এই প্রশ্নের উপরই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের কাছে এই প্রশ্নটা আজ একটা বিরাট সংকট। বিশেষ করে তারা যত পরাজিত হবে, তত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর ততই গভর্নমেন্টের এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হবে এবং এতে করে তারা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার পথে এগিয়ে যাবে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ বর্মায় কি ঘটছে তা একবার লক্ষ্য করা যাক। রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে সেখানে ভীষণ জটিল সংঘর্ষ চলছে, তাড়াতাড়ি কোনো পক্ষ যে সম্পূর্ণ জয়ী হতে পারবে এমন আশা তাদের মধ্যে কেউই করে না। এই সংঘর্ষের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাংঘাতিক কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে এবং তাদের জয় পরাজয় প্রধানত নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তিগুলির কার্যকলাপের উপর, দেশের ভিতরকার যুধ্যমান শক্তিগুলির উপর নয়। ব্রহ্মদেশের কমিউনিস্টদের জয় নির্ভর করছে সবচেয়ে বেশি লাল চীন ও ভারতবর্ষের জনগণের শক্তির উপর। যদি এই শক্তিগুলি বর্মার বিপ্লবীদের সাহায্য না করে তাহলে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে ক্রমাগত এবং ক্রমবর্ধমান সাহায্য পেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শক্তিশালী হয়ে পড়বে এবং আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারবে যতদিন না অর্থনৈতিক অচল অবস্থা সেখানকার জঙ্গী জনতার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব এনে দেয়। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে বর্তমানের অবস্থা সম্পর্কে। বর্মার কমিউনিস্টরা কি এখন সন্ধি প্রস্তাব করে থাকিন-নু'র কাছে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করবে এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করার জন্য সরকারের ডাকে পিছিয়ে এসে ভোট-কেন্দ্রে উপস্থিত হবে? দেশের সম্পূর্ণ ধ্বংস এড়ানোর জন্য কোন এক অদূর ভবিষ্যতে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে তারা কি এক পা পিছিয়ে আসবে?

অনেকেই হয়ত আপনাদের প্রশ্ন করতে পারে, যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জয়লাভ না করা যায় তাহলে বিপ্লব ঘোষণা করে লাভ কি? তারা হয়ত বলবে, ভারতে বর্মার অবস্থা ডেকে আনার কি প্রয়োজন, যদি আমরা বর্মার জয়লাভ সম্পর্কে এতই অনিশ্চিত, তাহলে নিজেদের এই অনন্ত এবং দুর্গম সংগ্রামের পথে নিয়ে গিয়ে লাভ কোথায়, তার চেয়ে শুরু না করাই ভাল।

কিন্তু এ ভাবে দেখা একটা অবাস্তব অচল পদ্ধতি। আমরা যদি ভারতবর্ষে অচল অবস্থার মতোও একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে ঠিক বর্মার অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হয় না। পৃথিবীতে যে সাধারণ গোলযোগ আগেই আরম্ভ হয়েছে তাকে আরো জোরদার করা হয়। বর্মায়, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায় ইন্দোচীনে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ জুড়ে সংগ্রাম অন্তত এশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদকে চিরতরে খতম করার পক্ষে যথেষ্ট। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে শত্রু আজ তার শক্তি সংগ্রহের শেষ সীমায়। সে আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দম নেবার জন্য কি ধরনের আকুপাকু করছে, সে আজ কত মরিয়া কত শ্রান্ত, কত ক্লান্ত এবং কত আতংকিত? সে আজ প্রায় পরাজিত, আর কয়েকটি আঘাত তাকে দিন, তাহলেই সে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের এই অনিশ্চয়তার যুগও শেষ হয়ে যাবে, তারপর বিরাট সূচনা সামনে। যখন সে এই ভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, তখন আপনাদের চুপচাপ থাকা মারাত্মক ভুল হবে। তাদের সশস্ত্র শক্তির তথাকথিত শক্তিমান গণ্ডী বৃদ্ধির শেষ সীমায় উপস্থিত—আজ এটা ভেঙে পড়তে বাধ্য এবং মহাশব্দে ভেঙে পড়বেই।

আজ এক পা ও পিছনে যাওয়া চলবে না। কেবল সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আজ আপনাদের সমস্ত কার্যক্ষমতাকে, সমস্ত সাহসকে, সমস্ত বুদ্ধিমত্তাকে শাণিত করে তুলতে হবে একটি মাত্র কাজ করার জন্য, তা হচ্ছে সংঘাত সৃষ্টি করা। বিরাট ভাবে শুরু করা যায় ভালই, তা না হলে সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে এবং ইতিহাসের সমস্ত নির্দেশ অনুযায়ী ছোট করে সংঘাত শুরু করলেও আমরা নিশ্চিত জয়ের দিকে এগিয়ে যাব কারণ 'পৃথিবীটা আমাদের জয়ের জন্যই পড়ে আছে। ইতি—

১০/১১/৪৯

সপ্তম চিঠি

সফল বিপ্লবের দু'ধরনের চিত্র আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। একটা রাশিয়ার এবং আর একটা চীনের। একটাতে আমরা দেখছি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য, সমস্ত জয়কে দৃঢ় করতে ও জনগণের রাজত্বকে অটুট রাখার উদ্দেশ্যে বিপ্লবের পর লালফৌজ সৃষ্টি হল এবং অন্যটিতে দেখছি বিপ্লবকে আনার মুক্তিদাতা হিসাবে লালফৌজ একটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র। একটাতে দেখলাম সারা দেশব্যাপী দ্বৈত শক্তির মতো ধনীরাজত্বের মধ্যেই পাল্টাশক্তি হিসাবে পঞ্চায়েত তৈরি হল। একটা বিপ্লব (নভেম্বর বিপ্লব) তার নেতৃত্ব সম্পূর্ণ হাতে নিয়ে গোড়া থেকেই সমাজতন্ত্রবাদ এবং সর্বহারা একনায়কত্বের পরিষ্কার চিত্র সামনে রেখে শুরু হল এবং তারপর রাশিয়ার যন্ত্রশিল্পে পুরাতন ও পিছিয়ে পড়া অবস্থাকে উন্নত করার প্রয়োজনে নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (N I P) কায়দায় সন্ধি করে অর্থাৎ সামনে লাফিয়ে পড়ার জন্য এক পা পিছিয়ে আসার মতো করে অগ্রসর হলো, আর একটি বিপ্লব অর্থাৎ চীন বিপ্লব প্রধানত চাষী দ্বারা শুরু হয়ে, সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে হতে তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করল। বীরত্বপূর্ণ সংঘাতের নীতি ক্রমে ক্রমে বিশ্লেষিত করে সমাজবিপ্লবের কথা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হতে হতে নয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হলো।

এই দু'টি পরিষ্কার চিত্র ছাড়া লড়াই-এর আরও অন্যান্য চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সে সমস্ত লড়াই-এর চিত্র অর্থাৎ বর্মা, ইন্দোচীন, মালয় ইন্দোনেশিয়া এবং গ্রীসের লড়াই-এর

চিত্রগুলি এখনও পরিষ্কার নয়, তবে পরিষ্কার করার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। পারিপার্শ্বিক অসুবিধা এবং পিছিয়ে পড়া অবস্থা বর্তমান থাকার জন্য এই সমস্ত লড়াই-এর রাশিয়ার চিত্র অপেক্ষা চীনের চিত্রের সঙ্গেই বেশি মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দোচীনের লড়াই এর চিত্র সম্ভবত দু'টি চিত্রেরই সংমিশ্রণ এবং মালয়ের চিত্র দুটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এছাড়া পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে বিপ্লব একটা অদ্ভুত উপায়ে হয়েছে। সেখানকার জনগণের স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব ক্ষমতা দ্বারা বিপ্লব আনা সম্ভব হয়নি, এনেছে রাশিয়ার লালফৌজের উপস্থিতির সুযোগ এবং তার অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের দ্বারা। তাদের সৃষ্টির মূলে জনগণের বিপ্লব প্রচেষ্টার চেয়ে যুদ্ধ এবং লালফৌজের দানই আছে বেশি।

পৃথিবীর বিপ্লব পূর্ব দেশ সমূহের ভবিষ্যতে এই ধরনের সুবিধা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। সুতরাং জনগণের দ্বারা কৃত বিপ্লবগুলি সম্পর্কে যা আমরা চিন্তা করে বিচার করব, ঐ সমস্ত দেশগুলির অবস্থা নিয়ে তত চিন্তা করে বিচারের প্রয়োজন নেই।

বিপ্লবের এই সমস্ত চিত্র বিচার করার উদ্দেশ্য এই নয় যে তার থেকে বিপ্লবীদের পছন্দ করে একটা বেছে নিতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্ত ব্যাপারে আমাদের পছন্দ করে নেওয়ার পথে ঠিক হবে। যদি আমরা এখন চীনের পথে বিপ্লব শুরু করার চেষ্টা করি তাহলে তার মানে এই নয় যে আমরা রাশিয়ার পথকে অপেক্ষাকৃত খারাপ পথ ভেবে ইচ্ছা করে ত্যাগ করছি। এটা সত্য যে রাশিয়ার বিপ্লবই ইতিহাসে সবচয়ে উন্নত এবং চমৎকার ভাবে কৃত বিপ্লব। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের ঐভাবে বিপ্লব শুরু করতে দেবে না। এইজন্য আমরা সে পথ ত্যাগ করছি।

এর মানে কি এই যে ভবিষ্যতে আর কোনো দেশে কখনও রাশিয়ার ধরনে বিপ্লব হবে না? এর মানে তা নয় এই ধরনে বিপ্লব হওয়া নির্ভর করবে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তিগুলির পরিবর্তিত অবস্থার উপর। আন্তর্জাতিক বিপ্লবের উন্নততর ধাপে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভেঙে পড়তে পারে এবং তাহলে পৃথিবীব্যাপী এমন এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হবে যে তখন খুব সম্ভবত বিপ্লবের শেষ ধাপ রাশিয়ায় বিপ্লবের মতো কিম্বা তার চেয়ে বেশি প্লাবন এবং সর্বজয়ী রূপ নিয়ে দেখা দেবে।

বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের চিত্রগুলি কখনও একেবারে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করলে চলবে না। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির সম্পর্ক লক্ষ্য রেখে, এগুলির মিলিত ফলে ধনিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করে চিত্রগুলি বিচার করতে হবে। বিভিন্ন দেশের এই সমস্ত সংগ্রাম, বিপ্লব, বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং বিদ্রোহগুলি একত্রে ধনতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রচেষ্টাকে ওলোট পালোট করে দিয়ে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে, রাজনৈতিক শক্তিগুলির ভারসাম্য দৃশ্যভাবেই পরিবর্তিত করছে। তার ফলে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের পক্ষে বহু প্রকারের সুযোগ সুবিধা এসে যাচ্ছে এবং সেইজন্য কোন দেশে কিভাবে শেষ সংগ্রাম দেখা দেবে তা সঠিকভাবে কেউই বলতে পারে না। কারণ শেষ সংগ্রাম বা সংগ্রামের শেষ নিজের দেশের অবস্থার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আন্তর্জাতিক অবস্থার উপর এবং আন্তর্জাতিক অবস্থাসৃষ্ট সুযোগের উপর , বিশেষ করে বিপ্লবের শেষ কিভাবে ঘটবে তা দেশের চেয়ে পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থার উপরই বেশি নির্ভর করে। এ কথাটাই ভিন্নভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, সমস্ত দেশেরই সমস্যা পরিবর্তিত হচ্ছে কারণ সমস্ত দেশের সমস্যা ক্রমেই আন্তর্জাতিক রূপ নিচ্ছে বা আন্তর্জাতিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। ৪নং চিঠির বিশ্লেষণ এবং যে ধরনের

সংগ্রাম আমরা তৈরি করতে চাইছি তা বাস্তবে পরিণত করবার জন্য অত্যন্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন, কারণ বর্তমান অবস্থায় কেবলমাত্র এই পথই আমাদের আছে। এই সংঘাত যখন বাস্তবে পরিণত করা হবে তখন অন্যান্য স্থানে আরও সংঘাত সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়ে এবং অন্যান্য সংঘাত ত্বরান্বিত করে ভারতবর্ষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবে, তার ফলে যে কোনো সময়ে গভর্নমেন্টের ভেঙে পড়ার অবস্থা তৈরি হয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে লড়াই এর মধ্যবর্তী সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে রাশিয়ার বিপ্লবের মতো সারা ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান জুড়ে শেষ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটতে পারে। সুতরাং ৪নং চিঠির চিত্র কখনও আন্তর্জাতিক সংগ্রাম থেকে পৃথক করে নিয়ে বুঝতে গেলে চলবে না বা সতত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর একটা স্থির চিত্র হিসাবে ধারণা করে নেওয়া ঠিক হবে না। পৃথিবীর পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে, শক্তিশালী কারণগুলি অবিরাম কাজ করে চলেছে। যেটাকে স্নায়ুযুদ্ধের মতো মনে হচ্ছে সেটা সত্যসত্যই শান্তি বা সন্ধি নয়, একটা ক্ষয়কারী শক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রবাদকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করার উদ্দেশ্যে তার প্রাণশক্তিকে তলায় তলায় ক্ষয় করে ফেলছে। এই অবস্থায় সংঘাত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, একে আমাদের অবশ্যই সচেতনভাবে বাস্তবে পরিণত করতে হবে।

বর্তমান সময়ে বিপ্লবের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে আসার পর আমাদের সামনে যে কাজ আসছে সেটা হচ্ছে গ্রামের কৃষক এবং কারখানা শ্রমিকদের সংগ্রামগুলি সংযুক্ত করার সমস্যা, যাতে তারা একত্রে এমন এক অগ্নি সৃষ্টি করতে পারে যা অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃত আকার ধারণ করতে পারে। যেমন বিভিন্ন দেশের সংগ্রামগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে শক্তিশালী করে আন্তর্জাতিক সংগ্রামের সমগ্র চিত্রকেই পরিবর্তিত করছে, তেমনি ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে কোনো প্রদেশ অথবা জেলার গ্রাম ও কারখানার জনসাধারণের সংগ্রাম ও সংঘাতগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক এবং পরিবর্তনশীল অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য এবং শক্তিশালী করবে আর তার ফলে সেই প্রদেশ অথবা জেলার সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই পরিবর্তন আসবে। এখন তাহলে পার্টির কর্তব্য হচ্ছে সংগ্রামগুলি সংযুক্ত করার সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করা এবং সংগ্রামের পরিকল্পনা এমনভাবে করা প্রয়োজন যাতে জনগণের সংগ্রামগুলি তাড়াতাড়ি সংযুক্ত হয়। সুতরাং শত্রুকে কত জোর আঘাত দেওয়া হলো কেবলমাত্র তা দেখেই আমাদের পরিকল্পনার মূল্য নির্ধারিত হবে না, আমাদের পরিকল্পনার মূল্য নির্ধারিত হবে সেই সংঘাতে কত বেশি জনসাধারণকে বা কত বিচ্ছিন্ন সংগ্রামকে সংযুক্ত করা গেল তার উপর।

সুতরাং প্রথম আঘাতটা একটা দর্শনীয় ঘটনা হলো কি না হলো, তা বিচারের বস্তু নয়। প্রথমেই একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়েই আক্রমণ শুরু হতে পারে আবার পার্টির পরিকল্পনা অনুযায়ী কতকগুলি ছোট ছোট এবং একটার পর একটা স্থানীয় সংঘাত থেকে শুরু হয়ে, সেগুলি সংযুক্ত এবং একত্রিত হয়ে বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়ে সমগ্র এলাকা অধিকার করতে পারে এবং ৪নং চিঠিতে বর্ণিত চিত্র বাস্তবে রূপ নেওয়ার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

নীচে থেকে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা সৃষ্ট দেশের এখানে সেখানে চাষী এবং মজুরের লড়াইগুলিকে আমরা ভুল বলছি কারণ সেগুলি লক্ষ্যহীন ও বিচ্ছিন্ন, নীতি এবং কৌশলের কোনো একটি বিশেষ পন্থা অনুযায়ী নয় এবং সংগ্রামের মার্কসীয় কায়দায় কোন বিভাগের সঙ্গেই তার মিল নেই বলে। তাদের সংগ্রামগুলি তারা সংযুক্ত করে না, তার ফলে জনসাধারণ সংগ্রামে সংগঠিত হয় না, কেবল বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে, তারপর পরাজিত হয়ে জনগণ ভীত

হয়ে পড়ে। স্থানীয় বা অন্য যে কোনো লড়াই-এর মৌলিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হলো জনসাধারণের বৈপ্লবিক ঐক্য এবং সংযোগ তৈরি করা। যদি আমরা এটা ধরেও নিই যে এই সমস্ত মজুর ইউনিয়নগুলি এবং কিষান সভাগুলি ভেঙে যেত, কারণ বৈপ্লবিক কাজে কখনই তারা ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে জনসাধারণ সত্যই লড়াই করছে, অথচ লড়াই-এর সংগঠনগুলি যেমন গণবাহিনী এবং পঞ্চায়েত কিছু করছে না, তখন এটা কি ধরনের বিপ্লব প্রচেষ্টা? এসবের কারণ তাদের পরিকল্পনার শূন্যতা ও লক্ষ্যহীনতা। পরিকল্পনা শূন্যতার জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি নীতি এবং কৌশলের প্রশ্ন চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করে না এবং যেহেতু তারা লক্ষ্যহীন সেইজন্য সংগ্রামী জনতার কাছে রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার তাগিদ অনুভব করেনা। তাই কেবলমাত্র দমদমের পরিকল্পনাই তারা অপছন্দ করে তাই নয়, কোনো পরিকল্পনা এমন কি তাদের নিজেদের এলাকাতে নিজেদের কাজকর্মের একটা সাধারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা তারা পছন্দ করে না। বাস্তব ক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন এবং চিন্তাশূন্যতার পরিচয় তারা যতদিন দিয়ে চলবে ততদিন তারা রাজনীতির দিক থেকে অস্পষ্টতা, লেজুড়বাদ এবং ঘা খেয়ে খেয়ে শেখবার অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ইতি –

১৮/১১/৪৯

অষ্টম চিঠি

মুক্ত অঞ্চলের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং সর্বপ্রথম করণীয় কাজ কি তা আগে থেকেই ভেবে ঠিক করে রাখতে হবে, যাতে তখন গোলমালে অযথা সময় নষ্ট না হয়। জনগণের পঞ্চায়েতী সরকারকে শক্তিশালী করবার জন্য জনসাধারণের সৃষ্টি করবার ক্ষমতাকে তক্ষুনি ঠিকমত ব্যবহার করতে হবে যাতে এক ঘণ্টার স্বাধীনতায় এক বছরের কাজ শেষ হয়। বিপ্লবের সময়কার মানুষ—যারা নিজেদের জীবন এবং রক্ত দিয়ে মুক্ত হয়েছে তারা সাধারণ সময়ের নিষ্প্রাণ এবং নির্জীব মানুষের মতো নয়। ইতিহাসে দেখা গেছে বিপ্লবের সময়েই প্রকাশ পায় মানুষের সবচেয়ে ভালো ভালো গুণগুলি। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং সর্বপ্রথম কাজগুলি নীচে দেওয়া হল।

১। গণবাহিনী— অর্থাৎ জনগণের সৈনিক বা ভারতীয় বিপ্লবের লালফৌজ। যখন আমরা চীন বা বর্মার বিপ্লবের কৌশল অর্থাৎ একটার পর একটা অঞ্চল মুক্ত করতে বাধ্য তখন লালফৌজ আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটাই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার নাও হতে পারে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর লালফৌজ গঠিত হয়েছিল—কিন্তু চীনে লাল ফৌজ গঠিত হওয়ার পর বিপ্লব সাফল্য লাভ করেছিল। চীন সংগ্রামের একটা সময়ে দেখা গিয়েছিল কোনো নির্দিষ্ট এলাকা মুক্ত অঞ্চল নয়, সংগ্রামী জনগণের গতিশীল বাহিনীই একটা মুক্ত অঞ্চল। বিপ্লবের স্থান একটা এলাকার মধ্যে নয়, বিপ্লবের স্থান গণবাহিনীর মধ্যেই। গণবাহিনীর স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত অঞ্চলের স্থানও পরিবর্তিত হয়েছিল, এটা দেখা গেছে তাদের দীর্ঘ অভিযানের সময়। অবশ্য চীন বিপ্লবের ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা আমাদেরও ঘটাতে হবে বা দীর্ঘ অভিযান আমাদেরও একটা করতে হবে এরকম চিন্তা করে অযথা সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। খুব সম্ভবত তাদের মতো আমাদের কোনো রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে না। কিন্তু বিপ্লবে তাদের গণবাহিনী যে সব কাজ করেছে তার থেকেই বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে গণবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু গণবাহিনী গঠন করা আমাদের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেজন্য প্রত্যেক কর্মীকেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও নিজেদের এক একজন সৈনিক হিসাবে তৈরি হতে হবে। আমাদের গণবাহিনী হচ্ছে একটা রাজনৈতিক বাহিনী, বৈপ্লবিক যুদ্ধ পরিচালনা করাই হচ্ছে এই বিপ্লবী বাহিনীর কাজ। সেইজন্য প্রত্যেককেই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান এবং জনগণের যুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ করার স্পৃহা জন্মাতে হবে। যুদ্ধের সমস্ত কৌশল -- প্রতিরোধ, আক্রমণ, সমর সম্ভার সরবরাহ, অগ্রগামী এবং পশ্চাদ্‌ভাগের সৈনিকদের প্রস্তুতি কৌশল, সৈন্যদের প্রস্তুত রাখা এবং জোরদার কৌশল সম্পর্কে এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি এবং মেরামত প্রভৃতি কাজ করা সম্পর্কে প্রত্যেককেই দৈনন্দিন চিন্তার বিষয়বস্তু করে তুলতে হবে। এখন থেকেই কাগজে কলমে যতদূর সম্ভব সকলকেই এই সমস্ত জ্ঞান লাভ করতে হবে, সংঘাত শুরু হলে যাতে তাদের কোনো প্রকার ইতস্তত না করতে হয় এবং সুযোগ পেলে হাতে কলমে শিক্ষা করতে যাতে মুহূর্তমাত্র সময়ও নষ্ট না হয়।

এই বিপ্লবে যেহেতু গণবাহিনী আসল শক্তি সেজন্য তার গঠনে এবং সংগঠনে বিপ্লবের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া চাই অর্থাৎ শ্রমিক, ভূমিহীন চাষী ও গরিব চাষীদের সংখ্যায় এবং নেতৃত্বে আধিপত্য রেখে, মধ্যবিত্ত চাষীদের পিছনে অথবা নিরপেক্ষ রেখে, শোষিত জনগণের ঐক্য বজায় রাখতে হবে। গণবাহিনীর এই শ্রেণী বৈশিষ্ট্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক মতবাদের বৈশিষ্ট্য রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই জন্য গণবাহিনীর উচ্চতম থেকে নিম্নতম প্রত্যেকটি বিভাগ পার্টির সবচেয়ে উপযুক্ত কর্মীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত রাজনৈতিক অফিসার দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার।

মুক্ত এলাকার সৈন্য এবং গেরিলা বাহিনীর শিক্ষা দেবার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যে স্থান প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক থেকে দুর্ভেদ্য এবং প্রতিরোধের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়, যাতে অত্যন্ত কম বাধাপ্রাপ্ত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষা দেওয়া যায়। বিদ্রোহী জনতার প্রথম আক্রমণের প্রাথমিক জয় এবং তার ফলে শত্রুর মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেওয়ার জন্য আমরা বিদ্রোহী জনতার অন্তরালে আমাদের সৈন্যবাহিনী বিরাট ভাবে গঠন করতে, তাদের আধুনিক যুদ্ধ কৌশলে শিক্ষিত এবং প্রস্তুত করে নিতে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ পেয়ে যাব। গণবাহিনী গঠিত হওয়ার পর তারাই জনসাধারণকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে।

২। পঞ্চায়েত ও জনগণের রাষ্ট্র—মুক্ত অঞ্চলের স্থানীয় ছোট ছোট এলাকার এবং সমগ্র এলাকার প্রধান ও আইনসঙ্গত শক্তি। এর আইন সভা, পরিচালক সমিতি এবং বিচার বিভাগ থাকবে। বহুদিন ধরে পার্টির মধ্যে এই সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে, সেই জন্য এখন আর এটা নিয়ে সময় নষ্ট করব না। পঞ্চায়েতেও গঠন, সংগঠন এবং নেতৃত্বে গণবাহিনীর মতো শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য থাকবে। এখানেও সমস্ত বিভাগেই পার্টি নির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৩। গণ-আদালত- বিপ্লবের একটা প্রয়োজনীয় কার্য বিভাগ। এর কাজ হচ্ছে নতুন বৈপ্লবিক আইন প্রতিষ্ঠা করা জনগণের শত্রুদের ধ্বংস করা, জনসাধারণের আইন রক্ষা করা, শক্তির অপব্যবহার বন্ধ করা এবং সুবিধাবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেওয়া। ছোট ছোট গণ-আদালতগুলি এবং তাদের উচ্চতম আদালতের পরিচালনা বা নিয়মকানুন হবে বিপ্লবের মতবাদের সঙ্গে মিল রেখে বিভিন্ন বৈপ্লবিক আইনের উপর ভিত্তি করে। পার্টির নির্দেশে গণবাহিনীর দ্বারা স্বীকৃত হয়ে পঞ্চায়েতের দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে এই আইনগুলি তৈরি হবে। এই গণ আদালতগুলি হবে প্রকাশ্য বিচারশালা, প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ এতে অংশ গ্রহণ

করতে পারবে। বিপ্লব যতই শ্রম বিভাগ এবং কার্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে আদালতের কাজও অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী বিচারক দ্বারা চালিত একটি কাজে পরিণত হবে। জনতার মধ্যে উৎসাহ এবং ভুল বোঝা এড়ানোর জন্য প্রথম দিকে জনতার সামনে এবং তাদের দ্বারাই সমস্ত বিচার হওয়া উচিত।

৪। গণ সম্ভার পরিষদ— মুক্ত অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে এর একটি এবং সমগ্র এলাকায় উচ্চতম গণসম্ভার পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন। কৃষি কাজের জন্য জমির পুনর্বণ্টন করা, জনসাধারণ এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বণ্টন করা, মুক্ত অঞ্চলের বাইরে থেকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব মোচন করা, সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা, স্কুল কারখানা ইত্যাদি তৈরি করা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা শিল্পোন্নতি যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করা, বাজার ব্যাংক ও মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করা খাটিয়ে লোকদের জীবিকা নির্ধারণ করা প্রভৃতি কাজগুলি হচ্ছে পরিষদের কর্তব্য। এইটাই সম্ভবত বিপ্লবের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ, এর জন্য পার্টি নেতৃত্বের সঠিক বাস্তব জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন এই কাজগুলি সহজসাধ্য নয় সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা যায় না। বিপ্লবের বিস্তৃতি এবং শক্তি বৃদ্ধির ওপরই এগুলির সন্তোষজনক সমাধান নির্ভর করছে।

৫। গণশিক্ষা পরিষদ স্থানীয় ছোট এলাকায় এবং সমগ্র এলাকায় জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রচার, প্রেস, প্রচার কেন্দ্র শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উপযুক্ত শিক্ষা ও মার্কস লেনিনের শিক্ষার প্রচার করা স্কুল সমূহের বন্দোবস্ত নির্ধারণ করা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ করা, সমগ্র জনতার কাছে রাষ্ট্রের খবরগুলি বিশ্লেষণ করা, রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্ষেত্রে জনগণের বক্তব্য এবং গণতন্ত্রকে উৎসাহ দেওয়া, জনতার মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, জনসাধারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্যক্ষমতাকে উৎসাহিত করা, সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ও যৌথ কাজের ইচ্ছাকে বর্ধিত করা, নালফৌজের সঠিক শ্রেণী সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও সুদৃঢ় করা ইত্যাদি কাজগুলি হচ্ছে এই পরিষদের।

মুক্ত অবস্থায় পার্টিকেই পুনঃসংগঠিত করে দেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য নতুন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত সংগঠনকেই রদবদল করা চাই। দোদুল্যমান ব্যক্তিদের বিতাড়িত করে পার্টিকে জনগণের ওপর দাঁড় করাতে হবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। পার্টি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে কর্মীদের সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

মুক্ত অঞ্চলের বাইরে বিশেষ করে চতুর্দিকে এবং সাধারণভাবে সমস্ত প্রদেশ পার্টিকে পার্টির কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য পার্টি সভ্যদের নিয়ে একটা বিপ্লবী পরিষদ গঠন করতে হবে। মুক্ত অঞ্চলের মধ্যে এই কাজের জন্য কর্মীদের তৈরি করে প্রচুর সংখ্যায় শত্রু এলাকার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া শত্রুর অবস্থা জানবার উদ্দেশ্যে, শত্রু এলাকায় কাজ করবার জন্য গেরিলা বাহিনীদের শিক্ষিত করা, বাইরের কাজের জন্য বই, প্রচার পত্র এবং অন্যান্য সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা, বিপ্লবী পলাতকদের জন্য আশ্রয়স্থল ঠিক করা, বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখা ইত্যাদি কাজগুলি সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবের সাধারণ প্রস্তুতিতে মুক্ত অঞ্চলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব।

মুক্ত অঞ্চলের দায়িত্ব সম্পর্কে ওপরে যে চিত্র দেওয়া হলো তা মোটেই সর্বসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন দেশের বিপ্লব থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে নজর রেখে

নিজেদের কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কমরেডদের যতদূর সম্ভব বুদ্ধি খাটিয়ে দায়িত্ব ঠিক করে নিতে হবে। আজকের এই দায়িত্বকে দূর ভবিষ্যৎ ভাবলে এবং আলোচনা করলেই চলবে একথা কেউ যেন না ভাবেন, তাহলে বিপ্লবটাই এখনকার না হয়ে দূর ভবিষ্যতের কাজ হয়ে পড়বে। কেউ যদি এই দায়িত্বগুলি সম্পর্কে স্থিবভাবে চিন্তা করেন তাহলে আজই এগুলিব গোড়াপত্তন কবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন এবং বিপ্লব যতই এগিয়ে আসবে এগুলিব প্রয়োজনীযতা অবশ্যম্ভাবী মনে হবে। উপবে যে সমস্ত কাজগুলিব কথা বলা হলো, আমাদেব বর্তমানেব কাজ তাব উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের সমস্ত প্রস্তুতির সাথে এগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে, কারণ বিপ্লব শূন্য থেকে কিংবা আকাশ থেকে হঠাৎ আবির্ভাব হয় না ধ্বংসোন্মুখ সমাজের গর্ভে এর বীজ ভেতর থেকে জন্মগ্রহণ করে এবং বহুদিন ধরে বর্ধিত হয়ে থাকে। ইতি ---

১৯/১১/৪৯

নবম চিঠি

ইতিপূর্বে আমবা বলেছি আঞ্চলিক স্বাধীনতার রূপে বিপ্লবেব শক্তি নির্ভর করছে জনতার সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র প্রতিরোধেব উপর। মুক্ত অঞ্চলেব ভিতর থেকে দিতে হবে সশস্ত্র এবং বাইরে প্রদেশব্যাপী ও সমগ্র দেশব্যাপী দিতে হবে নিবস্ত্র প্রতিরোধ। আমরা এখন নিরস্ত্র প্রতিরোধের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব, জনতার মধ্যে এই প্রতিরোধশক্তি কতটা এবং কিভাবে জন্মানো যায় সেইটেই আলোচ্য বস্তু। আগেকার চিঠিতে মুক্ত অঞ্চলের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এই চিঠিতে চারদিকেব অমুক্ত অঞ্চলের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা কবা প্রয়োজন।

আমবা বলেছি মুক্ত অঞ্চলেব কাজ আমাদের সংঘাতেব প্রধান দায়িত্ব এবং অমুক্ত অঞ্চলের কর্মীবা বাইরে থেকে যে কোনো উপায়ে সম্ভব মুক্ত অঞ্চলের রক্ষাকাজে নিযুক্ত থাকবে। তাই বলে এটা মনে করলে চলবে না যে তাদের কাজ অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় এবং কেবলমাত্র মুক্ত অঞ্চলকে সাহায্য কবাই তাদেব কাজ। কাজ হিসাবে ভিতরকার কাজকে প্রথম এবং বাইরের কাজকে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে তাব মূল্য অপেক্ষাকৃত কম মনে করলে সমস্ত অবস্থাটারই ভুল বিচার করা হবে। বাইরের কাজটা কিছুতেই কম প্রয়োজনীয় হতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে দুটোই সমান প্রয়োজনীয একই কাজের অর্থাৎ বিপ্লবের এক একটি অংশ। মুক্ত অঞ্চলের ভিত্তি যত দৃঢ় হবে, ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পাবে এবং প্রযোজনীয় সামগ্রীর দিক থেকে যত শক্তিশালী হবে বাইরে আমাদের কাজ ততই জোরদার হবে। আগেকার চিঠিতে আমরা আলোচনা করেছি কি ভাবে বাইরের কাজের জন্য ভিতর থেকে গেরিলা বাহিনীকে শিক্ষিত এবং অস্ত্রসজ্জিত করা যেতে পারে এবং কিভাবে এই সব সৈনিকেব সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা যেতে পাবে। এই ভাবে যেমন বাইরের কাজকে মুক্ত অঞ্চল নানা ভাবে সাহায্য কবতে পারে, তেমনি মুক্ত অঞ্চলও নিজেদেব প্রতিরোধ এবং আক্রমণেব কাজে বাইরে থেকে বহু সাহায্য পেতে পারে। সুতরাং দু'টি অঞ্চলই একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল এবং দু'টোবই প্রয়োজনীযতা সমান।

নিরস্ত্র প্রতিরোধেব গণশক্তিকে সমবেত কবার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি ফৌজের আক্রমণেব পক্ষে ক্ষেত্র প্রস্তুত কবা। এটা করা যেতে পারে প্রথমত শত্রু সৈন্যের কাজকর্ম জনতার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে অচল অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকাবের বিরুদ্ধে অসহযোগ করে, প্রথম থেকে শস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে এবং ধর্মঘট প্রভৃতির সাহায্যে।

দ্বিতীয়ত শত্রুকে বিপর্যস্ত করবার কাজে নিযুক্ত গেরিলাদের সঙ্গে আরও বিশেষভাবে সহযোগিতা করে, আশ্রয়, খাদ্য প্রভৃতি দিয়ে এবং মুক্ত অঞ্চলে তাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সররবাহ করে। তা ছাড়া অবস্থা সুবিধাজনক হলেই জনতাকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ছেড়ে তাড়াতাড়ি সক্রিয় হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে অর্থাৎ নিরস্ত্র অসহযোগিতা থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে দেওয়ার জন্য। এই ভাবে যত শীঘ্র সম্ভব সমগ্র দেশ জুড়ে অভ্যুত্থান সৃষ্টির চেষ্টা সব সময়েই থাকা চাই।

বিশেষ করে আমাদের দেশে আগ্নেয় অস্ত্রের অভাব অত্যন্ত বেশি সেইজন্য এখানে নিরস্ত্র প্রতিরোধ কৌশল সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। অতীতে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামে জনসাধারণ যতরকমের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগী কৌশলের সঙ্গে পরিচিত ছিল সেগুলিকে আরও উন্নত করে পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। সেই সমস্ত কৌশলে গান্ধীবাদের গন্ধ আছে অতএব সেগুলি প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংস্কারপন্থী এধরনের অবৈপ্লবিক আপত্তি কারো কারো আছে। এ রকমের ধারণা থাকা অত্যন্ত বোকামী। যদি মার্কসবাদে ধর্মঘট ব্যবহার হতে পারে তবে কেবলমাত্র গান্ধী ব্যবহার করতেন বলেই অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ অ মার্কসীয় এই ভেবে এই কৌশলগুলি ত্যাগ করবার কোনো অর্থই হয় না। তা ছাড়া সশস্ত্র সংগ্রাম সংস্কার পন্থায় এবং সহযোগিতায় পর্যবসিত হতে পারে। সহযোগিতার মূল কৌশলগুলির মধ্যে এটা নিহিত নয়, এটা নিহিত আছে আন্দোলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে এবং সংগ্রামী পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে সংগ্রামটা সহযোগিতায় না বিপ্লবে পর্যবসিত হবে তার সূত্র খুঁজে বের করে নিতে হবে। সাধারণ ধর্মঘট এবং শত্রুর রাষ্ট্র অস্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলির ব্যবহারকে বাদ দিলে এমনি কোনো পার্থক্যই নেই। বিশেষ করে সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে বন্ধুত্বভাব দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে টেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কৌশলপূর্ণ সত্যাগ্রহ এবং জনতার আবেগকে বর্ধিত করবার প্রয়োজনে শান্তিপূর্ণ অথচ সুদৃঢ় শোভাযাত্রার যে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে তাকে তুচ্ছ করা যায় না। এমন কি একাকী নিরস্ত্র অথচ সুদৃঢ় হয়ে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার সাহসকে উৎসাহিত করবার প্রয়োজন আছে কারণ সম্পূর্ণ সংগ্রাম-বিমুখী মানুষের ক্রোধ এবং বেপরোয়া ভাবকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য এটা একটা মানসিক আবেদন। অল্প কিছুকাল আগেও ভারতবর্ষেই এই সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এগুলিকে তুচ্ছ মনে করে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, অহিংস প্রতিরোধ এবং আত্মত্যাগের এই ধরনের ঘটনাসমূহ ঘৃণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে এত বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি করে যে তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে আঘাত করবার স্পৃহা অত্যন্ত চরমে উঠে যায়, তখন সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান দিলে জনসাধারণের কোনো অংশই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে শত্রুকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত এবং পরাজিত করা যেতে পারে। কথাটা হচ্ছে এই যে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে শত্রুর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে তীব্র ঘৃণা জন্মানো প্রয়োজন, বুদ্ধিমানের মতো কতকগুলি সত্যাগ্রহ কৌশলে ব্যবহারের দ্বারাও এটা জন্মানো কিংবা ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। শত্রুকে সব সময়েই সবদিক থেকে বে-কায়দায় ফেলে রাখতে হবে। তার সমস্ত বর্বরতা, নৃশংসতা, স্বার্থপরতা এবং বীভৎসতা খুলে ধরতে হবে, যাতে তার গর্ব করবার কিছুই না থাকে।

গভর্নমেন্টের দুঃসহ অবিচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করা, শত্রুকে সাহায্য না করা ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা, ভুখা অভিযান এবং শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ প্রভৃতিও আমরা করব। এগুলিকে কার্যতালিকা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দেব না,

বিপ্লব এই রাস্তা দিয়েও আরম্ভ করা যেতে পারে যদি পিছনে একটা ব্যাপক পরিকল্পনা থাকে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সশস্ত্র লড়াইয়ের উপযুক্ত প্রস্তুতি থাকে। অহিংস এবং সহিংস এ দু'টি লড়াইকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করে রাখলে চলবে না--অবস্থার পরিবর্তনে একটিকে ছেড়ে অন্যটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আসবে এবং জনতার মনোভাব স্থানীয় নেতৃত্বের সতর্কতা এবং বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে। তা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারের সময় এবং কায়দা সম্পর্কে সংগ্রামী জনতার প্রতি আমাদের একটা সাধারণ নির্দেশ থাকা চাই যাতে কোনো একটি অঞ্চলব্যাপী অথবা নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে একই সময়ে সর্বত্র কমবেশি সেটা ব্যবহার হতে পারে।

অহিংস এবং সহিংস প্রতিরোধ ব্যবহারের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেকের জ্ঞান পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যাতে কেউ দু'টির ব্যবহারে গোলমাল না করে ফেলে, অর্থাৎ যখন একটির প্রয়োজন তখন অন্যটির না ব্যবহার করে ফেলে। নেতৃত্ব যখন কোনো শোভাযাত্রাকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তিপূর্ণ রাখতে চাইছে তখন কারো সেটাকে সহিংস করা উচিত নয়, তাহলে শত্রুর ফাঁদেই পড়তে হবে। সহিংস সংগ্রামের নিয়ম না মেনে সহিংস হওয়া তার ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিচয়। সুসম্পন্ন জয়লাভের জন্যই সর্বদা চেষ্টা করা উচিত—শত্রুকে কেবলমাত্র চিমটি কাটার উদ্দেশ্যে নয়। প্রায়ই নেতাদের অথবা সংগঠকদের অজ্ঞাতে কতকগুলি মাথাগরম ব্যক্তির দায়িত্বজ্ঞানশূন্য কার্যকলাপের ফলে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাকে পুলিসের বর্বরতার সম্মুখে ফেলে দেওয়া হয় সর্বাগ্রে শত্রুর প্রতি পাথর কিংবা বোমা নিক্ষেপ করা কিংবা ব্যবহার করার অনিচ্ছা নিয়ে ডাণ্ডা দেখানো সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যবহারিক কৌশল নয়। বুদ্ধির অভাব থাকলে বিপ্লবীর অগ্রসর হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সশস্ত্র সংগ্রামের ইচ্ছা থাকলে অর্থাৎ তা নেতৃত্বের দ্বারা স্বীকৃত হলে জনতার হাতের লাঠি, পাথর ও বোমা তুমুল কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে, অবশ্য যদি তার সঙ্গে থাকে একটা পরিকল্পনা, কিছু আগ্নেয় অস্ত্র এবং দৃঢ়নেতৃত্ব।

প্রত্যেকটি গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনতার চিন্তা এবং সাহসকে প্রবলভাবে নাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ জনতার আসল শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা বৃদ্ধি করার জন্য গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্তমান সমাজের অক্ষমতা ও অবজ্ঞা জনসাধারণের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থাকে জনতার সামনে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতেই হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের গঠনমূলক লক্ষ্য দেশ এবং পৃথিবীর ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সমগ্র চিত্র ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সামনে পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কোনো লজ্জা কোনো ভীরুতা এবং বক্তব্য প্রকাশের কোনো দুর্বলতা চলবে না। বক্তব্য হওয়া চাই দুরন্ত সাহসপূর্ণ, দুরন্ত আবেগপূর্ণ অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্ণ। তা ছাড়া জনতার বক্ষে লুক্কায়িত আবেগের আগ্নেয়গিরিকে স্পর্শ করা যাবে না এবং গণ উদ্দীপনার যাদু যেটা সমস্ত বিপ্লবের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাকে প্রেরণা দেওয়া যাবে না। কিন্তু একবার যদি জনতার মধ্যে বৈপ্লবিক উদ্দীপনা জাগে তাহলে তাদের সুকঠিন হস্তচালনার এক ধাক্কায় পর্বতপ্রমাণ বাধা ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। ইতি--

২০, ১১/৪৯

দশম চিঠি

দলের কর্মীদের কাছে উপস্থিত হতে পারি না বলে আমি খুব দুঃখিত থাকি। ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছিটকে পড়ে গিয়ে কর্মীরা নিজ নিজ বুদ্ধি ও দায়িত্ব অনুযায়ী এ কয়টি দীর্ঘমাস চালিয়েছেন, কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে আশ্রয়হীন, অর্থহীন অবস্থায়, আজ আবার ধীরে ধীরে

আমাদের পুনর্গঠন করতে হলে আজ যাদের বিশেষ দরকার সেই সব অভিজ্ঞ কর্মীরা আজ প্রায়ই জেলে—যারা দু'একজন আছেন তাদের চলাফেরা এত সঙ্কুচিত করতে হয়েছে তাদের দিয়ে সবকাজ সর্বত্র ও সুচারুরূপে হওয়া সম্ভব নয়। অতএব নতুন নতুন অনভিজ্ঞ কমরেডদের নিজেদের উৎসাহ ও উদ্যোগই আজ প্রধান ভরসা, তাদেরকেই অগ্রণী হয়ে দল পুনর্গঠন করতে হবে, ভুল একটু আধটু হতে পারে কিন্তু সজাগ দৃষ্টি ও শেখবার মনোভাব থাকলে সে ভুল সামলে নিতে কোনো কষ্ট হবে না।

এই সব সাধারণ নবাগত কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষা, দলগঠন, সংগ্রাম বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার কাজটা যদি আমাকে দিয়ে করা সম্ভব হতো তবে তার চেয়ে আনন্দের কাজ আমার পক্ষে আর কিছুই হতো না। কিন্তু সাক্ষাতে পরস্পর মুখোমুখি বসে আজ আমার কোনো কিছু করতে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার বিচার অনুযায়ী আমি কতকগুলি বিষয় পত্রকারে সবই উল্লেখ করে লিখব আপনারা তা মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, আলোচনা করবেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বিচারশক্তি দিয়ে মিলিয়ে দেখবেন, এর দ্বারা অনেকটা কাজ হতে পারে। কর্মীদের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা থাকলে আমার কাছে থেকে উত্তর পাওয়া সম্ভব, আশা করি উৎসাহী কর্মীরা এই সুযোগ নেবেন। চারদিক থেকে আমাদের মুছে ফেলার জন্য সরকার যে দুর্দান্ত চেষ্টা করে চলেছে তাকে ব্যর্থ করতে হলে আমাদের প্রত্যেককে সামান্যতম সুযোগটাকেও অবহেলা করলে চলবে না, তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই বৃহত্তম সুযোগ চারদিক থেকে আমাদের জন্য খুলে যাবে একদিন। রাজনৈতিক জীবনের এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, এই দুর্যোগের দিনেই আমরা শক্ত হব এবং এই দুর্যোগের মধ্যে আমাদের ব্যবহার কি রকম এবং আমরা টিকতে পারি কিনা অথবা পালাই কিনা এ না দেখে জনতা ভীড় করে আমাদের পতাকাতলে আসবে না। অতএব বন্ধুগণ এই অজ্ঞাতবাসের দিনগুলিকে অবহেলার বস্তু বলে মনে করবেন না। সত্যিকার কথা এই যে এটা অজ্ঞাতবাস নয়, কোনো রকমে পালিয়ে থাকার কোনো সার্থকতা নেই—আসলে এখনো আমাদের কাজ তেমনই রয়েছে এবং থাকতে হবে। পুলিশের কাছে গোপন থাকলেও জনতার কাছে অজ্ঞাত থাকার কথা নয় বরং তাদের খুব নিকটে গিয়ে আমাদের কাজ দেখাতে হবে। তারপর একদিন জনতা সঙ্কোচ, ভয় ও সংস্কার ত্যাগ করে আমাদের পথকেই সত্য বলে জানবে এবং আমাদের দলকেই শক্তিমান করতে লাখে লাখে এগিয়ে আসবে। অতএব ঘুমিয়ে বসে এই দিন কয়টি কাটিয়ে দিলে আমাদের সে পরিচয় ও যোগ্যতা জনতার কাছে পরিষ্কার হবে না। একটি কর্মী কেমন করে এই সরকারি প্রতি আক্রমণের দিন কয়েকটি কাটিয়েছিল সে কথা শুধু কথা দিয়ে চাপা দেওয়া সম্ভব হবে না, তার চোখে মুখে ব্যবহারে তা ফুটে বেরবেই। তাছাড়া আগামী আক্রমণের প্রস্তুতি এরই মধ্য দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। অবস্থা যত কঠিনই হোক, অর্থ যত কমই থাকুক এখানে বুদ্ধির লড়াই, যোগ্যতার লড়াই, আন্তরিকতা ও সাহসের দরকার এবং এ যদি আমরা না দেখাতে পারি তবে জনতা কেন আমাদের ডাকে আসবে? আমরা দুর্বল বলে তারা কেউ আসে না, আমাদের বল দেখেই তারা বলীয়ান বোধ করে এবং এখানে বল মানে শুধু আমাদের পথের নির্ভুলতাই নয়, আমাদের চরিত্রের বল, উদ্দেশ্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাকে জানায়। দীর্ঘকাল ধরে যে জাত পচে পচে ক্ষয়ে যাচ্ছিল, হাজার বছরের মধ্যেও যার কোনো বিরাট বৈপ্লবিক ঐতিহ্য নেই সেই হতভাগা দেশের আমরা সন্তান। এই দেশে কেবল মাত্র একটি নির্ভুল মতবাদ কাগজে ছেপে দিলেই যথেষ্ট নয়—সেই মতবাদকে রক্ত দিয়ে ত্যাগ দিয়ে জীবন্ত করতে হবে, দেশে নির্ভীকতা, দুর্জয় সাহস, সত্যনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সৃষ্টি

করতে হবে—তা না হলে নির্ভুল মতবাদকে গ্রহণ করার মতো সাধ্যে কুলাবে না। শক্তি না থাকলে সত্যকে গ্রহণ করা যায় না। এই সত্য ও শক্তির পথিক হিসাবে ইতিমধ্যেই আমাদের বীর কর্মীরা ও শহীদেরা দেশবাসীর কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুধু অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে নিরস্ত্র করতে এগিয়ে যায়নি, নিরস্ত্র বীর শুধু হাতেও শত্রুর রাইফেল ছিনিয়ে নিতে দুর্জয় সাহস দেখিয়েছে, জেল টপকে বেরিয়ে এসেছে, আরো কত কি বিস্ময়কর সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছে যা আজ জনসাধারণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে, অগোচরে ও অজ্ঞাতে নিজেরাও এগিয়ে চলেছে এবং এখানে সেখানে বীরত্বের পরিচয় দিতে শুরু করেছে। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা শক্তিকে আবিষ্কার করতে চলেছি। শত্রুরা অ্যাটম বোমা আবিষ্কার করতে ব্যস্ত কিন্তু ভয়ে, কিন্তু আমরা তার চেয়েও শক্তিমান এক চিরকালের অস্ত্র পুনরাবিষ্কৃত করতে চলেছি, সে হলো সাহস। এই সাহস ভয়ের যে কোনো অস্ত্রকে পরাজিত করতে পারবে এবং আমাদের সাহস কোনকালে ফুরোতে পারবে না যেহেতু সত্য আমাদের।

অতীতে আমাদের কর্মীরা কি করেছেন, আমাদের কি দিয়ে গেছেন তা যদি আমরা বুঝি তবে পাথেয় আমাদের কোনোকালে ফুরোবে না। কিন্তু আমরা যা করেছি তাই বসে বসে ভাঙিয়ে খেলে চলবে না, আমরা যা করতে চলেছি তার তুলনায় আমাদের অতীত ম্লান হয়ে যাবে এমনি হবে আমাদের প্রতিজ্ঞা, শত্রুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আগামীতে আমরা আরো এমন কিছু করতে চলেছি যাতে তাদের বিস্ময়ের সীমা কখনো শেষ হবে না—চীনে বিপ্লব শেষ হতে চলেছে, বর্মায় বিপ্লব এসেছে, তিব্বতে এসেছে, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ায় বিপ্লব চলেছে, অতএব আর কি--আমাদের বিপ্লব হলো আর কি —এমনি ধরনের সস্তা হিসেব যেন কেউ না করেন। বিশ্ববিপ্লব শুরু হয়েছে, অনেক জায়গায় বিপ্লব জয়ী হতে চলেছে, এ সবই ঠিক কিন্তু আমরা দুর্ভাগারা যারা পিছনে পড়ে যাচ্ছি তাদের মার খেতে হবে বেশি, পৃথিবীর ধনতন্ত্রীরা সমস্ত এশিয়া থেকে মার খেয়ে পালিয়ে এসে ভারতবাসীর উপর নির্মম অত্যাচার করবে, সমস্ত ঝাল আমাদের উপর দিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে। আজ এখানকার অনেক ধর্মঘটকে সরকার নিষ্ঠুর হাতে দমন করেছে এই অপরাধে যে চীনে বিপ্লব হচ্ছে। অতএব কমরেডস্ তীব্রতম সংগ্রামের জন্য তৈরি হোন, কোন সহজ মোহ যেন না থাকে, কোমর কষে দাঁড়ান, একটুকু বেহুঁশিয়ারী হলে চলবে না, সংগ্রাম আমাদের চীনের মতো দীর্ঘস্থায়ী হবে না, সংগ্রাম একবার ভালভাবে লাগার পর শীঘ্রই শেষ হবে কেননা পৃথিবীর ও ভারতের ধনতন্ত্রের আর্থিক বুনিয়াদ আজ প্রায় নিঃশেষিত, কিন্তু যে একটি দিন লড়াই হবে তা হবে খুব তীব্র, ক্ষমাহীন ও নিষ্ঠুর। তার নমুনা সরকারের বীভৎস ও নির্লজ্জ বর্বরতা থেকে বুঝতে পারছেন—বুঝতে পারছেন কয়েদীদের বন্ধ গাড়ির মধ্যে পুরে বেপরোয়া ভাবে গুলি করে মারার উদাহরণ থেকে। অতএব কঠিন হোন, নির্মম আঘাত দেবার ও পাবার জন্য প্রস্তুত হোন, কোনো রকম নমনীয়তার কোমলতার দুর্বলতার স্থান নেই আজ, নির্মম আঘাত হানতে হবে, ক্ষমাহীন আঘাত হানতে হবে, শত্রুর শেষ করতে হবে এর মধ্যে কোনো প্রকার ইতস্ততার স্থান নেই, সর্বপ্রকার দ্বিধা ত্যাগ করুন। এই একটি ছাড়া দুইটি চিন্তা যেন আমাদের মাথায় না থাকে, সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি, সাহস, ধ্যান, জ্ঞান একাগ্র করে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হোন, বেপরোয়া লড়াইয়ের জন্য তৈরি হোন। পুলিশ ও সরকার আমাদের এই জন্যই বেশি ভয় করে যে এদের এত বেপরোয়া সাহস যে এদের কোনো লাভ-লোকসান জ্ঞান নেই—যে কোনো কাজ করতে এগিয়ে যেতে পারে।

সত্যিই তাই—আমরা আমাদের এই "কাণ্ডজ্ঞানহীন" সাহসের জন্য লজ্জিত নই, কেননা আমাদের 'কাণ্ডজ্ঞান লাভ-লোকসানে'র হিসাব ও মানদণ্ড ইতিহাস ও সমগ্র মনুষ্যজাতির

ভবিষ্যৎ দিয়ে তৈরি—ক্ষুদ্রতা ও মেকী বিপ্লবীর হিসেব এ নয়—বেনিয়া স্বার্থবাদ এই সাহসের হিসেব করতে পারে না।

আরো সাহস, আরো সাহস চাই (Audacity, more audacity, still more audacity), সকল গুণের রাজা গুণ হল সাহস—চিন্তার সাহস, কল্পনার সাহস, সংগ্রামের সাহস—একমাত্র সাহসী লোকেরাই সত্য পথ আবিষ্কার করতে পারে।

ভয় যেখানে ব্যাধি সাহস সেখানে একমাত্র ঔষধ- অন্য চালাকি নয়। ইতি—

৯/১/৫০

একাদশ চিঠি

দশম চিঠিতে কমরেডদের মনে একটা ধারণা হওয়া স্বভাবিক যে আমরা আজ এক রণক্ষেত্রের মধ্যে চলে এসেছি—যেখানে মারা অথবা মরা ছাড়া বুঝি আর কোনো দৃশ্য নেই। অবশ্য একথা সত্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন এসেছি তখন সকল সংগ্রামের মত আমাদের এই সংগ্রামেও রয়েছে ক্ষমাহীন আঘাত ও প্রত্যাঘাত, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা , কিন্তু এ যুদ্ধ নয়—এ হলো বৈপ্লবিক যুদ্ধ। বিপ্লব ও যুদ্ধ এক বস্তু নয়। বিপ্লব যেখানে (যেমন চীনদেশে) মুক্তি ফৌজের সাহায্যে এগিয়ে চলেছে সেখানেও মুক্তি ফৌজের বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র যুদ্ধশাস্ত্র দিয়ে বোঝা যায় না। বিপ্লব ও যুদ্ধ এক বস্তু নয় -যদিও বিপ্লবের মধ্যে যুদ্ধ আছে ও থাকবে।

বিপ্লব কি? আপনারা বহুবার শুনেছেন যে আমাদের লক্ষ্য হলো সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মূলে রয়েছে কি? সমাজের উৎপাদিকা শক্তির মুক্তি, ব্যক্তিগত ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির বন্ধন থেকে মুক্তি। তার রাজনৈতিক চেহারাটি কি? শাসন ব্যবস্থা ও ক্ষমতা ধনীদের হাত থেকে শ্রমজীবীদের হাতে চলে আসা। এবং তার লক্ষ্য কি? শ্রেণীহীন এক পৃথিবীতে একটি সাম্যসমাজ তৈরি করা। কিন্তু তার উপায় কি? বিপ্লব। আবার কেউ কেউ বলেন এই যে সমাজের আমূল পরিবর্তন এটাই হলো বিপ্লব। কিন্তু সে বিপ্লবকে আনবার উপায় কি? সেও বিপ্লব। অর্থাৎ বিপ্লব একসাথে উপায় ও লক্ষ্য। অতএব বিপ্লব যদি কায়েম করতে চাই, সমাজে বিপ্লবকে যদি দীর্ঘজীবী করবার জন্য ধ্বনি তুলি—তবে সেই বহুজনকাম্য বিপ্লব শুধু কেবল মাত্র একটা ভয়াবহ, নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডই হতে পারে না, তবে সে বিপ্লব মানুষের বুকে অভয় বাণী তুলতে পারে না। বিপ্লব যদি বীভৎস হতো তবে বিপ্লবকে কায়েম করবার জন্য কোনো ডাক দেওয়া সম্ভব হতো না। কোনো এক বস্তুর হুবহু তুলনা অন্য বস্তু দিয়ে করা যায় না। কেবল ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র, নইলে মার্কস যখন বিপ্লবকে বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন বিপ্লব হল ইতিহাসের ধাই, নূতন সমাজের নব জন্মের ধাত্রী, এখন ভেবে দেখুন, তিনি কিন্তু এমন কোনো তুলনা দিতে যান নি যে বিপ্লব হোল অস্ত্রোপচারের জন্য এক সার্জন। বিপ্লব অস্ত্রোপচার নয়—নবজন্ম।

নূতন সমাজের নূতন মানুষের জন্মের এই বিরাট ঘটনার মধ্যে বেদনার কথাটাই বড় নয়- নবজন্মের সৃষ্টি চেতনার কথাটাই বড়।

বিপ্লব শত্রুদের প্রাণে তুলেছে আতঙ্ক ও ভয়—কিন্তু জনতার বুকে জাগাচ্ছে নির্ভীকতা ও অভয়। মানুষের যে ভবিষ্যৎ আছে সেই অভয় বাণী এনেছে বিপ্লব এবং তাকে বহন করবার যে শক্তি তাও এনেছে বিপ্লব। জনতার বুকে যে বেদনা এনেছে তার কারণ জনতাকে মুক্ত হতে হবে—ধনতান্ত্রিক মোহমুক্ত হতে হবে—স্বার্থ সম্পত্তিজাত আবেগ থেকে মুক্ত হতে হবে,

কূপমণ্ডুকতার আসক্তি থেকে ছিন্ন হতে হবে, যেমন নবজাত শিশুকে মুক্ত করতে হয় মায়ের সঙ্গে নাড়ির সূত্রটাকে ছিন্ন করে। সেই আসক্তি, অভ্যাস ও মোহ থেকে ছিন্ন হতে গিয়ে যে বেদনা ওঠে মানুষের বুকে অন্ধ আবেশে, সে বেদনা তাকে পেতেই হবে--কিন্তু তাতে ভয় নেই, তা অসহ্য নয়, মারাত্মকও নয়। বিপ্লবে সকল মানুষের বুকে নবজন্মের নূতন সৃষ্টির বাণী এমন প্লাবনের মতো চলে আসে যে শুষ্ক প্রাণ নদীনালা পুকুরগুলির নিজেদের সামান্য জলসম্পদের জন্য কোনো মোহ ও দুঃশ্চিন্তা রাখে না কেননা প্লাবন সকলেরই বুক ভরে দিয়ে যাবে। শুষ্কপ্রাণ নদীনালাগুলি যেমন তাদের সামান্য জলটুকু প্লাবনকে উপহার দিয়ে নিজেদের ধন্য করে নেয়, পূর্ণ করে নেয়—তেমনি ক্ষুদ্রস্বার্থ বিড়ম্বিত মানুষ, নিঃসঙ্গ রণক্লান্ত মানুষ বিপ্লবের জীবনের জোয়ারে স্নান করে পবিত্র হয়ে নেয়, মুক্ত হয়ে ধন্য হয়ে নেয়, পূর্ণ হয়ে নেয়। মানুষের বুকে আজ যে পুঞ্জীভূত ক্লেদ রাশি রাশি জমে গিয়ে জীবন বিষাক্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে সেই ক্লেদ, সেই ক্লান্তি, সেই নীচতা, সেই ক্ষুদ্রতা বেদনাকে যদি আজ কোনো একটা কিছু প্লাবনের মত ধৌত করে নিয়ে যেতে না পারে তবে নূতন জীবন ও নূতন সমাজ গঠন করা অসম্ভব। 'মানুষের চেয়ে সমাজ বড়' এই গভীর সত্যকে বহন করে নিয়ে আসে বিপ্লব, জলের ঘটটি শূন্য হয়ে গেলে যেমন জলাশয় থেকে পূর্ণ করে নিতে হয়, তেমনই যখন একটি মানুষের জীবন শূন্য, বিপন্ন, ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে পূর্ণ করে নিতে হয়—সমাজ সম্পদ থেকে, সমাজ চেতনা থেকে। সকল মানুষেরই মৃত্যু আছে, কিন্তু সমাজের মৃত্যু নেই মানুষের অভিধান তাই চিরকালের মানুষকে অর্থাৎ সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার অভিযান, তাই মৃত্যু দিয়ে তৈরি হলো জীবনের অব্যাহত গতিকালের সীমান্তকে অতিক্রম করবার অভিযান। কিন্তু যখনই মানুষ সমাজকে বঞ্চিত করে নিজে অমরত্ব লাভ করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে সেই সর্বনাশা ভুল ভাঙবার জন্য সমাজে বিপ্লবের উপস্থিতি হয়েছে। মোহমুক্ত নির্বোধ মানুষকে বারে বারে সমাজের সেই "বিশ্বরূপ" দেখাতে হয়েছে। আরো এক বিরাট মহান বাণী নিয়ে আসে বিপ্লব। অন্ন বস্ত্র বসতি ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না--মনুষ্যত্ব না থাকলেও মানুষ বাঁচতে পারে না। পশুরা যেমন পশুত্ব না থাকলে বাঁচতে পারে না, মানুষও তেমনি পশুত্ব গ্রহণ করলে বাঁচতে পারে না। এইটাই প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান---সমাজের চিরন্তন শিক্ষা ও অভ্যাস। অতএব যখনই মানুষকে পশু বানাবার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই ঘটেছে মানুষের বিপদ, যেমন যখনই বন্য পশুকে মানুষ বানাবার চেষ্টা হয়েছে তখনই সে পশুর শক্তি ও সাহস গেছে ও হয়েছে মানুষের ভক্ষ্যবস্তু। যদি আমরা পশুকে অনুকরণ করতে চাই তবে অচিরে আমরা বন্য পশুর শৃগালের খাদ্য হতে বসব অথবা নিজেরা নিজেদের শেষ করে ফেলব। যদি পশুকে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকতে হয় তবে পশুত্বকে পরম যত্নের সঙ্গে বাড়াতে হবে, হতে হবে তাকে নির্মম, হিংস্র, জিঘাংসুক ও ভয়ানক কুৎসিত। তার দাঁত, নখ, সব রাখতে হবে সদা সতর্ক , কিন্তু পশু আজ পরাজিত, মানুষের কাছে পরাজিত। আজ যদি কোন পশুকে বেঁচে থাকতে হয় তবে তা একমাত্র মানুষের আশ্রয়ে মানুষের দয়াতেই বেঁচে থাকতে হবে। জীবন পশুত্বের পথে ব্যর্থ হতে বসেছিল বলেই বনমানুষকে মানুষ হতে হয়েছিল ---সমাজকে অধিকার করে। সমাজের সাহায্যেই বনমানুস সেই অবশ্যম্ভাবিত পরাজয় থেকে রক্ষা পেল। মুক্তি পেল, সমাজই বনমানুষের পশুত্ব ঘুচিয়ে দিল তাকে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব কি? মনুষ্যত্বের রূপ যুগে যুগে পরিবর্তন হলেও তার অন্তর্নিহিত একটি প্রধান সত্তা আছে—সে হল তার সমাজচেতনা, মানুষের জীবনের ঐক্যবোধ। অপর মানুষের উপরে সমাজের, সমাজের উপর আমার কি দায়িত্ব সেই বোধটাই হল মনুষ্যত্ববোধ। নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষের কোনো ন্যায়, নীতি বা

মনুষ্যত্বের দরকার নেই, সামাজিক জীবনেই দরকার হয় ওসব গুণের, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মানসিক আধারই হল মনুষ্যত্ব— যুগে যুগে তার রূপ পরিবর্তন হয়েছে। এইজন্য যে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি পাল্টিয়েছে — অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেউ প্রভু, কেউ দাস, কেউ মালিক, কেউ শ্রমিক, কেউ শোষক, কেউ শোষিত রূপে অবস্থিত হয়েছে এবং কালে কালে একদিন প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক মানুষের সহযোগী না করে দাঁড় করিয়েছে প্রতিযোগী হিসাবে, শত্রু হিসাবে অর্থাৎ মানুষের সেই আসল সামাজিক ঐক্য বোধটাই অগ্রাহ্য করে– ফলে মনুষ্যত্ব হয়েছে উধাও, মানুষ হয়েছে বিপন্ন। আজ বিপ্লব মানুষের সেই মনুষ্যত্বের বাণী নিয়ে উপস্থিত অর্থাৎ মানুষের সেই সামাজিক ঐক্য নিয়ে উপস্থিত, তাই কম্যুনিজমে এসেছে community of all men on earth এর বাণী নিয়ে , সমস্ত মানুষ শুধু সমান নয় —এক, এই মহামিলনের বাণী নিয়ে এসেছে আজ আমাদের বিপ্লব।

এই মহামিলনের পথে শেষ করতে হবে শ্রেণী ধ্বংস করতে হবে স্বার্থ তাই শোষণকারীরা স্বার্থবাদীরা হয়েছে আতঙ্কিত বিক্ষুব্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে নেতা—বহুযুগের নির্যাতন ও কপটতার বিরুদ্ধে, ঘনিয়ে উঠেছে শেষ লড়াইয়ের পটভূমিকা। যুদ্ধ মানুষকে পশু বানাতে চায় –বিপ্লব মানুষকে দেবতা বানায়। যে সব দার্শনিক বলেন পশুত্বে হয়নি মনুষ্যত্বেও হবে না—চাই দেবত্ব, চাই অতিমানবত্ব— তারা মানুষের অমূল্য সম্পদ এই মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন উৎস দেখতে পান নি – সে উৎস যে বিপ্লব তাকে অস্বীকার করতে গিয়ে পথ খুঁজে পান নি, নিরাশ হয়ে ভগবানের কাছে দেবত্ব ভিক্ষা করেছেন – কিন্তু দেবত্বের কল্পনা যে মানুষই করেছে এবং দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব আকাশে জোর করে প্রার্থনা করলে পাওয়া যায় না- পাওয়া যায় অপর্যাপ্ত রূপে, পাওয়া যায় প্লাবনের রূপে পাওয়া যায় বিপ্লবের মধ্যে। তারই জন্য আমাদের এই বিপ্লবের সাধনা এবং তারই জন্য বলে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। যুদ্ধ শত্রুকে পরাজিত করে বড় হতে চায়--বিপ্লব শত্রুকে কেবল পরাজিতই করে না অভিভূত করে দেয়। কেননা শত্রু লক্ষ লক্ষ—সমগ্র সৈনিক, পুলিশ আছে তারা জনতা—তাদের শুধু পরাজিত করাই কাজ নয়, এবং সম্ভবও নয়, তাদের অভিভূত করে দিতে হবে এবং আসল শত্রু মুষ্টিমেয় বনিকের দলটাকে তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে—শত্রু সৈন্যদের মোহমুক্ত করতে হবে, তাদের ভয় ভেঙে দিতে হবে সে শক্তি যুদ্ধের নেই আছে বিপ্লবের। অতএব কমরেডস যখন বলছি যুদ্ধের জন্য তৈরি হোন—নির্মম আঘাত দেবার ও নেবার জন্য তৈরি হোন-- তখন আমাদের সামনে কেবল জেল, অনশন, গুলি, লাঠি, গ্যাস ও বোমার চিত্রটাই আনা হচ্ছে না— এই মহান বিপ্লবের আবির্ভাবের কথাটা স্মরণ করুন। এই দু'কূল ভাসানো প্রাণের জোয়ারটাকে লক্ষ্য করুন। অতএব নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতে শিখুন যে কী এক মহান বিপ্লবের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন। এই সংগ্রামটাকে অভিশাপ হিসাবে মনে না করে আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করুন, তবেই আসবে নির্ভীকতা, আসবে মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস। সমস্ত আকাশ নূতন যুগের নবচেতনায় লাল হয়ে উঠেছে—এসেছে নবজীবনের অমর মন্ত্র- মানুষের মুক্তির ডাক। বাংলার এক ক্ষুদ্রপল্লী অথবা শহরের এক ক্ষুদ্র বস্তি থেকে আজ যে আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে এই বাণী নিয়ে উপস্থিত হতে পারছি এর চেয়ে আর বড় গৌরবের বিষয় কিছুই নেই। জীবন আমাদের সার্থক হতে চলেছে, যুগ যুগান্তরের বেদনা, কামনা, ধ্যান, সাধনা ও কল্পনা আজ যে আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির মধ্যে দিয়েও প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি চান? ইতি—

১০/১/৫০

দ্বাদশ চিঠি

আজকের সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি আমাদেরকে একটা অরাজনৈতিক মারদাঙ্গা বা গুণ্ডাদল হিসাবে প্রচার করতে চায় এবং তাই অপবাদ দিয়ে চুপচাপ আমাদের মেরে ফেলতে চায়। আমাদের যে কোনো আদর্শ বা রাজনৈতিক মত আছে বা উদ্দেশ্য আছে সে কথাটার জবাব দেওয়া এদের সম্ভব নয় বলেই যেন আমাদের কোন কথা শোনেইনি এমনি ধরনের কপটতা করে চলেছে। এই বিষয়ে সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টি পর্যন্ত একজোট অর্থাৎ সরকারি মার ও অন্যান্যদের উপেক্ষা এই দুইয়ে মিলে আমাদিগকে গুণ্ডা বা ব্যানডিট আখ্যা দিয়ে চেপে দিতে সচেষ্ট, কিন্তু আসলে এদের চেষ্টা করে উপেক্ষা করতে হচ্ছে -সহজভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ্য সভায় বলবার মত সাহস এদের নেই। কেননা আমরা যা চাই তা ওরা চায় না, এই কথা জনতাকে বলবার মত সাহস এদের নেই। আমরা বিপ্লবী সাম্যবাদকে বিপ্লবী পথ দেখিয়ে আনতে ব্যস্ত, আমরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চীন বিপ্লবের এক মাত্র সন্তান সমর্থক — আমরা রুশ বিপ্লবেরও প্রকৃত সন্তান — আমরা কম্যুনিস্টদের নিয়মতান্ত্রিকতা ভেঙে দিয়ে তাদের বিপ্লবে সহযোগিতা করতে ডাকি— আমরা যে কোন উপায়ে হোক দেশে সত্বর বিপ্লব চালু করতে চাই — যারা এসব চায় না অথচ সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি নাম ভাঙিয়ে খায়, তারা জনসাধারণের কাছে সে কথা বলতে পারে না—তাহলে জনসাধারণ তাদের স্বরূপ বুঝে যেলবে এবং মেরে তাড়াবে। অতএব আমাদের কাজের কোনো পরিষ্কার সমালোচনা করা, আমাদের পথের কোনো বিচার করা—এসব তাদের একদম সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতে হয়। কেবল আসে বৈঠকখানায় মতামত করে বেড়ায় যে আমরা গুণ্ডা ছাড়া আর কিছুই নই, ঠকাবিতা ছাড়া আর কিছুই করছিনা, আর তাছাড়া আমরা দুই চার জনা লোক তাও শেষ হয়ে গেছে। ওদের যদি আমাদের বই দেন পড়বে না, পড়তে ভয় পায়। আমাদের যে কোনো বইপত্র আছে, কাগজ ছিল একথা যেন জানেই না এমনি জ্ঞানপাপী।

একবার দমদম জেলে কম্যুনিস্ট বন্দীরা সরকারের কাছে জানালো যে আমাদের বন্দীদের সাথে তারা কোনো একত্র দাবি রাখবে না —যেহেতু তারা রাজনৈতিক বন্দী—কিন্তু আমাদের বন্দীরা রাজনৈতিক নয়। সকল দলের মধ্যে যারা আমাদের নিকটতম— যাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা পদে পদে আহ্বান করে থাকি- যাদেরকে সাহায্য করবার জন্য আমরা বারে বারে খবর দিয়েছি -যাদের সঙ্গে একমাত্র আমরা বি পি টি উ সি'তে থাকি তাদের এই ব্যবহার? পরে এদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবো. কিন্তু এইটুকু শুধু বুঝে রাখুন ঈর্ষা, দুর্বলতা ও নিজেদের কলঙ্কিত রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসটাকে ঢাকবার জন্য ওরা আজ এত স্বার্থকতার যে আমাদের রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য করতেও ওদের ভয়।

কিন্তু যে কোন সমঝদার লোক যার রাজনীতি সম্পর্কে কিছুটাও জানাশোনা আছে সে ই বলবে, দল হিসাবে আমরা ছোটই হই আর বড় হই রাজনৈতিক মতামত আমাদের মত আর কারো এত সুষ্ঠু, স্পষ্ট, এত পরিচ্ছন্ন ও এত বেগবান নয়, আজ একথা আপনারা গর্বের সঙ্গে বলে দিতে পারেন—অনেক বই, অনেক কাগজ আমাদের ছিল না বটে, কিন্তু যতটুকু আছে সারবস্তুই আছে। ওর অর্দ্ধেকের অর্ধেক সারবস্তুও অন্যান্যদের টন টন কাগজে নেই, বিস্তর রাবিশ ওরা লিখেছে ও ছড়িয়েছে বটে—যার বেশিটাই ভুল ও অপদার্থ ও ইতিহাসের আবর্জনা। ওরা বোধ হয় আজ নিজেরাই নিজেদের ছায়ায় লজ্জিত। আমাদের যেটুকু আছে

তার একটি কথাও ভুল প্রতিপন্ন হয়নি—ওরাই চুরি করেও ধীরে ধীরে তা অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছে, তাই তাদের এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ এবং আমাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য এত ব্যস্ততা। আমাদের অস্তিত্ব ওদের কাছে একটা পরম লজ্জার কারণ। আমাদের বক্তব্য তাই ওদের অস্থির করে তোলে। সাইকো-এনালিসিসে একটা ব্যাপার আছে। তাতে দেখায় যে লোক তার জীবনে এমন কোনো একটা জঘন্য কামনা ও বাসনার তাড়নায় পড়েছিল যা সে প্রকাশ করতে পারে না—সে ঘটনাটিকে গোপন করার জন্য সেই ঘটনাটিকে বেমালুম ভুলে যায়—শত চেষ্টা করেও তাকে সে কথা স্মরণ করানো যায় না। স্মৃতির পট থেকে সব কথা সে উদ্ধার করতে পারে কিন্তু উক্ত ঘটনাটিকে কিছুতেই পারে না, খুব সযত্নে তা এড়িয়ে চলে চেতন ও অবচেতন উভয় মন দিয়ে। বোধ হয় এই ধরনের একটা কমপ্লেক্স আজকের সরকার ও অন্যান্য দলগুলিকে পেয়ে বসেছে। তাই তারা নিজেদের ও জনতাকে বোঝাতে চায় যে বিপ্লবী সাম্যবাদীদের কোন রাজনীতি নেই, আদর্শ নেই। আমাদের রাজনীতি নেই তবে রাজনীতি আছে কার? আমাদের আদর্শ নেই তো আদর্শ আছে কার?

ওরা বেশ জানে যে দেশে যদি কারো রাজনৈতিক আদর্শ থাকে সে আমাদেরই আছে, কিন্তু তাহলে ওদের উপায়? যদি জনসাধারণ সে কথা জেনে ফেলে, এবং আমাদের কথায় ও কাজে কান দিয়ে ফেলে—তবে তো ওদের উপায় নেই, তাই একজোট হয়ে তারা আমাদের বিবৃত গোপন প্রচার অথবা ধাপ্পা বা চুকলি দিয়ে চাপতে চায়, আর সরকার যখন আমাদের উপর বর্বর অত্যাচার করে—বন্ধ গাড়িতে গুলি করে হত্যা করে—তখন একটি প্রতিবাদ, একটি শব্দ করে না, এমন কি সরকারের সাথে খবরটা পর্যন্ত প্রচার করতে চায় না।

দমদম বসিরহাট সম্পর্কে আজো যে সরকার কোনো মামলা শুরু করতে পারেনি সে কেবল তাদের একই উদ্দেশ্য থেকে। দমদম বসিরহাট সম্পর্কে কোনো প্রমাণযোগ্য কিছু পায়নি বা মামলা দাঁড় করবার মত কিছু পায়নি, -এর মত হাস্যকর যুক্তি আর কিছু নেই। বরং এত তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছে, যে একমাসের মধ্যেই ওরা মামলা শুরু করতে পারত কিন্তু সে মামলা করতে গেলে তা হতো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং তার প্রভাব জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হোত ও প্রভাবিত হোত রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে। কিন্তু ও ওরা হতে দিতে কুণ্ঠিত—অতএব চোর ডাকাত খুনে হিসাবে দাঁড় করানো যায় কিনা তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ও সে জাতীয় তথ্য তৈরি করতে গিয়ে একটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। হয়তো ভেবেছে এক বছর পর হয়তো আর কারো সে কথা মনেও থাকবে না অন্তত যা খুশি তাই একটু বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে, কিন্তু যতদিন যাবে তত আমাদের কথা আরো মূল্যবান হবে—যত কীর্তিই অপর দল করুক আমাদের কাছে তা হার মানতে বাধ্য হবে। এবং গোপনে আমাদের পথকে স্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোনো পথ থাকবে না—যদি তারা জনতার সঙ্গে চলতে চায়।

অতএব কমরেড্‌স! শত্রুদের প্রচারে ও কপট বিপ্লবীদের চুকলিতে নিজেরা এক মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত বা বিচলিত হবেন না, কখনো নিজেদের গুণ্ডামী দোষে দোষী মনে করবেন না। সরকারের কি ক্ষতি আমরা করছি—ধনীদের কতটা ঘায়েল আমরা করেছি, তাদের প্রতি আমরা যতটুকু অন্যায় করেছি সেজন্য আমরা এতটুকু লজ্জিত নই, কিন্তু নিরীহ জনসাধারণের এতটুকু ক্ষতি কেউ কোনোদিন করিনি—মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে মিটিংএ এনে বোমা ও লাঠি খাওয়াইনি—আমরা যা করেছি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে করেছি—নিজেরা মরে জনতাকে মরতে ডেকেছি—নিজেরা বেঁচে অন্যকে এগিয়ে দিইনি, যা করেছি, যা বলেছি, ও বলে থাকি—তার মূল্য আগে নিজেরা দিতে প্রস্তুত হয়েছি ও নিজেদের উপর দিয়ে তা আগে চালিয়েছি।

আদর্শ ও রাজনীতি ছাড়া আমাদের যে আর কোনো পরিচয়ই নেই, একথা শীঘ্রই স্বীকৃত হবে। একদিন মাও-সে-তুংকে পৃথিবীর কাগজগুলি ব্যানডিট্ বা দস্যু বলে চালাতে চেয়েছিল—আজো মালয়ের বিপ্লবীদের ব্যানডিট্ ছাড়া আর কিছু বলে না। আজ সে আমাদের গাল দিচ্ছে, তাইতো বুঝতে হবে আমাদের ঔষধে কাজ দিচ্ছে—কেননা শত্রু ও কপটদের কাছ থেকে গালাগালি ছাড়া আমরা আর কিছুই আশা করি না—ওরা যদি প্রশংসা করে তবে বুঝতে হবে আমরা বিপথে চলেছি এবং তাদের ক্ষতি করতে পারছি না। জনসাধারণ আমাদের গাল দেয় না—শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। আমাদের কথা প্রচারিত না হতে দিলেও আমাদের নীরবতা ওদের বিশ্রী চিৎকারের চেয়ে বেশি কার্যকরী—বেশি সরল জানবেন।

কোনো প্রতারণা, কোনো প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে নিজের মনে সংঘাতের আয়োজন—সংগঠন ও চেতনা গড়ে যান। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে যেমন হাতি কান দেয় না—তেমনি বাজারের গুজবে কান দেবার প্রয়োজন নেই আমাদের। শীঘ্রই প্রমাণিত হবে কারা দস্যু আর কারা আদর্শ বিপ্লবী। ইতি—

১৩/১/৫০

ত্রয়োদশ চিঠি

দলের পুনর্গঠন, শক্তিবৃদ্ধি, আঘাত করবার ও আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা—এ সমস্ত যাবতীয় কাজ আর যা আমাদের করতে হবে তার একটা প্রধান অন্তরায় আজ আপনারা কি তা ভেবে দেখেছেন?

সবচেয়ে বড় বাধা হলো এমন একটা জিনিস যা আমাদের মধ্যে রয়েছে। সে হচ্ছে কর্মীদের মধ্যে চিন্তাশীলতার অভাব। সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, আজ্ঞানুবর্তিতা, রাজনৈতিক জ্ঞান ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিস দরকার, তার অভাব খুব হচ্ছে না—তথাপি কাজটা উন্নত হচ্ছে না। একমাত্র চিন্তাশিলতার অভাবেই আমাদের কাজের উন্নতি হচ্ছে না ; কর্মীদের উন্নতি হচ্ছে না।

বেশিরভাগ কর্মীই মেসিনের মতো কাজ করেন, যেটুকু হুকুম আসে সেটুকু করে নিতে পারলেই যথেষ্ট মনে করেন—অথবা দিনরাতও কেউ কেউ কাজ করেন—কিন্তু তার কাজের সমষ্টিগত ফলাফল ও উদ্দেশ্য কি তা একটি নজর দিয়েও দেখেন না—তাছাড়া বেশির ভাগ কর্মীই কাজ খুঁজে পান না, কাজের অসুবিধা দূর করতে পারেন না ; আধাখামচা কাজ ও আধাখামচা চিন্তায় জড়িয়ে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতা এনে ফেলেন এবং কালে কালে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়টুকুও খুইয়ে বসেন। অটোমেশন বা রোবোট বলতে যা বোঝায় সেই দশাপ্রাপ্তি হয়। এরই জন্যে শেষ পর্যন্ত বই পড়তে ইচ্ছা করে না ; খবরের কাগজটাও রীতিমত পড়বার অভ্যাসটুকুও রাখতে পারেন না। এরই জন্যে আমরা আশানুরূপ দায়িত্বশীল কর্মী পাই না। চিন্তার বিরুদ্ধে, চেতনার বিরুদ্ধে যেন একটা অরুচি এসে গেছে। একথা অবশ্য ঠিক যে শারীরিক পরিশ্রম করা কত সহজ, মানসিক শ্রম তত সহজ নয়, কেননা মনের বয়স শরীরের চেয়ে অনেক কম। সব জীবজগতে একমাত্র মানুষের মধ্যেই তার বিকাশ হয়েছে এবং তাও অনেক পরে—বহু হাজার বছর আমরা মন না নিয়েই—অন্তত মনের বর্তমান শক্তির কোনো খবর না নিয়েই একমাত্র গতর দিয়ে চলেছি। তারপর শরীরের বিবর্তন গেছে ফুরিয়ে, শরীরের সীমা গেছে নির্দিষ্ট হয়ে ; কিন্তু মনের বলে মানুষের শক্তি এতটা বেড়েছে। মনের উন্নতি হয়েছে শ্রমের ধারায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান বুদ্ধি বেড়েছেঃঅন্ধ আবেগ ও প্রেরণাকে চেতন মন নেতৃত্ব করতে

সক্ষম হয়েছে। এখানেই মানুষের প্রতিষ্ঠা আজ বিশ্বজগতে এত উঁচুতে। কিন্তু বহু মেহনত বহু শ্রম করে এই চিন্তাকে ও চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত রাখতে হয়— কেননা প্রতি মুহূর্তে আমরা আবার সেই চিন্তাহীন অটোমেটিক স্তরে ঝিমিয়ে পড়তে চাই (relapsing tendency to an ignorant state of bliss)। মনের এই পরিশ্রম আমাদের ভাল লাগে না , শরীর আমাদের রাতদিন কাজ করে চলেছে—আমরা কখনো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে ক্লান্ত হই না, আমরা কখনো খাদ্যবস্তু হজম করতে বিরত হই না— কিন্তু যা দিয়ে চিন্তা করি সেই মনটাকে আমরা যতোটা সম্ভব অকেজো রাখতে চাই, যেন শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিরকাল বেঁচে থাকুক একমাত্র মস্তিষ্কটা বাদ দিয়ে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায়—যখন সভ্যতার নানা সংকট দেখা দিয়েছে—যখন সভ্যতার অভিযান মন্দা হয়ে এসেছে , যখন মানুষের চরিত্র সবদিক থেকেই পতনশীল হয়ে উঠেছে এবং বাস্তব জীবন যতই অর্থহীন জটিল সংকটে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তখন এই মনের বিরুদ্ধে এবং মস্তিষ্কের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিতৃষ্ণা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সভ্যতার এইটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। মানুষ মদে খেয়ে মনটাকে স্তব্ধ করে রাখতে চায় এবং তাকেই বলে আনন্দ, জেগে থাকার চেয়ে ঘুমিয়ে থাকাটাই বেশি ভালবাসে, মাথার চেয়ে হাত পা পেটটাকেই বেশি যত্ন করে বেশি দাম দেয়—যদিও জানে মাথাটা ছাড়া এগুলি অচল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা হাঁটতে পারি কিন্তু চিন্তার ব্যাপারে একফুট এগুতেই কতো বিদ্রোহ। এই কি সভ্যতার ইতিহাস নয় বিশেষ করে অধঃপতনের যুগে? এমন কি যারা পড়ুয়া লোক বিদ্বান লোক তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অটোমেশনের মতো পড়ে যেতে পারে, কিন্তু পঠিত বইখানা নিয়ে পাঁচ মিনিট ভাবতে পারে না। এইসব লক্ষণ আজ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। এগুলি বিপদজনক লক্ষণ বলে জানবেন। এরই ভিতর আত্মসমর্পণের ও অধঃপতনের যাবতীয় বীজ উপ্ত আছে। মনটাকে মেরে ফেলবার এই যে ইচ্ছা তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মালিকেরা, যারা শুধু মদ, গাঁজা, ভাঙ দিয়েই জনতাকে ভুলিয়ে রাখতে ব্যস্ত নয়, একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে গান, নাচ, ছবি, শিক্ষা, প্রচার, সিনেমা, সাহিত্য এমন কি জ্ঞানবিজ্ঞানকে পর্যন্ত এই কাজে লাগিয়েছে। অতএব অটোমেটিকের উপর স্বয়ংচালিত শক্তির উপর যত আমরা ঢলে পড়ব তত আমরা তাদের নিষ্পেশনযন্ত্রের খোরাক হবো মাত্র। এর বিরুদ্ধে আজ মনকে বিদ্রোহী করা চাই। এই স্বয়ংসিদ্ধতার অপচক্র থেকে মানুষকে টেনে বের করে আনা চাই, সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ও জিজ্ঞাসু স্বভাব আনা চাই।

এই অটোমেটিক বা স্বয়ংচলমানতার প্রতি আকর্ষণ যে আমাদের মধ্যে কত গভীর সুদূরপ্রসারী তা হয়তো আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন নি। বহুলোক আজকাল সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ চায়, সাধারণ মানুষমাত্রেই আজ সাম্যবাদী একথাও বলা চলে। কিন্তু সমাজতন্ত্র চাওয়ার পিছনেও একটা অটোমেটিকের লোভ হাত দেখিয়ে চলেছে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র স্থাপিত হলে আমাদের আর ভাবতে হবে না—চিন্তা, যার অপর নাম হয়েছে আজ দুশ্চিন্তা তার হাত থেকে রেহাই পাবে—খাওয়া থাকা ছেলেপিলে মানুষ করা ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন সমাজগত স্বয়ং-চলমান ব্যবস্থায় মিটে যাবে —আর যেন ভাবতে হবে না। তবে কি সমাজতন্ত্রে আমাদের ভাবনার বালাইয়ের সাথে সাথে মনেরও বালাই চুকে যাবে? এটা ভাববার কথা। বিশেষ করে সাম্যবাদী আন্দোলন যত বাড়ছে- দেশে দেশে কম্যুনিস্ট যত গজাচ্ছে, তত কম্যুনিস্টদের চিন্তাহীনতাও যেন বেড়ে চলেছে —সুদূর মস্কো নগরের কোন এক নেতৃত্বের কাছে যাবতীয় চিন্তা করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেরা অটোমেশনের মতো কাজ করে চলেছে। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হলে এই জাতীয় স্বয়ংচলমানতা ও মননহীনতা বেড়ে যাবে না তো? এটা কেবল কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যদের

প্রযোজ্য বলে আত্মপ্রসাদ লাভ কবার কোনো সুযোগ নেই। কেননা এমন কি আমাদেব মধ্যেও-- বিপ্লবী কম্যুনিস্টদের মধ্যেও কি এই মননহীনতা ও চিন্তাজগতে পরনির্ভরশীলতাব লক্ষণ অবর্তমান? আমরাও কি কোনো এক সেণ্ট্রাল কমিটিব উপব যাবতীয় চিন্তার ও দায়িত্বের দায় চাপিয়ে দিয়ে অটোমেটিকের মতো হাঁ-করে বসে থাকি না?

অথচ একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সভ্যতা যত বাড়বে অটোমেটিক ব্যবস্থা ত বাড়বে। শহরে জল সাপ্লাই থেকে শুরু করে তাপ বিদ্যুৎ আলো প্রভৃতি যেমন অটোমেটিক উপায়ে আমাদেব আয়াসসাধ্য হচ্ছে ততই আমরা সভ্য হচ্ছি—এমনি করে একদিন খাদ্যবস্তু ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন যত অটোমেটিক উপায়ে নিষ্পন্ন হবে—ভাবনার ও চিন্তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ততই আমরা সভ্য হলাম এবং প্রকৃতির অপরাজিত শক্তির উপর নজর দিতে সময় বেশি পেলাম। অতএব সভ্যতায় অগ্রগতি অটোমেটিকের অগ্রগতি দিয়েও মাপ করা যায়। বিজ্ঞান ফলিত বিজ্ঞানের পথে সভ্যতার যন্ত্রশক্তিতে বিকশিত হতে থাকে তার প্রত্যেকটি স্তর (achievement)-কে তার প্রত্যেকটি আবিষ্কারকে সামাজিক প্রয়োজনের অটোমেটিক ব্যবস্থার স্থায়ী করে নেয় এবং মানুষের শক্তি ক্রমশ ধাপের পর ধাপ বেড়ে চলে। চিন্তাব ক্ষেত্র থেকে অটোমেটিক ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টাই হল মানুষের শক্তিবৃদ্ধিব কারণ। তাইতেই একজন টাইপিস্ট যদিও দেখে দেখে টাইপ রাইটারেব অক্ষরগুলির সাথে পরিচিত হয়েছে—কিন্তু যত তাড়াতাড়ি তার মনেব ক্ষেত্রে থেকে অটোমেটিক আঙুলের ক্ষেত্র বেড়ে যাচ্ছে ততই তার সার্থকতা কায়েম হচ্ছে। এমনি করে সর্টহ্যাণ্ড লেখক চেতন জগৎ থেকে শুরু করে অবচেতন অটোমেটিক ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এই যে নামতার জ্ঞান এগুলি প্রথমে বুদ্ধিসাধ্য ও চেতনক্ষেত্রেব কাজ ছিল একটি শিক্ষার্থীর পক্ষে, কিন্তু এই নামতা জ্ঞানটাকে তাকে অটোমেটিক করে নিতে হয় শুধু এই জন্য যে পরবর্তী অঙ্কগুলি বুঝতে ও কষতে তার সুবিধা হয়। এইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রকেও আমরা অটোমেটিক করে থাকি জ্ঞানের অভিযানকে আবও বেগবান করার জন্য। মুখস্থ করা মানে জ্ঞানকে শবীরস্থ করা ও শরীবের অন্যান্য কাজের মতো অটোমেটিক কবে নেওয়া। ক্রমটোমিটার যন্ত্র এভাবে জ্ঞানকে বাস্তব অটোমেটিকে পরিণত করছে গণিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকেই বাড়ানোর জন্য। এবই নাম বস্তু ও মনের দ্বন্দ্বমূলক সংগতি ও বিকাশ। এমনি করে শিল্পীর তুলি ও হারমোনিয়াম বা পিয়ানোর আর্টিস্টের আঙুল অন্ধ অটোমেটিক হবার উপবেই সার্থকতা অর্জন করছে যাব নাম হোল blind process, শিল্পীব মন যেমন তার আঙুলগুলিকে অটোমেটিক করে দিয়ে শেষ হয় না—বরং শিল্পী মন অযথা অন্তবায় থেকে মুক্ত হয়ে নূতনতর ও সূক্ষ্মতম অনুভূতিকে রূপ দেবার স্বাধীনতা পায় তেমনি সমাজতন্ত্র কায়েম হবার পর মানুষের মন ও দায়িত্বের শেষ হয় না—মানুষের মন অযথা পরিশ্রম ও পশুশ্রমের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর জয় ও অভিধানের জন্য মুক্ত করে নেয়। সমাজতন্ত্র অবশ্যই আমাদের জীবনেব অটোমেটিক ক্ষেত্র বাড়িয়ে দেবে। খাওয়াদাওয়া বেঁচেবর্তে থাকাব এই অতি প্রাথমিক প্রয়োজন থেকে মনকে করবে মুক্ত, কিন্তু মুক্ত এই জন্যই করবে যে মানুষের মন তাতে আরও যুগান্তকারী আবিষ্কার ও জয়ের পথে এগিয়ে গিয়ে মুক্তি পাবে। মন আবও সক্রিয় হবে—মন শরীরের ক্ষেত্রকে আবো বেশি নিশ্চিত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বৃহত্তর দায়িত্ব হাতে নেবে। এই কথা যেন আমাদের স্মরণ থাকে—নইলে আমাদের বর্তমান পশুত্ব থেকে নিস্তার নেই এবং ভবিষ্যৎও নেই।

তার মানে এই কথা বলছি না—আসুন আমরা কাজকর্ম ফেলে দিয়ে সবাই চিন্তা কবতে বসে যাই। এব চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। কাজ ছাড়া চিন্তা করবেন কি দিয়ে? রীড ছাড়া হারমোনিয়ামের সুর ওঠানো সম্ভব? আমরা যে চিন্তাশীল হবো—তা হবো

কি করে? চিন্তার ভিত্তি ও উপাদান কিসে? কাজে—কাজের তাগিদে, চিন্তা ও মননসশক্তির জন্ম কাজ থেকেই—কাজেরই প্রয়োজনে। প্রতি পদে মানুষের কাজে যে অন্তরায় জন্মায়, সমস্যা সৃষ্টি হয়, পরাজয় মানতে চায় তাকে অতিক্রম করার জন্যই দরকার হয় চিন্তার, জ্ঞানের, দর্শনের। যা কাজহীন চিন্তা, তা চিন্তা নয়—ভাবনা। ভাবুনেগিরিটাকে দর্শন বলে ভুল করবেন না। মার্কসবাদের মতে দর্শন হল কাজের চোখ guide to action এই Action বা কাজটাই যদি না থাকে তবে দর্শন পালাতে বাধ্য, বিজ্ঞান কুসংস্কার হতে বাধ্য।

কাজেই কোথা থেকে আমরা আমাদের মধ্যে মননশীলতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রবাহিত করতে পারি? এবং রবিঠাকুর যে বলেছেন 'চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার অন্তরালে" সেই চেতনাকে ভাবুনেগিরির থেকে কি দিয়ে মুক্তি দিতে পারি? মন তো চুপ করে থাকে না, একটা না একটা ব্যাপার নিয়ে সর্বদাই আইঢাই করে ছুটে বেড়াচ্ছে, ভাবনার চক্রবাক (vicious circle) তৈরি করে করে চলেছে—তার থেকে চিন্তাশীলতাকে একমুখী ও বৈজ্ঞানিক করা যায় কি উপায়ে?

আপনার নিজের কাজের দিকে মনটাকে ফেরান— দেখবেন আপনার কাজের কত সমস্যা, কত অন্তরায়, কত বাধা। এই বাধাগুলি কি করে অতিক্রম করা যায় এই নিয়ে আপনার চিন্তা ও মনকে নিযুক্ত করুন। সমস্যা ও অন্তরায়গুলি দূর করার জন্য এই যে আপনার মনের ব্যবহার তাই থেকেই মিলবে তার চিন্তার খোরাক ও সমস্যা দূরীকরণের উপায়। আপনি যখন চিন্তা করতে শুরু করবেন—দেখবেন দেখতে দেখতে শুধু আপনার সমস্যা দূর করবার যাবতীয় উপায়ই আবিষ্কার করতে পারছেন তা নয়, এমন কি আপনার সহকর্মীদের সমস্যার সমাধানের কাজেও সত্যিকার সাহায্য করতে পারছেন এবং সম্পূর্ণ দলটার রাজনৈতিক পথ ও মতটাকে প্রশস্ত করবার জন্য আপনার ক্ষমতা বেড়েছে। কোনো নীতির ভুল ত্রুটি বিচার করবার আপনার শক্তি জন্মেছে, আপনি একজন সত্যিকার চিন্তাশীল লোক হতে চলেছেন এবং দলের নেতৃত্বকে শক্তিমান ও নির্ভুল করতে পারছেন, নিজের মধ্যে তখন আপনি যথেষ্ট আনন্দও পাবেন। আপনার অন্ধ কাজটা তখন সত্যি দৃষ্টিশক্তি পাবে—যেমন অন্ধপাখির ছানাটির একদিন চোখ ফোটে।

একটু চিন্তা করতে আরম্ভ করুন—আপনার হাতের কাজগুলি দিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করুন। সমস্ত দিনের মধ্যে একটি বারের জন্য—আধঘণ্টার জন্যও স্থির হয়ে বসে বা শুয়ে নিজের সমস্ত কাজটার উপর একবার চিন্তার সমগ্র দৃষ্টিটা ফেলে দেখুন। আধঘণ্টা দিয়ে শুরু করুন, দেখবেন একদিন চিন্তা করাটাও অনেকটা অভ্যাস বা অটোমেটিকের মতো সহজ হয়ে গেছে।

তাছাড়া যত আমরা আমাদের কাজ নিয়ে চিন্তা করতে সমর্থ হব—মতের সংখ্যা বা মতানৈক্য তত বাড়বে না— তত আমরা বেশি একমত হতে পারব এবং ততই সহযোগিতা বাড়বে। কেননা যতই আমরা সত্যিকার বৈজ্ঞানিক চিন্তা করতে পারব ততই আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individualism) ও ভাববিলাসিতা (Subjectivism) দূর হবে ও ততই আমাদের সংহতি বৃদ্ধি পাবে ও বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটবে—সকল মানুষের বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে যে সাধারণ সত্তাটা আছে তার নিকটবর্তী হবো, ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বহুর শক্তি স্পর্শ করতে পারব—ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে বহুর শক্তি স্পর্শ করতে পারব—ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে বহুর অসীমতার প্রাণস্পর্শ পাব এবং কখনো ভেঙে পড়ব না। ইতি—

২৫/৬/৫০